(স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যক্রমানুসারে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত)

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস

ও

সাম্প্রতিক সমস্যা

অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা-প্রকাশনী

৩৪৫ গাঙ্গুলী বাগান গভঃ কলোনী -

কলিকাতা-৪৭

প্রকাশনা এবং কপিরাইট—তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ই জুলাই, ১৯৫৯।

প্রাপ্তিস্থান :
স্টুডেন্টস্ হোম
৯-এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
জে, এন, ঘোষ এণ্ড সন্স্
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
উষা পাবলিশিং হাউস
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয় চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

সূচীপত্র

প্রথম অংশ

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
প্রথম :	সূচনা ; প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শন	১—৬
দ্বিতীয় :	প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা	৭—৫৫
	বিশেষ পাঠ :	৫৬—৬১
তৃতীয় :	মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা	৬২—৮০
চতুর্থ :	আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষা : মিশনারী প্রচেষ্টার আদিপর্ব	৮১—৯০
পঞ্চম :	পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ	৯১—১০২
ষষ্ঠ :	পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন	১০৩—১৩১
সপ্তম :	শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ	১৩২—১৫৭
অষ্টম :	শিক্ষা চেতনার নূতন দিগন্ত : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন	১৫৮—১৭৩
নবম :	শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন	১৭৪—১৮৭
দশম :	স্বাধীনতার যুগ—শিক্ষা পরিকল্পনা : স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	১৮৮—১৯১
একাদশ :	স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা	১৯২—২১১
দ্বাদশ :	স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্যা	২১২—২৪১
ত্রয়োদশ :	স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্যা	২৪২—২৫৯
চতুর্দশ :	স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা	২৬০—২৭৯
পঞ্চদশ :	স্বাধীন ভারতে নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা	২৮০—২৮৯

প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভাগ

প্রথম :	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে (কোঠারি রিপোর্ট)	২৯০—৩১৪
দ্বিতীয় :	পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা	৩১৫—৩২৫
তৃতীয় :	শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা	৩২৬—৩৩৯
চতুর্থ :	দশ ক্লাস—বারো ক্লাস।	৩৪০—৩৬৮

দ্বিতীয় অংশ

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
প্রথম :	ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব	১—৪
দ্বিতীয় :	ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব	৫—৫৭
তৃতীয় :	সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা	৫৮—৮০

তৃতীয় অংশ

শিক্ষাগুরুদের কথা
(শিক্ষাতত্ত্বের বিবর্তন , রুশো, পেস্তালোৎসি,
হার্বার্ট, ফ্রোয়েবেল্, গান্ধী, স্পেন্সার,
মন্তেসরি, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ) ১—১১২

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

সবদেশে ও সব যুগেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন নিয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবর্তন। **তারই সাথে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা।** এই বিবর্তনের মূলে আছে সমাজের জীবন দর্শন, ধর্মচেতনা, রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ, রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি, অর্থনৈতিক জীবন ও শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যাদি। এইসব উপাদানের ভাঙাগড়াই জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলে, এবং গড়ে তোলে শিক্ষা ব্যবস্থাও। বস্তুতঃ **প্রতিটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় চরিত্রের প্রভাব পড়বেই।** একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ মানবগোষ্ঠী, বিশেষ ভাষায় ভাব বিনিময় করে সুদীর্ঘ সাধনায় যখন ভাবের সমানুভূতি সৃষ্টি করে, তখনই সে মানবগোষ্ঠীর একটি নিজস্ব সত্তা গড়ে ওঠে। জাতীয় চরিত্রের এই বিশিষ্ট সত্তা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিশেষ রূপ দেয়।

প্রতি জাতির শিক্ষাব্যবস্থাই তার নিজস্ব সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষাব্যবস্থাই জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আবার জাতির বিস্তৃত আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিতও হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। সুতরাং জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা সেই জাতির নতুন সংস্কৃতি, নতুন মূল্যবোধের স্রষ্টা, এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। বর্তমানের মধ্যে যেমন রয়েছে আগামী দিনের ইশারা, তেমনি আছে অতীতেরও পরিচয়। **আমাদের বর্তমান শিক্ষার রূপ ও সমস্যাকে বোঝবার জন্য, আর ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য তাই অতীতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।** ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে একটি স্বাধীন উন্নতিকামী জাতির নতুন জীবমানস প্রতিফলিত। অন্যদিকে সুদীর্ঘ ইংরেজ শাসন ও ঔপনিবেশিক জীবনের পুঞ্জীভূত কুপ্রভাবের অন্ধকার আজও আমাদের শিক্ষাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। একদিকে যেমন বর্তমানের আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন প্রগতিশীল জাতির সর্বশেষ ভাবধারায় আমরা প্রভাবিত, অন্যদিকে তেমনি আমাদের সুপ্রাচীন

ও সুমহান সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রভাবও রয়েছে। তাই বর্তমানকে যথার্থভাবে জানতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কথা জানতেই হবে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিভিন্ন প্রভাব :—আর্যদের আগেও ভারত ছিল সুসভ্য মানুষের দেশ। আর্যরা তাদেরকে জয় করলেও প্রাচীন অনার্যদের সাংস্কৃতিক অবদান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। উভয় সংস্কৃতির যুক্তবেণী রচিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আর্য ও অনার্য উভয়েরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী হয়েছিল। **এই জাতীয় চরিত্রই বিধৃত রয়েছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে।** আজকের মতই প্রাচীনকালেও ধর্মচেতনা আর জীবনদর্শন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। **জীবনদর্শনই শিক্ষাদর্শনের মূল। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ধর্মসাধনা সে যুগের জ্ঞান সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।** আজও যেমন **ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ** মানুষকে প্রভাবিত করে, অতীত ভারতেও তেমনি করেছিল। সমুদ্রতীরে যে জাতি পালিত, বাণিজ্য-লক্ষ্মী তার সহায় হয়েছে। মরুভূমির স্বল্পতা যে জাতিকে ক্ষুধিত রেখেছে, সেই জাতি দিগ্‌বিজয়ের সাধনায় মেতেছে। **প্রকৃতির অকৃপণ দানে পুষ্ট গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত অঞ্চলে (ধ্রুব মধ্যদেশ) স্থায়ী বাসভূমি গড়ে কঠোর জীবন যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল বৈদিক ভারতবাসী। তারই ফলে অবকাশ পেয়েছিল বেদ, উপনিষদ ও দর্শন, সাহিত্য গড়ে তোলবার।** তপোবন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন, "সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল ·····যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে-রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপ বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন: যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। ·····তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে **বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত** যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায় দিয়েছে, ফল-ফুল দিয়েছে, কুশ, সমিধ জুগিয়েছে। তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল।······ এইজন্য নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা

বোধের দ্বারা নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।" [রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' প্রবন্ধ থেকে]

নিখিল চরাচরকে এক করে পাবার এই সাধনাই বৈদিক সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। আর **ঐ সংস্কৃতিকেই লালন করেছে সেই বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা।**

আজকের দিনে দেখি সমাজের শ্রেণীবৈষম্য ভাবমানসকে প্রভাবিত করে। **প্রাচীন ভারতের বর্ণবৈষম্য সে যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।** বৈদিক যুগের উষাপর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত আর্যদের কৃষিজীবন সে যুগের শিক্ষাকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছিল। বৈদিক সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে রাজশক্তির উত্থান, বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, জটিলতর প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য ও বিশেষীকরণের ফলে সমাজ জীবনে যে নূতন উপাদান সঞ্চারিত হয়েছে, তারই ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিমাণগত ও গুণগত রূপান্তর হয়েছে। **প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির এই পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের পরিচয় রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনে।**

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন :—প্রতিটি দেশে ও যুগে শিক্ষা চেতনা সেই দেশ ও যুগের জীবন দর্শন দিয়ে প্রভাবিত হয়। বৈদিক ভারতের দার্শনিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে শিক্ষাচেতনার সম্পর্কের মধ্যে এ সত্য আরও প্রকট। অদ্বিতীয় 'বিরাট পুরুষ' সৃষ্টি সুখে নিমগ্ন হলেন। "অসীম" বিকশিত হলেন 'সীমা'য়। 'বিরাট' হলেন 'ক্ষুদ্র'। একক, অনন্ত ও অরূপ রূপ নিলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে। তাই **প্রত্যেক মানবসত্তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক বৃহত্তর সত্তার অংশ, এক পরম উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার পরিপূরক।** আপন পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে সেই পরম উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণ করতে হবে—এই হল মানবসত্তার চরম ও পরম কর্তব্য। সৃষ্টি সুখের আবেগে পরম "এক" বহু হয়েছেন। নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে পুরাতনের বিলুপ্তি এনেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত হয়েছে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের চক্র। 'বিরাট পুরুষের' আত্মযজ্ঞে সৃষ্ট এই জগত তাই অনন্ত বিবর্তনে চলমান।

মানুষও এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চক্রের অধীন। মানুষকে সীমিত পার্থিব জীবন গ্রহণ করতেই হয়, আবার মৃত্যুও তার অবশ্যম্ভাবী। এই জীবনে যদি মানুষ নিজেকে এবং নিজের পাশবিকতাকে আত্মসংযমের যুপকাষ্ঠে বেঁধে দিতে পারে, তবেই জীবন সীমার বাইরে অসীম পরমের সন্ধান পেতে পারবে। প্রাচীন ভারতের ঋষি তাই সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে একটি মাত্র সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ স্রষ্টার অসীম ও চিরন্তন নৈতিক অধিরাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ—যেন একই বীণার

নানান সুর। ভারতের ঋষি মনে করেছেন সেই **পরম সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু**। পার্থিব জীবন যেন স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাময়িক প্রবাসী জীবন। মানুষের **প্রকৃত লক্ষ্য জীবনের সেই প্রকৃত আবাসে ফিরে যাওয়া—পরম সত্তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া**। জীবনের মৌলিক সত্যানুসন্ধান করে মৃত্যুকে জয় করে মানব শক্তির সঙ্গে পরমশক্তির চূড়ান্ত মিলনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষয় লয়ের পরিসমাপ্তিই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথা।

শিক্ষাদর্শনঃ **বৈদিক শিক্ষা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ও জীবনবোধেরই অংশ**। 'বেদ' শব্দের অর্থই জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগের পথে অধ্যাত্ম মার্গে উন্নীত হয়ে পরম পরিণতি লাভ করা যায়। পরম জ্ঞান এবং তদনুসারী জীবনবিধি ও মূল্যবোধকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে বৈদিক শিক্ষা দর্শন। চিন্তা ও মননের পথে হবে স্বরূপানুভূতি, তপস্যার পথে হবে সত্যানুসন্ধান, এবং দিব্যদৃষ্টিতে পরম জ্ঞান পাওয়ার মধ্য দিয়ে হবে মোক্ষলাভ। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু আহরণ করে, কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেই মোক্ষলাভ হয় না। **পরমের অনুভূতিই পরম প্রজ্ঞার পরিচয়**। **শিক্ষার পরম লক্ষ্য প্রকৃত আত্মসংযমের পথে স্বরূপানুভূতি তথা অমৃতানুভূতি**। যোগক্ষেম বা ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে মনকে জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত করে নেবার ক্ষমতার নাম চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এই অবস্থায় পৌঁছতে পারলেই স্বরূপানুভূতি সম্ভব। **তাই 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ'কেই ব্রাহ্মণ্য ভারতের শিক্ষা-দর্শনরূপে অভিহিত করা যায়।**

শিক্ষা সম্পর্কে ধারণাঃ—ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছিল। অজ্ঞানতাই বন্ধন, আর জ্ঞানই মুক্তি—এই ছিল প্রাচীন ঋষিদের মত। তাই প্রাচীন ঋষিরা শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন সাধনা; মনোরাজ্যে দীপশিখা, প্রকৃত প্রজ্ঞা, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণ, বন্ধন থেকে মোক্ষ। তাই শুধু শুষ্ক জ্ঞান আহরণ করা নিরর্থক, অনুশীলন ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জ্ঞান রূপান্তরিত হবে শক্তিতে। সুতরাং **মননের সাহায্যে নিজের ও পরমাত্মার শক্তিকে আবিষ্কার করাই প্রকৃত শিক্ষা**। এই পথেই ঋষিদের যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত করেছিল। প্রাচীন যোগীর পক্ষে আত্মসংযম অবশ্য পালনীয় বলেই **সংযম সাধনা ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ**। যোগ ও সংযমের মিলনে গঠিত হয়েছিল নিয়মানুবর্তিতার ধারণা। সুতরাং **আত্মোন্নতির জন্য জীবনব্যাপী সাধনাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রত্যয়।**

শিক্ষার আদর্শঃ—বৈদিক শিক্ষার মূল আদর্শ ছিল আত্মোৎসর্গের আদর্শ।

আত্মোৎসর্গের শিক্ষা বলতে বোঝায় পিতৃঋণ, **ঋষিঋণ**, দেবঋণ পরিশোধের জন্য সন্তান, যজ্ঞ এবং অধ্যয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্তব্য **সম্পাদন**। যজ্ঞ সম্পাদনে মানুষ আত্মানুভূতির পথে ক্রমশ বিশ্বানুভূতি তথা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করে। তখনই মুক্তি আসে, তখনই পরমের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে।

কিন্তু বৈদিক ঋষি ইহজীবনকে অস্বীকার করে পারলৌকিক জীবনের কল্পনা করেন নি। পরমের ইচ্ছাতেই পার্থিব জীবন। এই জীবনের বৈতরণী পার হয়েই পরমাত্মার সাথে পুনর্মিলন সম্ভব। **তাই পার্থিব দায়িত্বও স্বীকার করা হয়েছে।** সেইজন্য জ্ঞানদান, শিক্ষাদান ও সামাজিক দায়িত্ব পালনকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হত। শিক্ষাকে অধ্যাপন, শিক্ষা ও বিনয়—এই তিন রূপেই অভিহিত করা হয়েছিল। প্রাচীন ঋষি **সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য** সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই শিষ্যকে পুত্র, স্বামী এবং পিতা হিসাবে কর্তব্যের শিক্ষাও দিয়েছেন। সমাজ জীবনে বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হত না বলেই দণ্ডনীতি, ধনুর্বেদ শ্রাদ্ধ-বিধান এবং **বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হত।** চরিত্রবল জ্ঞানবলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য ছিল। তাই নৈতিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং **ব্রহ্মচর্য পালনের পন্থায় আত্মশুদ্ধিও ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।**

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের শিক্ষা, এই দুই উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যাকেও দুইভাগে পরিবেশন করা হত। পরম জ্ঞান লাভের জন্য তিন বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত অনুশীলন করা দরকার। আত্মসংযম ও যোগসাধনার পথে এই অনুশীলন করতে হবে, একেই বলা হয়েছে **পরাবিদ্যা**। অপরদিকে পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুশীলনকে **অপরাবিদ্যা** রূপে শিক্ষার অংশ করা হয়েছে। পরা-অপরার সার্থক সমন্বয়ে সফল হয়েছে বৈদিক শিক্ষা।

তিনটি অধ্যায় :—বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগকে মোটামুটি তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করা চলে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই বিভিন্ন অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। **আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর থেকে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ বৎসর** পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রথম অধ্যায়টিকেই "বৈদিক যুগ" বলা হয়েছে। এই যুগটিকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে:—ঋক্ বেদের যুগ; পরবর্তী বেদের যুগ, এবং সূত্র সাহিত্যের যুগ। সমগ্র অধ্যায়টির শ্রেষ্ঠ অবদান বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত এবং সর্বশেষে সূত্র সাহিত্য। **দ্বিতীয় অধ্যায় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে মৌর্যোত্তর কাল পর্যন্ত।** এই অধ্যায়ে বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। শুধু বৌদ্ধ প্রভাবই নয়, মৌর্যোত্তর

যুগে বহির্ভারতীয় প্রভাবের ফলেও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় পরিবর্তন আসে। আর **শুঙ্গ** ... **থেকে কনৌজের পতন তথা তুর্কী-আফগান বিজয় অভিযান ... সময়কেই তৃতীয় অধ্যায় রূপে ধরা যায়।**

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরাভিযান, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার সহ অবস্থান, বৌদ্ধ শিক্ষায় নানা মতের অভ্যুত্থান এবং ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত ও গ্রহণ বর্জন, এই সকল বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের শিক্ষায়। ভারতীয় শিক্ষার এ যুগের রূপটিই ধরা রয়েছে বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণে।

কিন্তু পর্যটকদের ভারত চিরদিন থাকেনি। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরব মধ্যযুগে হলো বহুলাংশে স্তিমিত ও প্রাণহীন। ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করে নূতন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবেশ করলো ভারতের দেহে। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি কোন রকমে আত্মরক্ষা করে চললো। তারপর এলো পশ্চিম থেকে আবার নতুন প্রভাব। নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে এলো নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি। "প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষা" অবক্ষয়ের মধ্যে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করলো মাত্র। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই বিবর্তনই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. **Discuss the different factors which influenced ancient Indian Education.** ("ভারতীয় শিক্ষায় বিভিন্ন প্রভাব" শীর্ষক অংশ)

2. **Analyse the Concept and Philosophy of Education in ancient India in relation with Hindu Philosophy.**
("প্রাচীন ভারতীয় দর্শন", "শিক্ষাদর্শন" এবং "শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা" শীর্ষক অংশে আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ করে একের পর এক গ্রথিত আকারে উপস্থিত করতে হবে)।

3. **Discuss the aims of education in ancient India.** ('শিক্ষার আদর্শ' অংশ—পারলৌকিক উদ্দেশ্য, পার্থিব দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য; বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য, নাগরিকতার শিক্ষা; গার্হস্থ্য দায়িত্বের শিক্ষা, নৈতিক উন্নতি ও চরিত্র গঠন তথা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য)।

4. **Point out the distinctive phases in the history of ancient Indian Education.** ("তিনটি অধ্যায়" অংশ—(ক) খ্রীঃ পূঃ ২০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০০; বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগ। (খ) খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীঃ ২০০; (গ) খ্রীঃ ২০০ থেকে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)।

এবং আরও বিষেষীকরণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের সহায়ক হিসেবে গণিত, জ্যোতিষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যা ; একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার সৃষ্টি।)

2. Discuss the teacher.pupil relation in Gurukul or in Vihar. (গুরুকুল—আবাসিক গৃহবিদ্যালয় ; বেতনহীন, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা , পিতৃতুল্য গুরু, কর্তব্য ও সমষ্টিজীবনের শিক্ষা, নির্দিষ্ট শ্রম। এর পরে 'গুরু-শিষ্য সম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনাব সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে হবে।

বিহার—যৌথ পরিচালনায় আবাসিক বিদ্যালয়। 'গুরু-শিষ্য সম্পর্ক' (বৌদ্ধ শিক্ষায়) আলোচনাব সারাংশ উল্লেখ করতে হবে।

3. Give an account of the curriculum and methods of instruction in the ancient Brahmanic system of education. Did the Buddhist system bring about any improvement in these respects ? ('পাঠ্যক্রম' শীর্ষক আলোচনাব সারাংশ উপস্থিত কবে হিন্দু পাঠ্যক্রম এবং 'বিদ্যালয় জীবন ও শিক্ষণ পদ্ধতি' শীর্ষক আলোচনার সারাংশ দিয়ে পদ্ধতির কথা বলতে হবে। বৌদ্ধ যুগে পরিবর্তন সম্বন্ধে বৌদ্ধ শিক্ষা আলোচনার পর্যায়ে 'উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রম' শীর্ষক আলোচনা থেকে পাঠ্যক্রমেব প্রসার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হবে। 'পদ্ধতি' শীর্ষক অংশ থেকে শিক্ষণ পদ্ধতির সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৌদ্ধ শিক্ষায় তর্ক, আলোচনা, শিক্ষাভ্রমণের উপব বিশেষ গুরুত্ব এবং প্রাকৃত ভাষার সমাদর সম্বন্ধে বলা দরকার)।

4. Analyse the concept of discipline in ancient Indian education. How far could discipline be considered as synonymous with education ? ('বিদ্যালয় জীবন ও শিক্ষণ পদ্ধতি' শীর্ষক আলোচনার সারাংশ থেকে নিদিধ্যাসন, তপস্যা, যোগ এবং নিয়মবিধির সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতার সম্পর্কের কথা এবং 'ব্রহ্মচর্য' শীর্ষক আলোচনা থেকে নিয়মানুবর্তিতার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। বৌদ্ধ ব্যবস্থায় পব্বজ্জিতের অনুজ্ঞা এবং 'বিহার জীবন' সম্পর্কে আলোচনার শেষাংশ উল্লেখ্য)।

5. Discuss how Buddhist Philosophy influenced the concepts and aims of Buddhist education. ('বৌদ্ধ ধর্মে জীবন চেতনা' শীর্ষক আলোচনা থেকে নির্বাণতত্ত্ব এবং শীল' এর তাৎপর্য আলোচনা করে 'শিক্ষার ধ্যান ধাবণা' শীর্ষক অংশেব সাবাংশ)।

6. Attempt an estimate of the extent and quality of womsen'

education in ancient India and the factors that had influenced it. ('প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা' শীর্ষক আলোচনাটি সম্পূর্ণ উপস্থিত করতে হবে)।

7. Give an account of professional and vocational education in ancient India. 'বৃত্তি, কারিগরি ও শিল্প শিক্ষা' শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই উপস্থিত করতে হবে)।

8. How did State and Society fulfil obligations to education in ancient India? ('শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক অংশটি সম্পূর্ণই বলতে হবে)।

9. Describe the major types of educational institutions of ancient India and compare them with their present prototypes, if any. ('প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক অংশের সম্পূর্ণ সার সংক্ষেপ তৈরি করতে হবে)।

10. Mention the names and some of the characteristics of educational centres in ancient India. (সংক্ষেপে 'প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র' অংশটি উপস্থিত করতে হবে)।

11. Give an account of any of the following centres of learning (Universities)—Taxila, Nalanda, Vikramsila, Nadia. Mention some aspects and features which may have some importance even for today. (প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলাদা ভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের জন্য বলা দরকার—আবাসিক ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষা, যৌথ পরিচালনা, রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীন পৃষ্ঠপোষকতা, বাছাই করে ভর্তির নীতি, শিক্ষকের খ্যাতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি, বহু ধরনের পাঠ্য, নিয়মানুবর্তিতা, আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি)।

12. Discuss the salient features of either Brahmanical or Buddhistic education. ('ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান', এবং 'বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান' শীর্ষে আলাদাভাবে দুইটি আলোচনা করা হয়েছে। সে দুটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপনা দরকার)।

13. State and critically comment on the resemblances and differences between the Brahmanical system and the Buddhist system of education. Was the Buddhist system a rival to the

other ? ("ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা" শীর্ষক অংশ। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ। শিক্ষা ব্যবস্থা, নিয়মানুবর্তিতা, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রভৃতিতে সাদৃশ্য। পাঠ্যক্রমের বৈষম্য ক্রমে সাদৃশ্যে রূপান্তরিত। বেদ, বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রমের অস্বীকৃতি, সংঘ জীবন, গণতান্ত্রিক প্রসারতা, স্ত্রী শিক্ষা সংকোচন, গণশিক্ষা ও প্রাকৃত ভাষা, উপনয়ন ও পব্বজ্জা কিংবা সমাবর্তন ও উপসম্পদা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের তাৎপর্যে বৈষম্য। যুগপৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরিপূরক)।

14. **Make an evaluation of the Buddhist system of education with special reference to its contributions, and account for its decline.** ("বৌদ্ধ শিক্ষাব অবদান ও বিলুপ্তিব কারণ" শীর্ষক আলোচনাটি সংক্ষিপ্তাকারে বলতে হবে)।

15. **Make an evaluation of the Brahmanical system of education with special reference to its contributions as well as defects and limitations.** (প্রথম অংশেব জন্য "ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" অংশের সারসংক্ষেপ প্রয়োজন। দ্বিতীয় অংশেব জন্য "ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সামগ্রিক বিচার" অংশেব সারাংশ)।

16. **Give a general account of ancient Indian education and point out its influence upon modern education. What are the special features which we may odopt even today ?** (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা চেতনা ও শিক্ষার আদর্শ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতি, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, ব্রহ্মচর্য ও নিয়মানুবর্তিতা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা দবকাব।

দ্বিতীয় অংশের জন্য "প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সাম্প্রতিক মূল্য" এবং "আধুনিক শিক্ষায় প্রাচীনতার প্রভাব" শীর্ষক অালোচনাব সারাংশ বলতে হবে)।

17. **Describe some of the most important rituals connected with education in ancient India and comment upon the significance of each.** (উপনয়ন—১০পৃঃ; উপকর্ম ও উৎসর্জন ১৫ পৃঃ, সমাবর্তন ১৬পৃঃ, বৌদ্ধ শিক্ষায় প্রব্রজ্যা ২১পৃঃ এবং উপসম্পদা ২৭পৃঃ)।

18. **Write notes on :—Mantra, Samhita, Hota,** (এই তিনটির আলোচনা রয়েছে ৭পৃঃ), **Upanayana** (১০পৃঃ); **Brahmacharya** (১১পৃঃ); **Samavartana** (১৬পৃঃ) **Pavajja**; **Samanera** (এই দুটি ২১-২২ পৃঃ), **Upasampada** (২৭পৃঃ), **Gurukul** (৮পৃঃ); **Sutra** (১৪ পৃঃ); **Parishad** (৩৪পৃঃ); **Tapovana** (৩৪পৃঃ); **Vihar** (২১-২৩পৃঃ); **Yoga** (১৬পৃঃ); **Acharya** (১২ এবং ২২ পৃঃ); **Brahmavadini** (২৮ পৃঃ)।

বিশেষ পাঠ

(১) **ঋক বেদ'এর যুগে শিক্ষা**—ম্যাক্সমূলারের মতে ঋক হলো প্রাচীনতম গ্রন্থ। কিন্তু ঋকের মধ্যেও বৈদিক সভ্যতার উষাপর্ব বিধৃত হয়নি, হয়েছে মধ্যাহ্ন পর্ব। অবশ্য ঋকই হলো হিন্দু চেতনার ভিত্তি, "সরল জীবন, উচ্চ মননের" পরিচয়। এক বিশেষ জীবন শিল্পের কথা ধরা রয়েছে ঋক বেদ'এ।

ঋক বেদও অবশ্য ক্রমবিবর্তনের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিব ধারা। ১০১৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ ঋক বেদ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ড, ম্যাকডোনেল, উইণ্টারনিজ প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত যে শত শত বছরেব পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হলো ঋক বেদ। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মূর্ত থেকে বিমূর্ত চেতনার প্রসার। সংহিতা সংকলনের জন্যও এক বিশেষ রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। শব্দ চয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ প্রণালীতে সংকলন করা হয়েছে। এই সংকলন পদ্ধতিই ভাষা ও ছন্দ তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল। এই তত্ত্বই "শিক্ষা" নামে পরিচিত। সংকলনের শেষে অনুক্রমণিও সংযুক্ত হয়েছে।

বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজন (ছয়জন) ঋষিই ঋকের স্রষ্টা বলে কথিত। এঁদের সঙ্গে সৃষ্টিব কাজে যুক্ত হয়েছিল ছয়টি মণ্ডল। পরিশেষে অন্যান্য ঋষি পরিবারের রচনা, ঋষি কণ্বের সৃষ্টি, সোম শ্লোক এবং অন্যান্য বিবিধ শ্লোকও ঋক বেদ'এ স্থান পেয়েছে। সুতরাং পরিণামে ১০৫৮০টি শ্লোক নিয়ে গঠিত ১০২৮টি প্রার্থনার সংকলনেই রূপ পায় ঋক বেদ। সংহিতা সংকলনের মধ্যেই দুটি পর্যায় বোঝা যায়। প্রথম পর্যায় ছিল ঋষিদের শ্লোক সৃষ্টির যুগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল আলোচনা, সংকলন, সম্পাদনার ভিত্তিতে "ঋক বেদ সংহিতার" আকারে সংরক্ষণের যুগ।

ঋক বেদ'এ প্রতিফলিত শিক্ষাপদ্ধতি ছিল "তপস্যা"। সে যুগের শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি দুইটি পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল। প্রথমটি ছিল তপস্যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সত্যদর্শন। তপস্যাকে সায়ন ব্যাখ্যা করেছেন কৃচ্ছ তা, ত্যাগ এবং কষ্টসহিষ্ণুতা রূপে। সমাধি-নিমগ্ন তপস্যাক্লিষ্ট মুনিরাই ছিলেন অতীন্দ্রিয় সত্যের দ্রষ্টা। ঋষিদের সত্যদৃষ্টিতে পাওয়া অপৌরুষেয় জ্ঞানই ছিল শিক্ষার বিষয়বস্তু। এই জ্ঞান সংরক্ষণ এবং বংশপরম্পরায় প্রসার নির্ভর করতো ঋষিদের পুত্র এবং শিষ্যকুলের উপর। এ থেকেই সৃষ্টি হলো শিক্ষণ পদ্ধতি। যেহেতু শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু প্রতি শিষ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। ছাত্রদের ক্ষমতা অনুযায়ীই পদ্ধতি

স্থির করা হতো। সায়নের মতে ছাত্র ছিলেন তিন শ্রেণীর—মহাপ্রাজ্ঞ, মধ্যমপ্রাজ্ঞ এবং অল্পপ্রাজ্ঞ।

শিক্ষণের প্রথম ধাপই ছিল বেদ'এর আবৃত্তি। যতি, মাত্রা ও ছন্দের সাহায্যে উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এর ফলে সাত ধরনের ছন্দ সৃষ্টি হয়। নির্ভুল আবৃত্তি ছিল একান্তই আবশ্যিক। আবৃত্তির সহায়ক হিসেবেই সৃষ্টি হয় লিপি। কিন্তু শুধু মুখস্থকেই আবৃত্তি বলা হতো না। চিন্তা, মননশীলতা এবং অনুধাবন ছিল আরও মূল্যবান। ঋষিদের জ্ঞানকে ভাষায় রূপ দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি হলো বৈদিক সংস্কৃত। সাধারণের কথ্য ভাষাকেই পণ্ডিত পরিষদ অথবা ব্রাহ্মণ সংঘ সংস্কার করে নিয়ে এই ভাষার সৃষ্টি করেন। তাই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে শিক্ষার প্রথম ধাপই হলো মাতৃভাষার চর্চা! আব একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে প্রাজ্ঞ পরিষদে পিটিয়ে গড়িয়ে সংস্কৃত ভাষাব সৃষ্টি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ই এইসব পরিষদেব অধিবেশন হতো।

ঋক বেদ'এর যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক গৃহ বিদ্যালয় (গুরুকুল)। ব্রাহ্মণসংঘই ছিল সর্বোচ্চ স্তরেব শিক্ষা পাওয়ার স্থান। নিরুক্ততে বলা হয়েছে যে শিক্ষক কখনও বিচ্ছিন্নভাবে শব্দাংশ পডাবেন না। যাদের ব্যাকরণের জ্ঞান নেই এমন ছাত্রকে পডাবেন না। অনাবাসিক ছাত্রকে পডাবেন না। এবং স্বল্পমেধার জন্য যারা অনুপযুক্ত, তাদেরকেও পডাবেন না। এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে সে যুগেই ব্যাকরণের উদ্ভব হয়েছিল; এবং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যকালীন শিক্ষার রীতি চালু হয়েছিল।

ঋক বেদ'এ বিধৃত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল—(ক) গুরুকুল ব্যবস্থা, (খ) ছাত্রের নৈতিক পবিত্রতা এবং যোগ্যতা, (গ) নিয়মানুবর্তিতার জন্য ব্রহ্মচর্য, (ঘ) পিতা-পুত্র তুল্য গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, (ঙ) কর্তব্যে অবহেলাব জন্য স্কুল থেকে ছাত্র বহিষ্কার করায় শিক্ষকের সম্পূর্ণ অধিকার। (এই আলোচনার সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যোগ করলেই আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হবে)।

(২) **সূত্র যুগের শিক্ষা**—বৈদিক যুগে তিনটি পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছিল—(ক) ছন্দের যুগ—যখন ঋষিদের সত্যদৃষ্টি ভাষায় রূপ পেয়েছিল, (খ) মন্ত্র—যখন সেই সত্যজ্ঞান সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল, (গ) ব্রাহ্মণ—যখন এই জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য রচনার পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের হাতে বিষয়বস্তু সংগঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণের পরবর্তী পর্যায়ই ছিল সূত্রের যুগ।

ততদিনে বিষয়বস্তুর পরিমাণ এবং রকমভেদ অনেক বেড়ে গিয়েছে, অথচ একদিকে বৌদ্ধ ধর্মের চাপ এবং অপর দিকে বহিরাগত সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতির চাপে জ্ঞানবস্তু বিকৃত কিম্বা বিনষ্ট হওয়ার বিপদ দেখা দিয়েছে। সুতরাং সহজতম পন্থায় এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে বিষয়বস্তু সংরক্ষণের প্রয়োজন হলো। বিজ্ঞানীসুলভ কর্মকুশলতার ভঙ্গিতে এই দায়িত্বই পালন করলেন সূত্রকাররা। রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে নিবিষ্টচিত্তে ১২ বছর ধরে বেদ অধ্যয়নের সুযোগও হয়তো বিনষ্ট হতে চলেছিল। সুতরাং বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য ও পবিত্রতা রক্ষা করেও মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে সূত্রের আকারে ছোট ছোট শ্লোকে সমস্ত পাঠ্য-বিষয়কে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টাই জনপ্রিয় 'সূত্র সাহিত্যের' সৃষ্টি করে। সূত্র সাহিত্যই তখন পাঠ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

সূত্র সাহিত্যকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) শ্রৌত সূত্র (অনুষ্ঠান বিধি, যজমানের পক্ষে প্রয়োজনীয়), (খ) গৃহ্য সূত্র (সাধারণের প্রয়োজনে আইন ও আচারবিধি অর্থাৎ স্মৃতি, এবং ব্রাহ্মণদের জন্য অনুষ্ঠান বিধি, অর্থাৎ শ্রুতি), (গ) ধর্ম সূত্র, (ঘ) শুল্ব সূত্র (ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কীয়)।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই চার শ্রেণীর সূত্র সাহিত্যে রূপান্তর করা হয়। এই সাথে পরিপূরক সাহিত্য হিসেবে সৃষ্টি হয় পরিশিষ্ট, প্রয়াস, পদ্ধতি, কারিক, অনুক্রমণি। তাছাড়া বৈদিক বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সহায়ক হিসেবে শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প, জ্যোতিষ—এই ষড়বেদাঙ্গও সুগঠিত হয়। বেদাঙ্গ ছাড়াও জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এ সময়ে অনেক অগ্রসর হয়। 'উপবেদ' আকারে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যও প্রচলিত হয়। (অর্থশাস্ত্র এই শ্রেণীর বিষয়)। অবশ্য তখনও প্রধানতঃ ধর্মচেতনাই সাহিত্য তথা শিক্ষাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই যুগ ছিল বিশেষজ্ঞতার যুগ, বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের যুগ। তাই বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (সূত্র বিদ্যালয়) সৃষ্টি হয়। অশ্বলায়ন, সংখ্যায়ন প্রভৃতি ছিলেন এ ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এই যুগে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে আবদ্ধ হয়। পাঁচ বছরে বিদ্যারম্ভ, তারপরে চূড়াকর্ম এবং তারও পরে উপনয়নের বিধি ও বিধান পাকাপাকি রূপ পায়। অপরাধী এবং শূদ্র ছাড়া সকলেরই উপনয়নের অধিকার থাকে। (বৌধয়ন অবশ্য তাদেরকেও গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন)। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার্থীর জন্য উপনয়নের বয়স, সময় এবং অনুষ্ঠানবিধিও রচিত হয়। উপনয়ন লাভে ব্যর্থ হলে সাবিত্রী পতিত তথা সমাজপতিত বলে গণ্য হতো। সুতরাং তিনটি

উচ্চ বর্ণের জন্য উপনয়ন—তথা ব্রহ্মচর্য, তথা শিক্ষা ছিল পরোক্ষে বাধ্যতামূলক। ছাত্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমন তালিকাবদ্ধ করা হয়, শিক্ষকের গুণাগুণ, দায়িত্ব এবং অধিকারও তালিকাবদ্ধ করা হয়।

তখনও পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো মৌখিকভাবে এবং লিখিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই। তার ফলে স্মৃতিশক্তির চর্চা হতো, শিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিসম্পর্ক গড়ে উঠতো, জ্ঞানের প্রসারকে শিক্ষকই নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতেন। ব্যক্তিগত শিক্ষণের ফলে জ্ঞান সংরক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা থাকতো। জ্ঞানের রক্ষক ও প্রসারক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেন শিক্ষক। তখনও শিক্ষকের গৃহেই ছিল বিদ্যালয়। মৌখিক শিক্ষণের ফলে শিক্ষার জন্য সময় লাগতো বেশী। তাই একটি বিষয় বিশেষভাবে আয়ত্ত করাই ছিল তখনকার বিধি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুকুল ছাড়াও পরিষদ এবং শিক্ষা-উপনিবেশগুলি (অগ্রহার) শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ সুলভ পড়াশুনার জন্য 'সূত্র বিদ্যালয়' সৃষ্টি হয়। পুরাতন বৈদিক স্কুল অথবা চারণের নব সংস্করণ হিসেবেই এগুলির সৃষ্টি। কল্প, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতিও বিশেষ বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিত্বের বিকাশ অর্থাৎ অন্তঃপ্রকৃতির পরিমার্জনা করে চরিত্র গঠন। বৈদিক যুগের মতই স্ত্রী শিক্ষার ঐতিহ্য চলে এসেছিল। শিক্ষকরা যেমন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, ব্রহ্মবাদিনীরাও ছিলেন তেমনি শ্রদ্ধেয়া। ম্যাক্সমূলারের মতে সংকটকালে অব্রাহ্মণ শিক্ষকরাও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই যুগেই নির্দিষ্ট ভাবে বিদ্যা-স্নাতক, ব্রত-স্নাতক, বিদ্যা-ব্রত স্নাতক—এই তিন শ্রেণীতে স্নাতকদের চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে একটি শিক্ষাব্যবস্থা সূত্র যুগে পূর্ণতা লাভ করে।

এই ব্যবস্থার কিছু কিছু চিহ্ন আজও আমাদের জ্ঞান ও কর্মে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। চারণদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন যে পণ্ডিতশ্রেণী, যারা মুখস্থের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পাহাড় বহন করতেন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন না, তাঁরাই হলেন 'বৈদিক'। যারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ক্রিয়াতে পারঙ্গম হয়েছিলেন, তাঁরাই হলেন 'শ্রোত্রিয়'। গৃহ্য সূত্রে বিশেষজ্ঞরা হলেন 'যাজ্ঞিক'। তেমনি কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষে পারদর্শীরাও পেলেন বিশেষ বিশেষ উপাধি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইসব বিভাগ এবং বিভিন্ন উপাধি আজও পর্যন্ত রয়েছে।

(৩) মহাকাব্যের যুগে শিক্ষা—পাণিনির রচনায় মহাভারত এবং

যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি মহাকাব্যগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। দুর্যোধন এবং রাবণের পতন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে মহাকাব্য রচনার এবং মূল কাটামোটি তৈরীর কাজ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু আরও পরবর্তীকালে মহাকাব্যের সংকলন ও সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়। সে যুগের ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক চিত্র, জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রতিফলিত হয় মহাকাব্যে। সমাজব্যবস্থা ততোদিনে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই সমাজের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ স্থান পেয়েছে মহাকাব্যেও। বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রমের আদর্শগুলিও সুগঠিত হয়েছে।

এই আদর্শ অনুসারে নমনীয় বাল্য ও যৌবনকে ধরা হয়েছে কঠোব শিক্ষা এবং নিয়মানুবর্তিতার পথে অপবিত্রতা এবং অসঙ্গতি দূর করবার সময়; দ্বিতীয় স্তর হলো সুস্থ দেহে সুস্থ মন নিয়ে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে সংসাবযাত্রা নির্বাহেব সময়, তৃতীয় স্তর হলো পবিপক্ক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি এবং নৈতিক পবিত্রতা নিয়ে যৌথ সামাজিক জীবনের উন্নতিব জন্য আত্মনিয়োগের সময়, চতুর্থ পর্যায় হলো সংসাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম পুরুষের সাথে মিলনেব উদ্দেশ্যে খোলা মনে যাত্রার সময়।

এই চারটি স্তরেব মধ্যে প্রথম স্তরটি পরবর্তী স্তরগুলির জন্য প্রস্তুতির স্তর। সুতরাং পূর্ণবয়স্কতাব সময় এবং পূর্ণতর জীবনের উদ্দেশ্য অনুসারেই শিক্ষার বিষয়বস্তু স্থির হবে। এব ফলে শিক্ষা হয়ে উঠলো অনেকটা বাস্তব এবং বৃত্তিগত। মহাভারতেই চারটি বর্ণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুসারেই হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম এবং ছাত্রদের দায়িত্ব-তালিকা। উদাহরণ রূপে বলা যায় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর কথা। এখানে বলা হয়েছে যে পিতামাতা কেবল জাগতিক অর্থে জন্মদাতা, আধ্যাত্মিক জন্ম দিয়ে থাকেন গুরু। সুতরাং গুরু হলেন পিতৃতুল্য। তাই ছাত্রের চার ধরনেব দায়িত্বের কথা পবিষ্কার করে বলা হলো—(ক) সর্বতোভাবে গুরুর ইচ্ছা পূরণ করা, (খ) গুরুপত্নীকেও সমভাবে ভক্তি কবা (গ) গুরু যে উপকার করেছেন, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, (ঘ) গুরু-ঋণ পরিশোধ না কবে গুরুগৃহ ত্যাগ না করা। চার ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা জন্মাতো—(ক) মানসিক শক্তিব স্বাভাবিক বিকাশ, (খ) গুরুসঙ্গ, (গ) শিষ্যের মানসিক ক্ষমতা এবং আত্মপ্রচেষ্টা, (ঘ) সহপাঠিদের সঙ্গে আলোচনা।

শিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধেও মহাকাব্যে বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আত্মার পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিতে হতো। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পড়াশুনা করতে হতো। উদ্দালক, আরুণি, কচ প্রভৃতি ছিলেন আদর্শ ছাত্র।

নগরকেন্দ্রিকতা এই যুগে অনেকটা এগিয়েছিল। তার প্রভাব পড়ে শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষতঃ বৃত্তিশিক্ষায়। সমরশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্প ও কারিগরি, শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা, ভাস্কর্য প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে। ৬৪ কলা ও শিল্প সুগঠিত হয়। রাজশক্তির উত্থানের ফলে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা অনেকটা এগিয়ে যায়। তাঁরা বৃত্তি অনুযায়ীই শিক্ষা পেতেন। সবগুলো বেদ, বিভিন্ন শাস্ত্র, ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ—ইত্যাদি সবকিছুই পাণ্ডবরা পড়েছিলেন। রাজকীয় দক্ষতা সৃষ্টির জন্য আঁকা, লেখা এবং কাব্য পড়ার সাথে সাথে দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমরশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অশ্ব, হস্তী, রথী ও পদাতিক বাহিনী পরিচালনার সব দিক সম্বন্ধেই শিখতে হতো। ধনুর্বেদের সব বিভাগেই দ্রোণাচার্য ছিলেন উত্তম শিক্ষক। অর্জুনও অভিমন্যু এবং অন্যান্য রাজকুমারদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন।

তত্ত্বমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে শব্দশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদের কথা। এইসাথে নন্দনশাস্ত্র, নাটক কাব্যও সমাদৃত ছিল। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা তখনও যথেষ্ট প্রসারিত ছিল। বিবরণে দেখা যায় ব্রহ্মচারিণীদের সাথে অষ্টাবক্র আলোচনা করেছিলেন। ঋষি সাণ্ডিল্যের কন্যাও ছিলেন ব্রহ্মচারিণী। জনকও ব্রহ্মচারিণীদের সাথে শাস্ত্রালাপ করেছিলেন।

অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি এই সময়ে হতো ঘন ঘন। ঋষিদের আশ্রমগুলিও বড় হয়ে ওঠে। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বৃহদায়তন আশ্রমে ছিল অনেকগুলি বিভাগ—অগ্নিস্থান (পূজার্চনার জায়গা), ব্রহ্মস্থান (পড়াশুনার জায়গা), বিষ্ণুস্থান (রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা বিভাগ), মহেন্দ্রস্থান (সমরশিক্ষা বিভাগ), সোমস্থান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), গরুড় স্থান (যানবাহন বিভাগ), কার্তিকেয়স্থান (সমর বিভাগ) প্রভৃতি। নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনকের আশ্রমে ছিলেন ১০ হাজার ছাত্র। প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে ছিল চিত্রশালা, হর্ম্য, প্রাসাদ, তোরণ।

এ যুগে অযোধ্যা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল না। তাঁদের নিজস্ব সংঘ ছিল, যেমন ছিল ছাত্রসংঘ। তেমনি ছিল নাটকসংঘ, মহিলাদের বধূসংঘ। আশ্রমের ঋষিরা বক্তৃতামালায় অংশ নিতেন। লোকায়ত্ত বিতর্ক হতো। বস্তুতঃ রাজশক্তি ও নগরকেন্দ্রিকতার একটা ছাপ পড়েছিল মহাকাব্য যুগের শিক্ষায়।

প্রশ্ন

1. Write notes on (a) Rig Vedic Education, (b) Education as represented by Sutra Literature, (c) Education in the Epic period.

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা

ভারত বহু বৈচিত্র্যের দেশ। প্রাচীন ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা তার বিবর্তন পথে নানা বিচিত্র সুর লহরীকে আত্মস্থ করে একটি ঐক্যতান সৃষ্টি করেছিল। বাইরে থেকে পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি নানা জাতির প্রভাব এবং ভিতর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব, এ সবের সমন্বয় সাধন করেই হিন্দু সভ্যতা তার নিজস্ব রূপ লাভ করে।

এই ইতিহাসের প্রথম ব্যতিক্রম এল মধ্যযুগে। তুর্ক-আফগান অভিযানের সাফল্য এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে **এমন এক অভিনব উপাদান উপস্থিত করল, যাকে সহজেই আত্মস্থ করা সম্ভব হল না।** আগেকার অভিযাত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র পারসিক ও গ্রীক ছাড়া আর কোন জাতির গৌরবজনক সংস্কৃতি ছিল না। তাই তারাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিলীন হয়েছে। আগেকার অভিযানগুলি ছিল ক্ষণস্থায়ী—স্থায়ী রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিজয় তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি অভিযানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র 'গঙ্গা যমুনা বিধৌত অঞ্চল' এতে পরাভূত হয়নি।

কিন্তু বিজয়ী মুসলমান এলেন নূতন ভাষা, লিপি ও নূতন ধর্ম নিয়ে। তাঁরা বহন করে এনেছেন আরবীয় সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য। সমগ্র উত্তর ভারত ও পরিশেষে দক্ষিণ ভারতও এঁদের কবলিত হয়েছে। সর্বোপরি এঁরা এদেশে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। **সেই শক্তিশালী মুসলীম রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সযত্নে লালিত হয়েছে।**

অথচ হিন্দু সংস্কৃতির ছিল মাটির সঙ্গে যোগ। প্রতি গ্রাম জনপদ ও গৃহে ছিল এ সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন। আচার অনুষ্ঠানে রক্ষিত হত এই সংস্কৃতি। প্রতি গুরুগৃহই ছিল বিদ্যালয়। তাই রাষ্ট্রীয় শক্তির উত্থান পতন হওয়া সত্ত্বেও **প্রাচীন শিক্ষা বেঁচে রইল জনগণের মধ্যে।** রক্ষণশীলতার রক্ষাব্যূহ রচনা করায় সে শিক্ষার গতিশক্তি অনেকাংশে স্তিমিত হল—তবু তা বেঁচে রইল। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা রাজশক্তি ও বিত্তবানের যে প্রসন্ন দাক্ষিণ্য লাভ করত, তা সে হারাল। আর তারই পাশাপাশি মধ্যযুগীয় রাজানুকুল্য-বর্ধিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে

কেবল ইসলামী শিক্ষাই মধ্যযুগীয় শিক্ষা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সে যুগের সামগ্রিক রূপটিই সে যুগের পরিচয়। এই পরিচয়ের একাংশ সৃষ্টি হয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংসের ফলে এক বিরাট শূন্যতা দিয়ে। দ্বিতীয়াংশ সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ স্রোত দিয়ে। আর তৃতীয়াংশ সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যধন্য মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থার স্ফীত স্রোত। **সমগ্র মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ পাশাপাশি চলেছে।** মধ্যযুগের শেষার্ধে উভয়ে কাছাকাছি এসেছে, পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, সমন্বয়ী সংস্কৃতির সম্ভাবনা সৃষ্টি কবেছে। কিন্তু পরিশেষে যুগের অবক্ষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা চেতনা উভয়কেই পবাজিত করেছে।

শাসক চরিত্রে আপাতঃ স্ববিরোধ—মধ্যযুগীয় শিক্ষাব আলোচনায় **সর্বাগ্রেই লক্ষণীয় শাসক চরিত্রের আপাতঃ স্ববিরোধ।** মুসলীম সুলতানর ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধ্বংস করেছেন, আবাব অপরদিকে গড়েছেন। ভারতেব ইতিহাসে গজনীব সুলতান মামুদেব চবিত্র ধ্বংসাত্মক। কিন্তু গজনীর ইতিহাসে তিনি ছিলেন শিক্ষা সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক। বিক্রমশিলা ধ্বংসকাবী বখ্‌তিয়ার খলজীও মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরী কবেছিলেন। হিন্দুদ্বেষী ফিরোজ তুঘলক ছিলেন জ্ঞানী ও জ্ঞানের মহৎ পৃষ্ঠপোষক।

শাসক চরিত্রের এই স্ববিরোধ অকারণ নয়। একদিকে তাবা বিজয়ী এবং বিজিত হিন্দুরা তাঁদেব বিবেচনায় কাফেব। সেইজন্যই শত্রুভাবাপন্ন বিজিতদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধ্বংস করাই তাঁদের কর্তব্য বলে মনে কবেছিলেন। অপরদিকে এ শাসক সম্প্রদায় মুসলীম। শিক্ষার উপব তাঁদের ধর্ম খুবই গুরুত্ব দিয়েছে. জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারকে প্রকৃত ধার্মিকের কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছে। **সে জন্যেই তাঁরা 'ইসলামী শিক্ষার' প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক।**

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মোহম্মদ স্বয়ং ছিলেন শিক্ষাব শক্তিতে পরম বিশ্বাসী। তিনিই বলেছেন জ্ঞানার্জন করা পরম পুণ্যের কাজ। বিদ্যা ও অবিদ্যা দিয়েই মানুষ ও অমানুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ পবিত্র কোরাণ ও হাদিস বার বাব সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে।

মুসলীম সংস্কৃতির অতীত গৌরব :—শিক্ষা সম্পর্কে এই আগ্রহই জগতে মুসলীম অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে **আরবীয় সভ্যতার গৌরব রচনা করেছিল।** আরবগণ জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এই আরবীয় সভ্যতা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং

মধ্য এশিয়াকে প্রভাবিত করে। সারাসেন-তুর্ক সভ্যতার কাছে ইউরোপের নবজাগরণও বহুলাংশে ঋণী। **রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গজনী ও কাবুলের পথে এই সংস্কৃতি ভারতে প্রবেশ করে।** একথা অনস্বীকার্য যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফলে আরবীয় সভ্যতারও রূপান্তর ঘটে। ভারতে যে ইসলামী সংস্কৃতি এলো, তা আরবীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নয়। তবুও ভারতের **সুলতানরা শিক্ষাকে আনুকূল্য দিয়েছেন—যদিও তা কেবল ইসলামী শিক্ষা।** তাঁরা পণ্ডিতজনকে সম্মান ও আর্থিক আনুকূল্য দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতেব রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিন্ন না হয়েছে, ততদিন সেদিক থেকে দিল্লীর দিকে অবিরাম পণ্ডিতের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতে মুসলীম শিক্ষা প্রচেষ্টার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল রাজশক্তিব উপর নির্ভরশীলতা। **রাজশক্তির দোসররূপে এই শিক্ষা ভারতে আসে।** সুতরাং ভারতেব মাটিতে শিকড় না পওয়া পর্যন্ত রাজশক্তির আনুকূল্য কিম্বা আনুকূল্য-হীনতাই শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কবেছে। রাজশক্তির চরিত্র ছিল সামরিক, স্বৈবতান্ত্রিক। রাজদরবারের খেয়ালখুশীর উপরেই সব কিছু নির্ভর করতো। দরবার-কেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা মূলতঃ উচ্চ শিক্ষাকেই উৎসাহ দিয়েছে। তাই প্রয়োজনের তাগিদে **মুসলীম গণশিক্ষা ব্যবস্থা নিজের পথ নিজেই তৈরী করেছে।** তা ছাড়া সুলতানদের খেয়ালে শিক্ষার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে বলে কোন কোন সুলতানের আমলে শিক্ষার হয়েছে অগ্রগতি। আবার কখনো হয়েছে অধোগতি। প্রাদেশিক শাসক ও ওমরাহদেব মধ্যেও সুলতানেব ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। **তাঁদের উদার বদান্যতায় কখনো শিক্ষায় এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য, আবার তাঁদের অবহেলায় কখনো এসেছে জরাজীর্ণতা।**

তুর্ক-আফগান সুলতানীর যুগ

ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **মোহম্মদ ঘোরী** তাঁর স্বদেশ ও ভারতে মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর ক্রীতদাসদেরকেও, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন **সুলতান কুতবুদ্দিন**। পারসিক ও আরবী ভাষায় কুতবুদ্দিনের দক্ষতা ছিল। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। তাঁর সেনাপতি **বখতিয়ার খলজীও** মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন। সুলতান **ইলতুৎমিসের** আমলে দিল্লী হয়েছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল। তাঁর কন্যা **সুলতানা রাজিয়াও** দিল্লীতে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। **নাসিরুদ্দিন**

মাহমুদ নিজ হাতে কোরাণের অনুলিপি তৈরী করার মধ্য দিয়ে হস্তলিপিকে চারুকলার পর্যায়ে উন্নীত করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ছিলেন সাহিত্য রসিক। চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্য এশিয়া থেকে এই সময় অনেক পণ্ডিত দিল্লীতে আশ্রয় লাভ করেন। আমীর খসরুর উৎসাহে এঁদের নিয়ে গড়ে ওঠে অনেক সাহিত্য চক্র। রাজপুত্র মহম্মদ নিজে ২০০০ কাব্যের সংকলন তৈরী করেন। সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, নৃত্যবিদদের নিয়ে দিল্লীতে সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সুলতান বলবন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন জ্ঞানী, মনীষী ও সাহসী ব্যক্তির অবহেলা না হয়, কারণ তাঁরাই হবেন রাজার পরামর্শদাতা এবং রাজমুকুটের গৌরব। বস্তুত এ সময়ে দিল্লী হয়ে উঠেছিল বুখারার সমকক্ষ।

খল্‌জী সুলতান জালালুদ্দিন নিজে ছিলেন সাহিত্যামোদী। প্রায়ই তিনি কবি সভা আহ্বান করতেন। তাঁর সময়ে রাজকীয় গ্রন্থাগার সুসংগঠিত হয়। আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনীই ইতিহাসে স্থান পায়। কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর স্থান নগণ্য নয়। বহু পণ্ডিত তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। ফিরিস্তা তাঁকে গুণীর সমাদরকারী রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই সময় মসজিদ ও মহাবিদ্যালয় সৃষ্টি হতো যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে। ৪৫ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এইসব মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। এলিফিনষ্টোনের মতে আলাউদ্দিনের সময় দিল্লী ছিল গুণীজনেব আশ্রয়স্থল। সুলতানের স্থাপত্য কীর্তি এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন দিল্লীর নানা স্থানে আজও দ্রষ্টব্য বস্তু।

ইতিহাস যাঁর উপর অবিচার করেছে সেই মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন কবি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বহু শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী স্বয়ং ফিরোজ তুঘলকও ছিলেন শিক্ষিত। ঐতিহাসিক বরানি এব' সিবাজ আফিফ তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতদের জন্য তাঁর ৩৬ লক্ষ মুদ্রা দানের কথাও জানা যায়। প্রতি শুক্রবার তিনি পণ্ডিত সভা আহ্বান করতেন। তাঁর সময় বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য রাজ আদেশ প্রচারিত হয়, এবং অন্যূন ৩০টি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জালালুদ্দিন রুমি।

উল্লেখযোগ্য যে এ সময়ে হিন্দুরা পারসীক সাহিত্য এবং মুসলীমরা হিন্দী সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। ফিরোজ তুঘলক নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু সে মন্দিরে রক্ষিত বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। বহুদূরে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভ তিনি দিল্লীতে পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। আজও

এই স্তম্ভ দিল্লীর অন্যতম দ্রষ্টব্য। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে রাজপ্রাসাদের বিরাট সংখ্যক ক্রীতদাস বালকদের জন্যও তিনি কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুলতানি আমলের অবক্ষয়ের যুগেও সুলতান **সেকেন্দার লোদি** কাব্য প্রতিভা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর সকল সামরিক কর্মচারীই শিক্ষিত হয়। নিজে তিনি আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পণ্ডিতের সমাবেশে তখন আগ্রা হয়েছিল গৌরবান্বিত। পারসীক শিক্ষায় হিন্দুদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। এরই ফলশ্রুতি হলো **মিশ্রিত ভাষা রূপে উর্দু ভাষার সৃষ্টি।**

প্রাদেশিক রাজন্যবর্গের ভূমিকা :—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসকবর্গের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সুলতানী যুগের একটি বিশেষ দিক। সুলতানী সাম্রাজ্যের বিজয় অভিযান চলেছিল খলজী যুগ পর্যন্ত। তার পরে আসে অবক্ষয়ের যুগ। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে অনেক প্রাদেশিক শাসক নিজ নিজ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের ক্ষমতার রক্ষা কবচ ছিল রাজ্যগুলির আঞ্চলিক চরিত্র এবং স্থানীয় জীবনের সাথে এঁদের সম্পর্ক। **আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে শিক্ষা ক্ষেত্রেও এঁদের অবদান তাই উল্লেখযোগ্য।** উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাহমনী সুলতান **হাসান মোহম্মদ শাহ'র** কথা। তাঁর সময়েই গুলবার্গা, বিদার, ইলিচপুর, দৌলতাবাদ প্রভৃতি স্থান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তেমনি বলা যায় সুলতান **ফিরুজ শাহের** কথা, যিনি নিজে ছিলেন বহু ভাষাবিদ। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। একটি মানমন্দিরও তিনি নির্মাণ করেন। প্রতিবছর বহির্ভারত থেকে পণ্ডিত আনবার জন্য তিনি জাহাজ পাঠাতেন। বিজাপুরের **আদিল শাহও** পারস্য তুর্কিস্থান থেকে উলেমাদের আমন্ত্রণ করতেন। আদিল শাহী গ্রন্থাগার ছিল সে যুগের গর্বের বস্তু। এইরকম উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল গোলকুণ্ডার **কুতবশাহী বংশ কিম্বা গৌড়ের সুলতানদের।**

লখনৌটির সুলতানদের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন, নাসির শাহ, ইউসুফ শাহ এবং হুসেন শাহে'র নাম বাংলা সংস্কৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। বস্তুত **'হুসেন শাহী আমল' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।** বাংলাদেশের 'মঙ্গলকাব্য', এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলাদেশের ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে **পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর** নাম অবিনশ্বর। পরাগল খাঁর নামাঙ্কিত 'পরাগলী মহাভারত' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ। মুসলমান শাসকগণ সংস্কৃত বুঝতেন

না। অথচ বহুপ্রশংসিত রামায়ণ মহাভারতের রস উপভোগ করতে চাইতেন। মহাভারত অনুবাদে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার এটি বিশেষ একটি কারণ। কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁ'র বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন। মালাধর বসু 'ভাগবত' অনুবাদ করেন গৌড় সুলতানদের সম্বর্দ্ধনায়। বস্তুতঃ **প্রাদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাদেশিক সংস্কৃতি, যার ফলশ্রুতি রয়েছে আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনে।**

দুই স্তরের শিক্ষা :—সুলতানদের ভূমিকা আলোচনান্তে একথা সহজেই অনুমেয় যে রাজ আনুকূল্য-বর্ধিত শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ নগর কিম্বা প্রাদেশিক কেন্দ্রে। পণ্ডিত সভার অনুষ্ঠান, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিতদের ভরণপোষণ, বৃত্তি, বেতন, জায়গীর প্রভৃতির রূপেই রাজানুকূল্য প্রবাহিত হতো। এই শিক্ষা ছিল উচ্চস্তরের, প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা। ধর্মের সঙ্গে এর ছিল অঙ্গাঙ্গী সংযোগ, পাঠ্যতালিকার প্রধান স্থানে ছিল ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং সমাজ বিধি, ভাষা মাধ্যম ছিল আরবী ও ফারসী। এ ছিল **উলেমাদের শিক্ষা।** সাধারণ জনতা এ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হতো না। তা ছাড়া গুণগত মানে উন্নত হলেও এ শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনজীবনের প্রয়োজন শুষ্ক হয়ে থাকেনি। হিন্দুদের পাঠশালা ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে সেখানে। তাই **মুসলীমদের জন্য পাঠশালার অনুরূপে কর্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। গড়ে ওঠে মক্তবগুলি।** ধর্মীয় প্রভাবের ফলে মুসলীম প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে লিখন, পঠন, গণিতের সাথে কোরাণের সাধারণ পাঠ সংযোজিত হয়। মক্তবগুলি বেঁচে থাকে নিম্নবিত্তবান এবং সাধারণ গৃহস্থের দানে।

সংস্কৃতি সমন্বয় :—শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুলতানী আমলের শেষ ভাগ আর একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। তা হলো **সংস্কৃতি সমন্বয় আন্দোলন।**

সুলতানী রাজত্বের প্রথম শতাধিক বছর ধরে সুলতানরা নিজেদের মনে করেছেন শুধুমাত্র বিজয়ীরূপে। মধ্য এশিয়াকেই মাতৃভূমি এবং এ দেশকে পরভূমি জ্ঞান করেছেন। এদেশের জনতা ও সংস্কৃতিকে হীনজ্ঞান করেছেন। তাই **রাজধানী-কেন্দ্রিক উপরতলার সংস্কৃতি ছিল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।** কিন্তু ক্রমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। এ দেশের মাটির সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ হয়। এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার মুখ যাঁরা দেখলেন না, তাঁরা এ দেশকেই মাতৃভূমি মনে করতে লাগলেন। প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য।

তাই **এ যুগ থেকে মুসলীম সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হতে লাগলো।** দুই শত্রুভাবাপন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের কাছে এলো, সংযোগ ঘটলো। ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে, আদান প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয়ী ধারা প্রবাহিত হলো। লোদি যুগ থেকে এ সত্য বিশেষ পরিচ্ছন্ন।

উপবতলার চেয়ে **সমাজের নীচের তলায় এই আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী।** মাঝে মাঝে রাষ্ট্রবিপর্যয় ছাড়া উপরতলার প্রভাব নীচের তলায় অল্পই পড়েছে। হিন্দু মুসলীম প্রজা সমভাবেই পীড়িত হয়েছে। আশা হতাশায় সমতার ফলে পরস্পরের মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠ। **এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম সমন্বয়ের ধারা।** সৃষ্টি হয়েছেন নানক ও কবির। হিন্দু ধর্মে এসেছে বৈষ্ণব আন্দোলন। দুইটি গণসংস্কৃতির ধারাও হয়েছে নিকটতব। **জারি, সারি, বাউল, পীর ও গাজির গানই হয়েছে সমন্বয়ের বাহক। আঞ্চলিক মাতৃভাষাই হয়েছে হিন্দু মুসলীম উভয়ের ভাষা।**

বাংলা দেশের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় এই যুগের কাছে আমরা কত ঋণী। তেমনি ঘটেছে গুজরাট, মালব, মুলতান, জৌনপুর ও কাশ্মীবে। যে সমন্বয়ী ধারাব এইভাবে সূচনা হলো, তার শক্তি আরও বাডলো শের শাহেব যুগে। সম্রাট আকববের সমন্বয়ী নীতি দিল তাকে পূর্ণতা। হিন্দু-মুসলীম ধারাব আদান প্রদানেব পথে তিনি একটি জাতীয় শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের সংকল্প কবেছিলেন।

বাদশাহী যুগ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আরবী, ফারসী, তুর্কি ভাষাজ্ঞ কবি, সঙ্গীত রসিক, চিত্রকর ও আত্মজীবনীকার **জহিরুদ্দিন বাবর** যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। স্বল্পকালীন রাজত্বেও তাঁর দরবারে স্থান পেয়েছিলেন মৌলানা সাহাবুদ্দিন ও মির্জা ইব্রাহিম প্রমুখ সংস্কৃতি তারকা। বাদশাহের ছিল নিজস্ব চিত্র সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থশালা। একটি সরকারী বাস্তবিভাগ প্রতিষ্ঠা করে অপরাপর কাজের সঙ্গে তিনি এর উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

তাঁর পুত্র **হুমায়ুনও স্বয়ং ছিলেন শিক্ষিত।** ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি পৃথিবী ও সৌর মণ্ডলের গোলক নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন জাঁকজমকপ্রিয়। সপ্তাহে বিভিন্ন দিনে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের মূল্য ছিল সর্বাধিক। ধাতু নির্মিত তীরের ফলাকা দিয়ে তিনি বিভিন্ন

শ্রেণীর মানুষের মূল্য নির্দেশ করেছেন। সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের স্থান ছিল দ্বিতীয় স্তরেই। সপ্তগ্রহের নামানুসারে তিনি যে সুসজ্জিত কক্ষগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে শনি ও বৃহস্পতি নামাঙ্কিত কক্ষেই তিনি পণ্ডিতদের সাথে মজলিসে বসতেন। গ্রন্থপ্রিয় সম্রাটের একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থাগার যুদ্ধক্ষেত্রেও নিয়ে যাওয়া হতো। তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল গ্রন্থাগার থেকে পতনের ফলে। রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে শিক্ষা 'ব্যবস্থার' ক্ষেত্রে বেশী কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। তবুও তিনি দিল্লী মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে এক বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরিচয় আজও বর্তমান।

সম্রাট আকবরের অবদান

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে **উজ্জ্বলতম অধ্যায় ছিল মহামতি আকবরের যুগ**। তাঁর বিচিত্র প্রতিভা শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। পুরাতনের বদলে তিনি নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে তিনি সংস্কার প্রবর্তন করেন। কেবল ধর্মভিত্তিক এবং গ্রন্থভিত্তিক শিক্ষার বদলে শিল্পসাধনা, চারুকলা এবং কারিগরি শিক্ষাকেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। অকৃপণ আনুকূল্য, অযাচিত বৃত্তি ও পুরস্কার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অজস্র দানের ফলে **সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকে এসেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণচাঞ্চল্য**।

ফতেপুরসিক্রির ইবাদৎখানায় তিনি উলেমাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের আলোচনা সভা বসতো। অংশ গ্রহণ করতেন হিন্দু-মুসলীম-জৈন পণ্ডিত এবং মিশনারী পাদরীরা। সম্রাটের সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ছিল তৎকালীন গর্বের বস্তু। ফৈজীর মৃত্যুর পরে তাঁর ৪ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংযুক্ত হয়। গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত ছিল।

সম্রাট কেবল নিজেই পণ্ডিত সংসর্গে সন্তুষ্ট থাকতেন না। পুত্র পৌত্রদের শিক্ষার জন্যও তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করেছিলেন। এই শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তু ছিল ব্যাপক। **শিক্ষক নির্বাচনে তিনি হিন্দু মুসলীম বৈষম্য প্রদর্শন করেননি।**

সম্রাট আকবরের আনুকূল্যে চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব চিত্রশালায় হিন্দু ও মুসলীম চিত্রকরের সৃষ্টি সমভাবে আদৃত হয়েছিল। হস্তলিপিকেও চারুকলা রূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পকলার চর্চা স্থাপত্য শিল্পকেও প্রভাবিত করে। এরই ফলশ্রুতি ঘটে পরবর্তী বাদশাহদের আমলে। সঙ্গীতকলার প্রতি সম্রাটের আনুকূল্য সর্বজনবিদিত। হরিদাস, রামদাস, তানসেন প্রমুখ হিন্দু মুসলীম

গুণীজনের সমাগমে রাজদরবার সঙ্গীত-পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। নানা বাদ্যযন্ত্র ঝংকৃত হলো। প্রাচীন ভারতীয় রাগ রাগিনীর হলো নবজন্ম।

শিক্ষা সংস্কারক রূপেও সম্রাট আকবরের স্থান অতি উচ্চে। তিনি তৎকালীন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিকে সংস্কৃত ও উন্নত করেন। বহু নতুন মসজিদ ও কলেজ নির্মাণ করেন। আগ্রায় কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করে বিখ্যাত উলেমাদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। সেলিম চিস্তিব সমাধিস্থলে এক সুবৃহৎ বিদ্যালয়েব চিহ্ন এখনও রয়েছে। **প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ গৃহশিক্ষক রূপে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদান করতেন। স্ত্রী শিক্ষাও আকবরের আনুকূল্য লাভ করেছিল।** প্রাসাদের অন্দর মহলেই ছিল জেনানা বিদ্যালয়। নতুন আবিষ্কাবও তাঁব কাছে উৎসাহ লাভ করে। বহু গুণীজন নিয়মিত বেতন ও অনুদান ভোগ করতেন।

হিন্দু ও মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল। এ সময়ে উভয় সম্প্রদায় একই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। পাঠ্যক্রম ও বিষয়বস্তু নির্বাচনেও উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টি আবোপিত হয়। বহু লোকায়ত বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই আবুল ফজল মন্তব্য করেছিলেন যে সম্রাটের এই উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়গুলি নবরূপ ধারণ কবেছে এবং সাম্রাজ্যের গর্বের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

সম্রাটের উদাহরণ আমির ওমরাহদেরকে প্রভাবিত করে এবং আগ্রায় বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহম অনাগার মাদ্রাসা এবং খাজা মঈনের মহাবিদ্যালয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বৈরম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম ছিলেন বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত। অনেক শিক্ষার্থী তাঁর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে আকবরের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান অবশ্য সংস্কৃতি সমন্বয় উদ্যমে। তুর্ক আফগান রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে যে ধারার সূচনা হয়েছিল, আকবর তাকে পূর্ণতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ধর্ম সমন্বয় এবং হিন্দু মুসলীমের যৌথ প্রয়াসে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের যে আদর্শ তিনি নিয়েছিলেন, তাই মূর্ত হয়েছে শিক্ষা সমন্বয় প্রচেষ্টায়। হিন্দু তরুণদের তিনি শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। মাদ্রাসায় হিন্দু শাস্ত্রাদি পাঠের ব্যবস্থা করেছেন, এবং হিন্দু পণ্ডিতগণকে আনুকূল্য দিয়েছেন। সর্বোপরি **সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা** করে তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে সেই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার দিয়েছেন। **সম্রাটের** আদেশে মহাভারতের **ফারসী** অনুবাদ করা হয় 'রজম্ নামা' নামে।

রামায়ণ, অথর্ববেদ, হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র, নলদময়ন্তী, লীলাবতী প্রভৃতিরও ফারসী সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়। ইতিহাস, ভূগোল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তকও অনুদিত হয়। দুটি সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হওয়ায় শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাণ চাঞ্চল্য আসে। এইসব অবদানের জন্য **শিক্ষা ক্ষেত্রেও আকবরকে 'মহান' রূপে আখ্যাত করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।**

আকবরের উত্তরকাল:—আকবরের শিক্ষানীতি **সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বর্ধিত ও প্রসারিত না হলেও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল।** তাঁর সময় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আগ্রার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। পণ্ডিতরা রাজদরবারে সমাদর পেতেন। মুঘল চিত্রশৈলী জাহাঙ্গীরের সময়ই পূর্ণতা লাভ করে। রাজকোষ থেকে বিদ্যালয় গৃহ সংস্কারের ব্যয়ভার বহন করা হয়। সম্রাট আদেশ দেন যে পর্যটক অথবা উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাঁদের সম্পত্তি যেন বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয়িত হয়।

যদিও স্থাপত্যকর্মে জাঁকজমকের জন্যই **শাহজাহানের রাজত্বকাল** সমধিক প্রসিদ্ধ, তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। অন্তত পূর্বসূরীদের কীর্তি বিনষ্ট করার অপরাধ থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর আনুকূল্য থেকে পণ্ডিতগণ বঞ্চিত ছিলেন না। সঙ্গীত ও চিত্রকলাও তাঁর সহায়তা লাভ করে। অনেকগুলি পুরানো মাদ্রাসা তিনি সংস্কার করেন এবং দিল্লীর জুম্মা মসজিদের কাছে একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবরের সমন্বয়ী ধারার উত্তর সাধক ছিলেন শাহজাহানের পুত্র দারা। তিনি নিজে আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন এবং উপনিষদ, ভাগবত ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ফারসীতে অনুবাদ করেন। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, যোগী ও সুফিদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দারার পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বয়ী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হতে পারতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝার ফলে এই ধারার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

মানুচির বিবরণে দেখা যায় যে বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করে **সম্রাট আওরঙ্গজেব উচ্চশিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন।** পরিণত বয়সেও দিবারাত্রির নির্দিষ্ট সময়ে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। আইন শাস্ত্রে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁরই উৎসাহে 'ফতোয়া ই আলমগিরি' নামের আইন সংকলন লেখা হয়। নিজের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই আনুকূল্যলোভী প্রাক্তন শিক্ষককে পুরস্কারের বদলে ক্ষোভের সঙ্গে

তিনি তিরস্কারই করেন। **আওরঙ্গজেবও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তা ছিল ইসলামী শিক্ষা।** হিন্দু মন্দির এবং বিদ্যালয় ধ্বংস করার জন্য তিনি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দেন। কিন্তু অপরদিকে রাজকোষের অর্থে সাম্রাজ্যব্যাপী উলেমা নিয়োগ করেন, ছাত্রবৃত্তি এবং শিক্ষাভাতা প্রবর্তন করেন, বিদ্যালয়ের জন্য জায়গীর দান করেন। লক্ষ্ণৌতে ওলন্দাজ কুঠি অধিকার করে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে গড়ে ওঠে বহু নতুন মাদ্রাসা।

কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তাঁর শিক্ষা নীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আকবর চেয়েছিলেন ধর্ম সমন্বয়, সংস্কৃতি সমন্বয় ও সহনশীলতার ভিত্তিতে অখিল ভারতীয় সাম্রাজ্য। তাঁর শিক্ষানীতি সেইভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। আওরঙ্গজেবও চাইলেন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী কেন্দ্র শাসিত অখিল ভারতীয় সাম্রাজ্য। কিন্তু এ হবে **ভারতীয় ইসলামী সাম্রাজ্য।** এই আদর্শ তাঁর রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি এবং শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্য গঠনের কাজই শুধু ব্যর্থ হয়নি, সাম্রাজ্যে এসেছে ক্ষয়িষ্ণুতা, জনজীবনে এসেছে দুর্গতি এবং শিক্ষাজীবনে এসেছে প্রায়ান্ধকার। **আকবরের নীতি বর্জন করে তিনি যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছেন, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করেছেন।**

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রাণ স্পন্দন ছিল। সম্রাট মুহম্মদ শাহ'র আমলেও দিল্লীতে 'যন্তর মন্তর' নির্মিত হয়েছে। কিন্তু নাদির শাহ এসে রাজকীয় গ্রন্থাগারটি পর্যন্ত লুণ্ঠন করে পারস্যে নিয়ে যান। **নাদির শাহর ধ্বংসলীলার পরে শিক্ষার প্রাণশক্তি সম্পূর্ণই স্তিমিত হয়ে যায়।** প্রত্যক্ষ ক্ষতি থেকেও পরোক্ষ ক্ষতি হয় অনেক বেশী। নাদির শাহ'র সাফল্য মুঘল স্বত্বসর্বস্বতা সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দেয়! আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের দ্রুত ক্ষয়। এই ক্ষয়িষ্ণুতা শিক্ষাজীবনকেও গ্রাস করে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলি ছিল আবাসিক। আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে **শিষ্যের জীবন ধারার উপর গুরুর প্রভাব প্রতিফলিত হতো।** শিষ্যকে নির্দিষ্ট আচরণ বিধি অনুসারে দৈনিক জীবন যাপন করতে হতো। ইসলামী অনুশাসনে উলেমাদের চরিত্রশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সচ্চরিত্র শিক্ষকের সাথে পিতা-পুত্র সম্পর্কের ভিত্তিতে

শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন হতো উন্নত। হিন্দু শিক্ষার মত গুরু সেবাকে এক্ষেত্রেও শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করা হয়েছিল। গুরু শিষ্যের বৈষয়িক সম্পর্কও ছিল না, কারণ বিত্তশালীদের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসায় শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।

মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষাও ছিল প্রায় বেতনহীন। প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে ছিল একটি মক্তব। স্কুলের ঘর, আসবাব ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের বাহুল্য ছিল না। পল্লীবাসী প্রাথমিক শিক্ষক সাধারণতঃ পল্লীরই কোন গৃহস্থের বাড়ীতে "খাওয়া-থাকা" পেতেন। শিক্ষককে এভাবে স্থান দিতে পারা ছিল গৃহস্থের পক্ষে গর্বের বিষয়। নিজ বাড়ীতে দুচারটি পড়ুয়াকে আশ্রয় দিতে পারাও সম্পদশালী গৃহস্থরা সম্মান ও পুণ্যের কাজ মনে করতেন। মসজিদের আদায়ী অর্থ থেকেও বিদ্যালয় উপকৃত হতো। ইসলামী বিধানে আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র সেবায় দান করবার যে 'জাকাৎ' ব্যবস্থার নির্দেশ আছে, তা থেকেও মক্তবগুলি উপকৃত হতো। 'এতিমখানা' (অনাথাশ্রম) পরিচালনাও পুণ্যকর্ম বলে পরিগণিত হতো। সর্বোপরি মক্তবের মৌলভীরা পল্লীবাসীদের আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্মে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন। এইভাবে সংগৃহীত প্রণামী থেকেও তাঁদের ব্যয় নির্বাহ হতো। সুতরাং সাধারণের প্রয়োজনে, সাধারণের দানে, অবৈতনিক কিম্বা প্রায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার মতই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নৈতিক মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সত্যদ্রষ্টা হজরৎ মোহম্মদ 'ঈশ্বরের পথে শিক্ষাকেই" প্রকৃত শিক্ষা বলে নির্দেশ করেছিলেন। ভারতেও সম্রাটরা ফকির, দরবেশ, সুফি প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়েছেন। সুলতান বাদশাহদের এই উদাহরণ সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করেছে। মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ধর্মগুরু এবং শিক্ষাগুরুর কাজ ছিল একই হাতে। সমাজ জীবনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে উলেমাদের জীবন ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের জীবনযাত্রার উদাহরণ শিক্ষার্থী তথা সমগ্র সমাজকেই প্রভাবান্বিত করেছিল।

মধ্যযুগে নারী শিক্ষা

ইসলামী অনুশাসনে নারী শিক্ষা অবৈধ ছিল না। হজরৎ মোহম্মদ নারী শিক্ষাকে আবশ্যিক রূপে প্রয়োজন বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামী গৌরবের প্রথম যুগে ফাতিমা, হামিদা, সোফিয়ার মত বিদুষী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা অবশ্যই সংকুচিত হয়। পর্দার প্রচলন হওয়ায় নারী শিক্ষার সুযোগ আরও সংকীর্ণ হয়। ভারতের নূতন পরিবেশে নারী শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার হয়নি। কিন্তু গুণগত ঐতিহ্য এদেশের সুলতান বাদশাহরাও রক্ষা করেছেন। সাধারণ নারী শিক্ষা অবশ্যই সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু উচ্চ বংশের মেয়েদের মধ্যে অন্দরমহলে শিক্ষার ধারা চলেছিল। তাই এ যুগে কয়েকজন বিদুষীও সৃষ্টি হয়েছিলেন। কোন কোন সম্রাট নারী শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে আকবরের পদক্ষেপ ছিল বলিষ্ঠ। কিন্তু **অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল অন্দরমহলের মধ্যে।** হারেমের শিক্ষার জন্য বিশেষ উলেমা এবং চারুকলা শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিয়োগ করা হতো। রাজপরিবারের বহু মহিলা কেবল নিজেরাই শিক্ষিতা ছিলেন না, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকাও ছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন শিক্ষিতা। বাবরকন্যা গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' রচনা করেন। আকবরের ধাত্রীমাতা মোহাম আনাগা নিজে বিদুষী ছিলেন, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাও খ্যাতি অর্জন করে। পারসীক ও আরবীয় সাহিত্য এবং চারুকলায় দখল ছিল নূরজাহানের। সলিমা সুলতানার ছিল কাব্যদক্ষতা। মমতাজও ছিলেন শিক্ষিতা। শাজাহান তনয়া জাহানারা বেগমের শিক্ষা দীক্ষার কথা সর্বজনবিদিত। মুঘলযুগে নারী শিক্ষার শেষ রশ্মিটির মত জেবুন্নিসা বেগমও আরবী ও ফারসীতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন। **কিন্তু সাম্রাজ্যের ক্ষয়ব্যাধি আরম্ভ হলে সাধারণ শিক্ষার চেয়েও নারী শিক্ষার অধোগতি হয় দ্রুততর।**

মুসলীম শাসনকালে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যে রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ধারণ করলো, তার **প্রধান বলি হলো নারী স্বাধীনতা তথা নারী শিক্ষা।** তবুও অভিজাত পরিবারের অন্দরে নারী শিক্ষার দীপটি কোন রকমে জ্বলে রইল। কয়েকজন প্রতিভাশালিনী কখনো কখনো এখানে ওখানে সাধারণ গৃহস্থ ঘরেও আত্মপ্রকাশ করেছেন, কবি চন্দ্রাবতী যাঁদের অন্যতমা।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা ইতিহাস **যুগপৎ ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস**। স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তির উপব শিক্ষা ছিল নির্ভরশীল। তবে অধিকাংশ সম্রাট উচ্চশিক্ষার' পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশ্য এ ছিল নগরকেন্দ্রিক, মাদ্রাসা ভিত্তিক, ঐস্লামিক শিক্ষা। প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অনেক বিত্তবান ব্যক্তিও শিক্ষায় আনুকূল্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সুলতানরা এ বিষয়ে খ্যাত। আনুকূল্যের রূপ ছিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অধ্যাপক সংগ্রহ, ভূমি, অর্থ, বেতন ও অনুদান ব্যবস্থা। এর ফলে **উচ্চশিক্ষা ছিল অবৈতনিক এবং মূলতঃ আবাসিক**। আরবী ভাষার চর্চা সমগ্র মধ্যযুগেই হয়েছে। তাছাড়া সুলতানী যুগে তুর্কি এবং বাদশাহী যুগে ফারসী ভাষার চর্চা হয়। নগরকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় দিল্লী, ফিরোজাবাদ, আগ্রা, জৌনপুর, বদাউন, বিদার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। **মক্তবকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ সাধারণের দানে পরিচালিত হয়। এ শিক্ষাও প্রায় অবৈতনিক ছিল**। মক্তবগুলিতে সর্দাব পোড়োব ব্যবস্থাও ছিল। উভয় স্তরেব শিক্ষাতেই শিক্ষকেব স্থান ছিল মর্যাদামণ্ডিত। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্র সম্পর্কের মত। **নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল**। কারিগাব ও চারুকলা শিক্ষাও দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি। স্ত্রী শিক্ষার অধোগতি হলেও অনেক সম্রাট এব পৃষ্ঠপোষকতা কবেছেন, এবং তা ব্যর্থও হয়নি।

বাজশক্তির বোষ সত্ত্বেও আনুকূল্যবর্জিত **হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করে টিকে থাকে। রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ধারণ করায় এ শিক্ষার গতিশক্তি গেল বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে**। নতুন জ্ঞানের দিগন্ত সন্ধানের বদলে পুরাতন জ্ঞানেরই চর্বিত চর্বণ চলতে লাগলো।

তবু হিন্দু শিক্ষার প্রাণস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হলোনা। বিদ্রোহী দক্ষিণ ভারতের রক্ষাব্যূহেব মধ্যে হিন্দু জীবনাদর্শ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন আশ্রয়স্থল খুঁজে নিল। দক্ষিণ ভাবত থেকেই সুরু হলো সংস্কার আন্দোলন। আর উত্তর ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শত দুর্বিপাক সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো। বেঁচে বইলো বারাণসী। সংস্কৃত শিক্ষাব কেন্দ্ররূপে সে আজও বেঁচে আছে। আকববের আমল পর্যন্ত মিথিলাব গৌরব ম্লান হয়নি। নদীয়ার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রইলো সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী। আর মাটির সঙ্গে যোগ সূত্রে আবদ্ধ টোলগুলি এখানে ওখানে

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বেঁচে রইলো। তা ছাড়া শিক্ষার শেষ সম্বল রূপে অসংখ্য পাঠশালা জড়িয়ে রইল গণজীবনের সাথে (যার সামান্য পরিচয় পেলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও রেভাঃ এ্যাডাম)।

রাজশক্তির প্রতিকূলতায় হিন্দুশিক্ষার জ্ঞানজগৎ যত সংকীর্ণ হলো, হৃদয়জগৎ হলো তত আবেগপূর্ণ। নতুন কাব্য সাহিত্যে রূপ পেল হৃদয়াবেগ। বৈষ্ণব কাব্যশৈলী মধ্যযুগেরই অবদান। হিন্দু মুসলীম সকলের এক মাতৃভাষারূপে সুগঠিত আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবও মধ্য যুগে। বাজপুত কথা ও কাহিনীর সৃষ্টি এই যুগে। সমগ্র উত্তর ভারতে আন্ত-আঞ্চলিক ভাষারূপে হিন্দীর যাত্রাবম্ভও এই সময়ে।

হিন্দু স্বজনী শক্তি জ্ঞানলোকে প্রসার ক্ষেত্র না পেয়ে **চারুকলার ক্ষেত্রে ভাষা খুঁজে নিল।** উত্তর ভাবতের মুঘল চিত্রশৈলীর উপর, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পেব উপর হিন্দু প্রভাব এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। রাজপুত চিত্রশৈলী স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অর্ধ-অবনমিত ওডিস্যায় অমিশ্রিত হিন্দু স্থাপত্য নিজেকে প্রকাশ করার জায়গা খুঁজে পায়। 'মন্দিবের দেশ' ওডিস্যাব অসংখ্য ভগ্নমন্দিব এই বিবর্তনের ইতিহাস বহন করে আছে। **দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থার এই সমান্তরাল অবস্থিতি, পৃথক পৃথক অবদান এবং পরিশেষে উভয়ের আদান প্রদানই মধ্যযুগীয় শিক্ষার ইতিকথা।**

মধ্যযুগ আর নেই। **কিন্তু মধ্যযুগের প্রভাব আজও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত।** পুরাতনের সাক্ষ্যরূপে কিছু কিছু মাদ্রাসা ও মক্তব আজও বেঁচে আছে। সংস্কৃত ভাষার মত আরবী ও ফারসী ভাষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে ঐচ্ছিক ভাষারূপে স্বীকৃত। দুইটি ভাষাতেই স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। উর্দু ভাষা সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ প্রমুখ অঞ্চলে আপন গৌরবে প্রচলিত। যে সব আঞ্চলিক ভাষার গৌরব আজ আমরা করি এবং উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যমরূপে যাদের স্বীকৃতি আমরা দাবি করি, তাদেরও প্রকৃত গঠনকাল মধ্যযুগ। তেমনি রাষ্ট্রভাষারূপে যে হিন্দীর কথা আজ সোচ্চার, তার উত্থানকালও মধ্যযুগ। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গে ধারণ করে রয়েছে ওসমানিয়া, আলীগড, জমিয়া মিলিয়া, নাহ্‌দাতুল উলেমা।

অপরদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যে ধর্মদ্বেষিতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছিল, তা থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হইনি। উভয় ধর্মের সংকীর্ণতার প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে

হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা ধর্মশিক্ষাদানের অধিকারও স্বীকার করতে হয়েছে। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা থেকে আজও আমাদের শিক্ষা মুক্ত নয়। হিন্দু সমাজে আজও রয়েছে অস্পৃশ্যতার বিষ, যার বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। মুসলীম সমাজে রক্ষণশীলতা আজও সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিবন্ধক। এ জন্যই পর্দা স্কুলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সমগ্র আধুনিক যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনকে মুসলীম শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যমের কথা বলতে হয়েছে।

যুগবৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি যুগের উত্থান ঘটে। যুগ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যুগের রেশ থাকে ঐতিহ্যের তন্ত্রীতে। মধ্যযুগ বহন করেছে প্রাচীন যুগের রেশ। আধুনিক যুগ বহন করছে সমগ্র পূর্বকালের প্রভাব। শুভ অশুভের মিশ্রণে এই সমগ্র ঐতিহ্যই আধুনিক যুগের উত্তরাধিকার। অশুভ উত্তরাধিকার বর্জন এবং শুভ ও সুস্থ উত্তরাধিকার লালনই আজকের সমস্যা।

সামগ্রিকভাবে অবশ্য মধ্য যুগের কয়েকটি বিশেষ অবদান রয়েছে। হস্তলিপিকে চারুকলার স্তরে উন্নয়ন, সমগ্র ভারতে একটি রাষ্ট্রভাষার প্রচলন, উর্দু ভাষার উদ্ভব, ভারতে ইতিহাস রচনাশৈলী প্রবর্তন, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি, প্রাদেশিক নৃপতিদের সৌজন্যে **আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপন** এবং আকবরের যুগে হিন্দু মুসলীম যৌথ শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতিই মধ্যযুগের বিশেষ অবদান।

ধর্মদ্বেষিতা তথা হিন্দুশিক্ষাদ্বেষিতা সত্ত্বেও হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা সংকীর্ণ গণ্ডীতে পৃথক শিক্ষা ধারা রূপে বেঁচে থাকে। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ও ঘটতে থাকে। কিন্তু আওরঙ্গজেব ও তাঁর উত্তরকালে এই আন্দোলন ব্যাহত হওয়ায় সমগ্র ভারতে নেমে আসে সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়া। এই দুরবস্থা যে কেবল তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেই ব্যাহত করেছিল তা নয়, ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব হলো সুদূরপ্রসারী।

সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়ের যুগ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েনি। তবে আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় যে অবক্ষয়ের সূচনা, তা অপ্রতিরোধ্য ভাবে অগ্রসর হয়েছে তাঁর উত্তরকালে। নাদির শাহ'র অভিযান শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ করেছে। তারপরে ক্ষমতাহীন অথচ উচ্ছৃঙ্খল সম্রাটরা হয়েছেন ক্ষমতাপ্রিয় আমীরদের ক্রীড়নক। ষড়যন্ত্রপূর্ণ রাজদরবারের দুর্বলতায় **সমগ্র সাম্রাজ্যে এসেছে**

অরাজকতা। প্রাদেশিক শাসকরা সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভাগ্যান্বেষীরা ক্ষমতা নিয়েছে হায়দ্রাবাদ ও বঙ্গদেশে। আর নর্মদার উত্তর তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমপ্রান্তে বর্গির হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে মৃত্যু, লুণ্ঠন ও ত্রাসের রাজত্ব।

এই রাজনৈতিক অব্যবস্থার সর্বপ্রধান শিকার হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর উত্থান পতন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে আনুকূল্যের উৎসমুখ গেল শুকিয়ে। জনজীবনের শান্তি হলো বিনষ্ট। নিত্য নতুন প্রভু এবং ভাগ্যান্বেষীর বল্গাহীন লুটের তাড়নায় উৎপীড়িত জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতিও হলো সীমায়িত। পল্লী জীবনও রেহাই পেল না। গ্রামের পর গ্রাম বর্গি হাঙ্গামায় উজার হলো। **অরাজকতার ফল ভোগ করলো হিন্দু মুসলীম উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাই সমভাবে। তবে রাজানুকূল্যের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল মুসলীম উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থারই যে বেশী ক্ষতি হলো তা নিঃসন্দেহ।**

রাজনৈতিক আলোড়ন **অর্থ নৈতিক জীবনকেও করলো বিপর্যস্ত।** আইনবিধি পদদলিত হলো। পুরানোর বদলে নূতন ভূস্বামীর উদয় হলো। কৃষকের শস্যভরা জমি হলো লুণ্ঠিত। কারিগর হারালো তার উৎপাদনী যন্ত্র। বর্গিদের হানা থেকে অনেকেই হলো দেশান্তরী।

ধর্মীয় জীবনে উগ্রতা, অন্ধতা, সংকীর্ণতার পুনরাবির্ভাব ঘটলো। ধর্মচক্রের বিধিনিষেধ ও আত্মরক্ষাব্যূহ রচনাই হলো ধর্মীয় নেতাদের কাজ। হিন্দু-মুসলীম উভয়ের সমাজ জীবনে এলো দুর্ভেদ্য রক্ষণশীলতা। নারী সমাজের উপর আঘাত এলো সর্বাপেক্ষা বেশী। **এ অবস্থা প্রতিফলিত হলো নৈতিক জীবনে।** নারী ও সুরামত্ততাই অভিজাত শ্রেণীর আমোদের সারবস্তু হলো। পুরাতন মূল্যবোধ হলো নিশ্চিহ্ন, কিন্তু অরাজক জীবনে **নতুন কোন সুস্থ মূল্যবোধও গড়ে উঠলো না।** অনাচার, ব্যাভিচার, ষড়যন্ত্র, শঠতা ও অকৃতজ্ঞতা সমগ্র সমাজ দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুললো। **সামাজিক ও নৈতিক জীবনের মহাশূন্যতা শিক্ষা জীবনেও শূন্যতা সৃষ্টি করলো।** সংকীর্ণ রক্ষাব্যূহের মধ্যে পুরাতনের চর্বিত চর্বণ করে টোল ও মাদ্রাসাগুলি কোন রকমে বেঁচে রইল মাত্র। প্রাণ স্পন্দনের অভাবে নতুন কোন সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হলো না। অপরদিকে গণ-জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও দৈন্যদশাগ্রস্ত অবক্ষয়ের চিহ্ন বহন করে কোন ক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চললো মাত্র।

এই সর্বাঙ্গীন অরাজকতা, হতাশা, দৈন্য এবং গতিহীনতার ফলে **জীবনের**

সকল ক্ষেত্রে যে মহাশূন্যতার সৃষ্টি হলো, তারই ফাঁকে অনুপ্রবেশ করলো এক নতুন শক্তি। বাণিজ্য আর রাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকদের দোসর রূপে ধর্ম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন ইউরোপের খ্রীষ্টান পাদরীর দল। ভারতের ইতিহাস তথা শিক্ষা ইতিহাসেরও আরম্ভ হলো এক নতুন অধ্যায়।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. How can you explain the apparent contradiction that most of the Muslim rulers of India, particularly during the Sultanate, destroyed one type of education and patronised another type simultaneously? ("শাসক চরিত্রে আপাত স্ববিরোধ" এবং "মুসলীম সংস্কৃতির অতীত গৌরব"— এই শীর্ষে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থিত করতে হবে)।

2. Discuss the role of the Turko-Afghan Sultans of Delhi and their Provincial Governors in the field of education. ("তুর্ক-আফগান সুলতানীর যুগ", "প্রাদেশিক রাজন্যবর্গের ভূমিকা" এবং "দুই স্তরের শিক্ষা" শীর্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ তৈরী করা দরকার)।

3. What was the outcome of the impact of Islamic religion and culture upon Hindu Culture and society? ("সংস্কৃতি সমন্বয়" অংশটি উপস্থিত করতে হবে)।

4. Discuss, with special reference to Akbar, the contributions of the Mughul Emperors to the cause of education in India. Was Akbar "great" also in the field of education? ("বাদশাহী যুগ", "সম্রাট আকবরের অবদান"—শীর্ষক অংশ দুটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থিত করতে হবে। তারপরে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান দারা সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করে সমালোচনা সহ আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতির কথা বলতে হবে। পরিশেষে মন্তব্য করতে হবে যে পরবর্তীদের ব্যর্থতাকে ছাপিয়েও আকবরের অবদানই আমাদের কাছে গৌরবের বিষয় হয়ে আছে। বস্তুতঃ সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রেও আকবর ছিলেন 'মহান')।

5. Enumerate the principal features of Islamic Education in India. What efforts were made to combine Hindu and Islamic elements of culture in a general system of education? (প্রথম অংশের আলোচনা রয়েছে "ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" শীর্ষক অংশের

প্রথম অনুচ্ছেদে। দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় 'সংস্কৃতি সমন্বয়ের' উল্লেখ করে আকবরের ও দারার নীতি ও কাজের উল্লেখ করতে হবে)।

6. Describe the state of Hindu education in the mediaeval period and the result of the impact of Islam upon it. ("ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" শীর্ষক অংশের ২য়—৫ম অনুচ্ছেদ)।

7. Give a brief account of education that prevailed in medieval India and its influence on the present system, if any. (মাদ্রাসা, মক্তব, টোল, পাঠশালা। রাজা এবং অমাত্য'র ভূমিকা, জনসাধারণের ভূমিকা ইত্যাদি বলতে হবে প্রথম অংশের জন্য। দ্বিতীয় অংশের জন্য "ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" শীর্ষক আলোচনার শেষের পাঁচটি অনুচ্ছেদ উপস্থিত করা দরকার)।

8. The ancient tradition of spiritually oriented higher education and practically oriented elementary education continued throughout the medieval period." Discuss. ("দুই স্তরের শিক্ষা" শীর্ষক অংশটি)।

9. State the causes of the decline of Indian education with the fall of the Mughul Empire and the circumstances which favoured Western Missionary activity. ("সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়ের যুগ" অংশ পুরোপুরি বলতে হবে)।

10. Write notes :

(a) Tol and Madrasah as comparable institutions of higher learning. ("বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" অংশ থেকে মাদ্রাসার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে। টোল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে আগেকার অধ্যায়ে এবং তারও আগে ১২৭-২৮ পৃষ্ঠায়)।

(b) Pathsala and Maktav as elementary schools. (পূর্ববর্তী সংকেত এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)।

(c) Teacher-Pupil relation and moral education in the Islamic system. ("ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক" অংশটি পুরোপুরি বলতে হবে।

(d) The state of women's education in medieval India. ("মধ্যযুগে নারী শিক্ষা" শীর্ষক অংশটি পুরোপুরি উপস্থিত করতে হবে)।

(e) Contributions of the medieval period in the field of literature & language, arts & architecture. (সংস্কৃতি সমন্বয়, আকবরের অবদান এবং "বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান" আলোচনার শেষাংশ সাজিয়ে উত্তর পাওয়া যাবে)।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষা

মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব

ভারতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগের পরিবেশ যদিও ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজকে সহজ করে দেয়, তবুও এই সুযোগেই যে তাঁরা ভারতে প্রথম আসেন এমন নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তাঁরা এদেশে আসছিলেন। পর্তুগীজদের দেখানো পথে ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ বাণিজ্য কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব দেশ থেকে পাদরীরাও আসেন।

শক্তিশালী মুঘল সম্রাটদের আমলেও ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। **সম্রাটরা শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনবোধে কঠোর শাস্তি দিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।** ধর্মের ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের ইবাদৎখানায় পর্তুগীজ পাদরীরা আলোচনার সুযোগ পেলেও প্রজাদের জীবনে বাড়াবাড়ি করলে এঁদের কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। **ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির ভাগ্যে উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাদরীদের কার্যকলাপেও এসেছে জোয়ার-ভাটা।**

আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ সত্য আরও প্রকট। প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সোহাগ-বিরাগ বহুলাংশে বণিকদের ভাগ্য এবং ঐ সঙ্গে পাদরীদের কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমাবস্থায় এদেশে অপর কোন অবলম্বনের অভাবে মিশনগুলিকেও কোম্পানীগুলির বাহুলগ্ন হয়ে থাকতে হয়েছে।

মিশনারী উদ্যমের কারণ

মাঝে মাঝে ভাগ্য বিপর্যয় সত্ত্বেও পাদরীরা প্রতিকূল পরিবেশেও কাজ করেছেন। এর অনেক কারণও ছিল। প্রথমতঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের উত্তরকালে পৃথিবীর দিকে দিকে ইউরোপীয় বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তারের যে সূচনা হয়, **সেই অভিযানে বণিক শ্রেণীর দোসর রূপে অগ্রবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মিশনগুলি।** ভারতবর্ষেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পরে সংস্কার ও প্রতিসংস্কারের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী

সংঘর্ষ চলে, তার ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টরা নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নূতন অনুগামী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। উগ্র ক্যাথলিক জেস্যুইটরা সর্বস্ব পণ করেন। বিভিন্ন প্রোটেষ্ট্যান্ট গোষ্ঠীও পিছিয়ে থাকেন না। ভারতবর্ষও হলো এই প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্র।

মিশনারী উদ্যমের উদ্দেশ্য

ভারতীয়দেরকে ধর্মান্তরিত করে নূতন খ্রীষ্টান সংগ্রহ করাই ছিল পাদরীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সাথে শিক্ষা প্রচারের কাজটি ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইউরোপে মধ্য যুগ থেকেই ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা প্রচার ছিল ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। পাদরীরাই শিক্ষকতায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য ভারতেও প্রসারিত হলো। এদেশে মিশনারীরা কখনও ধর্মান্তরের পরে ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, আবার কখনও শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্মান্তরিত করেছেন। পরিবেশ ও সুযোগ অনুযায়ী তাঁরা এগিয়েছেন।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের আশ্রয়স্থল ছিল তাদের কুঠি। কুঠি ছিল তিন শ্রেণীর—বাণিজ্য কুঠি, অধিকৃত খাস মালিকানাধীন কয়েকটি অঞ্চল এবং সৈন্যাবাস। এই কুঠিগুলিকে অবলম্বন করেই প্রথমে পাদরীদের কাজ চলে। ক্রমে কুঠির বাইরে এই উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়। পরিশেষে কোম্পানীগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনজীবনেও এই কাজ ছড়িয়ে পড়ে।

পর্তুগীজ প্রচেষ্টা

সম্পূর্ণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্তুগীজ মিশনারীরাই শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিপত্য করেছিলেন। এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি পর্তুগীজ কুঠিকেন্দ্র। এঁরা ছিলেন উগ্র ক্যাথলিক জেস্যুইট সম্প্রদায়ের পাদরী। ফাদার সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং রবার্ট ডি, নোবিলি ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন। ফাদার জেভিয়ার্স প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করেছিলেন। পাদরীদেরই প্রচেষ্টায় গোয়াতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে আরও চারটি ছাপাখানা এঁরা প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় খ্রীষ্টানদেরকে পাদরীর বৃত্তিতে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে একটি জেস্যুইট কলেজ স্থাপিত হয়। সলসেট'এ ঐরকম আর একটি প্রতিষ্ঠান ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে।

কিন্তু (ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ওলন্দাজ নৌ-শক্তি।) ভারত মহাসাগরে লড়াই চলে। ওলন্দাজ শক্তিরই জয় হয়। (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকেই পর্তুগীজ বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে এবং ক্রমে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসও স্তিমিত হয়।)

ওলন্দাজ প্রচেষ্টা: (ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন সত্য, কিন্তু বাণিজ্যের জন্য তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল)। (সপ্তদশ শতাব্দীতে **বাংলা দেশে চুঁচুড়া, হুগলী** প্রমুখ কয়েকটি স্থানে তাঁরা কুঠিও স্থাপন করেন।) কিন্তু ভারতে তাঁরা কখনও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারেননি। (শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওলন্দাজ পাদরীদের ভূমিকা ছিল না।)

ফরাসী প্রয়াস:—ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত কাজ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মাহে, কারিকল, **পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি** স্থানে ছিল ফরাসী কুঠি। এই সব স্থানই ছিল ফরাসী ক্যাথলিক পাদরীদের শিক্ষাকর্মস্থল। এসব জায়গায় তাঁরা যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন সেখানে অখ্রীষ্টানদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। পর্তুগীজ এবং ভারতীয় শিক্ষকও তাঁরা নিয়োগ করেছিলেন। পণ্ডিচেরীতে একটি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলও এঁরা স্থাপন করেন।) কিন্তু (রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে ফরাসীরা অনেক সময় অগ্রাধিকার দেওয়ায় এঁদের বাণিজ্য এবং শিক্ষাপ্রয়াস ব্যাহত হয়। তদুপরি ভারতে ফরাসী কোম্পানী এবং পাদরীরা নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার ফলে এদেশে তাঁদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়াস যেমন বাধা পেয়েছে, শিক্ষা প্রয়াসও তেমনি সংকুচিত হয়েছে।) (**ইংরেজদের কাছে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের শিক্ষা প্রয়াসেরও অবসান ঘটে**।) কয়েকটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ফরাসী উপনিবেশগুলিতে ফরাসী ঐতিহ্য রক্ষা করে বেঁচে থাকে।)

দিনেমারদের সাফল্য

(মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন দিনেমারগণ। ওলন্দাজরা পর্তুগীজদেরকে পরাজিত করেও শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কিছু করেননি। এই শূন্য স্থানটি পূরণ করার সুযোগ এলো দিনেমারদের কাছে। তাঁরা দক্ষিণ ভারতেই মূল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে দিনেমারদের বাণিজ্য ছিল অল্পই।) সুতরাং

বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে দিনেমাররা ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে বেশী মনোযোগ দিতে পেরেছেন। তাছাড়া দিনেমাররাও ছিলেন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। সুতরাং **ইংরেজরা এঁদেরকে কণিষ্ঠ অংশীদার রূপে সাহায্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন**। এইসব কারণেই দিনেমার পাদরীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে এঁরা দক্ষিণ ভারতে ট্রাঙ্কুভারকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলেন। বাংলাদেশে শ্রীরামপুর ছিল এঁদের প্রধান ঘাঁটি। এঁরা ইংলণ্ডের "খ্রীষ্টীয় জ্ঞান প্রচারক সমিতির" (Society for Promoting Christian Knowledge, সংক্ষেপে S. P. C K.) সাংগঠনিক ও আর্থিক আনুকূল্য পেয়েছেন।)

দিনেমার পাদরীদের মধ্যে **বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিগেনবল্গ** (Ziegenbalg)। তিনি ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি তামিল ছাপাখানা স্থাপন করেন। একখানি তামিল ব্যাকরণের রচয়িতা এবং তামিল ভাষায় 'বাইবেল' এর অনুবাদকও তিনি। মাদ্রাজ'এ দুইটি দাতব্য বিদ্যালয় এবং ট্রাঙ্কুভাব'এ একটি শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ও তাঁব কীর্তি। (১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে জিগেনবল্গ'এর মৃত্যুব পরে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই অনুগামী সহকর্মী সুলজ্ (Schultz), সুয়াৎর্জ্ (Schuartz) এবং কিয়ারন্যাণ্ডার (Kiernander)। সুলজ্ একখানি তেলেগু অভিধান এবং বাইবেল-এর তেলেগু অনুবাদ প্রস্তুত করেন। এঁদেব প্রচেষ্টায ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ত্রিচিনোপল্লী, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ'এর আমন্ত্রণে কিয়ারন্যাণ্ডাব বাংলাদেশে আসেন এবং ১৭৫৮ সনে কলকাতায়ও স্কুল প্রতিষ্ঠা কবেন।

ইংরেজদের প্রচেষ্টা

ইংরেজদের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে **বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। সুতরাং ইংরেজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসও মূলতঃ এই সময়ের।** কিন্তু পাদরীদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিলেতে কোম্পানীর পরিচালক সভা (Court of Directors) প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভারতে কোম্পানীর কর্মকর্তাদেরকে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয়দের মধ্য থেকে প্রচারক সংগ্রহ করতে। কয়েকজন ধর্মান্তরিত ভারতীয়কে প্রচারকরূপে শিক্ষণের জন্য বিলেতে পাঠানোও হয়। (১৬৩৬ সনে ইংলণ্ডের প্রধান বিশপ লড্ (Laud) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদে

পাদরীদের সম্বন্ধে একটি ধারা সংযুক্ত হয়। **এই ধারায় কোম্পানীর ভারতস্থ কর্মকর্তাদেরকে ধর্মপ্রচারের কাজকে উৎসাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।** কোম্পানীর কুঠি ও সৈন্যাবাসে স্কুল গডবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ভারতগামী প্রতি ৫০০ টন বা তদূর্দ্ধ আয়তনেব জাহাজেই অন্ততঃ একজন পাদরী বহনের ব্যবস্থাকে আবশ্যিক করা হয়। বস্তুতঃ (**এই নির্দেশনার মধ্যেই ছিল ইংরেজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসেব বাস্তব ভিত্তি।**)

পাদবী-শিক্ষক আমদানীব উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ ইউরোপীয় কর্মচারী ও পরিবাববর্গের ধর্মাচবণের স্যোগ করা, দ্বিতীয়তঃ ইউবোপীয ও ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রীষ্টান শিশুদেব শিক্ষার বন্দোবস্ত কবা, এবং তৃতীয়তঃ ভারতীয় কর্মচাবীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। কিন্তু ইংবেজ কোম্পানী কখনোই ধর্ম ও শিক্ষাব কাছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বিসর্জন দেননি। তদুপবি স্থানীয় অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবাব ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীব ভাবতীয় কর্মকর্তাদেব অনেক বেশী ছিল। তাই পবিচালক সভাব সব নির্দেশই সব সময়ে অক্ষবে অক্ষরে পালিত হয়নি। **ভারতে ইংরেজ কোম্পানী তাই** S. P. C. K. **প্রতিষ্ঠানকে পরোক্ষ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়ে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দিনেমারদেরকে উৎসাহিত করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করেছে।**

(**ইংরেজ পাদরীদের উদ্যোগে কিছু দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।** এগুলির মধ্যে মাদ্রাজের সেন্ট মেরী (St. Mary's) ১৭১৫, বোম্বাইয়ের কব (Cobbe) ১৭১৯ ; কলকাতার বেলারমী (Chaplain Bellarmy) ১৭২০, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত "ভারতীয়দের উন্নতি বিধায়ক সমিতি" ও (Society for promotion of Indians) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দাতব্য নীতির ফলেই পববর্তীকালে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে "লেডি ক্যাম্পবেল মহিলা অনাথাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্প পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পুরুষ অনাথাশ্রম। এই সব প্রচেষ্টাব সাথে দিনেমারদেব প্রচেষ্টা মিলিযে হিসেব করলে অনুমান করা যায় যে **ইংরেজ মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা নিতান্ত অল্প ছিল না।**)

ইংরেজ মিশনারী উদ্যমের উদ্দেশ্য :—ইংরেজ মিশনারী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল **প্রথমতঃ ইউরোপীয়দের ধর্মাচরণ ও শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ, তৃতীয়তঃ ধর্মান্তরিতদের মনকে একটি বিশেষ গড়নে গড়ে তোলা, চতুর্থতঃ গণসংযোগের পথ প্রস্তুত করে জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করা। স্কুল প্রতিষ্ঠার**

কাজও এই অনুসারে বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কুঠি ও সৈন্যাবাসে, ইউরোপীয় সন্তানদের জন্য। ক্রমে ইউরেশীয়দের ক্ষেত্রে এই সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ পর্যায়ে সুযোগ সম্প্রসারিত হয় কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইংরেজ কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ দেশী মহল, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হননি এমন হিন্দু মুসলীম সহযোগীর মধ্যে। কোম্পানী কিংবা ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় দালাল, বাণিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর। সর্বশেষ পর্যায়ে কুঠির বাইরে সর্বসাধারণের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

কোম্পানীর ভুমিকা :—মিশনগুলিকে কোম্পানীর উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতিও ছিল দূরদৃষ্টির পবিচায়ক। **কোম্পানী কখনই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহন করেনি। উদার রক্ষাকর্তা এবং পরোক্ষ সহায়করূপেই ছিল কোম্পানীর ভুমিকা।** লটারীর সাহায্যে অর্থসংস্থান করে, বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার করে, এককালীন সাহায্য দান কবে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ সুদে মিশনারী শিক্ষা তহবিল আমানত রেখে এবং কর্মচারীদেরকে অবসর সময়ে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকরূপে কাজ করবার অনুমতি দিয়ে পাদরীদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত কব: হয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে **কোম্পানীর এই সাহায্য সত্ত্বেও মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা মূলতঃ দাতব্য ভাণ্ডারের উপরেই নির্ভরশীল ছিল।**

বিচ্ছেদের পর্ব

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব **এই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরলো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।** পলাশীতে জয়লাভেব ফলে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর চরিত্রে পরিবর্তন এলো। এই বিজয়ের ফলে ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু দেশীয় কিছু সহযোগীর আনুগত্য লাভ করলেও প্রত্যক্ষ রাজক্ষমতা তখনও হস্তগত হয়নি। সমগ্র দেশেব জনমানস তখনও অনুকূল নয়। বিপদ সংকুল পথে এগোতে হলে যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। **যে কোন ভুল পদক্ষেপ সমস্ত সম্ভাবনাকেই নষ্ট করতে পারতো।** যে কোন ভুলের সুযোগ গ্রহণ করতে ফরাসী এবং ওলন্দাজরাও উদ্যত ছিলেন। সুতরাং ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সংস্কারের বিষয়ে কোন বাড়াবাড়িকে কোম্পানী ভয়ের চোখে দেখলো। এই সব বিষয়ে বিক্ষোভ দানা বাঁধলে সাম্রাজ্যের স্বপ্নই ধূলিসাৎ হতে পারতো। অথচ পলাশীর সাফল্যে মিশনারীদের মধ্যে অত্যুৎসাহিতারই প্রবণতা দেখা দিল। **কোম্পানী তাই রশ্মি টেনে ধরলো।**

এই সমস্যা আরও তীব্র হলো ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে। মীরকাসিমকে পরাজিত করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে কোম্পানী নিজেই বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলো। অপরদিকে বাংলার নবাবকে এবং নবাবী প্রশাসনকে সম্পূর্ণ করতলগত করলো। প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানী এবং পরোক্ষভাবে নিজামতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দায়িত্বও বাড়লো।

শাসনের দায়িত্ব আসায় প্রশাসনিক নীতি স্থির করার প্রশ্ন এলো। অন্যতম নীতি হলো মিশনারীদেরকে উৎসাহদান বন্ধ করা। নবলব্ধ ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর জয় করতেই কোম্পানী তখন উদ্যোগী। হিন্দুদের কাছে হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক রূপে স্বীকৃত হতেই সে আগ্রহী। সুতরাং ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারী স্বার্থ থেকে কোম্পানীর রাজনৈতিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পেলো। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই বিচ্ছেদ তীব্র গতিতে বাড়লো। [একশ' বছর আগে কোম্পানীর জাহাজে মিশনারী আমদানী যেখানে আবশ্যিক করা হয়েছিল, সেখানে একশ' বছর পরে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভা বিনানুমতিতে কারও ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বে-আইনী প্রবেশকারীর বহিষ্কার আদেশ জারি হলো। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোর-এ সিপাহী অভ্যুত্থান কোম্পানীর ভয়কে আরও ঘনীভূত করলো। সুতরাং বিধি নিষেধ আরও তীব্র হলো।] ক্রমে মিশনারীদের স্বাধীন শিক্ষা প্রয়াস অসম্ভব হলো। এই ভাবেই পরিসমাপ্ত হলো মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার আদি পর্ব।

মিশনারী প্রচেষ্টার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ভারতের মত বিশাল দেশ এবং বিচিত্র জনসমাজের মধ্যে পরিমাণের হিসাবে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির বিচারে এর গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় বহু ধরনের স্কুল গড়ে উঠেছিল। এঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক দাতব্য বিদ্যালয়। ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের অনাথ শিশুদের উৎপাদনী বৃত্তি এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে লেখাপড়ার সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষারও বন্দোবস্ত ছিল। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়ও এঁরা স্থাপন করেন। শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের এঁরাই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। দেশীয় পাদরীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কয়েকটি ধর্মীয় কলেজও

প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এঁরা গঠন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলীম অভিজাত সমাজ এবং বর্ণ হিন্দু উচ্চ সমাজের রক্ষণশীলতার রক্ষাব্যুহ ভেদ করা মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং হিন্দু সমাজের উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষই খ্রীষ্টধর্মের সরল প্রচারে আকৃষ্ট হয়েছে। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা তাদের মধ্যেই ছিল বেশী। সুতরাং এই যুগে মিশনারী স্কুলে ছাত্র এসেছে অধিকাংশই নিম্নবর্ণের সাধারণ সমাজ থেকে। তাই এদের জন্য বিদ্যালয়গুলি ছিল অধিকাংশই প্রাথমিক মানের। এ দেশের মানুষ যে ধরনের দেশজ বিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত, পাদরীরাও সেই দেশজ বিদ্যালয়ের ধারা ও রূপকে অব্যাহত রাখেন।

ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, দেশীয় খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানদের জন্য যদিও অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, তবুও খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান উভয় শ্রেণীর সাধারণ ভারতীয় শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার মাধ্যম ছিল সাধারণতঃ মাতৃ-ভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাইবেল প্রচার সহজসাধ্য ছিল বলে মিশনারীরাও বিভিন্ন "দেশীয় ভাষা" আয়ত্ত করেন, অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন, অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন হলেও এসময়ে তেমন কোন বিপ্লবী পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মূলতঃ লিখন, পঠন, গণিতের সাথে খ্রীষ্টধর্মীয় শিক্ষা সংযোজন করে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়। মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দাতব্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং বণিক কোম্পানীগুলির ছত্র ছায়ায় বিচরণ।

মূল্যায়ন

আদি পর্বের মিশনারী প্রচেষ্টার গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কম ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা জীবনের ভগ্নদশায় এঁরা শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যমের পথে ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন। ছাপাখানা প্রবর্তন এবং প্রচার পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ করে জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেন। সুতরাং গণ শিক্ষা প্রেরণায় এঁরা ছিলেন পথ প্রদর্শক। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করে দেশীয় ভাষাগুলির উন্নতির পথেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি ও কারিগরি দক্ষতার উপর এরা নতুন ভাবে আলোকপাত করেন। সকলের কাছে

বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদের প্রাচীর ভাঙতে এঁরা সাহায্য করেছেন।

দেশজ বিদ্যালয়ের রূপটিকে মিশনারীরা। গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার অনেক সংস্কার ও উন্নতি করেন। ছাপানো পাঠ্য বই এবং সরঞ্জামের ব্যবহার তাঁদের বিশেষ অবদান। ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ, একটি বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্ট এবং নির্দিষ্ট আইন বিধির প্রচলনও তাঁদেরই কাজ। ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করে শিক্ষার মানও উন্নীত করেন।

এইসব ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে 'আধুনিকতার' নিদর্শন। কিন্তু এগুলি 'পাশ্চাত্য শিক্ষার' নিদর্শন নয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, আদি পর্বের মিশনারীরা সে শিক্ষা প্রবর্তন করেননি। তবে বহু আধুনিক উপাদান সংযোজন করে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Discuss the contributions of early Christian Missions to education in India.

(গণ শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, শিক্ষণ কলেজ, অনাথাশ্রম ও বৃত্তিশিক্ষা প্রবর্তন, ছাপাখানা, পুস্তিকা প্রকাশ, দেশীয় ভাষার উন্নতি, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা ; বেসরকারী উদ্যোগের উদাহরণ, শিক্ষায় আধুনিকতা সংযোজন ইত্যাদি.)।

2. Enumerate the different methods in which the East India Company patronised the Danish and English missionary efforts. When, why and how was there a total reversal in the Company's attitude ?

(সহায়ক এবং রক্ষাকর্তার ভূমিকা, লটারী, গৃহ সংস্কার, এককালীন দান, বেশী সুদে টাকা আমানত, স্বেচ্ছাশ্রম প্রভৃতি পন্থা। দেশীয় লোকদের সম্ভাব্য প্রতিরোধের ভয়ে ১৭৫৭ সনের পরে রাজনৈতিক স্বার্থে নীতি বদল ; ১৭৬৫ সনে দেওয়ানী পাওয়ার পরে প্রশাসনের দায়িত্ব ; হিন্দু মুসলীম জনতার হৃদয় জয় করার প্রয়োজন ; ধর্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা, মিশনারী কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি।)

3. Make an analysis of the important features of the educational enterprise of early Missions. How far were the Missions responsible for the introduction of Western education in India ?

(পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু নানা ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত গুরুত্ব সম্পন্ন ; নিম্নবর্ণের দরিদ্রের শিক্ষা ; দেশীয় পাঠশালার স্বীকৃতি, মাতৃ ভাষার সমাদর, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা , পাঠ্যক্রমের গুণগত উন্নতি ; দাতব্যের উপর নির্ভরতা, শূন্যস্থান পূরণ করেছেন , স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগের পথ প্রদর্শক , ছাপাখানা ও প্রচার পুস্তিকার ফলে গণশিক্ষা এবং দেশীয় ভাষার উন্নতি, বর্ণবিরোধী ব্যবস্থা। শিক্ষার আধুনিক উপাদান—কিন্তু 'পাশ্চাত্য' শিক্ষা নয়) ।

4. Narrate the circumstances which led to the termination of 18th century Missionary educational enterprise.

(পলাশী , দেওয়ানী লাভ এবং প্রশাসনের দায়িত্ব , নিরপেক্ষতা নীতি। ১৭৮১ থেকে বিচ্ছেদের দ্রুতগতি । ১৭৮৩ সনে পাসপোর্ট, ১৭৯৩ সনে বহিষ্কারের আদেশ। ১৮০০ সনে ভেলোর বিদ্রোহের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ) ।

5. Make a general estimate of the contributions of 18th century missionaries to the cause of education in India.

(ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মিশনারীরা আসেন—একে একে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট উভয় দলই আসেন। উদ্দেশ্য ছিল যুগপৎ ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরকরণ এবং শিক্ষাদান। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক—সামাজিক—সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এঁদের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ধর্ম-প্রচারের ও শিক্ষাদানের কাজ ছিল অঙ্গাঙ্গী জড়িত। নানাধরনের বাধা সত্ত্বেও এঁরা কাজ করেছেন। প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থানের শেষে দিনেমারদের সহায়তায় ইংরেজদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইংরেজ কোম্পানী বিভিন্ন পন্থায় (২নং প্রশ্নে দেওয়া আছে) পাদরীদেব সাহায্য করে। কিন্তু ১৭৫৭ সনের পর থেকে রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীব নীতি বদলে যায়। (২নং প্রশ্নের শেষাংশ এবং ৪নং প্রশ্নে দেওয়া অংশ) ।

মিশনারীদের বিশেষ অবদান—১নং প্রশ্নের উত্তরে, এবং মূল্যায়ন ও মন্তব্য ৩নং প্রশ্নের উত্তরে রয়েছে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেননি, কিন্তু তার পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁরা যেভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবলম্বন করে শিক্ষা প্রয়াস সুরু করেছিলেন, সেই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো ভারতের শিক্ষা ইতিহাস অন্যভাবেই লিখিত হতে পারতো। কিন্তু নতুন পরিবেশের প্রভাবে তাঁদের তৈরী জমির উপরই গড়া হয় নতুন ধরনেব ইমারৎ।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরেজ শিবিরে দুটি ধারা পাশাপাশি চলে। একদিকে ভারতীয়দের স্পর্শকাতরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মিশনারী উদ্যমে বাধা সৃষ্টি করা হয়, অপরদিকে সেই বাধা ও বিচ্ছেদের মধ্যেও নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। প্রথম প্রশ্ন সৃষ্টি হয় শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্বন্ধে। তামিল, তেলেগু, পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গি, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার কথাই আলোচিত হয়। কিন্তু ইংরেজীর প্রতি সমর্থনই ক্রমে দানা বাঁধে। এই মনোভাবই কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ

এই বিচ্ছেদের যুগেই দিনেমার পাদরী 'সুয়াৎর্জ-এর উদ্যোগে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচিনপল্লীতে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দেব জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরেজীকে শিক্ষার গ্রহন করা হয়। ঐ বৎসরই তাঞ্জোর'এ ঐ ধরনের একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় অভিজাত সমাজ এবং রাজন্যবর্গও দাতব্য ভাণ্ডারে দান করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঞ্জোর, রামনাদ, শিবগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে **ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী স্কুল** প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নতুন প্রচেষ্টার পিছনে উৎসাহদাতা ছিলেন কোম্পানীর তাঞ্জোরস্থ 'রেসিডেন্ট' **সুলিভান** সাহেব (Sullivan)। তাঁর আদর্শকে সুয়াৎর্জ সাহেব কার্যে রূপায়িত করেন। সুলিভান সাহেব প্রস্তাব করলেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দিলে কোম্পানী ও ভারতীয়দের মধ্যে **বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠ হবে** এবং ফলে **"সকল প্রকার আদান প্রদান"** সহজসাধ্য হবে। সুলিভানের এই মন্তব্যের বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমতঃ এই মন্তব্যের মধ্যে **শিক্ষার 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে তিনি নতুন আলোকপাত** করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই মন্তব্যের মধ্যেই শিক্ষায় **পাশ্চাত্যবাদের প্রথম সূচনা** লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচ্যবাদের সূচনা

অপরদিকে ১৭৬৫ সনের পরবর্তী বৎসরগুলিতে কোম্পানীর ভারতস্থ উচ্চতম কর্তৃমহল ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে **উদার নিরপেক্ষতার নীতি** (Benevolent Neutrality) অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁদের মতে দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াস হঠকারিতার সামিল। বরং জনতার আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন। জনতাকে বোঝাতে হবে যে কেবল রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি তাদের হয়নি। তাই হিন্দু ও মুসলীম রাজাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে **এদেশীয় শিক্ষায়** উৎসাহ দেওয়াই শ্রেয়। ভারতীয় **অভিজাত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ককে** ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে তাঁদের ছেলেদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে এঁরা উদ্যোগী হন। **প্রাচ্য বিদ্যায়** পারদর্শী এইসব তরুণরা রাজস্ব বিভাগে কিম্বা বিচার বিভাগে হিন্দু মুসলমান আইন বিশ্লেষক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন। তার ফলে কোম্পানীর **প্রশাসনিক সমস্যাও বহুলাংশে লাঘব হবে।**

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ শাসকরা **রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে** এই নীতি গ্রহণ করলেন। অপরদিকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত এই নীতি **সমর্থন** করলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে **এশিয়াটিক সোসাইটি** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **উইলসন** প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যানুরাগীরা অভিমত প্রকাশ করলেন যে ভারতীয় **প্রাচীন সংস্কৃতির** অমূল্য সম্পদের চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতির ফলেই ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলীম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে **কলকাতা মাদ্রাসা** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঠ্যক্রমে থাকে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আইন, গণিত, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি। শিক্ষার বাহন হয় **আরবী**। হেষ্টিংস-এর অনুগামী জোনাথন ডানকান ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন **বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ**। পাঠ্যক্রমে থাকে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, আইন, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি। শিক্ষার বাহন হয় **সংস্কৃত**। এইভাবে শিক্ষানীতিতে **প্রাচ্যবাদের প্রথম সূচনা** ঘটে। বিলেতের **পরিচালক সভা বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থের জন্য হেষ্টিংস নীতিকেই সমর্থন করেন।**

চার্লস্ গ্রাণ্ট-এর আন্দোলন

কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নীতি সত্ত্বেও ইতিমধ্যে অন্য এক চিন্তাস্রোতও প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। ইংলণ্ডের মিশনারী কেন্দ্রগুলি বিচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত **চার্লস গ্র্যান্টের** 'Observations'

পুস্তিকায় নতুন চিন্তা দানা বাঁধলো। ভারতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের নিন্দা করে গ্র্যান্ট সাহেব বলেন যে অজ্ঞানতাই নীতিহীনতার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাই অজ্ঞানতা দূর করবে। আর খ্রীষ্টীয় ধর্মই নৈতিক পুনর্জন্ম আনবে। সুতরাং ভারতীয়দেরকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত করা প্রয়োজন। যন্ত্রবিজ্ঞান এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য অগ্নি, জল ও বাষ্পশক্তি প্রয়োগের দক্ষতাও তাদের দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ **পাশ্চাত্য শিক্ষা** ভারতে প্রবর্তন করা উচিত। ইংরেজী ভাষায় সুনির্বাচিত পাঠ্যের মাধ্যমে সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকপাত করা দরকার। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহে অভাব নেই। **বিনা বেতনে** পড়বার সুযোগ করে দিলে দলে দলে ছাত্র আসবে। সুদক্ষ ও সচ্চরিত্র শিক্ষক অবশ্য প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মিশনারীরাই সর্বাপেক্ষা যোগ্য। ভবিষ্যতে শিক্ষিত ভারতীয়রাই ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে পর্তুগীজ ও ভারতীয় কেরাণীরাও ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তদুপরি **ইংরেজীকে আইন আদালত ও প্রশাসনের ভাষা** বলে স্বীকৃতি দিলে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বাড়বে। ইংরেজী শিক্ষাই ভারতীয়গণকে অনুগত করে তুলবে। এছাড়া খ্রীষ্টীয় ধর্মেও আনুগত্য সঞ্চারের শক্তি রয়েছে।

এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্র্যান্ট সাহেব তাঁর আসল উদ্দেশ্যটিকেও ব্যক্ত করে ফেললেন। তিনি অভিমত দিলেন যে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা **শাসক ও শাসিতের মধ্যে সৌহার্দ** প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরিণামে **বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে**। সুতরাং "সভ্য জাতির" কর্তব্য হিসাবে এবং নিজের স্বার্থেও ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করাই ইংলণ্ডের নীতি হওয়া উচিত।

ভারতীয়দের নৈতিক মান সম্বন্ধে চার্লস গ্র্যান্ট যে মন্তব্য করেন তা নিশ্চয়ই সর্বাংশে সত্য নয়। একথা ঠিক যে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের যুগে সুস্থ মূল্যবোধ অনেকটা নষ্ট হয়েছিল। তবুও সে যুগে ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য ইংরেজের অভিজ্ঞতা গ্র্যান্ট সাহেবের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। সুতরাং **বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির দোষে অতিরিক্ত নিন্দাবাদের জন্য তিনিই নিন্দনীয়**। তা ছাড়া রোগ চিকিৎসার জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের যে দাওয়াই তিনি দিলেন, তাও নিঃসন্দেহে নিশ্চিত ঔষধ নয়। তবুও তাঁর কয়েকটি মন্তব্য ও প্রস্তাব ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রূপেই গ্রহণ করা চলে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজীর স্বীকৃতি এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, এমন কি যন্ত্রবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ারও প্রস্তাব করেন। উত্তর-

কালে ভারতীয়রাই ইংরেজী শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এ মন্তব্যও তিনি করেছিলেন। **এই হিসেবে তিনি লর্ড মেকলে প্রমুখ আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারকদের পূর্বসূরী।**

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার মধ্যেই অবশ্য চার্লস গ্র্যাণ্টের মন্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য। **ভারতীয়দের আনুগত্য** প্রতিষ্ঠা, এবং কৃষিতে উন্নত ভারতের সঙ্গে **ইংলণ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের নিজ স্বার্থে** ভারতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার কথাই গ্র্যাণ্ট সাহেব বলেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে ততদিনে **শিল্পবিপ্লব** অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতকে আর **'পলাশী-লুটের'** ভাণ্ডার রূপে বিচার না করে **দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য** রূপে দেখবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই ভারতে প্রশাসনিক সংস্কারের চেতনা এসেছে। ভারতের কৃষি আর ইংলণ্ডের শিল্পের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেতনা উন্মেষিত হচ্ছে। এই নূতন পরিবেশের রাজনৈতিক প্রতিফলন হলো কর্ণওয়ালিশ-এর শাসন সংস্কারে এবং শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিচ্ছবি পড়লো চার্লস গ্র্যাণ্ট সাহেবের 'অবজারভেশনস' পুস্তিকায়।

উইলবারফোর্স প্রস্তাব

এই পরিবেশে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নতুনভাবে মঞ্জুর করার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে উত্থাপিত হলে গ্র্যাণ্টের দলের প্রেরণায় **উইলবারফোর্স** (Wilberforce) সাহেব একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে **ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ ও সুখ বিধান করা** ইংলণ্ডের কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের **ধর্মীয় ও নৈতিক মানের উন্নতি** প্রয়োজন এবং ''**কার্যকরী জ্ঞান**' প্রচার করাও প্রয়োজন। এই আদর্শে কাজ করবার জন্য পাদরী ও শিক্ষকদেরকে ভারতে বাধাহীন ভাবে যেতে দেওয়া উচিত।

কোম্পানীর পরিচালক সভা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতা এবং অর্থ-কৃচ্ছ্রতার অজুহাতে উইলবারফোর্স প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রবল যুক্তিতে কোন কোন সদস্য মন্তব্য করেন যে সংস্কৃতির ব্যাপারে ভারতকে ইংলণ্ডের দেবার নেই, বরং ভারত থেকে গ্রহণ করার আছে। সুতরাং সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এর চেয়েও প্রখর যুক্তি হলো যে আমেরিকার উপনিবেশে শিক্ষা প্রসারের ফলে যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হলো, তারই জন্য আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারাতে হয়েছে। তেমনি ভুল দ্বিতীয়বার হতে দেওয়া চলে না।

বস্তুতঃ ইংলণ্ড তখন বিপ্লব ভীতিতে কম্পিত। সেই যুগটি ছিল ফরাসী বিপ্লবের যুগ। ইংলণ্ড ছিল ফরাসী বিরোধী শক্তি সমন্বয়ের নেতা। 'উদার' ইংলণ্ডের চারদিকে রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলে তখন বিপ্লবী ভাবধারার গতিরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতেও ফরাসী জুজুর ভয় ছিল। ভারতের মাত্র একাংশ তখন ব্রিটিশ কবলিত। মারাঠারা তখনও প্রবল। অনধিকৃত ভারতের সহানুভূতি রয়েছে ফরাসীদের প্রতি। এই পরিবেশে কোন ঝুঁকি লওয়া পার্লিয়ামেণ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতের ইংরেজ শাসকবর্গও রক্ষণশীল প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন। সুতরাং উইলবারফোর্স প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টে অগ্রাহ্য হলো।

শুধু তাই নয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহী অভ্যুত্থান ভারতস্থ কর্মচারী এবং পরিচালক সভাকে আরও শঙ্কিত করে তুললো। তাই ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচারিত "Address to Hindoos and Mohammedans" এর বিরুদ্ধে ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে প্রতিক্রিয়া হলো, তখন শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যমকে শুব্ধ কবার ব্যবস্থা হলো। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভা "উদার নিরপেক্ষতা" নীতি আবার ঘোষণা কবে ভাবতীয় সমাজকে আশ্বস্ত করলেন। ইংরেজ প্রাচ্য-বিদ্যাবাদীরা বললেন যে ভারতীয় জ্ঞান ও শিক্ষার অবক্ষয় রোধ করার জন্য সরকারী আনুকূল্যের প্রযোজন আছে। সবকারী সাহায্যে প্রাচীন শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে ভারতীয় অভিজাত সমাজের অন্তর জয় করাও সম্ভব হবে।

এই নীতিই প্রস্তাবিত হলো ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভার কাছে লেখা লর্ড মিণ্টোর মন্তব্যে। তিনি লিখলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথে চলেছে। পণ্ডিতের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিদ্বৎসমাজ সংকুচিত হচ্ছে। সুতরাং তিনি কলকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী কলেজের সংস্কার, আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ এবং কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে উচ্চমানের হিন্দু ও মুসলীম শিক্ষা সংরক্ষণের প্রস্তাব করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানীর উদ্যোগ ও অর্থ-ব্যয়ের প্রস্তাব করলেন।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যবিদ্যা পন্থীরাও সরকারী হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্যবিদ্যা পন্থীরাও সরকারী হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন। সরকারী ভূমিকা সম্পর্কে এই ঐক্যমত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের

পথ প্রশস্ত করে দিল। স্বল্প কয়েক বৎসর পরে, ১৮১৩ সনেই শিক্ষায় সরকারী উদ্যোগের সূচনা হলো।

শিক্ষা সংস্কৃতির নতুন পটভূমি

নীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমতঃ কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কিত এক **ভারতীয় বণিক শ্রেণী** ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজের উপর নির্ভরশীল এক **নতুন ভূস্বামী শ্রেণী** সৃষ্টি হয়েছে। পুরাতন বর্ণকৌলিন্যের বদলে এই দুই শ্রেণী **অর্থকৌলিন্য** দাবি করেছেন। ইংরেজী সমাজ ও শিক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠতাকে এঁরা কৌলিন্যের বহিরঙ্গ বলে মনে করেছেন। তৃতীয়তঃ কোম্পানীর চাকুরিয়া **একদল মধ্যবিত্তও** মাথা উঁচু করেছেন। চতুর্থতঃ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ** প্রতিষ্ঠার ফলে এক নতুন সাংস্কৃতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এই যুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোম্পানীর নব্য ইউরোপীয় কর্মচারীদেরকে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা এবং দেশীয় মধ্যবিত্তদেরকে ইংরেজী ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করবার উদ্দেশ্যেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিকে অবলম্বন করে স্বনামখ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ী এক বিপ্লবাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুদক্ষ প্রচারক রেভারেণ্ড ডঃ **উইলিয়াম কেরী** (Carey) এদেশে এলেন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রথমে মালদহকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন। মুদ্রণ পারদর্শী **ওয়ার্ড** এবং শিক্ষকতায় পারদর্শী **মার্সম্যান** এলেন ১৭৯৯-এ। কিন্তু পাদরীদের কাজ সম্বন্ধে সরকারের বিরূপতার ফলে এঁরা তিনজনই শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিতে আশ্রয় নিয়ে যৌথ ভাবে কাজ করতে থাকেন। এঁরা তাই শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে খ্যাত।

এঁদের চেষ্টায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে **শ্রীরামপুর ছাপাখানা** প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী সাহেব **বাইবেলের** New Testament **বাংলায়** অনুবাদ করেন। ক্রমে এই গ্রন্থ ভারতের ৩১টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮০১ সনে কেরী প্রণীত **বাংলা ব্যকরণ** প্রকাশিত হয়। প্রায় ৮০ হাজার শব্দ সম্বলিত, চার খণ্ডে

যমাগু কেরী সাহেবের **ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধান**ও এক স্মরনীয় গ্রন্থ। কথ্য বাংলা ভাষার সাথে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করবার জন্য লিখিত **'কথোপকথন'** (Colloquies) কেরী সাহেবের আর এক কীর্তি। তিনি **"ইতিহাসমালা"**ও রচনা করেন। এটি কিন্তু অনুবাদ নয়। বাংলাদেশে লোকমুখ থেকে সংগৃহীত ১৫০ টি ছোট গল্প কেরী সাহেব সংকলন এবং সম্পাদন করেন। ১৮২০ সনে প্রকাশিত হয় **'বিদ্যাহারাবলী'**। ইংরেজী Encyclopaedia Britannica থেকে শারীরবিদ্যার (Anatomy) অংশ অনুবাদ করেই এই বই তৈরী হয়।

উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের **প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ** হয়েছিলেন। ঐ কলেজের ভিতরে ও বাইরে দেশী বিদেশী কয়েকজন পণ্ডিত নিয়ে তিনি এক চক্র গড়েন। দেশী পণ্ডিতদের দিয়েও তিনি বই লেখালেন। কেরী সাহেবের মুন্সী **রামরাম বসু** ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর লেখা **"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"** ১৮০১ সনে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে **"জ্ঞানোদয়"** এবং **"লিপিমালা"** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **গোলকনাথ শর্মার** বাংলায় **"হিতোপদেশ"** ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন"** বইখানি সংস্কৃত "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" অবলম্বনে লেখা। লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল **"রাজাবলী"** এবং **"প্রবোধচন্দ্রিকা"**। এইসব গ্রন্থকেই দেশীয় লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে গণ্য করা চলে। বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত। পরে অবশ্য তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০৩ সনে **তারিণীচরণ মিত্র "ঈশপ"-এর গল্পাবলীর** অনুবাদ করেন। আর **রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত"** প্রকাশিত হয় ১৮০৫ সনে। ইনিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে **রামকিশোর তর্কালঙ্কারের** হিতোপদেশের আর একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ রায়ের **"পুরুষ পরীক্ষা"** প্রকাশিত হয় ১৮১৫ সনে। কলেজের ছাত্রদের জন্যই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। **রামচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবাগীশের "জ্যোতিঃসংগ্রহ"** প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সনে। এখানাই বাংলা ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ।

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টিতে কেরী সাহেবের দান অবিস্মরণীয়। তিনি অবশ্য মারাঠি এবং হিন্দী ভাষায়ও গদ্য রচনা করেন। শ্রীরামপুর ত্রয়ী স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার সূচনাও করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় **"সমাচার**

দর্পণ" প্রকাশিত হল ১৮১৮ সনে। এই শুভ সূচনাই স্বল্পকালের মধ্যে বিভিন্ন ভাবচক্রের মুখপত্র রূপে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ খুলে দেয়।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগের ফলে সমাজ, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এ যুগে সৃষ্টি হলো। শ্রীরামপুরের ত্রয়ী পাদরী স্বভাবতঃই এ বিষয়ে চুপ করে রইলেন না। ১৮০৭ সনে প্রচারিত তাঁদের "Address to Hindoos and Mohammedans" পুস্তিকায় হিন্দু ও মুসলীম ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কটাক্ষ ও সমালোচনায় উভয় ধর্মের রক্ষণশীল সমাজেই প্রতিবাদ ওঠে। "বিচ্ছেদনীতি"র প্রভাবে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রীরামপুর প্রেস বাজেয়াপ্ত করে ত্রয়ীকে পুলীশী পাহারায় কলকাতায় আনবার আদেশ দেন এবং আবারও "নিরপেক্ষতা" নীতি ঘোষণা করেন। দিনেমারদের মধ্যস্থতায় অবশ্য শ্রীরামপুর ত্রয়ী রক্ষা পেলেন। কিন্তু তাঁদের ধর্ম প্রচারের কাজে নানা বিধিনিষেধ দেওয়া হলো।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর উদ্যম কিন্তু আদৌ কমলো না। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ও মার্শম্যান "Calcutta Benevolent Institution"প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরই মার্শম্যান শ্রীরামপুরে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৫ সনের মধ্যে কেবল ত্রয়ীর চেষ্টাতেই কুড়িটির বেশী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সনে হলো **শ্রীরামপুর কলেজ**। খ্রীষ্টান এবং অখ্রীষ্টান যুবকদের মধ্যে **পাশ্চাত্য কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারই** হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশীয় শিক্ষক তৈরী করা**। এইটিই হলো প্রথম ইংরেজ মিশনারী কলেজ। এই কলেজে ধর্মতত্ত্বও পড়ানো হয়। ১৮২৭ সনে এই কলেজ এক সনদের মাধ্যমে স্নাতক উপাধি দানের যোগ্যতা অর্জন করে। আজও এই কলেজে ধর্মতত্ত্বে (Divinity) উপাধি দেওয়া হয়।

অন্যান্য বেসরকারী উদ্যোগ

পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ ক্রমে দানা বাঁধছিল তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন অন্যান্য মিশনারীরা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি শিক্ষা-ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিশেষ পর্যন্ত। এঁদের কাজ ভারতের অন্যত্রও প্রসারিত হয়। ১৮০৪ সন থেকে **লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি** দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপত্তম এবং বাংলাদেশে চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। Weslyan Misson স্কুল গড়েন আগ্রা, সুরাট, ট্রাঙ্কুভার, মীরাট, কলকাতা প্রভৃতি কেন্দ্রে। ১৭৮৯ সনেই Calcutta Free School Society গঠিত হয়, এবং এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল, যা আজও

St Thomas' স্কুল নামে জীবিত। এরও আগে ১৭৮৮ সনে হিন্দুদের জন্য **ব্রাউনের বোর্ডিং স্কুল** স্থাপিত হয়। স্বল্পদিনের মধ্যেই এইরকম ২০টি প্রাইভেট স্কুল গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে কেবল বাংলা দেশেই শতাধিক নূতন ধরনের বিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। এই নূতন পটভূমিই **১৭৯৩ সনের নীতি পুনর্বিবেচনার** ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

তাছাড়া ভারতের বৃহত্তর অংশে ততদিনে **ব্রিটীশ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত** হয়েছে। মহীশূরের পতন হয়েছে। মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ই ধ্বংসের মুখে। ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আর রইল না। **ওলন্দাজ এবং ফরাসী ভীতিও দূর** হয়েছে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে ব্রিটীশ ভারতে **প্রশাসনিক স্থায়িত্ব** এসেছে। ইউরোপেও ফরাসী শক্তির ভগ্নস্তূপের উপর **ইংরেজ সাম্রাজ্য হলো নিষ্কণ্টক**। নতুন সম্ভাবনা এবং দ্রুতগতি শিল্পায়নের প্রেরনায় ইংবেজ পার্লিয়ামেণ্টও ভারত সম্বন্ধে নতুন করে ভাবলো।

১৮১৩ সনের সনদ আইন

এই ভাবনা বাস্তব রূপ নিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরনের সময়। পার্লিয়ামেণ্টের সামনে ছিল **দুটি সমস্যা—মিশনারীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভাব** এবং **শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা**। প্রথম সমস্যার ক্ষেত্রে ১৮১৩ সনের সনদে ভারতে **মিশনারীদের অবাধ প্রবেশ** এবং কর্মোদ্যম স্বীকার করা হল। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে পরিচালক সভার বাধাকেও পার্লিয়ামেণ্ট অগ্রাহ্য করলেন। প্রাচ্যবাদী এবং পাশ্চাত্যবাদী—উভয়দলই ভিন্ন ভিন্ন কারণে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং আর্থিক সাহায্যের দাবি তুলেছিলেন। এই ঐক্য মতকেই পার্লিয়ামেণ্ট গ্রহণ করলো। সনদ আইনের ৪৩ **ধারায়** বলা হলো যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ভারতের দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত সরকারী রাজস্ব থেকে প্রতি বৎসব অন্যূন ১ **লক্ষ টাকা** ব্যয় করা সমীচীন হবে।

সনদ আইনের মূল্য ও তাৎপর্য

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা ধারার তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বলা দরকার। (১) এই সিদ্ধান্তের ফলে চার্লস গ্র্যাণ্টের আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হলো, কিন্তু পুরোপুরি জয়লাভ করল না। মিশনারীদের কাজের সুযোগ হল, কিন্তু তাঁদের একাধিপত্য হল না, বরং নূতন বিপত্তি এড়াবার জন্য পাশাপাশি সরকারী উদ্যমও

স্বীকৃত হল। (২) খ্রীষ্ট ধর্মীয় শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা বলে ঘোষণা করা হল না। এটাই হলো ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ভিত্তি। (৩) সাহিত্য ও শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং উন্নয়ন ; দেশীয় পণ্ডিতকে উৎসাহদান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান,—উভয় কথাই বলা হল। সুতরাং প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটিকেও নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা হল না। এরই ফল হল ভবিষ্যৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব। সুতরাং মনে রাখা দরকার যে **১৮১৩ সনের আইন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেনি,** কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে **এক ধাপ অগ্রসর করিয়েছে** একথা ঠিক। বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে। (৪) এই সনদেই মিশনারীদের সুযোগ করিয়ে দিয়ে **বেসরকারী উদ্যমকে স্বীকার করা** হল। কিন্তু পাশাপাশি সরকারী উদ্যমের প্রবর্তন হল। **সরকারী ও বেসরকারী উদ্যম সমন্বয়ের** এই ধারা আজও পর্যন্ত চলেছে। (৫) সরকারী উদ্যমের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিও বোঝা দরকার। এই আইনে শিক্ষায় **পূর্ণাঙ্গ** সরকারী **"দায়িত্ব" স্বীকৃত হয়নি**। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে **সরকারী উদ্যম ও কর্তব্য স্বীকৃত হয়েছে**। অর্থাৎ শিক্ষায় সরকারী **"অংশীদারত্ব"** (Partnership) স্বীকৃত হলো। সম্যক দায়-দায়িত্ব গ্রহনের বদলে **নির্দিষ্ট অর্থব্যয় ও অনুদান** ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত সরকারী ভূমিকার ফলশ্রুতি আজও চলছে।

সনদ আইনটি হল একটি **আপস-রফার দলিল**। কিন্তু এই সাময়িক আপসের নীচে লুকানো ছিল ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ। অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির সুমীমাংসার জন্যই ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বিতর্ক ও সংঘর্ষ চলেছিল। এই সংঘর্ষের পরিণামেই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিষ্কারভাবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি সুস্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন এবং প্রস্তুতি সংকেত

1. **Discuss the historical significance of Sullivan's proposal and his educational activities in Southern India.**

(কোম্পানী ও মিশনারীদের সম্পর্কে ফাটল ধরা সত্ত্বেও নূতন চিন্তার উন্মেষ ; সুলিভানের উৎসাহে সুয়ার্ৎজ-এর চেষ্টায় ইংরেজী স্কুল স্থাপন, এই কাজে দেশীয় নেতাদেরও সহযোগিতা। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সুলিভানের ব্যাখ্যায় ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শাসক-শাসিতের মধ্যে বোঝাপড়া। এ থেকেই পাশ্চাত্য পন্থার উদ্ভব। এখানে ঐতিহাসিক তাৎপর্য।)

2. State the viewpoints of, and account for the conflict between Hastings-Duncan School and Grant-Wilberforce School of thought.

(হেষ্টিংস-ডানকান চক্রের অভিমত—রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা দরকার, সুতরাং ধর্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা এবং হিন্দু মুসলীম রাজাদের মত প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যায় উৎসাহ; অন্তর জয় করার চেষ্টা; উচ্চশ্রেণীর যুবকদের শিক্ষা দিয়ে চাকরি দেওয়া, এই শ্রেণীর সাথে সদ্ভাব; এর ফলে শাসনের সুবিধা; তাই মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এশিয়াটিক সোসাইটির নেতাদেরও একই অভিমত। সাম্রাজ্যের স্বার্থে এই নীতিতে পরিচালক সভার সমর্থন।

গ্র্যাণ্ট-উইলবারফোর্স দলের অভিমত—নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ভারতীয়দের আগ্রহ। ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করলে আগ্রহ আরও বাড়বে। ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনারী প্রভাবে লোকের আনুগত্য আসবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য শাসক ও শাসিতের ঘনিষ্ঠতা। বিলেতে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারত সম্পর্কে নূতন চেতনা)।

3 Analyse the forces and circumstances which led to the adoption of the education and missionary clauses in the Charter Act of 1813.

Or, **How can you explain that the proposals rejected in 1793 were accepted in 1813 ?**

(১৭৯৩ সনে প্রস্তাব বর্জনের কারণ—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার ভয়; প্রাচ্য বিদ্যাও সুমহান, এই যুক্তি। আমেরিকার অভিজ্ঞতা; সর্বোপরি বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভয়। প্রস্তাব শুধু বর্জন করাই হলোনা, ভেলোর বিদ্রোহের পরে মনোভাবে আরও কড়াকড়ি; শ্রীরামপুর ত্রয়ীর বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব; নিরপেক্ষতা নীতির পুনর্ঘোষণা।

অবস্থার পরিবর্তন—ভারতে বণিক ও নূতন জমিদার শ্রেণী এবং অর্থকৌলিন্য; মধ্যবিত্তের জন্ম; ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ; শ্রীরামপুর পাদরীদের অবদান, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ; বেসরকারী উদ্যোগের সূচনা। অনুকূল পরিবেশ। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটীশ শাসন। রাজনৈতিক ভয় রইল না। নূতন ধরনের প্রশাসন। স্থায়ী সাম্রাজ্যের চেতনা। সুতরাং নূতন শিক্ষা।)

4. **Discuss the nature and significance of the educational clauses of the Charter Act of 1813.**

(চার্টার আইনের দুইটি ধারা—মিশনারীদের সুযোগ এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়। গ্র্যাণ্টের পুরো জয় নয়, মিশনারীদেরও নয়; কিন্তু উভয়েরই আংশিক জয়। পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ; মিশনারীদের একচেটিয়া সুযোগ নয়; নির্দিষ্টভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলেও নয়। আপসের দলিল। কিন্তু মিশনারী ও অন্যান্য বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ; রাষ্ট্রের অংশীদারত্ব এবং আর্থিক দায়িত্ব। অমীমাংসিত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য বিতণ্ডার সূচনা।)

5. **"The Charter Act of 1813 forms a milestone in the history of modern education in India."—Discuss.**

(অষ্টাদশ শতকের মিশনারীরা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছিলেন, কিন্তু তাঁদের পিছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরোক্ষ উৎসাহ এবং সহায়তা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর দায়িত্ব ছিল না। এমন কি ঐ শতকের শেষভাগে মিশনারীদের সাথে কোম্পানীর বিচ্ছেদ ঘটেছিল। মিশনারীরাও ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার বদলে প্রধানতঃ দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতিতেই শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিন্তাজগতে পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হওয়ায় পরিবর্তন দ্রুততালে এগিয়ে যায়। ১৮১৩ সনে নূতন নীতির সূচনা হয়। মিশনারীরা আবার কাজের সুযোগ পান। এবারে তাঁরা সচেতনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার করতে থাকেন। কোম্পানীও সরাসরি এবং সরকারীভাবে শিক্ষার কাজে অংশ নিতে থাকে। রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা হয়। তখনও পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে কোম্পানীর নীতি ঘোষণা না করলেও ১৮১৩ সনের পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পথ খুলে যায়। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই চার্টার আইনের তাৎপর্য।)

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন

শিক্ষার জন্য সরকারী রাজস্ব থেকে ব্যয় করার নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে **১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হলো ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি।** সনদ আইনে বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকলেও অন্ততঃ **তিনটি সুস্পষ্ট বক্তব্য** উপস্থাপিত হলো। (১) মিশনারী প্রচেষ্টার সুযোগ হলো, (২) সরকারের কর্তব্য স্বীকৃত হলো, (৩) কিন্তু সবকারী সাহায্যেব পরিমাণ সীমায়িত হওয়ায় বে-সরকারী উদ্যমের ব্যাপক সুযোগ হলো। এই তিনটি ধাবাতেই পরবর্তী বৎসরগুলিতে শিক্ষার কাজ এগিয়েছে।

মিশনারী কর্মোদ্যম

১৮১৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত মিশমারীদের অবদানই সর্বাধিক। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পাদরীর দল আসেন। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সনের মধ্যে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, লণ্ডন মিশন, চার্চ মিশন, স্কটিশ মিশন, ওয়েসলিয়ান মিশন প্রভৃতিই ছিল প্রধান উদ্যোগী! ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেব সনদ আইনে আরও একটু উদাবতাব ফলে পরবর্তী ২০ বৎসরে আরও নতুন নতুন সংগঠনের আমদানী হয়। Basel Mission, Lutheran Society, American Baptist Union, American Board, American Presbytarian Mission প্রভৃতি এই যুগে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

পুরাতন কর্মোদ্যমকে এঁরা বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। **সমগ্র ভারতে এঁরা ছড়িয়ে পড়েন।** বাংলাদেশে বেশী সক্রিয় ছিল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, স্কটিশ মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি। কেবল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিই ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ সনের মধ্যে রেভারেণ্ড মে'র (Rev May) নেতৃত্বে চুঁচুড়ার চারপাশে ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানকে কেন্দ্র করে দশটি দেশীয় ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের পরিচালনায় ছিল ১০৭টি স্কুল। এঁরা নীতি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরোপযোগী কয়েকখানা পাঠ্য-পুস্তকও প্রকাশ করেন। বোম্বাইতে আমেরিকান মারাঠি মিশন, দক্ষিণ ভারতে ওয়েসলিয়ান মিশন, সৌরাষ্ট্র-গুজরাটে আইরিশ মিশন বেশ সক্রিয় ছিল। এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের বিশপ কলেজ, বোম্বাইয়ের উইলসন কলেজ প্রভৃতি।

ডাফ্-এর যুগ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিশনারীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, ইংরেজী ও দেশীয় উভয় ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন। কিন্তু স্কটিশ মিশনের Rev. Alexander Duff'এর নেতৃত্বে মিশনারী কাজের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন আসে। ডাফ বললেন যে **পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা** এবং **বাইবেলের প্রতি অনুরাগই** ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ। তাঁর বক্তব্য হলো যে ভারতীয় **অভিজাত সমাজকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত** করাই মিশনারীদের প্রকৃত কর্তব্য। সুতরাং এই **শ্রেণীর মধ্যেই মিশনারীদের কাজ করা উচিত**। এটি হবে **পূর্ণাঙ্গ পাশ্চত্ত্য শিক্ষা**। সুতরাং **ধর্মান্তরকরণের চেষ্টার** সঙ্গে শিক্ষার কাজ যুক্ত হওয়া দরকার।

এই নীতিকে অবলম্বন করেই ডাফ সাহেব ১৮৩০ সনে General Assembly's Institution (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই ডাফ নীতি সমগ্র মিশনারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। এ সময় উগ্র ডাফ নীতি অনুসারে মিশনারীদের কাজ ছড়িয়েছিল বলেই উনবিংশ শতকেব চতুর্থ-পঞ্চম দশককে বলা হয় **ডাফের যুগ**।

ডাফনীতির বৈশিষ্ট্য

ডাফ যুগে মিশনারী কাজের **বৈশিষ্ট্য** ছিল (১) ধর্মান্তরের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান, সুতরাং **ধর্মান্তরকরণের অগ্রাধিকার**; (২) আবশ্যিক রূপে **বাইবেল অধ্যয়ন**। (৩) মূলতঃ **উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা** প্রচেষ্টা, (৪) পূর্ণাঙ্গ **পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা**। (৫) প্রধানতঃ **মাধ্যমিক** ও **উচ্চস্তরের শিক্ষা**। (৬) **সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিত্তালয়** (৭) শিক্ষার মাধ্যম রূপে **ইংরেজী ভাষা**; (৮) উচ্চশ্রেণীর **নারী সমাজেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার**। (৯) শিক্ষার ক্ষেত্রে **মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকার**। (১০) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যমের বদলে মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকার এবং কেবল আর্থিক **অনুদানের মাধ্যমেই সরকারের দায়িত্ব সম্পাদন**।

লক্ষণীয় যে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের মিশনারীদেব কাজ থেকে উনবিংশ শতকের মিশনারীদের কাজ প্রকৃতিগত ভাবে পৃথক হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীরা দেশজ ধরনের স্কুলে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে কার্যকরী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ করেছিলেন। ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তর তাঁরাও

করেছেন, কিন্তু কেবল সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয় পরিচালনা করেননি। উনবিংশ শতাব্দীর কাজে এই নতুনত্ব মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। ভারতে রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই মিশনারী শিক্ষানীতিতে এই পরিবর্তন এসেছে।

আলেকজাণ্ডার ডাফ এক পুবোদস্তুর আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তিনি বলেন যে কোম্পানীর বিদ্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ, সুতরাং ক্ষতিকারক, দ্বিতীয়তঃ অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। শিক্ষা দেওয়ার নৈতিক অধিকার রয়েছে কেবলমাত্র পাদরীদের, এবং অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের শক্তিতেও তাঁরাই যোগ্য। সুতরাং মিশনগুলিকে সরকারী সাহায্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে দাঁড়ানো উচিৎ। লর্ড অকল্যাণ্ড ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং প্রাচ্য বিদ্যার জন্য সাহায্য দেওয়ার নীতিকেও তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা কবেন। সবকারী চাকুরির জন্য সবকারী স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পবীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জ'-এর প্রস্তাবকেও তিনি নিন্দা করেন।

কিন্তু শত ভাল কাজ সত্ত্বেও উগ্র নীতিব মধ্যে লুকানো ছিল মিশনাবীদেব ভবিষ্যৎ পরাজয়ের বীজ। ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে স্বপ্ল সংখ্যক যদিও খ্রীষ্টিয় ধর্মেব মাদকতায় উন্মত্ত হলেন, তবুও অধিকাংশই রইলেন নিজস্ব ধর্মে অবিচল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট হলেন না। মিশনারী কলেজগুলিতে বাইবেল শিক্ষাও ফলপ্রসূ হলো না। পরন্তু **ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে** আন্দোলন সৃষ্টি হলো। ফল হলো ধর্মনিরপেক্ষ **দেশীয় অভিমতের সাথে মিশনারী অভিমতের সংঘাত**। মধ্যবিত্ত দেশীয় সমাজকে জয় করাই ছিল সে যুগের সরকারী নীতি। তাই কোম্পানী ও পাদরীদের মধ্যে সাধারণ সদ্ভাব থাকলেও, এবং কোম্পানীর বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী কর্মকর্তা পাদরীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আবারও সৃষ্টি হলো **সরকার ও মিশনারীদের দ্বন্দ্ব**।

মিশনারীদের কৃতিত্ব

নীতিগত উগ্রতা এবং সংঘাত সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারীদের দান অনস্বীকার্য। প্রথম পর্বে **পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের কৃতিত্ব তাঁদের।** ঐ সূত্রে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক **আধুনিক উদারনৈতিক ভাবধারাও** আমাদের দেশে সঞ্চারিত হয়; সমাজ সংস্কারের পথে আমাদের **অগ্রসর হওয়ার**

পথ, সুগম হয়। **নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে** পাদরীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষা এবং কয়েকটি **উন্নত স্তরের স্কুল** ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁদের। প্রথম **নরম্যাল স্কুলও** তাঁরাই স্থাপন করেন। অবশ্য এদেশের ভাবজগতে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল বলেই এ সব কিছু সম্ভব হয়েছে।

বাংলার নবজাগরণ

এ দেশের ভাবমানসে যে বিরাট পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা জগতে পরিবর্তনের পটভূমি তৈরী হলো, তাকেই বলা হয় **রেনেসাঁ**। ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রধানতম ক্ষেত্র বাংলাদেশকে অবলম্বন করেই এই পবিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল বলে 'বাংলার নবজাগরণ' হিসাবেই এই আন্দোলন সমধিক খ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনায় যে আলোড়নকে অবলম্বন করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায়, শিক্ষা ও যুক্তি সাধনায়, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে নতুন কর্মস্রোত প্রবাহিত হয়ে সমগ্র জীবনকে আলোড়িত করে, তাই **বাংলার নবজাগরণ**।

ক্ষয়িষ্ণু এবং কলুষিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনে ধর্মীয় কুসংস্কার যখন দানা বেঁধে ছিল, রক্ষণশীলতার আবর্তে সমাজ যখন প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিল, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে যখন সৃজনশীলতা নিশ্চিহ্ন হচ্ছিল, সে সময় এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই আমরা জেগে উঠলাম। নতুন প্রকৃতির ব্রিটিশ শাসন, নতুন ধনবাদী অর্থনীতি, সামাজিক জীবনে উদারনৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান জীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত করে নবজাগরণের সূচনা করলো।

ইউরোপে নবজাগরণের পরিবেশ এবং কারণের সাথে ভারতের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকলেও বাহ্যিক রূপে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। প্রাচীন জ্ঞানের সারবস্তু আহরণের জন্য নতুন ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে। যুক্তিশীল দৃষ্টিতে বেদ উপনিষদের মর্মকথা চয়নের প্রবণতা দেখা দেয়। এরই ফলশ্রুতি হলো ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টা। প্রাচীন সাহিত্যেব নতুন মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় মাতৃভাষার আধুনিকীকরণ, গীতিকাব্য, গদ্য সাহিত্য এবং ব্যাপক সাহিত্য চর্চা। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্যক্তির মূল্য স্বীকৃত হয়। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন এই সূত্রেই অনুভূত হয়। যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার

ফলে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনও এই নবচেতনার অংশবিশেষ। পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তে এক নতুন মূল্যবোধই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রাজা রামমোহন রায়

প্রথম পর্বে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন রাজা রামমোহন রায়। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী; বাংলা ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত এই মহামানব হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও ছিলেন সুপণ্ডিত। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার বর্জন করে বেদান্তের একেশ্বরবাদকে তিনি নতুন করে প্রচার করেন। অপরদিকে পাদরীদের উগ্রতা ও সংকীর্ণতাকে সমালোচনা করে খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বেরও উদার ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে পরস্পরের কাছে পরিচিত করবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এবং তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের বেন্থাম (Bentham)ও জেম্স মিল প্রমুখের র‍্যাডিক্যাল মতবাদের প্রভাবও তিনি ধারন করেছেন। তিনিই সমাজ সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ অবদান আত্মস্থ করে ভারতীয় সংস্কৃতির রূপান্তর সৃষ্টিতেই তিনি ব্রতী হন। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের বদলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম অবদানের **সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর নীতি**। একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষাকে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে আবার আধুনিক বাংলা ভাষার জনক রূপে খ্যাত হয়েছেন। সমাজ সংস্কার এবং নারী স্বাধীনতা দাবি করেছেন; কিন্তু ভাববিলাসীদের মত দেশের সমগ্র মূল্যবোধকেই বিসর্জন দেননি। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন জ্ঞানের চর্বিত চর্বণে বাধা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে বেদান্ত শিক্ষাও যে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা প্রমাণ করেছেন। সমন্বয় সাধক রাজা রামমোহনকেই **ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত** বলা চলে। এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় বিদ্বজ্জন।

বাস্তব কাজেও রাজা রামমোহন ছিলেন অন্যতম অগ্রণী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Anglo Hindoo School-এর পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল ভলতেয়ারের তত্ত্ব, ইউক্লিড়'এর জ্যামিতি, জোতির্বিজ্ঞান; যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে ইংরেজী পড়ানো হতো। শ্রীরামপুর ত্রয়ী রেভারেণ্ড এ্যাডাম, স্কটিশ মিশনকে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। এমন কি উগ্রপন্থী ডাফও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে

তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং পাদরীদের প্রধান সহায়ক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সর্বোপরি, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন 'অপ্রয়োজনীয় শিক্ষার' জন্য অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে যিনি লর্ড আমহার্ষ্ট-এর কাছে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং 'প্রয়োজনীয়' পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য অর্থ সাহায্য দাবি করেন। বস্তুতঃ দেশীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই শক্তিশালী প্রগতিশীল অংশ সোজা-সুজি পাশ্চাত্য শিক্ষা দাবি করার ফলেই সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি স্থির করা অবশ্যম্ভাবী হলো। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে দেশীয় অভিমতের এই অগ্রগতি ইংরেজ মহলের পাশ্চাত্যবাদী দলকে শক্তিশালী এবং সাহসী করে তুললো। তারই ফলশ্রুতি হলো ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব।

ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া

শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও রামমোহনের নেতৃত্বে নবজাগরণ আন্দোলন ভারতের ভাবমানসে **ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয় প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে**। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধে একটি ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীল অভিমতের মধ্যে। এই দলের নেতৃত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। তাঁরা রামমোহনকে ধর্মত্যাগী, সমাজত্যাগী বিদ্রোহী সন্তান বলে অভিহিত করে সর্বাত্মকভাবে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন প্রবল বিরোধিতা করেন নি। রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রাজ্ঞতায় তাঁরাও সন্দিহান ছিলেন না। কিন্তু রামমোহনের আন্দোলনে নব্য সমাজে যে উগ্রতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে রক্ষণশীল সমাজের ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয় রামমোহনের উপর। অথচ রামমোহনের সাহচর্য বাদ দিয়ে তাঁরাও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন। বস্তুতঃ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দুবিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও পরিচালক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটিতে' এঁরাও অংশ গ্রহণ করেছেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও এঁরা সাহায্য করেছেন। কিন্তু রামমোহনের সমন্বয়ী নীতির বদলে এঁরা চেয়েছিলেন **রক্ষণশীল ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থান**। যাই হোক, আধুনিক শিক্ষার প্রতি এই দল সম্পূর্ণ বীতরাগ না হওয়াতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

উগ্রপন্থী প্রতিক্রিয়া

অপরদিকে ভাবজগতের উগ্র চেতনা দানা বাঁধে যুব-বাংলা আন্দোলনের মধ্যে। হিন্দু বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুব সমাজেরই একাংশ **ডিরোজিও'র প্রভাবে যুব বাংলা আন্দোলন** গড়ে তুললেন। পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, হিন্দু সমাজের বাঁধন অস্বীকার করে, **সব কিছু আধুনিকতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ** করার পদ্ধতিতেই গড়ে উঠলো এই আন্দোলন। বলা বাহুল্য এঁদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টানও হলেন।

যুব-বাংলার চিন্তাধারার উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের। মতবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এঁরা ১৮৩০ সনে 'Parthenon' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজপতিদের দাবিতে এই পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে পার্থেনন'-এর কণ্ঠরোধ করায় এদেশের ইংরেজরাও খুশী হয়েছিলেন, কারণ এই যুবশক্তিই ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত এঁরাই জুরীর বিচার, প্রশাসনের দেশীয়করণ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষে এবং ভারতকে নির্লজ্জ শোষণ এবং ভারতীয়দেরকে কুলিরূপে বিদেশে চালানের বিরুদ্ধে সভা সমিতি সংগঠন করেন। ১৮৩৩ সনের সনদ আইনের বিশেষ বিশেষ ত্রুটির জন্য সনদ আইনকেও এঁরা সমালোচনা করেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও **দেশবাসীর জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান প্রচারের দাবিও** এঁদের কাছ থেকেই সর্ব্বপ্রথম আসে।

কেবল সভা সমিতিতে সন্তুষ্ট না থেকে এঁরা ইংরেজীতে 'Enquirer' এবং বাংলায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। "Academic Association" ছিল এঁদের আর একটি প্রতিষ্ঠান। ১৮৩৩ সনে এঁরা 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরই 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Public Library প্রতিষ্ঠায় এঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সনে এঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন "Society for the Acquisition of General Knowledge," এবং ১৮৩৯ সনে "Mechanical Institute."। নারী স্বাধীনতা এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এঁদের উৎসাহ ছিল অতুলনীয়। এই দলেরই অন্যতম নেতা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন স্কুলের জমি দান করেছিলেন।

শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার হিসেবে যুব-বাংলার দান উল্লেখযোগ্য

ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষার সমাদর, দেশীয় 'জনসাধারণের' শিক্ষা, বিজ্ঞান চেতনা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির স্বপক্ষে এঁদের আন্দোলনের ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। তখনকার মত এই আন্দোলন পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় চেতনার বীজও রোপন করেছিল।

উগ্র মতবাদের জন্য যুব-বঙ্গ গোষ্ঠী সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই এঁদের আন্দোলন হয়েছে **স্বল্পস্থায়ী**। কিন্তু এই অগ্নির আলোকে চারিদিক হয়েছে উদ্ভাসিত এবং এই আগুনের উত্তাপে রক্ষণশীলতার জমাট বরফও ক্রমে গলেছে।

সংরক্ষণ পন্থা ও উগ্র পন্থার সংঘাতের মধ্য দিয়ে **আবার সমন্বয় পন্থাই জয়যুক্ত হয়েছে**। নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ**। ১৮৩৬ সনে Society for the Promotion of Bengali Language and Literature প্রতিষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ইঙ্গিত।

(শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের কথা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য।

পশ্চিম ভারতে সাড়া

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও নবজাগরণের সাড়া জেগেছিল। কোথাও বাংলার সমসাময়িক কালে, কোথাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, অসমভাবে এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে নব ভারতের আর দু'জন নেতার কথা। **বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শংকরশেঠ** ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই **সম্পূর্ণ পাশ্চত্যকরণ সমর্থন করেন** নি, এবং ইংরেজীকেও শিক্ষার মাধ্যম করতে চাননি। বোম্বাইয়ের **মহাত্মা ফুলে** বালিকা বিদ্যালয় এবং হরিজনদের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গণশিক্ষার জন্য দাবি উত্থাপনই শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবজগতে এই ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ফলে উত্তর কালে শিক্ষানীতি ও প্রশাসনেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এসেছিল।

বে-সরকারী ইউরোপীয় প্রচেষ্টা

বে-সরকারী ইউরোপীয়রাও এই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। **বে-সরকারী ভারতীয় ও অভারতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়** এবং যৌথ প্রয়াসই

হয় বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বে-সরকারী উদ্যোগ সরকারী **কর্মকর্তাদের** ব্যক্তিগত কিম্বা পদাধিকারগত আনুকূল্যও পায়।

বোম্বাইতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **বম্বে এডুকেশন সোসাইটি** প্রচলিত দাতব্য বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নতুন বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি থেকেই উদ্ভূত **"বম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি"** ১৮২২ সন থেকে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক মুদ্রন এবং শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এঁদের প্রচেষ্টা সরকারী আনুকূল্য পায়। **মাদ্রাজেও** ঐভাবে **মাদ্রাজ স্কুল সোসাইটি** প্রতিষ্টিত হয়। ১৮২৮ সনে কাশীতে জয় নারায়ণ ঘোষালের দানে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৪ সনে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর দানে আগ্রা কলেজ প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে সংযুক্ত প্রদেশে ইংরেজী শিক্ষা সুরু হয়।

বাংলাদেশের ভূমিকাই অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্পূর্ণ বে-সরকারী ইংরেজ শিক্ষানুধ্যায়ী মহামতি **ডেভিড হেয়ার** নিজেই একটি নিম্নবিদ্যালয় পরিচালনা করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ সত্ত্বেও মিশনারীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাসও তিনি বুঝতে পারেন। **সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার নীতিই** তিনি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে পেলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Edward Hyde East এবং রাজা রামমোহন প্রভৃতিকে। রাধাকান্তদেব প্রমুখ অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল নেতৃমহলও ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে রাজি ছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হলো **১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিদ্যালয়,** যার সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হলো দেশীয় তরুণদের পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া। স্বভাবতঃই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই পাঠ্যক্রমে প্রধান স্থান পেলো। এই সঙ্গে দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিও গৃহীত হলো। **হিন্দু বিদ্যালয়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য** বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এর **পরিচালক সভা গঠিত হলো ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সদস্য সমন্বয়ে।** দ্বিতীয়তঃ এখানকার **শিক্ষামান হলো কলেজীয় স্তরের।** তৃতীয়তঃ এর **ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা।** স্বভাবতঃই দুই ধরনের বিরোধিতা সহ্য করেই এই বিদ্যালয়কে দাঁড়াতে হয়েছে। এখানে সংস্কৃত চর্চার সুযোগ না হওয়ায় **অতি রক্ষণশীল ভারতীয়রা** একে সুস্থ মনে গ্রহণ করেননি। আবার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য **মিশনারীরাও একে সুস্থ মনে গ্রহণ করেননি।** কিন্তু বে-সরকারী ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু-

বিদ্যালয় একটি "**মডেল**" বলে গণ্য হলো। হিন্দু বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা এবং সাফল্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু, ভাষা, পদ্ধতি স্থির করতে সরকারকেও সাহায্য করলো।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরও কয়েকটি পরিবর্তন এলো। ঐ বৎসরেই Calcutta School Book Society" গঠিত হলো। এর উদ্দেশ্য হলো তরুণদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং বিদ্যালয় স্তরের বালকদের মধ্যে তা বিতরণ করা। সমিতির সাফল্যও হয়েছিল প্রশংসনীয়। ১৮১৯ সনে দেশী ও বিদেশী বে-সরকারী উদ্যমের সমন্বয়ে গঠিত হলো "Calcutta School Society"। এর উদ্দেশ্য হলো দেশীয় তরুণদের জন্য ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এই সমিতি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ও বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ ১৮২১ সনে এই সংগঠনের পরিচালনাধীন ছিল ১১৫টি বাংলা বিদ্যালয়। সমিতি এগুলি পরিদর্শন করতেন, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতেন, এবং পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। **কলকাতা মেডিকেল কলেজ** প্রতিষ্ঠার জন্যও বেসরকারী উৎসাহের অভাব ছিল না। এক্ষেত্রে অবশ্য ডেভিড হেয়ারের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

সরকারী উদ্যম

এতক্ষণের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়েছে যে ১৮১৩ সনের পরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এদেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবমানসে এক আমূল পরিবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। মিশনারী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই প্রবণতাকে সংগঠিত রূপ দিচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতির ফলেই সরকারের পক্ষে শিক্ষানীতি স্থির করা প্রয়োজন হলো। কিন্তু সরকারী শিবিরেও নানা মুনির নানা মত দেখা দিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষায় সরকারী ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। কোম্পানীর পরিচালকরা আইনটিকে মেনে নিলেও আইনের পিছনে চার্লস গ্র্যাণ্টের যে মতাদর্শ কাজ করেছিল, তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক-জটিলতা তখনও সম্পূর্ণ দূর না হওয়ায় **পরিচালক সভা সংশয় থেকে মুক্তি পাননি**। তাই সনদ আইনের যে ব্যাখ্যা ও নির্দেশ ১৮১৪ সনের ৩রা জুন পরিচালক সভা পাঠালেন, তাতে বলা হলো যে দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতির কথাই সনদে বলা হয়েছে। সুতরাং ইংরেজী পদ্ধতিতে **নতুন ধরনের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন ওঠে না**, বিশেষতঃ যেহেতু রক্ষণশীল ভারতবাসীর এ বিষয়ে বিরোধিতা রয়েছে।

সুতরাং দেশীয় বিদ্যালয় এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য দেওয়ার জন্যই সরকারী বরাদ্দ ব্যয় করা উচিত, এমন কি গ্রাম্য শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যও অর্থ ব্যয় করা চলে।

ঐ নির্দ্দেশের ফলে তখনকার বড়লাট লর্ড ময়রা ঘোষণা করলেন যে সরকার থেকে উচ্চমানের প্রাচ্য-বিদ্যাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য শিক্ষকদের সাহায্য এবং গণশিক্ষার প্রতিও নজর দেওয়া হবে। প্রতিটি জেলা সদরে দুটি করে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবা হবে। কিন্তু পিণ্ডারী দমন, তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ প্রভৃতি রাজনৈতিক আবর্তের ফলে ১০ বৎসর পর্যন্ত বিশেষ কোন কাজই হলো না। রাজনৈতিক গোলমাল মিটে গেলে ১৮২৩ সনে কলকাতায় গঠিত হলো "General Committee of Public Instruction" (G. C. P. I)। দশজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এই সমিতির হাতে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো। শিক্ষাব জন্য বরাদ্দ অর্থও এই সমিতির হাতেই দেওয়া হলো।

শিক্ষা কমিটির প্রথম জীবনে এর উৎসাহী নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যাপন্থী। পাশ্চাত্যবিদ্যাপন্থীরা আপাততঃ সংখ্যালঘু হলেও ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় কবেন। সুতরাং নীতির প্রশ্নে কমিটির মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিল। এই মত পার্থক্যই প্রাচ্যবাদ—পাশ্চাত্যবাদের দ্বন্দ্ব নামে খ্যাত। এই মতদ্বৈধতা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও এই সংঘাত ঘটেছিল।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ-এ নীতির সংঘাত

মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতনের পরে গঠিত হলো বোম্বাই প্রদেশ। বিজিত জনসাধারণকে খুশী করবাব উদ্দেশ্যে 'পেশোযা'র ঐতিহ্য রক্ষা করে প্রাচ্য বিদ্যায় উৎসাহ দেওয়ার সরকারী প্রবণতা দেখা দেয়। গভর্ণর এলফিনষ্টোন (Mountstuart Elphinstone) তাই পুনা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা কবেন। কিন্তু স্বল্পদিনের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন শিক্ষানীতি স্থির কবার প্রয়োজন হলো। ১৮২৩ সনে এলফিনষ্টোনের এক ঘোষণায় বলা হলো যে জনসাধারণের জন্য দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার জন্য সবকারী অর্থ ব্যয় করা হবে। অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধারা প্রবর্তন কবা হবে। সেই উদ্দেশ্যে পৃথক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহনেচ্ছু ভারতীয়

দের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য **বেসরকারী উদ্যমের সঙ্গে সহযোগিতা** করা হবে। **অনুদান ব্যবস্থাই** (Grant in aid) হবে সহযোগীতার রূপ। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সরকারের হাতে।

এলফিনষ্টোন্-নীতিতে **উচ্চশ্রেণীর জন্য উচ্চমানের পাশ্চাত্য শিক্ষা** এবং **জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা**—এই দুইরকম ব্যবস্থার প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র গভর্ণরের কাউন্সিল **সদস্য ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন** (Francis Warden) প্রস্তাব করলেন যে **কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা** প্রসারেই সরকারী দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। সুতরাং বোম্বেতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত উপস্থিত হলো। এলফিনষ্টোন্ উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ পথ হিসাবে ইংরেজী ভাষার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হলেও কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষেই রায় ঘোষণা করেন নি। তবে ইংরেজী শিক্ষাব প্রবণতা বোম্বেতেও ক্রমে শক্তিশালী হয়। ১৮২৭ সনে এলফিন্ ষ্টোন্ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এদিকে এক বিশেষ পদক্ষেপ। তদুপরি নেটিভ এডুকেশন সোসাইটিও ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। সর্বোপরি ১৮৩৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় "Elphinstone Institution"। সাধারণের দানে সংগঠিত এবং কোম্পানীর পরিচালক সভার সাহায্যপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো নীতিজ্ঞান ও ধীশক্তি-সম্পন্ন যোগ্য ভারতীয়দের **উচ্চ সরকারী পদের জন্য শিক্ষিত করে তোলা।** সুতরাং ১৮৩৫ সনে G. C. P. I. নির্ধারিত পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি বোম্বাইকেও ক্রমে গ্রাস করলো। কিন্তু মাতৃভাষায় গণ শিক্ষার স্বপক্ষে এলফিনষ্টোন যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তারই ফলে সাধারণের শিক্ষার দাবিকে বোম্বাই থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

মাদ্রাজেও গভর্ণর **টমাস মনরো'র** (Thomas Munro) উদ্যোগে ব্যাপক শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি ২০টি জিলার প্রত্যিটির সদর কেন্দ্রে ২টি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং ৩০০ তহশীলের প্রতিটিতে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানেও **১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে** Committee of Public Instruction গঠিত হয়। ১৮২৮ সন পর্যন্ত কোম্পানীর পরিচালক সভা এসব উদ্যোগ সুনজরেই দেখেছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তার উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং পরিণামে ১৮৩০ সনে একটি নির্দেশ পাঠিয়ে **'অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কে'** তাঁরা নিরুৎসাহ করেন। সুতরাং বোম্বাইয়ের মত মাদ্রাজকেও ক্রমে কলকাতা থেকে

নির্ধারিত নীতি মেনে চলতে হলো। বস্তুতঃ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং দেশীয় ভাবমানসের কর্মকেন্দ্র কলকাতার চিন্তাচেতনাই ভারতের শাসকবর্গ এবং বলেতের পরিচালক সভার শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং G.C.P.I. **এর ভিতরে ও বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বই ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।**

জি. সি. পি. আই.

আগেই বলা হয়েছে শিক্ষা কমিটির প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যবিদ্যা পন্থীরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। ১৮১৩ সনের সনদকে নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে তাঁরা উচ্চমানের প্রাচ্য শিক্ষার জন্যই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। তাঁদের **কর্মপদ্ধতি হলো পণ্ডিতদের অর্থানুকুল্য**, সাম্মানিক **উপাধি**, টোল-মাদ্রাসার জন্য **সাহায্য**, ছাত্রদের জন্য **বৃত্তি**, মূল্যবান **প্রাচ্যগ্রন্থ সংকলন ও রচনার জন্য পণ্ডিতদের অনুদান**, প্রাচ্য গ্রন্থ **মুদ্রণ ও বিতরণ** এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থ সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় **অনুবাদ ও প্রকাশনা** প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে কমিটি নিজস্ব ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাপার জন্য প্রচুর বরাদ্দ করেন। তা ছাড়া প্রাচ্য বিদ্যার কয়েকটি **নতুন কলেজও** তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু একথা মনে করা খুবই ভুল যে জি, সি, পি, আই কেবল প্রাচ্যবিদ্যাকেই উৎসাহ দিচ্ছিলেন। যুগের দাবিকে স্বীকার করে সংস্কৃত ও ফারসী বিদ্যালয়ে **ইংরেজী ক্লাশও** তাঁরা খুলেছেন, **ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বক্তৃতার** ব্যবস্থা করেছেন, বিভিন্ন প্রাচ্য বিদ্যালয়ে **পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্লাশও** খুলেছেন। **হিন্দু বিদ্যালয়কেও অর্থ সাহায্য দেওয়া** হয়েছে এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাদের এই **মিশ্রিত নীতি** বিভিন্ন মহল থেকে আক্রান্ত হয়।

এই নীতি বদলের জন্য সর্ব্বপ্রথম দাবি আসে বে-সরকারী ভারতীয় মহল থেকেই। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেই রাজা রামমোহন দাবি করেন যে ব্যাকরণের কচ্‌কচি এবং অপ্রয়োজনীয় দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের বদলে আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতই ভারতের পক্ষে প্রয়োজন। ভারতীয় মনোভাবে এই আনুকূল্যের সুর বুঝতে পারা কোম্পানীর কর্তাদের পক্ষে আদৌ কষ্টকর হলো না। যে কর্তৃমহল ১৮১৪ সনে প্রাচ্য শিক্ষার স্বপক্ষে নির্দেশ জারী করেছিলেন, ১০ বৎসর পরে তাঁরাই সম্পূর্ণ নতুন সুরে কথা

বললেন। বস্তুত এই **অন্তর্বর্তী** দশ বছরে পাঞ্জাব ছাড়া সম্পূর্ণ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য নিরঙ্কুশ হয়েছে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন প্রশাসন তৈরী হচ্ছে। সুতরাং ১৮২৪ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নির্দেশনামায় পরিচালক সভা জানালেন যে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে দেশীয় লোকের ভীতি সম্পর্কিত যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং 'অর্থহীন এবং ক্ষতিকারক' প্রাচ্য শিক্ষার জন্য কোম্পানীর মূল্যবান অর্থ ব্যয় করা হবে না। তার বদলে **পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যই সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।**

এই ইঙ্গিত আরো শক্তিশালী হলো ১৮২৭ সনে ঘোষিত সরকারী নীতিতে। এই ঘোষণায় বলা হলো যে কোম্পানীর জন্য **সুদক্ষ কর্ম্মচারী তৈরী করাই কোম্পানী-পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।** তদুপরি ১৮২৯ সনে বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঘোষণা করলেন যে ফারসীর বদলে **ইংরেজীকে সরকারী ভাষা করাই সরকারের নীতি।** ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভাও বেণ্টিঙ্ক-এর এই ঘোষণাকে সমর্থন জানালেন। স্বভাবতই এই পরিবেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরও বাড়লো। সুতরাং শিক্ষা কমিটির মধ্যে পাশ্চাত্যবাদীদের শক্তিও বৃদ্ধি পেল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নীতিগত বিতণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। শিক্ষা কমিটি **দুইটি সমশক্তি সম্পন্ন উপদলে বিভক্ত** হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক কাজকর্মেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। অথচ ১৮৩৩ সনের সনদ আইনে যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সরকারী কাজে ভারতীয়দের নিযুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হওয়ায় **শিক্ষানীতি চূড়ান্ত-ভাবে স্থির করার একান্ত প্রয়োজন সৃষ্টি হলো।** এই নীতিই গৃহীত হলো ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মেকলে মন্তব্য এবং বেণ্টিঙ্ক প্রস্তাবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব

ইতিহাসের গতিপথে এমন উদাহরণ বিরল নয় যখন অনেকদিনের অনেক সঞ্চিত সমস্যা কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত সেই রকম একটি ঘটনা। শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহুদিন ধরে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই **সংঘাতের প্রথম সূচনা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর কালে।** ১৭৮২ সন থেকে এর নির্দিষ্ট অগ্রগতি। একদিকে **মুলিভান** ও অপরদিকে **হেষ্টিংস-ডান্‌কান্‌** মতপার্থক্য দিয়ে দুইটি ধারার সূচনা। এই গতিপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে একদিকে **চার্লস্**

গ্রান্ট, অপরদিকে **লর্ড মিন্টো**। শেষ পর্যায়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন লর্ড **মেকলে** এবং **প্রিন্সেপ**। এই দ্বন্দ্বে অংশ নিয়েছিলেন সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়রা, মিশনারীরা, রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল দেশীয় নেতারা। **সংঘাত ছিল মতাদর্শের**। সুতরাং জাতীয়তা কিম্বা বর্ণের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়নি। পাশ্চাত্যদলে ছিলেন সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ, মিশনারী সম্প্রদায়, দেশীয় নেতৃত্বের একাংশ। অপরদিকে প্রাচ্য দলেও ছিলেন সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ এবং দেশীয় পণ্ডিত সমাজের একাংশ।

বিতর্কের বিষয়:—দুইটি শিবিরের মত পার্থক্য ছিল **কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে**, যেমন—সরকারী উদ্যোগে **শিক্ষার উদ্দেশ্য**, শিক্ষার **বিষয় বস্তু**, সরকারী **দায়িত্বের ব্যাপ্তি**, শিক্ষার **ভাষা মাধ্যম** ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক প্রভৃতি সকল রকম যুক্তিই উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচ্যবাদীদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্য অনস্বীকার্য। সুতরাং সংস্কৃত এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় সেই **সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনই বাঞ্ছনীয়**। এই পথে রক্ষণশীল অভিজাত সমাজকেও জয় করা যাবে। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হলে রাজনৈতিক দুর্যোগ ঘটতে পারে। প্রতিপক্ষ পাশ্চাত্যবাদীদের মতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই প্রকৃত সংস্কৃতি এবং ঐ সংস্কৃতিই নৈতিক পুনরুজ্জীবন আনতে পারে। সুতরাং **পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার করাই সরকারের নৈতিক কর্তব্য**। এইভাবে দেশীয় **মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে** জয় করা যাবে, এবং সর্বোপরি **স্বল্প ব্যয়ে সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী** পাওয়াও সহজ হবে।

সরকারী দায়িত্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উভয় দলের পার্থক্য ছিল **স্বল্পই**। প্রাচ্যবাদীরা যে উচ্চমানের প্রাচীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তাও ছিল অভিজাত হিন্দু মুসলমান সন্তানদের জন্য। প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষা জনতার আয়ত্বের বাইরেই ছিল। সুতরাং **জনসাধারণের শিক্ষার কথা প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীরা বলেন নি**। অপরদিকে **পাশ্চাত্যবাদীরা পরিষ্কারই বলেছেন যে জনসাধারণের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের নয়**; বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সীমাবদ্ধ আর্থিক বরাদ্দের দ্বারা সম্ভবও নয়। এ দেশের অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গ্যারান্টি। তদুপরি বাছাই করা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা উত্তরকালে তাঁদের দেশবাসীকে পাশ্চাত্য

সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করাতে পারবেন। তাঁরাই হবেন ভারতের কাছে পাশ্চাত্যের ভাষ্যকার। সুতরাং **জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার জন্য "শিক্ষক তৈরী করাই" সরকারের দায়িত্ব। তাঁরাই ভবিষ্যতে দেশবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব নেবেন।** ইংলণ্ডে যেমন হয়েছিল, ভারতেও তেমনি আধুনিক শিক্ষা **উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চুঁইয়ে নামবে।** সুতরাং বর্তমানে গণশিক্ষার প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে হয়তো শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আনুকূল্যে জনসাধারণ শিক্ষালাভ করবে। এই যুক্তিই তথাকথিত **চুঁইয়ে পড়া নীতি** (Downward filtration theory)। সুতরাং পাশ্চাত্যবাদীরাও সরকারী দায়িত্বকে সীমায়িত করতেই চাইলেন।

শিক্ষার **বিষয়বস্তুর প্রশ্নে প্রাচ্যবাদীদের অভিমত** ছিল যে **প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শনই** হবে মূল পাঠ্যক্রম। তবে **অনুবাদের মাধ্যমে ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানও** ঐ সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা চলবে। পাশ্চাত্যবাদীরা দাবি করলেন যে অকেজো প্রাচ্য জ্ঞান সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া দরকার এবং তার বদলে **পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সরাসরি** উপস্থিত করা উচিত।

ভাষার প্রশ্নে উভয় দলের **মতৈক্য** ছিল যে উৎকর্ষতার বিচারে **দেশীয় আধুনিক ভাষাগুলি শিক্ষার বাহন হওয়ার অযোগ্য।** কিন্তু **মতানৈক্য** হল এখানে যে **প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত এবং আরবী ফারসীকে** শিক্ষার বাহন করতে চাইলেন। **পাশ্চাত্যবাদীরা ইংরেজীকেই** বাহন করতে চাইলেন। অবশ্য ভবিষ্যতে দেশীয় কথ্য ভাষাগুলিই হবে শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু ইংরেজী ভাষার অফুরন্ত সম্ভার থেকে আহরণ করে যখন দেশীয় ভাষাগুলি সমুন্নত হবে, তখনই মাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রশ্ন উঠতে পারবে। সুতরাং মাতৃভাষার "ভবিষ্যত দাবিকে" স্বীকার করেও বর্তমানের জন্য ইংরেজী ভাষাকেই একমাত্র মাধ্যম করার দাবি করা হলো।

বুঝা যায় যে দুই দলের মধ্যে **মতানৈক্য ছিল প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে**–(১) **ভাষাগত প্রশ্নে** এবং (২) **পাশ্চাত্যকরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে।** প্রাচ্যবাদীরা অনুবাদ পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্রম সন্নিবেশের কথা বলেন, আর পাশ্চাত্যবাদীরা অনুবাদের কার্যকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্বাভাবিক বাহন ইংরেজীর মাধ্যমে সরাসরি পাশ্চাত্যবিদ্যা প্রসারের কথা বললেন।

দুই শিবিরের যুক্তি:–এইচ, টি, **প্রিনসেপ-এর** (H. T. Prinsep) নেতৃত্বে প্রাচ্যবাদীরা এবং **সি, ই, ট্রেভেলিয়ানের** (C. E. Trevelyan) নেতৃত্বে পাশ্চাত্যবাদীরা মতবৈষম্যের চরম পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাবি করে উভয়

পক্ষের বক্তব্য সরকারের কাছে পেশ করলেন। **প্রাচ্যপন্থীরা** বললেন যে **ঐশ্বর্য-সম্পন্ন প্রাচ্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়।** পাশ্চাত্যজ্ঞান সম্বন্ধে **দেশীয় লোকদের বিরূপতা** রয়েছে। এদেশের সমাজ **প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্পর্শকাতর।** সুতরাং কোন হস্তক্ষেপ হলে প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান সন্নিবেশ করার জন্য **অনুবাদ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ।** অপরদিকে **পাশ্চাত্যপন্থীরা** বললেন যে **প্রাচ্যবিদ্যা সম্পূর্ণ ই অন্তঃসারশূন্য এবং অচল।** পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে বিরূপতার বদলে এদেশে **আগ্রহই প্রবল।** ঐতিহ্য সম্বন্ধে সামাজিক স্পর্শকাতবতাব বদলে **সংস্কারের আগ্রহই ক্রম বর্ধমান। অনুবাদ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ** হয়েছে। বহু অর্থ ব্যয়ে অনুদিত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত বইগুলি অবিক্রীত বয়েছে, অথচ ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক স্বল্প সময়ে নিঃশেষিত হচ্ছে। উচ্চমানেব প্রাচীন গ্রন্থ ছাপানো, এমনকি অনুবাদ করাও অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যজ্ঞান পবিবেশন করা সম্পূর্ণ ই অবাস্তব।

এই সব যুক্তিজাল ছাডাও উভয় দলই নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসাবে ১৮১৩ সনের সনদ আইনেব ব্যাখ্যা কবলেন। **প্রাচ্যপন্থীরা** দাবি করলেন যে **সনদে উল্লিখিত "সাহিত্য উন্নয়ন" বলতে বুঝায় প্রাচীন সাহিত্যের উন্নয়ন** এবং **"দেশীয় শিক্ষিত বর্গ" বলতে বুঝায় প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতবর্গ।** অপরদিকে **পাশ্চাত্য পন্থীরা** বললেন যে **সাহিত্য বলতে বুঝায় একমাত্র ইংরেজী সাহিত্য** এবং প্রকৃত শিক্ষিত বলতে বুঝাস **পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে।**

নীতিগত এবং আইনের ব্যাখ্যাগত মতবৈষম্যের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো, তা অবসানের উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যাখ্যার জন্য বড়লাট বেণ্টিঙ্ক প্রশ্নটিকে **কাউন্সিলের আইন সদস্য এবং পদাধিকার বলে শিক্ষা কমিটির সভাপতি** বিখ্যাত পণ্ডিত **লর্ড মেকলের** (Macaulay) নিকট উপস্থিত করলেন। মেকলে সাহেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর সুবিখ্যাত মন্তব্য (Minute) দাখিল করে নীতি নির্দ্ধারণের পথকে সুগম করলেন।

মেকলে মন্তব্য:—১৮১৩ সনের সনদ আইনের আইনগত ব্যাখ্যা এবং ঐ ব্যাখ্যাব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজস্ব ভাষ্যের সমন্বয়েই মেকলের মন্তব্যটি তৈরী হলো।

আইনগত ব্যাখ্যায় তিনি বললেন যে সনদ আইনে উল্লিখিত 'সাহিত্য' বলতে **কেবল প্রাচ্য সাহিত্যই বোঝায় না।** এবং শিক্ষিত ভারতীয় বলতে **কেবল প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতই বুঝায় না।** মিলটনের (Milton) কাব্য এবং জন লক' এর

(John Locke) দর্শনে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ভারতীয়ও প্রকৃত শিক্ষিত। সুতরাং কেবলমাত্র প্রাচ্য-বিদ্যাকেই উৎসাহ দেওয়া হবে এমন কোন অঙ্গীকারের কথা ঐ সনদ আইনে নেই।

কিন্তু আইনগত প্রশ্নের তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার চেয়েও মেকলের অন্যান্য বক্তব্যই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্য জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি উগ্র মতবাদ প্রকাশ করে বললেন যে **অসঙ্গতি, কুসংস্কার এবং রহস্যবাদ ছাড়া প্রাচ্যবিদ্যায় আর কিছুই নেই।** আরবীয়, ভারতীয় তথা সমগ্র প্রাচ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য রয়েছে তা ইউরোপের যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের সামান্যতম অংশের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। তাছাড়া ভারতীয়দের **পুনরুজ্জীবন এবং নৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যজ্ঞানই প্রয়োজন।** ব্যাধির ঔষধ স্বাদ দ্বারা নিরূপিত হবে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগিতা দ্বারা নিরূপিত হবে। ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাধি উপশমের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাই প্রয়োজন। বস্তুতঃ পিতার কাছে এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি এমন বিশ্বাসও জানিয়েছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষার গুণে ধর্মান্তর করণের চেষ্টা ছাড়াই **ভারতীয় তরুণ সমাজ তাঁদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করবেন।** মেকলের এই বক্তব্য ডাফ্ নীতিরই আর এক সংস্করণ।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কেও মেকলে পরিষ্কার অভিমত জানালেন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন হওয়ার যোগ্যতা এদেশের কোন আধুনিক মাতৃভাষার নেই, এই মন্তব্য করে তিনি বললেন যে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা এবং ইংরেজীর মধ্যে বাছাই করতে হবে। এক্ষেত্রে **একমাত্র ইংরেজীর দাবিই স্বীকৃতিযোগ্য,** কারণ ইংরেজীর বাস্তব কার্যকারিতা আছে এবং এ ভাষাই আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি। ইংরেজীই ভারতের শাসকবর্গের এবং বাণিজ্যের ভাষা। এ ভাষাই ভবিষ্যতে সমগ্র প্রাচ্য দুনিয়ার বাণিজ্যিক ভাষা হবে। গ্রীক ল্যাটিনের চর্চা যেমন ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা করেছিল, তেমনি ইংরেজীর চর্চাও ভারতে নবচেতনার সঞ্চার করবে। গ্রীক ও ল্যাটিন যেমন ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় উন্নতি এনেছিল, ইংরেজী চর্চা তেমনি ভারতীয়দের বিভিন্ন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন করবে। **ভবিষ্যতে সেই উন্নত মাতৃভাষাই হতে পারবে শিক্ষার বাহন।** ভারতীয়রা যে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন, এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি ভারতীয়দের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সুতরাং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রচারই সরকারী নীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সরকারী দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে মেকলে অবশ্য খুবই পরিষ্কার বক্তব্য

উপস্থিত করলেন। তিনি জানালেন যে ব্যাপক জনতাকে শিক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব নয়। **সরকার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলবেন।** এবং সেখান থেকে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে চুঁইয়ে নামবে। এই প্রসঙ্গ আলোচনা ক্রমেই "শিক্ষার উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে মেকলে তাঁর অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা, যারা কেবল রক্তে ও বর্ণে থাকবেন ভারতীয়, কিন্তু প্রবৃত্তি, মতাদর্শ, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে হবেন সম্পূর্ণ ইংরেজ। সুতরাং ইংরেজের মূল্যবোধ ভারতের উপর প্রয়োগ করে, ভারতে 'সাংস্কৃতিক বিজয়' সম্পন্ন করে, **ইংরেজ মনোভাবাপন্ন একটি সহযোগী-শ্রেণী সৃষ্টি করাই মেকলে আদর্শের মূল সুর।**

বেন্টিঙ্ক ঘোষণা :—মেকলের চিন্তা এবং বেন্টিঙ্ক'-এর চিন্তা ছিল এক সূত্রে গ্রথিত। মেকলের মন্তব্য বেন্টিঙ্ক'এর চিন্তাকেই পরিপুষ্ট করলো। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক **১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ** ঘোষণা করলেন যে এদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থব্যয়ের **উদ্দেশ্য হবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনাকে পরিপুষ্ট করা।** শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সরকারী **অর্থ ব্যয় হবে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য।** তবে আগে স্থাপিত প্রাচ্য-কলেজগুলি ভেঙে দেওয়া হবে না এবং ছাত্র ও শিক্ষকের বৃত্তিও কাটা যাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে নতুন কোন দায়িত্ব নেওয়া হবে না। তদুপরি প্রাচ্য শিক্ষার গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্যও অর্থ ব্যয় করা হবে না। অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যেই সরকারী প্রচেষ্টা সীমায়িত রাখা হবে।

এইভাবেই আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। **১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পদক্ষেপে শিক্ষায় সরকারী অংশ গ্রহণের** নীতি গৃহীত হয়েছিল। **১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার অনুকূলে** প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। **ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলো।**

মেকলে'র মূল্যায়ন—মেকলে তাঁর মন্তব্যের জন্য যুগপৎ প্রশংসা ও নিন্দার পাত্র হয়েছেন। প্রশংসকের দল তাঁর মন্তব্যকে একখানি 'মহান দলিল' আখ্যা দিয়ে দাবি করেছেন যে তিনিই ভারতে নতুন শিক্ষা চেতনার উদ্ভাবক এবং শিক্ষানীতির প্রবর্তক। পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রসারের নীতি প্রবর্তন করে তিনি তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ভারতকে উদ্ধার করেছেন এবং আধুনিক জীবন দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষা চেতনার উদ্ভাবক তিনি নন। অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে

সরকারী ও বে-সরকারী মহলে চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি কোন নতুন শিক্ষার প্রবর্তকও নন। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে ভারতীয়দের মধ্য থেকে দাবি উঠেছিল, পরিচালক সভাও মনস্থির করেছিলেন, শিক্ষা কমিটির মধ্যেও বিতর্ক চলছিল, পাশ্চাত্যবাদী দল ক্রমেই শক্তিবৃদ্ধি করেছিল, এবং বেণ্টিঙ্ক সাহেবও এ সম্বন্ধে প্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সময়ের গতি যেদিকে চলছিল, তা থেকে অনুমান করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয় যে **মেকলে না থাকলেও এই সিদ্ধান্ত দুদিন আগে অথবা পরে গৃহীত হতো।** পাণ্ডিত্যে খ্যাত মেকলে সাহেব পদাধিকারের সুযোগে দৃঢ় প্রত্যয়ে দ্বিধাহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে **অবশ্যম্ভাবীতাকে ত্বরান্বিত করেছেন মাত্র।**

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেই আধুনিক রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তার মনোভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়। এজন্যও মেকলে যুগপৎ প্রশংসিত এবং নিন্দিত হয়েছেন। সমালোচকরা বলেছেন যে আধুনিক শিক্ষার সাহায্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সুযোগ করে দিয়ে মেকলে **উত্তরকালে সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছেন।** কিন্তু এক্ষেত্রেও নিন্দা কিংবা প্রশংসা এককভাবে মেকলের প্রাপ্য নয়। বস্তুতঃ রামমোহন রায় এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ'এর নেতৃত্বে নূতন রাজনৈতিক চেতনা আগে থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল। যুব বাংলার উদ্যোক্তারাও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করছিলেন।

অবশ্য কয়েকটি বিষয়ে মেকলে নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ উন্নত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই পরিবেশে এদেশের মাতৃভাষাগুলি সম্বন্ধে উগ্রভাবে নাসিকা কুঞ্চন করা সমীচীন হয়নি। অবশ্য এই সূত্রে এই কথাও বলা দরকার যে মাতৃভাষার 'ভবিষ্যৎ দাবিকে' তিনি স্বীকার করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনায় ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে মেকলের অশালীন মন্তব্য তাঁর অজ্ঞতারই পরিচয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উন্নাসিকতায় মত্ত মেকলে সাহেব প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনও বোধ করেননি। তাই তিনি আত্মতুষ্টি নিয়ে মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত একটি সুপ্রাচীন সংস্কৃতির বদলে নতুন সংস্কৃতি প্রবর্তনের কথা ভাবতে পেরেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী শক্তি সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজী ভাষার রসে তিনি দেশীয় ভাষার পুষ্টির কথা ভেবেছেন। কিন্তু একথা বিবেচনা করেন নি যে সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আধুনিক ভাষা সমূহ প্রাচীন ভাষার রসেই সমৃদ্ধ হতে পারে, যেমন হয়েছিল গ্রীক ও ল্যাটিন'এর রসে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলি।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য। প্রথমতঃ শিক্ষাকে তিনি উচ্চ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে **উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভবিষ্যতে দেশবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।** দ্বিতীয়তঃ তিনি **চেয়েছিলেন এই শিক্ষিত সমাজকে সর্বাঙ্গীণ রূপে ইংরেজ তৈরী করতে।** কিন্তু **এই দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী।** প্রথমতঃ উচ্চ শিক্ষিত ভাবতীয়দের একাংশ গণ-জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেন। তাঁদেব কাছ থেকে শিক্ষা চুঁইয়ে পডা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং আপাত দৃষ্টিতে ইঙ্গ-ভাবাপন্ন হয়েও তাঁদেরই আর একাংশ বেরিয়ে এসেছেন জাতীয়তাবাদের পুরোধা হিসাবে।

বস্তুত এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সমন্বয় করে যে সার্থক শিক্ষা ও সংস্কৃতি গডে উঠতে পাবতো, তা অস্বীকাব করে মেকলে গণশিক্ষা ও মাতৃ-ভাষার ক্ষতি করেছেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিন্ন করার দাবি করেও তিনি অযৌক্তিক পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে ইংরেজী শিক্ষা ভারতের ক্ষতি যেমন কবেছে, উপকাবও কবেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারত যে আত্মসমীক্ষার পথে পুনরভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর হতে পেবেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেকলের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিব ত্রুটি অবশ্যই ছিল। তবে সামগ্রিক বিচারে তিনি ছিলেন ইতিহাসেব ক্রীড়নক। সাম্রাজ্যের গৌরবেব দিনে আত্মসন্তুষ্ট উগ্র ইংরেজী মনোভাবই মেকলের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। তাই গণশিক্ষার দাবি হয়েছে অবহেলিত। অথচ সে যুগেও ভারতেব নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ়মূল অস্তিত্ব এতটুকু ছিল যে তাকে অবলম্বন করেই গডে উঠতে পারতো একটি আধুনিক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাব ইমারৎ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রচলিত দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রায় দুই হাজার বৎসরের কালস্রোতে এবং বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে ভারতেব প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যেও হিন্দু উচ্চ শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান কোনরকমে আত্মরক্ষা করে টিকে ছিল। ঠিক তেমনি আনুকূল্য স্তিমিত হলেও মুসলীম উচ্চ শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান বেঁচে ছিল। অপরদিকে চিরদিনের রাজানুকূল্য বর্জিত জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠশালা এবং মক্তব আগেকার মতই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষীণকায় অস্তিত্ব

রক্ষা করে চলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীর দল টোল ও মাদ্রাসার ধর্মীয় ভাবধারা সম্বন্ধে শত্রুভাবাপন্ন হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু **উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী কিম্বা পাশ্চাত্য-বাদীদের মনে দেশজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন মমতাই থাকবার কথা নয়।** তাই শিক্ষা-বিতর্কের কালে এই সব প্রতিষ্ঠানের দাবি তাদের মনে আদৌ স্থান পায়নি। তবুও এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে। মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ পতনের ফলে সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভারত ইংরেজের কবলিত হয়। অধিকৃত এই সব অঞ্চলে অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে (পরবর্তীকালে সংযুক্ত প্রদেশ) নতুন প্রশাসন গড়ে তুলতে হয়। তাই পূর্বেকার প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্যও গৃহীত হয়।

মাদ্রাজের গভর্ণর মনরোর নির্দেশে ১৮২২ সনে সংগৃহীত তথ্যাদির সার সংক্ষেপ করলে দেখা যায় যে সেখানে প্রতি হাজার অধিবাসীর জন্য ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সুতরাং মহিলা জনসংখ্যা বাদ দিলে বিদ্যালয় ছিল প্রতি ৫০০ জনে একটি। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের শিশুর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতো। বহুক্ষেত্রে বালকরা ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতো। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার পাঁচগুণ শিশু শিক্ষালাভ করতো বাড়ীতে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল পঠন, লিখন, সাধারণ গণিত, চিঠি এবং চুক্তিপত্র রচনা প্রভৃতি। অবশ্য শিক্ষকের স্বল্পবিদ্যা, পাঠ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, ছাপানো বইয়ের অভাব প্রভৃতি বহু ত্রুটিও ছিল।

বোম্বাইয়ের গভর্ণর এলফিনষ্টোনের নির্দেশে ১৮২৩ সনে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম প্রায় ছিল না। অবশ্য এইসব বিদ্যালয়ে মুখ্যত ছেলেরাই পড়তো। মেয়েদের শিক্ষা ছিল নগন্য। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা লাভ করতো, এবং কোন কোন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর শতকরা ৭০ জনই ছিলেন শিক্ষিত। আহমদনগর, পুনা প্রভৃতি স্থানে ছিল বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ ১৮১৯ সনে বোম্বাই শিক্ষা সমিতি (Bombay Education Society) মন্তব্য করেছিলেন যে এদেশে তদানীন্তন শিক্ষার হার ইংলণ্ডের তদানীন্তন হার থেকে বেশী। অবশ্য বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রেও ত্রুটির অভাব ছিল না। সেখানেও কেবল হস্তাক্ষর, পঠন ক্ষমতা এবং নামতাজ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা চলতো। কিন্তু মূলতঃ দেখা যায় যে বোম্বাই ও মাদ্রাজের রিপোর্ট

পরস্পরকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের তথ্যও উপরোক্ত তথ্যকে মূলত সমর্থন করে। বস্তুত বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত তথ্যাদিই তদানীন্তন সমগ্র ভারতের দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে।

বাংলাদেশে সমীক্ষা পরিচালন করেন পাদরী রেভাঃ উইলিয়াম এ্যাডাম। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরাধে নিজ ধর্মগোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত ভারত-প্রেমিক পাদরী এ্যাডাম ১৮২৯ এবং ১৮৩৪ সনে এই সমীক্ষার প্রস্তাব করে সরকারের সাড়া পান না। পরিশেষে বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনে তাঁকে এই সমীক্ষার সুযোগ এবং দায়িত্ব দেন। তিনি **১৮৩৫ সনে পরপর দুইখানি রিপোর্ট এবং ১৮৩৮ সনে তৃতীয় রিপোর্ট** পেশ করেন।

প্রথম রিপোর্টটি মূলত ছিল সরকারী দলিল, শিক্ষা কমিটির দপ্তরে সংগৃহীত রিপোর্ট, মিশনগুলির কার্যবিবরণী এবং পত্র পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সার-সংক্ষেপ। এই রিপোর্টে এ্যাডাম দাবি করেন যে তখনকার বাংলাদেশে **প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ,** অর্থাৎ প্রতি ৪০০ ব্যক্তির জন্য একটি।

দ্বিতীয় রিপোর্টে সন্নিবেশিত হয় রাজসাহী জিলার নাটোর থানার বিস্তৃত তথ্য। এখানে দেখা যায় যে ৪৮৫টি গ্রামে ছিল ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২। তদুপরি ২৩৮টি গ্রামের ১৫২৮টি পারিবারিক বিদ্যালয়ে, ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৪২। সুতরাং পারিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতো সাধারণ স্কুল থেকে বহুগুণ শিশু। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল নানা ধরনের—যেমন দেশজ প্রাথমিক, অদেশজ প্রাথমিক, পারিবারিক, দেশীয়, নারী শিক্ষালয়, বয়স্ক বিদ্যালয়, ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি। ভাষা মাধ্যমও ছিল নানা ধরনের। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হতো ইংরেজী, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষা। সমীক্ষাধীন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে ছিল আবাসিক ও অনাবাসিক ৩৯৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৮টি টোল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল অতি নগণ্য। তথাপি সমীক্ষাধীন অঞ্চলে লিখন পঠন শক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত'র হার ছিল আনুমানিক প্রায় শতকরা ৬ ভাগ।

এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে স্থান পায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ত্রিহুত এবং দক্ষিণ বিহার—এই পাঁচটি জিলার সমীক্ষা। সমীক্ষাধীন অঞ্চলে পারিবারিক বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৬৭ টি এবং ছাত্র সংখ্যা ৩০৯১৫। তদুপরি ছিল বহুসংখ্যক পারিবারিক বিদ্যালয়। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৩ জনে একজন, এবং মহিলা বাদ দিলে প্রতি

৩৬ জনে একজন। স্থান এবং বর্ণভেদে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৮ থেকে ১২ ভাগ। কোন কোন উচ্চ বর্ণে সকলেই ছিলেন সাক্ষর, আবার কোন কোন নিম্নবর্ণে সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এ্যাডাম ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, যেমন উচ্চ শিক্ষালয়ের শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক বুদ্ধিজীবী, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক, কেবলমাত্র লিখন পঠন সক্ষম ব্যক্তি এবং কেবলমাত্র নিজ নাম পড়তে লিখতে পারেন এমন ব্যক্তি।

এ্যাডাম রিপোর্টে সন্নিবেশিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা এবং শিক্ষার হার ইত্যাদি তথ্যের সম্পর্কেই একশত বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে ইংরেজ অভিমতের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী অভিমতের বিতর্কমূলক সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল। ইংরেজ অভিমতের মুখপাত্র **স্যার ফিলিপ হার্টগ** এই সব তথ্যকে কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা বলে আখ্যা দেন। অপরদিকে ভারতীয় অভিমতের মুখপাত্র রূপে **আর, ডি, পারুলেকর** এ্যাডামের তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য সত্য রূপে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল বিদ্যালয় এবং সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি হবে। বর্তমান কালের মানদণ্ডে সে যুগকে বিচার করা যায় না। সে যুগে যে ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যালয় বলা হতো সেই নিরিখে এবং পারিবারিক বিদ্যালয়কেও বিদ্যালয়রূপে গণ্য করলে এ্যাডামের তথ্য আদৌ কোনো রূপকথা নয়।

রেভাঃ এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঐ রিপোর্টেই রয়েছে তাঁর বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ। তিনি বলেন যে তদানীন্তনকালে **দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ—হিন্দুদের টোল এবং মুসলীমদের মাদ্রাসা।** পাঠ্যক্রমে বৈশিষ্ট্য অনুসারে টোলও ছিল আবার তিন ধরনের—(১) ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রধান, (২) কাব্য, ন্যায় ও শাস্ত্র প্রধান এবং (৩) তর্কশাস্ত্র প্রধান। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হতো উচ্চতম মানে। পাঠ্যবস্তু এবং বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল ধর্ম প্রভাবিত। শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং ছাত্রও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ সন্তান। স্বভাবতই উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। টোলগুলি ছিল নারীবর্জিত। এই সব বিদ্যালয়েই তৈরী হতেন সমাজের পণ্ডিতবর্গ। সুতরাং শিক্ষকরা ছিলেন উচ্চতম শিক্ষার অধিকারী। শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম ছিল সংস্কৃত।

টোলের তুলনায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল কম। এক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যম ছিল আরবী ও ফারসী। মাদ্রাসার উলামারা ছিলেন উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। এই

ব বিদ্যালয়ে তৈরী হতেন মৌলভীবর্গ। ফারসী তখনও সরকারী ভাষা ছিল বলে অনেক হিন্দু ছাত্রও ফারসী পড়তেন এবং অনেক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হিন্দুও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন।

টোল ও মাদ্রাসাগুলি চলতো প্রধানতঃ নিষ্কর ভূমির আয় এবং জমিদার ও অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের দানে। অবৈতনিক শিক্ষা তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি ক্রমেই কমে আসছিল। তদুপরি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ক্রমেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এই সব বিদ্যালয়ের দৈন্যদশা গভীরতর হচ্ছিল। শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি কমে যাওয়ায় এবং বিদ্যালয় গৃহ অসংস্কৃত থাকায় উচ্চ-শিক্ষার এই কেন্দ্রগুলি হয়ে উঠেছিল ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ও রক্ষণশীল পাঠ্যক্রমও ছিল জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য জনসমাজে স্বীকৃত ছিল না বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যাপকরূপে জনপ্রিয় ছিল না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়—হিন্দুদের পাঠশালা এবং মুসলীমদের মক্তব। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ছিল মূলতঃ লিখন, পঠন ও ব্যবহারিক গণিত। মক্তবে কোরাণ শরিফের দু'চারটি বয়েতও মুখস্থ করানো হতো। স্কুলের কোন নিজস্ব গৃহ বহু ক্ষেত্রেই ছিল না। মন্দির ও মসজিদের চত্বরে, চণ্ডী-মণ্ডপে, বিত্তবান ব্যক্তির কাছারি ঘরে, মুদি দোকানে এবং এমনি নানা জায়গায় কিম্বা গাছতলাতেও বিদ্যালয় বসতো। শিক্ষকের সুবিধার উপরেই স্কুলের সময় নির্ঘণ্ট নির্ভর করতো এবং অঞ্চল কিম্বা ঋতুভেদে পরিবর্তিত হতো। বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণী বিভাগও ছিল না। একটি বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষকও ছিলেন না। তবে 'সর্দার পড়ো' প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হতো মাত্র দু'তিনটি থেকে ১৪।১৫টি পর্যন্ত। দরিদ্রতম এবং নিম্নতম শ্রেণীর জনসাধারণ তখনও শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। বিশেষতঃ হরিজন সম্প্রদায় বহু পাঠশালাতেই প্রবেশাধিকার পেত না! তবে অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর কোন বিধি নিষেধ ছিল না। মেয়েদের সম্পর্কে বিধিনিষেধ না থাকলেও বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। পাঠশালার শিক্ষকতা কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল সামান্যই। শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল প্রাচীন। কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল শিক্ষাকার্যের প্রধান সহায়ক।

জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই মক্তব-পাঠশালাগুলি উচ্চশ্রেণীর কাছে

পুষ্ট ছিল না। মুদ্রায় কিংবা ভোগ্য পণ্যের আকারে সামান্য বেতনের ব্যবস্থা চলতো। সুতরাং শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল সামান্য। বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা ছিল আংশিক সময়ে আয়ের পন্থা। বিদ্যালয়ে সুনির্মিত গৃহ যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না আসবাব।

কিন্তু এত দৈন্যদশা, পাঠ্যক্রমে সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও এইসব বিদ্যালয় সমাজের এক বিরাট ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাচ্ছিল। কৃষক, তালুকদার, বেণে, ব্যবসাদারের বাস্তব প্রয়োজন মিটতো বলেই সাধারণ সমাজে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণস্পন্দন রক্ষা করেছিল। তাই **রেভাঃ এ্যাডাম এই স্কুলগুলিকেই ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন।**

নির্ভীক কণ্ঠে এ্যাডাম বলেন যে ভারতের উন্নতি করতে হলে ভারতবাসীকে সাথে নিতে হবে। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সঙ্গী করা যাবে না। নিজেদের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকেই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভারত তথা ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে একাত্ম না হলে ভাবতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন যে ইংলণ্ডে যেমন ঐতিহাসিক স্কুলগুলি জাতীয় শিক্ষার অংশ হয়েছে, ভারতে তেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক এই সব স্কুলকেই গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার সৌধভিত্তিরূপে। দীর্ঘকাল ধবে প্রচলিত, জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে বহিরাগত কোন ব্যবস্থা জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না। তাই রেভাঃ এ্যাডাম সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করে দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে বলেন।

তিনি **সংস্কারের জন্য এক কর্মসূচীও পেশ করেন।** আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কর্মচারী নিয়োগের কথা তিনি বলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং বিভিন্ন মানে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বিতরণ, গৃহ ও আসবাবপত্রের উন্নয়ন, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, চাকুরি কালের মধ্যে তাঁদের শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভূমি দান, পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল সন্তোষজনক হলে অন্যান্য রকম পারিতোষিক এবং এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য জেলা শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশও রেভা এ্যাডাম করেছিলেন।

কিন্তু তিনি কেবল অরণ্যে রোদনই করলেন। বস্তুত তাঁর তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করার আগেই লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর রায় দিয়ে রেখেছেন। ফলে এ্যাডামের রিপোর্ট

হয়ে রইল সরকারী দপ্তরখানায় ইতিহাসের দলিল এবং উত্তরকালের ভারতবাসীর যুগপৎ গৌরব ও বেদনার উৎস। বস্তুত ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রয়োগ করতে কর্তৃপক্ষ ততদিনে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষায় দেশীয় শিক্ষা, বিশেষতঃ গণ-শিক্ষার বদলে ইংরেজী ভাষায় কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্য এক নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। দেশের মাটি থেকে **দেশীয় শিক্ষা-বৃক্ষ উৎপাটিত হলো** এবং সেখানে এক **ভিন্ন দেশীয় চারা** তুলে এনে রোপন করার ব্যবস্থা হলো। এ শিক্ষা তাই ভারতের কাছে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হলো না। এরই ফলশ্রুতি হলো উত্তরকালে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রতিবাদ এবং সংস্কার আন্দোলন।

এ্যাডাম-রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রভাব ঘটেছে গণ-শিক্ষার উপর। একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন স্বাভাবিক গণ শিক্ষার ব্যবস্থা শুকিয়ে মরে গেল, নতুন কোন গণশিক্ষা ব্যবস্থা তার পরিবর্তে স্থাপন করা হলো না। পরিণামে সৃষ্টি হলো এক বিরাট শূন্যতা। শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নতুন ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী কাল এক বিরাট জনসমুদ্র এই শূন্যতার মধ্যে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রইলো। এই বঞ্চনার মধ্যেই সৃষ্টি হলো বর্তমান কালের প্রাথমিক শিক্ষার বহু সমস্যা। শিক্ষায় সর্বজনীনতার সমস্যা, শিক্ষক সংখ্যার সমস্যা, স্কুল গৃহের সমস্যা, নিরক্ষতার সমস্যা প্রভৃতি অনেক কিছুরই বোঝা লাঘব হতো যদি এ্যাডামের সুপারিশ কার্যকর করা হতো। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে উঠন্ত সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশের সে ভাগ্য সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Discuss the educational contributions of the Western Missions in India in the early part of the 19th Century.

(শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কাজ ৯৬ পৃঃ; মিশনারীদের কাজ সম্বন্ধে ১০২-৫ পৃষ্ঠায় আলোচনার সারাংশ, ১৮১৪-৩৩ এবং ১৮৩৩-৫৩ সনে দুই পর্যায়ে নানা দেশ থেকে মিশনারী আগমন; ১৮১৪-১৮ সনের মধ্যে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি এবং রেভাঃ মে'র কৃতিত্ব; ১৮৩৫ সনের মধ্যে চার্চ মিশনারী সোসাইটির ১০৭ স্কুল; নীতি শিক্ষার

পাঠ্যবই; বোম্বাইতে আমেরিকান মিশন, মাদ্রাজে ওয়েসলিয়ান মিশন, গুজরাটে আইরিশ মিশন প্রভৃতি; ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বিখ্যাত কলেজ এই যুগের সৃষ্টি। তা ছাড়া দেশীয় ভাষা, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, শিক্ষক শিক্ষণ ও নারী শিক্ষায় বিশেষ অবদান। উদারনৈতিক আধুনিক আবহাওয়ার সূচনা।)

2. Analyse the nature of missionary educational work in early 19th Century in contrast to the same in the 18th Century. What is meant by Duff Policy? Why did it ultimately fail?

(অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষা, দেশীয় ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আগেকার মতই পাঠ্যক্রম, দেশীয় ভাষাই বাহন, নিম্ন শ্রেণীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ ইত্যাদি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষা, নূতন ধরনের স্কুল, আধুনিক পাঠ্যক্রম, ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য, ধর্মান্তর করণের প্রতি বেশী নজর, উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বেশী মনোযোগ ইত্যাদি।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা প্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন এসেছে।

ডাফ নীতি সম্বন্ধে ১০৪-৫ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ।

3. Discuss the nature of the Bengal Renaissance and the impact of its ramifications upon education in India.

(এ সম্বন্ধে ১০৬-৯ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপই ভাল।)

4. Make an estimate of the role of Raja Rammohan in the field of culture and education.

(এ সম্বন্ধে ১০৬-৭ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রূপই শ্রেয়।)

5. Discuss the nature and extent of state enterprise in education from 1813 to 1835

Or,

Explain and comment upon the policy of the G. C. P. I. between 1823 and 1835.

(১৮১৩ সনে কোম্পানীর পরিচালকরা নিতান্ত আইনগত বিচারে সনদকে গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮১৪ সনে প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই নির্দেশ পাঠান, লর্ড ময়রাও সেইভাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দশ বছর পর্যন্ত কাজ হয় সামান্যই।

১৮২৩ সনে জি, সি, পি, আই গঠন। প্রথমদিকে প্রাচ্যবাদীরাই শক্তিশালী।

পণ্ডিতদের সাহায্য, সাম্মানিক উপাধি, স্কুলে অনুদান, বৃত্তি, পুস্তক মুদ্রণ, অনুবাদ, প্রাচ্য বিদ্যার কলেজ স্থাপন প্রভৃতিই হয় কাজের রূপ। ঐ সাথে প্রাচ্য কলেজে ইংরেজী ও বিজ্ঞান ক্লাশ, হিন্দু স্কুলের মত প্রতিষ্ঠানে সাহায্যও দেওয়া হয়।

১৮২৩ সনে রামমোহনের প্রতিবেদন, ১৮২৪ সনে পরিচালক সভা থেকে নীতি বদলের নির্দেশ, ১৮২৭ সনে চাকুরীতে ইংরেজী শিক্ষার কদর, ১৮২৯-এ ইংরেজী রাষ্ট্র-ভাষা। পাশ্চাত্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। শিক্ষা-বিতর্ক।

বোম্বাইতেও প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জন্য ইংরেজী শিক্ষা, সাধারণের জন্য প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা। দেশীয় স্কুলেও সরকারী সাহায্য। ওয়ার্ডেন কর্তৃক বিতর্ক সূচনা; নেটিভ এডুকেশন সোসাইটিও ইংরেজী স্কুল গড়েন। ১৮৩৪-এ এলফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট। চাকুরির জন্য ইংরেজী শিক্ষার সূচনা।

মাদ্রাজেও ১৮২৬ সন থেকে প্রাচ্য ও দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষা কমিটির সাহায্য। কিন্তু ১৮৩০-এ পরিচালক সভার নির্দেশে এই নীতির পরিবর্তন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনই এই পালা বদলের কারণ।

6. What were the major questions involved in the Oriental-Occidental controversy? How did it influence subsequent developments?

(১১৬-১২১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপই শ্রেয়)

7. How and to what extent did Lord Macaulay and Lord Bentinck determine the development of Western Education in India?

(১১৯-১২১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ।)

8. Write a critique of the Macaulay Minute.

(১২১-১২৩ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ।)

9. Give an account of the state of indigenous education in India in early 19th Century, with special reference to the reports of Rev. Adam.

(১২৩-১২৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত সম্পূর্ণ আলোচনাটি পড়া দরকার।)

10. What were the major recommendations of Rev. Adam? How did the rejection of them affect the fate of Primary education and literacy in India?

(১২৮-১২৯ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রূপই যথার্থ উত্তর)।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ

১৮৩৫ সনের মধ্যে কোম্পানীর সরকার দুই দফায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। **প্রথমতঃ ১৮১৩ সনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকৃত হলো,** কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারী সহ অন্যান্য সকলের বে-সরকারী উদ্যমও স্বীকৃত হলো। **দ্বিতীয়তঃ ১৮৩৫ সনে স্থির হলো যে সরকারী নীতি হবে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান এবং সরকারী উদ্যম সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল উচ্চ-শ্রেণীর জন্য উচ্চ শিক্ষার মধ্যে।**

কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের বিভিন্নতার ফলে এবং এককেন্দ্রিক শাসন যন্ত্র তখনও সুষ্ঠু ভাবে গড়ে না ওঠার ফলে **শিক্ষা নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৮৩৫ সনের পরে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তারতম্য ঘটতে থাকে।** বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় নেতাদের মতামতেও বিভিন্নতা দেখা যায়।

বোম্বাই প্রদেশে মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। সেখানে Downward Filtration নীতির বদলে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু দেশজ বিদ্যালয়গুলির বদলে আধুনিক ধরনের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত প্রভৃতিও পড়ানো হয়। সরকারী সাহায্যপুষ্ট Native Education Society প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন। ১৮৪০ সনে একটি সরকারী শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড রেভাঃ এ্যাডামের পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। ১৮৫২ সনে গ্রামীণ শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৫৩ সনে দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও সাহায্য দানের নীতি প্রচলিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৪৫ সনে বোম্বাইতে এবং ১৮৫২ সনে পুণাতে নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গোবিন্দ দাস ফুলে ১৮৫২ সনে হরিজনদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছুঁইয়ে পড়ার নীতিকে নিন্দা করে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন।

কিন্তু বাংলাদেশে গৃহীত নীতির প্রভাবে বোম্বাইতেও ভাষা-সংক্রান্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৩ সন থেকে পাঁচ বৎসর ব্যাপী এই বিতর্কে ইংরেজী পক্ষের নেতৃত্ব

করেন Erskine Perry এবং মাতৃভাষার পক্ষে ওকালতি করেন কর্ণেল জার্ভিস, জগন্নাথ শঙ্করশেঠ, ফ্রামজী কাওয়াস্‌জি, ইব্রাহিম মাকবা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। **পরিণামে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে ইংরেজী পক্ষেরই জয় হয়।**

মাদ্রাজে আগেই গঠিত হয়েছিল Committee of Native Education. ১৮৪৩ সনে এর স্থান গ্রহণ করে 'বোর্ড অব এডুকেশন'। এখানে প্রথম থেকেই তহশীল ভিত্তিতে দেশজ স্কুলগুলির উন্নতির নীতি প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এখানেও পরিশেষে ভারত সরকার নির্দেশ দিলেন যে কালেকটরেট্ এবং তহশীল স্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করতে হবে, এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যয়িত হবে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য। সুতরাং **পরিণামে ইংরেজীকেই ভাষা মাধ্যম রূপে প্রচলন করা হলো।**

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর Thómason চুঁইয়ে পড়ার নীতি বর্জন করে মূলতঃ রেভাঃ এ্যাডামের নীতি গ্রহণ করলেন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হলো, দেশজ স্কুলগুলিকেই গ্রহণ করার নীতি স্বীকৃত হলো। মাতৃভাষাকেও প্রাধান্য দেওয়া হলো এবং ১৮৪৪ সনে মাতৃভাষায় স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হলেন।

১৮৪৫ সনের এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে এই প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের মোট ৭৯৬৬ বিদ্যালয় রয়েছে এবং পাঠশালার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশীই শিক্ষা পাচ্ছে। এই সংখ্যাটি বৃদ্ধির জন্য ১৮৪৬ সনে একটি পরিকল্পনা রচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতি দুইশত গৃহের জন্য একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জমিদারদের মাধ্যমে জায়গীর প্রথায় এর ব্যয় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৪৮ সনে আর একটি সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রতিটি তহশীলে একটি করে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ভূগোল ও হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি যোগ করা হয়। "সাফল্যের পুরস্কার" দ্বারা শিক্ষকদেরকে উৎসাহদানের সিদ্ধান্ত হয় এবং পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। আগ্রাতে একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫১ সনে মথুরার প্রশাসক Mr Alexander প্রতি 'হলকা' এলাকায় একটি করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হারে সেস'এর সাহায্যে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু **এত সত্ত্বেও উত্তর পশ্চিম প্রদেশকেও বাংলাদেশের নীতি মেনে নিতে হলো। পাঞ্জাব প্রদেশে** যদিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পরিকল্পনাই চালু করা হয়েছিল, তবু **এখানেও অতি সত্বর ইংরেজী ভাষার দাবি প্রবল হয়ে উঠলো।**

সুতরাং দেখা যায় যে **বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে**

কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত একটি কার্যক্রমে পরিণত হতে থাকে। নীতি সমতার এই ধারা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৮৫৪ সনে।

বাংলাদেশে ১৮৩৫ সনে প্রাচ্যপন্থীদের বিরাট পরাজয় হলেও বিতণ্ডার শেষ হলো না। তবে শেষ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাচ্যপন্থীরা তাঁদের দাবিকে অনেক ছাঁটাই করে বলেন যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত স্কুলগুলিকে যেন চালু রাখা হয় এবং মূল্যবান প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশনার জন্য সরকারী সাহায্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তখনকার বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড বিপুলসংখ্যক রক্ষণশীল প্রাচ্যপন্থীদের সম্পূর্ণ বিরোধী শিবিরে ঠেলে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। অপেক্ষাকৃত উদারনীতিতে সকলকে খুশী করবার জন্য **১৮৩৯ সনের এক ঘোষণাপত্রে তিনি জানালেন যে প্রচলিত প্রাচ্য বিদ্যালয় এবং অধ্যাপক পদগুলি চালু থাকবে,** প্রয়োজনীয় প্রাচ্য সাহিত্যও প্রকাশ করা হবে এবং প্রাচ্য বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ ছাত্র বৃত্তি ভোগ করবে। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয়গুলির কর্তব্য সীমায়িত করে দিলেন। তাদের প্রধান কাজ হবে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন, এবং অতিরিক্ত সম্ভব হলে ইংরেজী শিক্ষা দান। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ।

প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি কিঞ্চিৎ উদারতার সঙ্গে সঙ্গে **লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অধিকতর উৎসাহ** যোগালেন। সরকারী জিলা স্কুলে ইংরেজীই চলবে। যে বিরাট সংখ্যক ভারতবাসী ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাদের চাহিদা পূরণ করাই সরকারের মুখ্য কর্তব্য বলে ঘোষিত হলো। ইংরেজী শিক্ষার জন্যই বেশী ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হলো। **অন্যদিকে ইউরোপীয়দের সমযোগ্যতাসম্পন্ন ভারতবাসীকে সমসুযোগ দানের নীতি ঘোষণার ফলে** ভারতবাসীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পেলো।

লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলেই ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সূচনা করেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব বাংলা গোষ্ঠী। রেভাঃ এ্যাডামের মত Hodgson, Wilkinson, Dr. Ballentyne প্রমুখ অনেক ইউরোপীয়ও এই আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু এ দাবি অগ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ প্রাচ্যবিদ্যাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়েও লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজী শিক্ষাকেই অধিকতর উৎসাহ দিলেন। তদুপরি Downward Filtration নীতিই চালু রইল। সরকারী উদ্যম উচ্চ শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো।

উড্ ডেসপ্যাচের পটভূমি

১৮৩৫ সনে জয়লাভের পর G. C. P. I. সংগঠনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্যপন্থীরা পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই এর পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৪৮টিতে দাঁড়ায়। **অপরদিকে সরকারী ঘোষণায় বিচার বিভাগীয় পদ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৩৭ সনে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকেই সরকারী ভাষা করা হয়।** সর্বোপরি ১৮৪৪ **সনে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সরকারী চাকুরিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি** এবং যোগ্যতা বিচারের জন্য **প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নীতি** ঘোষণা করেন। এ সবের ফলেই **ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে**; এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সীগুলিকেও এই পথে নিয়ে আসে।

অবশ্য **এই যুগে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে বেসরকারী ভূমিকাই ছিল বেশী।** ১৮৩৫ সনের সিদ্ধান্তকে তাঁদের জয় বলে মনে করে মিশনারীরা সংগঠিত চেষ্টায় সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রটি দখল করার চেষ্টা করেন। এই যুগটিকেই আগে আমরা **'ডাফের যুগ'** বলে অভিহিত করেছি। এই যুগেই তাঁরা অনেক স্কুল এবং কলেজ গড়ে তোলেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং ডাফের Free Body Institution, মাদ্রাজের রায়পেট কলেজ এবং মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, মাসুলিপট্টমের নোব্‌ল্ কলেজ, নাগপট্টমের সেইণ্ট জোসেফ কলেজ, নাগপুরের হিসলপ্ কলেজ, আগ্রার সেইণ্ট জোসেফ কলেজ প্রভৃতি এ যুগেরই সৃষ্টি। উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাত এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি আজও বেঁচে আছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালের আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র

ভারতীয় মহলেও এক নূতন কর্মোদ্যম আসে। শতাব্দীর প্রথম থেকে যে বিতণ্ডা চলছিল তার বদলে এখন দেখা যায় বাস্তব গঠনমূলক কাজ। উগ্র রক্ষণশীল এবং উগ্র আধুনিক এই দুই শ্রেণীর নেতারাই অপেক্ষাকৃত নরম সুরে কথা বললেন এবং এরই মধ্য থেকে **জয়লাভ করে রামমোহন প্রদর্শিত সংস্কৃতি সমন্বয়বাদ। এই নতুন চেতনার রূপ দেন একদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের তরফে**

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং অপরদিকে হিন্দু সমাজের পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নবরূপায়িত ব্রাহ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৪০ সনে প্রতিষ্ঠা করেন **তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা**। অন্যদিকে হিন্দু সমাজও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেন **অবৈতনিক হিতার্থী বিদ্যালয়**। পানিহাটিতেও এরকমের আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়, মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়, গুরুচরণ দত্তের উদ্যোগে ডেভিড হেয়ার এ্যাকাডেমি প্রভৃতিও এ সময়কার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় যশোহর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি মফঃস্বল কেন্দ্রেও অনেক স্কুল গড়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা কমিটির ইংরেজী স্কুল এবং প্রচলিত প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলিতেই সরকারী সাহায্য সীমায়িত ছিল। বেসরকারী ইংরেজী স্কুলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হতো না। সুতরাং **সরকারী সাহায্যের নীতি এই সময় এক সমস্যারূপে দানা বাঁধলো।**

(উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল।**) ১৮৩৬ সনে Society for the Promotion of Bengali Language and Literature প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কাজ আরম্ভ হয়। এই প্রতিষ্ঠানেই অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে বিদগ্ধ নিবন্ধাদি পাঠ করেন। যুগের প্রেরণাতেই অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কৃতির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

(ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত থাকার সময়েই বিদ্যাসাগরের আধুনিক ভাব-মানস তৈরী হয়। কিন্তু আধুনিক যুগধর্মকে গ্রহণ করতে গিয়ে ঐতিহ্য ও ধর্মকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয় না, একথাই তিনি প্রমাণ করলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি তাই ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলা—এই তিনটি ভাষাতেই সমগুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটাই করে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রয়োজনীয় অংশকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে তিনি ভীত হননি। অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর কাছেও সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজী পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন ধর্ম নিরপেক্ষ, বেসরকারী এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষকের পরিচালনায় আধুনিক বিদ্যালয়ের আদর্শ স্থাপন করেছে।

লর্ড ডালহৌসির আমলে ঈশ্বরচন্দ্রই মাতৃভাষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক প্রাথমিক

শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন। পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিষয়কে। তিনি পরিকল্পনা করেন একজন হেডপণ্ডিত এবং দু'জন পণ্ডিতের পরিচালনায় তিন থেকে পাঁচ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথম পর্যায়ে এই রকমের ২৫টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায়। দরিদ্র গ্রামীণ জনসাধারণের সুবিধার্থে এই সব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে দূরে। তিনি দু'জন পরিদর্শক, একজন মুখ্য পরিদর্শক এবং নরম্যাল স্কুল প্রভৃতির সুপারিশও করেন।

বস্তুতঃ দক্ষিণবঙ্গ. সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পরে বিশেষ পরিদর্শকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর আগ্রহকে কাজে রূপ দেবার সুযোগ করে নেন। ১৮৫৬ সনের আগেই প্রতি জেলায় পাঁচটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় কমপক্ষে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্রের দান চির উজ্জ্বল। তদুপরি প্রাথমিক পাঠোপযোগী পুস্তকমালা রচনা করে বিদ্যাসাগর সাধারণ লোকের কাছে শিক্ষাকে সহজসাধ্য করে গেছেন।)

নূতন দৃষ্টিভঙ্গি

পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে **প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে পরিবর্তিত হতে লাগলো**। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে শিক্ষা কাউন্সিল প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টি দিতে সুরু করে। ১৮৪৪ সনে ১০টি **বাংলা প্রাথমিক স্কুল** প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। স্থির হয় যে এদের পাঠ্যক্রমে থাকবে লিখন, পঠন, গণিত, বাংলা ভাষা, ভূগোল, ভারতের ইতিহাস। ছাত্রদের কাছ থেকে এক আনা হারে বেতন নেওয়া হবে। **১৮৪৭ সনে কলকাতায় নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়** এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়।

এই সূচনা আর এক ধাপ অগ্রসর হয় বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আমলে। **১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিল প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।** ১৮৫৩ সনে স্থির হয় যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে Thomason এর প্রদর্শিত পথে বাংলা প্রদেশেও রেভাঃ এ্যাডামের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়া হবে। সরকার দেশজ পাঠশালাগুলিকে অর্থ সাহায্য করবেন এবং এদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ-রূপে কিছু সংখ্যক মডেল স্কুল গড়বেন। উন্নত পাঠদানের জন্য সার্কেল পণ্ডিত

নিয়োগ করা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও কাজ হলো সামান্যই। **মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বছরে ব্যয়বরাদ্দ হলো মাত্র ৮ হাজার টাকা।** বিচিত্র নয় যে **১৮৫৪ সনে বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুল ছিল মাত্র ৩৩টি।**

দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্বই অবশ্য এক্ষেত্রে বেশ লক্ষণীয়। মাত্র কয়েক বছর আগেকার Downward Filtration **নীতির ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হতে লাগলো।** যেখানে ইংরেজী শিক্ষার গৌরবের উপর ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ পরিকল্পনা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেল যে **ইংরেজী শিক্ষাই বুমেরাঙ্গের কাজ করলো।** শিক্ষিত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই ইংরেজ শাসনের সমালোচনা ও নিন্দা সুরু হলো। সর্বাপেক্ষা উগ্র আধুনিকতা-পন্থী যুব-বাংলা গোষ্ঠীই মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি তুললেন। ১৮৪৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হলো Bengal British India Society. দাস শ্রম বিরোধী আন্দোলনে এবং বিদেশে ভারতীয় কুলি চালানের বিরুদ্ধে এঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৮৩৮ সনে স্বীকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলো। ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত বিচার বিভাগীয় সুবিধার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধলো (Black Bill Agitation)। বিলেতের পার্লামেণ্টে ভারতের নালিশ রুজু হতে লাগলো। ইংরেজ শাসক প্রমাদ গুণলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় মধ্যবিত্তের উপর শাসনের সংকীর্ণ ভিত্তির বদলে সাধারণ প্রজার সাথে সরাসরি সংযোগ করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। অপরদিকে ইংলণ্ডেও ততদিনে গণশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চেতনা দানা বাঁধছে। সুতরাং downward filtration **নীতি বাতিল করা প্রয়োজন হল।**

উড ডেস্‌প্যাচের কারণ

বস্তুতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল যুগ সন্ধিক্ষণ। **১৮৩৫ সনে আলোচিত এবং স্থিরীকৃত বহু সমস্যার জের তখনও চলছিল।** চুঁইয়েনামা নীতির অসারতা অতি সত্বর প্রমাণিত হলো। 'সুতরাং এ বিষয়ে **পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হলো।'** মূল নীতি পুনর্বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে হলো। প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার সাথে অবধারিত রূপে জড়িত ছিল ভাষা-মাধ্যম পুনর্বিবেচনার সমস্যা। ১৮৩৫ সনে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার দাবি আদৌ গ্রাহ্য করা হয়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে ভারতীয় উদ্যম দানা **বেঁধেছে, এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাতেও মাতৃভাষা গ্রহণের দাবি সোচ্চার**

হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হলো। G. C. P. I. গড়বার পর থেকে সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই সরকারী দায়িত্ব পালিত হচ্ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যমও অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং **সরকারী দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ণয়ের প্রয়োজন হলো।**

পুরাতনের এইসব জের ছাড়াও নতুন বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র ভারত তখন ইংরেজ কবলিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে ব্রীটিশ শিল্পসমৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যের তখন মধ্যাহ্নকাল। ভারতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ত ও জলসেচের আধুনিক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং **প্রয়োজন হলো ইঞ্জিনীয়ার, অন্ততঃ সিভিল ইঞ্জিনীয়ার।** নতুন আইনবিধি প্রয়োগ করা হয়েছে। **প্রয়োজন হলো আইনজীবীর।** সুতরাং **পেশাগত শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে উঠলো।** ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পাটকল, সুতোকল প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং **বৃত্তিগত দক্ষতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।** শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সবের প্রতিফলন পড়তে বাধ্য।

শাসনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার হয়েছে। সমযোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরিতে সমসুযোগের নীতি ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, তথা ইংরেজী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার নীতি গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়েছে ইংরেজী। **এই সব কিছুর ফলে আধুনিক শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে।** এবং সে কারণেই **শিক্ষার স্তরবিভাগ, শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রকাশ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা** এবং অর্জিত মান সম্পর্কে **বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রয়োজন হলো।** তাই সামগ্রিক ভাবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির কথা ভাবতে হলো। মুসলীমরা এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রায় বর্জন করেই আসছিলেন। কিন্তু একদিকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের স্বার্থে ইংরেজ সরকারও মুসলীমদের বর্জন করে রাখতে চাইলেন না, অন্যদিকে মুসলীম নেতাদের মধ্যেও নবচেতনা প্রকাশ পেতে লাগলো। সুতরাং **শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ স্থান করে দিতে হলো।** ঠিক তেমনি রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙ্গে **নারী শিক্ষার চেতনাও রূপ পাচ্ছিল। সুতরাং নারী শিক্ষা সম্বন্ধেও নীতি নির্ধারণ অবধারিত হলো।**

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছিল, **কিন্তু এ শিক্ষার কোন বিঘোষিত আদর্শ**

ও উদ্দেশ্য তখনও ছিল না। ১৮৩৫ সনের উত্তরকালে **মিশনারীরা ভেবেছিলেন যে বেন্টিঙ্কের রায় মূলতঃ তাঁদের পক্ষেই হয়েছে।** সুতরাং তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষাদানের পূর্ণ অধিকার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় **একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে লাগলেন।** ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল সরকারী স্কুলগুলিকে নিন্দা করেই তাঁরা ক্ষান্ত রইলেন না। সরকারী বিদ্যালয়ে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও অগ্রাহ্য করে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে থাকলেন।

কিন্তু অন্যদিকে **ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী উদ্যমও শক্তিশালী ও মুখর হয়ে মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করতে লাগলো।** এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থির করতে হলো।

পুরাতনের জের এবং নূতন সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত **হলো ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ সুবিখ্যাত উড'এর ডেসপ্যাচ** (Wood's Despatch.)। ১৮৫৩ সনে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সুযোগে ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পার্লামেন্টে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটলো। এই অনুসন্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চার্লস উড'এর নামে রচিত শিক্ষা দলিল ভারতে এলো ১৮৫৪ সনে।

উড্'এর দলিল

উড্'এর দলিলে **শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হলো।** ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা। **এই জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে হবে নৈতিক ও জাগতিক আশীর্বাদস্বরূপ।** পাশ্চাত্য-শিক্ষাই নীতিবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশ্বাসযোগ্য সরকারী কর্মচারী তৈরী করবে। এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে অনুধাবন করাবে শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের তথা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল। **ভারতবাসীর মধ্যে বাণিজ্য ও** ধনবৃদ্ধির চেতনা হবে। এর ফলে **এদেশ থেকে** ইংলণ্ড লাভ করবে তার যন্ত্রশিল্পের ও ব্যবহারের জন্য কাচা মালের সুনিশ্চিত যোগান এবং **এদেশে বিলেতী** শিল্পপণ্যের অফুরন্ত বাজার। **আশু উদ্দেশ্য হিসেবে** শিক্ষা ও চাকুরিকে একসূত্রে বাঁধা হলো। ঘোষণা করা হলো যে শিক্ষার **বিষয়বস্তু হবে উন্নত ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য, এক কথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান।**

৮. **উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম** থাকবে **ইংরেজী ভাষা**। তবে মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এবং গণশিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত করা হবে। এ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়, এমন কি প্রয়োজন বোধে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় এবং **প্রাথমিক শিক্ষার জন্য** দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ দেওয়া হবে। ভারতীয় ভাষাসমূহে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা চলবে।

ডেস্‌প্যাচে শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার **নীতি ঘোষিত হলো**। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। **কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মীয় শিক্ষা দিলেও তা আমলে আনা হবে না।**

শিক্ষা প্রশাসনের জন্য তদানীন্তন পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতে থাকবে সরকারী শিক্ষা বিভাগ। জনশিক্ষা অধিকর্তার (Director of Public Instruction) অধীনে থাকবেন বিদ্যালয় পরিদর্শক গোষ্ঠী। এই শিক্ষা বিভাগের হাতেই থাকবে মূল নিয়ন্ত্রণ। **কিন্তু সরকারই সমগ্র শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল স্থাপন করবেন না। বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী অনুদান** (Grant in aid) **দেওয়া হবে** শিক্ষকের বেতন, গৃহনির্মাণ, উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে। অবশ্য **অনুদান হলো শর্তসাপেক্ষ**—যথা, ধর্মনিরপেক্ষ উত্তম শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় উদ্যোগ, ছাত্র বেতন আদায়, নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন প্রভৃতিই হলো শর্তাদি। এই ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চরিত্রটি বোঝা দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে **সরকারী ও বেসরকারী যৌথ দায়িত্বের নীতিই হলো উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মর্মকথা।** শর্তসাপেক্ষে সকলকেই অনুদান দেওয়ার নীতি গৃহীত হওয়ায় **মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকারের দাবি অগ্রাহ্য হলো**। সুতরাং এ ক্ষেত্রে **বেসরকারী ভারতীয় উদ্যমকে পরোক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হলো**। ধর্মনিরপেক্ষতার শর্ত আরোপ করেও মিশনারীদের দাবি অস্বীকার করা হলো। অপরদিকে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা এবং ছাত্রবেতন ইত্যাদি শর্তের মধ্য দিয়ে এবং Grant-in aid **ব্যবস্থার** মাধ্যমে সরকারী দায় সীমাবদ্ধ করা হলো। **কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণ রইলো সরকারেরই হাতে**। অথচ ঘোষণা করা হলো যে সরকার ক্রমেই শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টার কাছেই শিক্ষার উদ্যোগ ছেড়ে দেবেন। অর্থাৎ **সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্তু দায়িত্ব থাকবে না।**

লক্ষণীয় যে ১৮১৩ সনের 'সাহায্য নীতি' এবং ১৮৫৪ সনের 'সাহায্য নীতির' মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য এসে গেল। ১৮১৩ সনে **নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয়ের** নীতি গৃহীত হয়েছিল। **কিন্তু ১৮৫৪ সনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও**

শর্তসাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যমকে অনির্দিষ্ট অর্থ সাহায্যের পথে সরকারী দায়িত্ব সীমায়িত করা হলো।

ডেসপ্যাচ-এ বলা হলো যে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে সক্ষম। সুতরাং **সাধারণের শিক্ষার প্রতি সরকারী দৃষ্টি দেওয়া হবে** এবং **দেশজ বিদ্যালয়গুলিকেও উৎসাহিত করা হবে।** সামাজিক সম্ভ্রম ও জীবনযাত্রা বিধি অনুযায়ী **প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে।** সামাজিক স্তরভেদে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ভাবার্থ হলো শিক্ষায় সমসুযোগের অস্বীকৃতি। এ নীতির ফলে ঘটলো **অশিক্ষিত কিম্বা স্বল্পশিক্ষিত সমাজের সাথে উচ্চ শিক্ষিত সমাজের দুস্তর ব্যবধান।** অবশ্য এ কথাও বলা হলো যে সরকারী বৃত্তিদানেব ব্যবস্থা করে যোগ্যতাকে উৎসাহিত করা হবে। কিন্তু বৃত্তি ব্যবস্থার সংকীর্ণতা ও স্বল্পতার ফলে অতি **নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যবানই দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেন।**

আগেই বলা হয়েছে যে অর্থনীতি ও প্রশাসনগত কারণে কোন কোন পেশাগত শিক্ষারও প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ডেসপ্যাচ'এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে **আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার কথা বলা হলো।** কোন কোন **বৃত্তিমূলক শিক্ষারও** উল্লেখ থাকলো। বলা হলো যে মুসলীমদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় সরকার বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করবেন এবং 'স্টাইপেণ্ড' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে **শিক্ষক শিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।**

উড ডেসপ্যাচ'এর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রেসিডেন্সী শহর কেন্দ্রে **বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা।** শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠান হবে বিশ্ববিদ্যালয়। তার নীচে থাকবে স্তরভেদে বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব থাকবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ এবং তদনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাম্মানিক পাঠ্যক্রমও প্রবর্তন করবে এবং কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করবে।

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্তৃত্বে, অপরিকল্পিত-ভাবে, অসম-মানের যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা এক সূত্রে গ্রথিত হলো। একটি নিয়ামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সর্বত্র অভিন্ন প্রকৃতির পঠন পাঠন সুসংহত হওয়ায় **শিক্ষা 'ব্যবস্থা' (System) সৃষ্টি হলো।**

স্ট্যানলী ডেস্‌প্যাচ :—উড্'এর ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার প্রথম পর্বেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটলো। বিলেতের হতচকিত কর্তৃপক্ষ ভাবলেন হয়তো

ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। তাই **১৮৫৮ সনে বিলেত থেকে লর্ড এলেনবরো ১৮৫৪ সনের ডেস্‌প্যাচ্** কার্যকর না করবার নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু মহারাণীর ঘোষণার পরে প্রথম **ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলী ১৮৫৯ সনে নূতন ভাবে নির্দেশ পাঠালেন।** এই নির্দেশে কোন নূতন নীতির কথা বলা হলো না। তবে একথা পরিষ্কার করে বলা হল যে তদানীন্তন সাহায্যদান নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করছে না। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের বেশী উদ্যোগ নেওয়া এবং আরও বেশী সরকারী প্রাথমিক স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য **'সেস্' প্রবর্তনের প্রস্তাবও এই ডেস্‌প্যাচের উল্লেখযোগ্য অংশ।**

স্ট্যানলীর ডেস্‌প্যাচ্ উডের ডেস্‌প্যাচের পরিপূরক মাত্র। তবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে **প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।** তদুপরি **সেস্ প্রবর্তন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এক নূতন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।**

মূল্যায়ন :—উড্ ও স্ট্যানলীর ডেস্‌প্যাচকে একই দলিলের দুটি পর্যায় রূপে বিবেচনা করা ভাল। জেমস্ সাহেব উডের দলিলকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ দলিল এত প্রশংসা দাবি করতে পারে না। ম্যাগনা কার্টা 'অধিকারের' দলিল। উডের দলিল **ভারতবাসীর শিক্ষার 'অধিকারের' দলিল নয়,** কিম্বা ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের জন্য সরকারী দায়িত্বের অঙ্গীকার পত্র নয়। **জাতির প্রয়োজনের বদলে প্রশাসনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।** শিক্ষার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা দাসত্বের শিক্ষা, আত্মসম্ভ্রমশীল জাতির শিক্ষাদর্শ নয়। তদুপরি শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরভেদ রচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া **এই দলিলের মধ্য দিয়েই সরকারী নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়।** শিক্ষায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকৃত হয়। **এক কাঠামোর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নমনীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।** তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এই দলিল বহু সঞ্চিত সমস্যার সমাধান এবং বহু প্রশ্নের উদ্রেক করে। এই হিসাবে জেমস্ সাহেবের বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব যে **"The Despatch of 1854 is thus the climax in the History of Indian Education: What goes before it leads up to it."**

(ডেস্‌প্যাচের **ইতিবাচক দিকগুলিও** উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দলিলই পার্লিয়ামেন্টের পক্ষে প্রচারিত **শিক্ষানীতির প্রথম ঘোষণাপত্র**। এই ঘোষণাপত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও **সরকারী কর্তব্য স্বীকৃত হয়েছে**। এখানেই **সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে**। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং 'চুঁইয়ে পড়া' নীতি পরিত্যাগ করে **গণশিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে**। এই সঙ্গে বৃত্তিদান পরিকল্পনার মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্রের নিকট উচ্চ শিক্ষার দ্বার কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষা-সিঁড়ি রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। সরকারী 'সাহায্য নীতি'র ফলে **বেসরকারী দেশীয় উদ্যোগের পথ প্রশস্ত হয়েছে**। সর্বোপরি **বিবিধ উদ্যোগকে গ্রথিত ও সংহত করে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারত্বে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বে**, একটি ব্যাপক 'শিক্ষা ব্যবস্থার' প্রবর্তন হয়।) বড়লাট লর্ড ডালহৌসি মন্তব্য করেছিলেন যে এ দলিলটি হলো…"a scheme of Education for all India far wider and more comprehensive than the Local or Supreme Govt could have even ventured to suggest."

(**কিন্তু একথা কোনক্রমেই মনে করা যায় না যে উডের দলিল একটি 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছিল**। জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, সরকারের নেতৃত্বে কিম্বা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। বিজাতীয় শাসকের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে **একটি ভিন্নদেশীয় ব্যবস্থা এ দেশের মাটিতে রোপন করা হয়েছে**। একথা ঠিক যে বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সংহত করে সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটি 'ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং উডের দলিল একটি **'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা'** (State System of Education) প্রবর্তন করে, এ কথা বলা চলে।)

ভবিষ্যতের উপর প্রভাব :—উডের দলিলের পরে ভারতের প্রায় এক শতাব্দী কাল স্থায়ী ইংরেজ শাসনে **এ দলিলের ফলশ্রুতি হয়েছিল সুদূর প্রসারী**। ১৮৫৭ সন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হলো আজও তা দূর হয়নি। পুঁথিগত অব্যবহারিক বিদ্যাবত্তার বোঝা ব'য়ে "বুদ্ধিজীবী" হওয়ার যে ঝোঁক সৃষ্টি হলো, সমগ্র জাতির মেধাকেই তা গ্রাস করে ফেললো। **প্রকৃত জ্ঞানপীঠ হওয়ার জন্যে আজও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে**। উচ্চশিক্ষার গেটপাস রূপে **প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাধান্যই** নিয়ন্ত্রণ করলো স্কুলের

পাঠ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে। পরীক্ষার বেড়াজালের বাইরে **শিক্ষকের স্বাধীনতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন সুযোগই রইল না। উচ্চশিক্ষার মোহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষার পথরোধ করে দাঁড়াল।** এই মোহ গণশিক্ষার **প্রশ্নকে দীর্ঘকাল আড়াল করে রাখলো।** মাতৃভাষার দাবি কিছুটা স্বীকৃত হলেও **ইংরেজীর আধিপত্য সমগ্র শিক্ষা জগতকেই অধিকার করে নিল।** শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের **দ্বৈত কর্তৃত্ব** পরিবর্তিত রূপে আজও চলেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ের বাহ্যিক আচার নিষ্ঠা ও নিয়মকানুনের বোঝা বাড়লো। **বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা অন্তর্হিত হলো।** অথচ সরকারী দায়িত্ব হলো সীমাবদ্ধ। মূলতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টা ও ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরতার ফলে **শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হলো অভিভাবক ও দেশবাসীকে।** কিন্তু অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে **সরকারী অংশীদারত্ব ও নিয়ন্ত্রণের** যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হলো তার জের আজও টেনে চলা হচ্ছে।

জাতির ক্রমবর্দ্ধমান আশা আকাঙ্খার সাথে সম্পর্কহীন, সংকীর্ণ আদর্শের এবং বিদেশী শাসকের হাতে নিয়ন্ত্রিত এই **ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধলো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে।**

১৮৫৪ সনের দলিল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে **এই দলিল পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্তরায়গুলিকে দূর করে ঐ শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম করে দেয়।** অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ১৮১৩ সনের পর থেকে মিশনারী এবং দেশী ও বিদেশী বেসরকারী প্রচেষ্টাও অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু **সরকারী নীতিস্থিরতার অভাবই ছিল অন্তরায়। ১৮৩৫ সনের নীতিগত সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল।** কিন্তু প্রাচ্য পন্থীদের **প্রতিরোধ তখনও রয়ে গিয়েছিল। ভাষাগত বিরোধও সম্পূর্ণ মেটেনি।** মিশনারী উগ্রতার ফলে **রক্ষণশীল মহলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কেই সন্দিগ্ধতা রয়ে গিয়েছিল।**

এ সব বাধাও ক্রমে ক্রমে দূর করা হলো। প্রাচ্য বিদ্যাকেও সাহায্য দানের নীতি গৃহীত হওয়ায় **প্রাচীন পন্থীরা নরম হলেন। ইংরেজীই প্রশাসন ও আদালতের ভাষা রূপে গৃহীত হলো।** ইংরেজী শিক্ষাকে সরকারী **চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারদানের সিদ্ধান্ত হলো।** এর ফলে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বাড়লো। এই ভাবে ধাপে ধাপে ইংরেজী শিক্ষার **অন্তরায়গুলি দূর হতে লাগলো;**

সর্বশেষে ১৮৫৪ সনে মিশনারীদের একচেটিয়া দাবি অগ্রাহ্য হলো। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতি গৃহীত হলো। সবরকম বেসরকারী উত্তমকেই সমদৃষ্টিতে দেখবার নীতি ঘোষণা করা হলো। সাহায্যদান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেসরকারী উত্তমকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। নারী শিক্ষা ও মুসলীম শিক্ষাকেও সরকারী উত্তমের মধ্যে আনা হলো। এই ভাবে প্রতিরোধ ও অন্তরায় দূর করে ১৮৫৪ সনে ইংরেজী শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ মুক্ত হলো।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রসার

ইংরেজী শিক্ষা চালু হলেও সংঘর্ষ ও সমস্যার শেষ হলো না। ভিক্টোরীয় যুগের প্রাচুর্যে ইংলণ্ড তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যিক শক্তি। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতেও ইংলণ্ডের প্রাধান্য। বহু বিষয়ে ইংলণ্ডের উদারনীতির দিকে দিকে জয়গান। কিন্তু সাম্রাজ্যের ব্যাপারে উদারনীতি ছিল সীমিত। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় সামন্তশক্তি সম্পুর্ণরূপে ইংরেজের অনুগামে পরিণত হলো। ইংরেজরাও এ শক্তিকে অনুচর রূপে গ্রহণ করলেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শা'র অপসারণের মধ্য দিয়ে মুসলীম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হলো। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলীম অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন। সুচতুর ইংরেজ শাসকরা তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন নিষ্কণ্টক হলো। বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সংকট ছাড়া আপাতঃদৃষ্টিতে ইংরেজ শাসনের আর কোন সমস্যা যেন রইল না।

কিন্তু এই পরিবেশেই জন্ম নিল ভবিষ্যতের বিরাটতম সম্ভাবনার বীজ। ইংরেজী শিক্ষিত যে ভারতীয়কে একদিন মেকলে সাহেব মনে প্রাণে ইংরেজ তৈরী করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই ঘটলো মোহমুক্তি। সিপাহী বিদ্রোহ এবং তার পরে ইংরেজদের আচরণ থেকে তাঁরা নিলেন বিরাট শিক্ষা। হিন্দু মেলার সংগঠন, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ-নীতির প্রতিবাদ, দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ বিরোধী আন্দোলন, আই, সি, এস, পরীক্ষার বয়ঃসীমার আন্দোলন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন এবং 'ভারত সভা' গঠনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনা ক্রমে দানা বাঁধছিল, তাই মূর্ত রূপ পেল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

জাতীয় চেতনার অবধারিত ফলশ্রুতি হলো জাতিকে শিক্ষা দানের চেতনা। স্কুল গড়াকে জাতি সেবা বলে মনে করার ফলে **বেসরকারী ভারতীয় উদ্যম তীব্র গতিতে অগ্রসর হলো। গণজীবনের প্রতিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়লো।** গণশিক্ষা তথা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই অন্যতম লক্ষ্য হলো।

এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়লো সরকারী প্রশাসনেও। শিক্ষা প্রশাসনের **বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হলো।** জাতীয় চেতনাকে কিঞ্চিৎ "কনশেসন্" দানের উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন সীমাবদ্ধ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করলেন। কিন্তু জাতীয় চেতনার বন্যাকে বাঁধ দিয়ে আটকানো গেল না।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই পটভূমিতেই উড্ ডেস্প্যাচের নির্দেশগুলি কার্যকরী করা হতে লাগলো।

উড ডেস্প্যাচের প্রয়োগ

উডেব দলিল অনুসারে ১৮৫৬ সনে বিভিন্ন প্রদেশে **শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।** স্কুলের উন্নয়ন, শিক্ষকদেব বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সাহায্য দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। শিক্ষাবরাদ্দের **এক অংশ সরকারী স্কুলের জন্য এবং অপর অংশ বেসরকারী স্কুলে সাহায্যের জন্য ব্যয়িত হয়।**

সরকারী উদ্যোগে কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ, লাহোব কলেজ, এলাহাবাদের মুর কলেজ প্রভৃতি এই সময়েই সুসংগঠিত হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়ে **সরকারী সাহায্যের মোটা অংশ এই সময়ে স্বভাবতঃই দখল করেন** মিশনারীরা। তাঁরা অবশ্য সরকারী সাহায্য ছাড়াও অগ্রসর হন। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লাহোবের ফোর্ম্যান কলেজ, লক্ষ্ণৌর রীড কলেজ, দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজ প্রভৃতি এ যুগের মিশনারী প্রচেষ্টার সাক্ষ্য।

বেসরকারী ভারতীয় উদ্যমও ক্রমে সংগঠিত হতে থাকে। বিশ বছব সময়ের মধ্যে ৬৫ টি কলেজ ভারতীয় উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উড্ডেসপ্যাচ্ অনুসারে **তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়** এবং ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি মূলতঃ কলেজ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিষ্ঠান রূপেই কাজ করে। **শিক্ষাদান ও গবেষণার দায়িত্ব** আসে অনেক পরে।

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও বিশ বছরের মধ্যে দাঁড়ায় ২ হাজার। কিন্তু

পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যা এবং ইংরেজীর প্রাধান্য শিক্ষাকে একমুখী করে দেয়। এ শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস পায়। **বিশ্ববিদ্যালয়মুখীনতাই হয় মাধ্যমিক শিক্ষার চরিত্র।** অবশ্য মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৭১ সনের মধ্যেই সারা ভারতে ১৩৭টি নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া ডাক্তারি, ওকালতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও প্রসার ঘটে। এ সবের জন্য ১৮টি কলেজ গড়ে ওঠে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী উদারতার নীতি গৃহীত হলেও মিশনারী প্রচেষ্টা তখনও ছিল অগ্রগামী ; সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যার চেয়ে মিশনারী স্কুলে ছিল দ্বিগুণ। ১৮৮১-৮২ সনে সারা ভারতে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৮২৯১৬টি। পাঠ্য পুস্তক এবং পঠন পাঠনের পদ্ধতিরও কিছু উন্নতি ঘটে। কিন্তু **বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সরকারী উৎসাহ লাভ করে।** মাদ্রাজ, বাংলা ও আসামে দেশজ বিদ্যালয়ের প্রাধান্য এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাবে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাধান্য ঘটে। মধ্য প্রদেশে মধ্যপন্থা অবলম্বিত হয়। **বাংলাদেশে** সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র ২৮টি, আর সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী ৪৭৩৭৪টি এবং সাহায্যহীন বেসরকারী বিদ্যালয় ছিল ৩২৬৫টি।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমস্যা হয় আর্থিক। অর্থ সঙ্কুলানের চেষ্টা হয় স্থানীয় সেস্, মিউনিসিপ্যালটির দান, ছাত্রবেতন, এবং বেসরকারী দান সংগ্রহের পথে। **তাই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে নমনীয় করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে দায়িত্ব স্থানান্তরিত** হয়। ১৮৭০ সনে লর্ড মেয়ো এর সূচনা করেন, এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটে। ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে **লোকাল বোর্ডের মাধ্যমে রাজস্বের উপর ১ থেকে ৭½ শতাংশ হারে শিক্ষা সেস্ প্রবর্তিত** হয়। **কিন্তু** প্রয়োজনের তুলনায় আয় হয় সামান্যই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার **প্রসার হয় ধীর গতিতে। কিন্তু** বাধা বিপত্তি এবং মিশনারীদের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও **ভারতীয় প্রয়াসই ক্রমে নেতৃত্ব অধিকার করে।** ১৮৮১-৮২ সনে ভারতীয় প্রয়াস মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করার মত শক্তি অর্জন করে। বস্তুত সরকারী শিক্ষা বিভাগও জনতার স্বার্থে সামিল হতে পারে না। সাহায্য দানের পদ্ধতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাই **বেসরকারী উদ্যমের সঙ্গে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।**

ক্রমেই অবস্থা এমন হতে থাকে যখন সরকারের কাছে দুটি পথ খোলা—হয় পূর্ণ

দায়িত্ব গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ উদাসীনতা। এর কোনটাই গ্রহণ না করার ফলে **মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রটি অধিকার করে বেসরকারী উদ্যোগীরা, আর প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়গুলি হয় অনাদরে ক্ষীণকায়।** ১৮৮১-৮২ সনেও সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী প্রদেশে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী পুরুষের ৭৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ৯৮ শতাংশ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে। পশ্চাৎবর্তী প্রদেশে পুরুষেব ৯২ শতাংশ ও মেয়েদের শতকরা একশ ভাগই স্কুলের বাইরে থাকে।

প্রথম শিক্ষা কমিশনের পটভূমি

এই পরিবেশে **নীতিগত সংঘাত অনিবার্য। দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী মনোভাব, শিক্ষার জন্য সেস্ কিংবা কর ব্যবস্থা, সরকারী অর্থ ভাণ্ডারের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের স্থান সম্পর্কে বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়।**

উডের ডেস্‌প্যাচে মিশনাবীদেব একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হয়নি এবং সরকার শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি বলে **মিশনারীরা ছিলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাঁরা সুস্থ মনে গ্রহণ করেন নি।** উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে **ব্যাপকহারে ধর্মান্তরকরণপ্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।** সুতরাং নূতন করে প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্ত্রী শিক্ষার দিকে তাঁরা নজর দিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে **পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, স্কুল পরিদর্শন, সাহায্য বণ্টন** এবং **প্রতিদ্বন্দ্বী** বিদ্যালয়েব **প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হলো।** ১৮৬৭ সনে ভারতের মিশনারীরা ইংলণ্ডে বার্তা পাঠালেন হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। তাঁদের সমর্থনে ১৮৭৮ সনে গঠিত General Council of Education in India ইংলণ্ডে **আন্দোলন সুরু কবলেন।**

এদিকে ভারতীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে **সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও প্রসার বৃদ্ধির দাবি উঠলো।** সাহায্যদান পদ্ধতি সম্পর্কেও নানা অভিযোগ উঠলো। এই পরিবেশে **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হলো।** গঠিত হলো W. W. Hunter এর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন (১৮৮১-৮২)। এ কমিশনে মিশনারী ও ভারতীয়রাও থাকলেন। **এটিই প্রথম** ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। **কমিশনের কাজ হলো সরকারী, মিশনারী ও ভারতীয় প্রয়াসের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণয় করা; প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলীম শিক্ষা**

এবং অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহের শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করা। তা ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক, ভাষা শিক্ষা, শিক্ষক যোগানোর সমস্যাও এর আলোচ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। সর্বোপরি শিক্ষায় অর্থ সংস্থান এবং প্রশাসনের কথাও কমিশনকে ভাবতে হলো। কমিশনকে তাই অনুসন্ধান করতে হলো যে ১৮৫৪ সনের নীতি কতটা কার্যকরী হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষাকে কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হলেও প্রসঙ্গক্রমে কমিশনকে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত কবতে হয়েছে।

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট

কমিশনের রিপোর্টে বলা হলো যে ১৮৫৪ সনেব নির্দেশ কোথাও যথাযথ পালন করা হয়নি। কমিশন তাই নূতন করে পরামর্শ দিলেন যে **মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারী উদ্যমের কাছে পুরোপুরি হস্তান্তরেব জন্য ক্রমে** ক্রমে সরকারকে হাত গুটোতে হবে। **প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারকে এক্ষুনি সরে আসতে হবে।** আরও উদার ভিত্তিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিতে হবে। সাহায্যদানের বেলায় টালবাহানা এবং পক্ষপাতিত্বেব অবসান করতে হবে। এ জন্য **সাহায্যদান বিধি** (Grant in Aid Code) **পুনর্বিবেচনা করতে হবে।**

ধর্মশিক্ষা ও মিশনারীদের দাবি সম্পর্কে বলা হলো যে **ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে শিক্ষানীতি।** সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেসরকাবী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হলেও সে শিক্ষায় যোগদান ছাত্রদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে না। এই বাবদে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হবে না। সরকারী অথবা সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন মিটবে **নীতিবোধ সংক্রান্ত পাঠ্য পুস্তক এবং মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে পাঠদানের মাধ্যমে।** পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতিতে মিশনারীদের একচেটিয়া দাবি অগ্রাহ্য করে 'স্কুল পুস্তক সমিতি'র (School Book Society) **উপরই এ ব্যবস্থার দায়িত্ব** দেওয়া **হলো।** সুতরাং এই তিনটি বিষয়েই মিশনারীদের **পরাজয় ঘটলো।** সর্বোপরি কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করলেন যে বেসরকারী **উদ্যম** বলতে বোঝায় বেসরকারী ভারতীয় উদ্যম **এবং ভারতীয় উদ্যমই বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করবে।**

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার দাবি দ্ব্যর্থহীনভাবে **স্বীকার করলেন।** নিম্ন

মাধ্যমিক স্তরে (Middle School Stage) **স্কুল কর্তৃপক্ষকে** ইংরেজী **অথবা** মাতৃভাষার মধ্যে বাছাই করার অধিকার দেওয়া হলো। মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে কোন পরিচ্ছন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হলো না। অর্থাৎ প্রচলিত ইংরেজী মাধ্যমকেই পরোক্ষে স্বীকার করা হোল। **কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর প্রাধান্য থেকে যাওয়ায় নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভবই হলো।** পরিণামে তাই ইংরেজীব প্রাধান্যই রয়ে গেল। মাতৃভাষায় হাইস্কুলের পরিকল্পনা কার্যতঃ পরিত্যক্ত হলো।

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন। আরও বেশী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির পূর্বশর্ত করবার কথা বলা হয়। মুসলীমদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, নারী শিক্ষার জন্য উদার সাহায্য, শিক্ষিকা নিয়োগ, মহিলা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক পরিদর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কমিশনের সুপারিশগুলির উল্লেখযোগ্য দিক।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হলো বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ। 'এ' কোর্স এবং 'বি' কোর্স নামে অভিহিত করে মাধ্যমিক স্তরে সমতুল্য দুইটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অব্যবহারিক মনন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমই হবে 'এ' কোর্সের বৈশিষ্ট্য, আর 'বি' কোর্সের বৈশিষ্ট্য হবে কর্মভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম। বিজ্ঞান, অঙ্কণ প্রভৃতিকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের কথা বলা হয়। তা ছাড়া বাণিজ্যিক বিষয় সমূহও 'বি' কোর্সের মধ্যে স্থান পাবে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপি পুঁথিগত এবং একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার ঐতিহ্যের বদলে **বহুমুখীনতার চেতনা এইখানেই যাত্রা শুরু করলো। তদানীন্তন পরিবেশে এই চেতনার ফলশ্রুতি হলো সামান্য, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্দেশ রচিত হলো।**

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলার এক্তিয়ার না থাকলেও মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সুপারিশের জের টেনে **উচ্চ শিক্ষার স্তরেও বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কথা বলা হয়।**

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে **সর্বাপেক্ষা সুদূর প্রসারী হয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য।** কমিশন বলেন এ দেশের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় প্রথায় পরিচালিত স্কুলকেই দেশজ স্কুল বলে ধরা হবে। এই ধরনের বিদ্যালয়ের রয়েছে জীবনীশক্তি এবং জনপ্রিয়তা। সুতরাং এগুলি সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণ এবং সরকারী উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে

এইসব স্কুল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। চাকুরির ক্ষেত্রে সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করে কমিশন বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও বেশী সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। বিশেষ করে পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও জনসমষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তা ছাড়া ভারতীয় পরিদর্শক নিয়োগ এবং প্রশাসনের নিয়মবিধিরও সংস্কার প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন বিস্তারিত সুপারিশ করেন। এ শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির সহায়ক পাঠ্যবস্তু পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে গণিত, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাণ ও ক্ষেত্র বিজ্ঞান (Mensuration), প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা প্রভৃতি। কৃষি ও বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষাদানও বাঞ্ছনীয়। পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রয়োজন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবে। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমেও নমণীয়তা থাকা দরকার। স্কুলগুলি হবে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আরও ভাল শিক্ষক ও তাঁদের শিক্ষণ প্রয়োজন। সুতরাং আরও বেশী নরম্যাল স্কুল দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন সম্বন্ধেও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লোকাল বোর্ড প্রমুখ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়। সেস্ থেকে আদায় করা স্থানীয় অর্থ কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ বহন করা হবে সরকারী সাহায্য থেকে। সরকারী সাহায্যও যেন কেবল শহরমুখী না হয় এই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রাম ও শহরের জন্য পৃথক বরাদ্দের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবেন প্রাদেশিক সরকার।

সুতরাং সুপারিশের মূল কথা হলো সরকারী সাহায্যপুষ্ট স্থানীয় দায়িত্ব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হাণ্টার কমিশন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে পারলেন না। তা ছাড়া সরকারী সাহায্যও হবে 'পরীক্ষার ফলাফল' সাপেক্ষ। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নমণীয়তা, বৈচিত্র্য, প্রসার এবং জীবন-সংযোগের কথা বললেও কমিশনের শেষোক্ত সুপারিশ হলো ঐ সব কিছুর নেতিমূলক।

মূল্যায়ন

হাণ্টার কমিশনের মূল্যায়ন করতে হলে এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় দিকই দেখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারী প্রাধান্য এবং প্রাথমিক স্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সরকারী দায়িত্ব সংকোচনের প্রচেষ্টাই প্রথমে লক্ষণীয়। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা এবং আয়ের উৎস হলো সীমাবদ্ধ। এরই জন্যে আশানুরূপ ফল হলো না। তা ছাড়া দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি দরদ মূলতঃ কাগজে কলমেই রইল। ভাষার প্রশ্নেও কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার করতে পারলেন না। মিশনারীদের অধিকার অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হলো। সর্বোপরি ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দানের নীতি শিক্ষা প্রসারকেই ব্যাহত করলো।

অপরদিকে ইতিবাচক দিকের পক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিবিধ পাঠ্যক্রমের এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার সুপারিশ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। নারী শিক্ষা, মুসলীম শিক্ষা, পশ্চাদপদের শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতির সুপারিশও সমগুরুত্ব সম্পন্ন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পুনরুল্লেখের ফলে এই সম্পর্কে আর বিতর্কের অবকাশ রইল না। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন, নমণীয় প্রশাসন, স্থানীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ফলে গণশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। সর্বোপরি বেসরকারী ভারতীয় উদ্যোগের প্রাধান্য স্বীকৃতির ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়।

সুপারিশের ফলশ্রুতি

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যমের যে প্রসার ঘটে তা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতা। ১৯০১-০২ সনে তাই মিশনারী কলেজের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৭টি, ভারতীয় বেসরকারী কলেজ ছিল ৪২টি। উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বাড়লো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভীড় হলো। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ না থাকায় প্রধানত মানবিক বিদ্যারই পরিমাণগত স্ফীতি হলো। অবশ্য চিকিৎসা, আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও কিছু বিস্তার ঘটলো।

তেমনি বিস্তার হলো নারীশিক্ষায়। ১৮৮২ সনে যেখানে মহিলা কলেজ ছিল ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬০০টি এবং শিক্ষণ বিদ্যালয় ১৫টি,

সেখানে ১৯০২ সনে সংখ্যাগুলি দাঁড়ালো যথাক্রমে ১২, ৪২২, ৫৩০৫ এবং ৪৫। আলীগড় আন্দোলনের সহায়তায় **মুসলীম শিক্ষাও আধুনিক ধারায় অগ্রসর হতে লাগলো।**

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ১৮৮২ সন থেকে ১৯০১ সনের মধ্যে মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বোম্বাই, বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 'বি' কোর্স প্রচলিত হয়। কিন্তু এ পাঠ্যক্রম তেমন সাফল্যমণ্ডিত হলো না। ১৯০১-০২ সনে 'এ' কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩০০০, আর 'বি' কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০০। এই **অসাফল্যের জন্যে আমরাও কিঞ্চিৎ দায়ী।** মানবিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ আমাদের চিন্তা জগতকে এমনভাবে গ্রাস করে ছিল যে **ব্যবহারিক শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে আমরা তখনও ভাবতে পারিনি।** চাকুরির শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবী পেশার শিক্ষাকেই মাত্র আমরা শিক্ষা বলে মনে করেছি। বেকার সমস্যার তীব্র দংশন তখনও সুরু হয়নি। তদুপরি দেশের শিল্প বাণিজ্যের ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ, সুতরাং ব্যবহারিক শিক্ষার আগ্রহ ছিল সঙ্কুচিত।

ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার না ঘটলেও হাণ্টার কমিশনের পরে **সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে যথেষ্ট।** ১৮৮১-৮২ সনে যেখানে স্কুল ছিল ৩৯১৬টি, সেখানে ১৯০১-২ সনে হলো ৫১২৪টি। এবং এর মধ্যে ভারতীয় বে-সরকারী উদ্যোগই প্রাধান্য পেলো।

বস্তুত ১৮৮২ সনের উত্তরকালে মিশনারীরা পরাজয় মেনে নিলেন। তাঁরা এখন অনগ্রসর এবং উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলে নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে গেলেন। উচ্চমানের যে স্কুল ও কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিকে তাঁরা লালন করে চললেন মাত্র। সুতরাং মিশনারী **'সমস্যার সমাপ্তি ঘটলো।**

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটলো। লর্ড রিপনের আইনে নবগঠিত **স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার দায়িত্ব পেল।** উচ্চশিক্ষাকে অবশ্য তাদের আওতার বাইরে রাখা হলো। তাদের শিক্ষাবাবদ আয়ের উৎস সুনির্দিষ্ট করা হলো। সরকারী সাহায্য বিধিও পরিবর্তিত হলো। কিন্তু দেশজ সমস্ত বিদ্যালয়কেই প্রশাসনের অধীনে আনবার যে কথা বলা হয়েছিল, তা আর কার্যকরী হলো না। তার বদলে নূতন ধরনের স্কুল গড়ার দিকে ঝোঁক পড়লো বেশী। **দেশীয় পাঠশালাগুলি ক্রমে শুকিয়ে যেতে লাগলো।** স্থানীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত স্কুলগুলিতে বাড়ীঘরের উন্নতি হলো, অপেক্ষাকৃত উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হলো, মেয়েরাও স্কুলে এলো, কিছু সংখ্যক হরিজন শিশুকেও স্কুলে দেখা গেল এবং অপেক্ষাকৃত ভাল

শিক্ষক নিয়োজিত হলেন। **কিন্তু 'ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য নীতির' ফলে ছাত্রদের** প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেবার অবকাশ রইলো না! তার বদলে নির্দিষ্ট মান রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা, কড়া প্রমোশন এবং অপচয় বাড়লো। **সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষায় সংখ্যাগত প্রসার কিছু হলেও আশানুরূপ হলো না।**

তা ছাড়া লর্ড রিপনই ঘোষণা করেছিলেন যে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকে **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বুঝায় না।** বস্তুতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ছিল অতি **সীমাবদ্ধ।** এদের পরিচালক বর্গের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শও ছিল সীমাবদ্ধ। জাতীয় চেতনার অগ্রগতির মুখে বিদেশী শাসকের 'কনশেসন' রূপে দেওয়া এইসব প্রতিষ্ঠান সহজেই জনপ্রিয়ও হলো না। বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিমাণও হলো বিভিন্ন। **অনেক প্রাদেশিক সরকারই কমিশনের আর্থিক সুপারিশগুলি অমান্য করেন।** সুতরাং শিক্ষাব জন্য বাড়তি বরাদ্দ অন্যান্য প্রয়োজনে কিম্বা অন্যান্য স্তরের শিক্ষায় ব্যয়িত হলো। **প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ দরিদ্রই রয়ে গেল।**

তবুও মোটের উপর বলা চলে যে ১৮৮২ সনের কমিশন **সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা নীতির অবতারণা না করলেও অনেকগুলি জটিলতা ভেঙ্গে ১৮৫৪ সনের দলিলের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছে। তদুপরি কয়েকটি দিকে নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।** সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এই কমিশন বিশেষ আলোকপাত করেছে। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে **আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।**

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. How was the policy-decision of 1835 implemented in the different Presidencies ?

(এই অধ্যায়ের প্রথম তিন পৃষ্ঠার সারাংশ করতে হবে।)

2. Discuss the factors which created the background for the Despatch of 1854.

Or

Why was the Despatch of 1854 called for ?

(পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জয়, সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী, চাকুরিতে শিক্ষিত ভারতীয় নিয়োগ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার। মিশনারী উদ্যোগেরই প্রাধান্য, ডাফ'এর যুগ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্যোগে নূতন ধরনের ভারতীয় আন্দোলন। সরকারী সাহায্যের উপযুক্ত বণ্টনের সমস্যা। প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—চুঁইয়ে নামা নীতির অসারতা, ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষের প্রকাশ।

পুরানো সমস্যার জের—প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ, মিশনারীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। নূতন সমস্যা—পেশা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন, মুসলীম ও নারী শিক্ষা—ভারতীয় উদ্যোগের প্রতি মনোভাব, শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তন প্রভৃতি প্রয়োজনেই ১৮৫৪ সনের দলিল।)

3. Discuss the major recommendations of the Despatch of 1854 as supplemented by the Despatch of 1859.

Or

Make a critique of the Despatch of 1854. How far is it true to say that it established a State System of Education ?

(কোন সংকেতের বদলে ১৪১-১৪৪ পৃষ্ঠার সারাংশ তৈরী করাই শ্রেয়।)

4. Discuss the historical significance of the Despatch of 1854, with special reference to its effect upon later developments.

('মূল্যায়ন' এবং 'ভবিষ্যতের উপর প্রভাব' অংশ দুটি যোগ করে সারাংশ তৈরী করা দরকার।)

5. Write a short note on the role of Iswar Chandra Vidyasagar as an educationist.

(কোন সংকেত গ্রহণের বদলে ১৩৬ ১৩৭ পৃষ্ঠার সারাংশ তৈরী করে নেওয়াই শ্রেয়।)

6. How was the English system of education introduced ? How were the obstacles to the expansion of Western education removed ?

(১৮১৩ সনে সরকারী সাহায্যের নীতি, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে পরিষ্কার বক্তব্য নয়, ১৮৩৫ সনে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত। তার পরে একে একে প্রতিরোধ অপসারণ—(ক) প্রাচ্য শিক্ষাতেও সাহায্য দান করে রক্ষণশীলদের বাধা অপসারণ, (খ) ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করা, (গ) চাকুরিতে ইংরেজী শিক্ষার অগ্রাধিকার—প্রভৃতির সাহায্যে আগ্রহ বৃদ্ধি। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় সাহায্য মুসলীম ও স্ত্রী শিক্ষায় সাহায্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণার পথে বাধা দূর করা হয়।

সরকারী সাহায্য নীতি ও শিক্ষা 'ব্যবস্থা' প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হলো।

7. How was the Despatch of 1854 implemented and to what effect ?

('উড ডেসপ্যাচ-এর প্রয়োগ' শীর্ষক আলোচনাটি উল্লেখ করতে হবে।)

8 Discuss the circumstances that led to the institution of the Hunter Commission. What were the major questions the Commission had to deal with ?

(বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার, বেসরকারী ভারতীয় উদ্যমের শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারী শিক্ষা বিভাগের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার, একচেটিয়া অধিকার না পাওয়ায় ধর্মশিক্ষা এবং পাঠ্য বই ইত্যাদির প্রশ্নে ভারতে ও বিলেতে পাদরীদের আন্দোলন, প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ যোগানোর সমস্যা, এবং ভারতে জাতীয় চেতনার দ্রুত উন্মেষই কমিশন গঠনের প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

কমিশনের বিচার্য হলো সরকারী, মিশনারী ও বেসরকারী ভারতীয় ভূমিকা নির্ণয়, ধর্ম শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক, ভাষা ও পাঠ্যক্রম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থ ও প্রশাসন—অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি।

9. Make an analysis of the recommendations of the Commission of 1882 in respect of (a) Missionary educational enterprise, (b) Secondary education and (c) Primary education. Discuss their importance and effects upon subsequent developments.

(প্রস্তাবিত সংকেতের বদলে "হান্টার কমিশনের রিপোর্ট" এবং "মূল্যায়ন" শীর্ষক অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং বিশেষ বিশেষ অংশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে।)

10. "The foundation of modern elementary education in India was actually laid in 1882". Discuss.

(এ্যাডামের আবেদন কার্যকর হয়নি, সুতরাং দেশীয় পাঠশালাগুলি মরে যেতে থাকে। ১৮৫৪ সনে প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি দেশীয় স্কুলকেও সাহায্য দেওয়ার নীতির কথা বলা হয়। কিন্তু কাজে তেমন কিছুই হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই নূতন ধরনের প্রাথমিক স্কুলের সৃষ্টি হয়।

১৮৮২ সনে স্থানীয় কর্তৃত্বে, সাহায্য পুষ্ট এবং উন্নত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে 'প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থার' প্রবর্তন। এই ব্যবস্থাই মূলতঃ এখনও চলছে।)

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা চেতনার নূতন দিগন্ত—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের **শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা যুগপৎ কাজ করেছিল।** একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটছিল। কিন্তু একই সঙ্গে ঐ শিক্ষার অসারতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠছিল। **জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিই এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ।**

মিশনারীরা এই সময়ে ইন্দোর কলেজ, শিয়ালকোটের মুরে কলেজ, কাণপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ, রাওয়ালপিণ্ডির গর্ডন কলেজ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও সাধারণভাবে তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তাঁদের বদলে **আর এক ধরনের আদর্শবাদীরা কর্মক্ষেত্রে এসেছেন।** তিলকের নেতৃত্বে পুণার ফার্গুশন কলেজ ১৮৮০ সনে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপন কলেজ ১৮৮২, লাহোরে আর্য সমাজের দয়ানন্দ এ্যাংলো-বৈদিক কলেজ ১৮৮৬ সনে, এ্যানি বেসান্তের কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ১৮৯৮ সনে স্থাপিত হয় এবং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজও পূর্ণতা লাভ করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের **প্রতিষ্ঠাতারা এক বিশেষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে নামেন।**

এইসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বহু স্কুল ও কলেজ এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সনে গৃহীত **"বেসরকারী ভারতীয় উদ্যোগের অগ্রাধিকার"** এবং **"উদার সাহায্য" নীতি এই গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।** বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কলেজ ও স্কুলকে স্বীকৃতি দানের যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পাঠ্যক্রমে নূতনত্ব আসে না। পরীক্ষা-প্রধান একমুখী শিক্ষা প্রসারের ফলে **শিক্ষামানের অবনতি ঘটে।** উপরন্তু চাকুরির বাজারে **শিক্ষিত বেকারের সমস্যা** দেখা দিতে থাকে। ১৮৮৯ সনে লর্ড ল্যান্স-ডাউনই বলেন যে প্রচলিত হারে স্কুল কলেজে যুবকরা শিক্ষা পেতে থাকলে উচ্চ-শিক্ষিতের সংখ্যা প্রতি বছর চাকুরির সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। অর্থাৎ ঐ হারে শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেকারত্ব আসবে।

কার্জন-যুগ

সরকার যখন শিক্ষার দ্রুত প্রসার তথা চাকুরি সংস্থানের অক্ষমতায় ভীত, অথচ দেশবাসী যখন শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যগ্র, সেই পরিবেশেই বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড কার্জন। তিনি প্রশাসনের সকল দিকেই সংস্কারের হস্তক্ষেপ করেন। **শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি অচিরেই হাত দিলেন।**

লর্ড কার্জন প্রথমেই ১৯০১ সনে সিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন বসালেন। সম্মেলনের সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয় যে শিক্ষার তৎকালীন প্রসার হয়েছে অসম এবং মাথাভারী। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বাড়লেও ভারতের শতকরা ৮০টি গ্রামে কোন স্কুল নেই, তিন-চতুর্থাংশ বালকের শিক্ষার সুযোগ নেই এবং শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র মেয়ে স্কুলে পড়বার মত সৌভাগ্যবতী। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাষাগুলি অবহেলিত। কিন্তু ইংরেজীর মানও নিম্নগামী। শিক্ষার লক্ষ্য হলো চাকুরি এবং তার ফলে পরীক্ষার অতি-প্রাধান্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিরাটাকার পাঁচমিশেলী সিনেট এবং এ্যাডহক সিণ্ডিকেটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও জরাজীর্ণ। অতি সহজেই অনুমোদিত কলেজগুলি শুধু কোচিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চতম স্তরে শিক্ষা দেওয়া এবং গবেষণার উদ্যম নেই। এই গড্ডলিকার মধ্যে ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা নেই। রাজনৈতিক উগ্রতার আবহাওয়া বিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করেছে।

এই সমীক্ষার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য লর্ড কার্জন ১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। রিপোর্টে কমিশন আর নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলেন। পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রক্রিয়ার পুনর্নির্দেশের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে নির্দিষ্ট করা এবং দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট গঠনের সুপারিশ করা হয়। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন 'বোর্ড অফ স্টাডিজ' গঠনের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানোরও সুপারিশ করা হয়।

কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করে। শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রধান সুপারিশই হয় অনুমোদনের কড়াকড়ি। অনুমোদনের জন্য কলেজগুলিকে উপযুক্ত বাড়ী, সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, সুগঠিত লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী ও হোষ্টেল রাখতে হবে। ছাত্রদের জীবন ও কাজের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখতে হবে। কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। ইংরেজী শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমে উন্নতি এবং পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধেও কমিশন মন্তব্য করেন। মেধাবী ছাত্র ছাড়া কারও পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার খর্ব করার জন্য কঠিনতর প্রবেশিকা পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়।

মোটের উপর কমিশনের বক্তব্য হলো যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ (Second

grade college) **আদৌ থাকবে না।** অনুমোদিত কলেজ মারফত ছাড়া (প্রাইভেট) পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। এর ফলে নিকৃষ্ট মানের অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মেধাবী শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন কমাতে হবে। কিন্তু অনুমোদিত কলেজগুলি **যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পাবে।** শিক্ষার এই মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়েই নিযোজিত হবেন লেকচারার ও অধ্যাপক। Extension Lecture ও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।

১৯০৪ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন :— কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার স্থির করে দেওয়া হয় এবং আইনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংগঠিত হয়। **১৯০৪ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন** এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হয়। আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট, নূতন সিনেট এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থা গঠিত হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কলেজের অনুমোদন সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। **প্রতিদানে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।**

সাধারণ উচ্চ শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বহু বিষয়েও কার্জন হস্তক্ষেপ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠেরও উন্নতি করা হয়। পশুপালন, বন সংরক্ষণ এবং কৃষি শিক্ষার সূচনা হয়। পুসা কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া চারু-কলা মহাবিদ্যালয়, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি, প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ সংরক্ষণ প্রভৃতিও কার্জনের উদ্যমের চিহ্ন। নারী শিক্ষার জন্যও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

বস্তুতঃ **শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে শিক্ষায় সরকারী মনোযোগ এবং উদার অর্থ সাহায্যের নীতি তিনি গ্রহণ করেন।** বেসরকারী কলেজগুলির জন্য সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯০৪ সন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়, ১৯১২ সনে এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। কারিগরি শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। **কেন্দ্রীয় প্রশাসনে শিক্ষা অধিকর্তা** (Director General) নিয়োগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কার্জনের এই উদ্যমের ফলেই ১৯১০ সনে বড়লাটের কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগের জন্য সদস্য পদ সৃষ্টি করা

হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে আধুনিক উচ্চশিক্ষণ ও গবেষণার সূচনা হয় এই আমলে। তবুও গুণগত উন্নতির বিনিময়ে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি জাতীয়তাবাদী ভারত মেনে নিতে পারে নি।

উচ্চ শিক্ষায় হস্তক্ষেপের অবধারিত ফল হিসেবে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষায়ও হস্তক্ষেপ করেন। এ ক্ষেত্রেও নীতি হলো ভালো মন্দের মিশ্রণ। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ১৮৮২ সনের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সময় বহু নিম্নমানের বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের সাথে কার্জন এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। একদিকে তিনি বললেন মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা পড়াব কথা, ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি এবং Direct Method গ্রহণের কথা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষক-শিক্ষণের কথা, পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনতা এবং স্কুল ফাইনাল অথবা School Leaving Certificate পরীক্ষার জন্য আরও ব্যাপকভাবে 'বি কোর্স' প্রবর্তনের কথা। অপরদিকে "নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নতির" নীতিতে তিনি নিম্নমানের বিদ্যালয়গুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেন। তাই সাহায্যহীন বিদ্যালয়কে অনুমোদন দানের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্কুল অনুমোদনের ব্যাপারে কড়াকড়ি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় কঠোরতা অবলম্বন করতে বলা হলো। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্ষমতা বাড়লো। এতেও সন্তুষ্ট না থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াও সাহায্যলাভের জন্য স্কুলকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি গ্রহণের নীতি প্রবর্তিত হলো। সরকারী স্বীকৃতির নিয়মে কড়াকড়ি করে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হলো। নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে অনুমোদিত বিদ্যালয়কে পুরস্কৃতও করা হলো। তাদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়লো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অধিকার পেল কেবল অনুমোদিত স্কুলগুলি। এইসব স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই সরকারী বৃত্তি সীমাবদ্ধ করা হলো। মাধ্যমিক শিক্ষায় কার্জন এই নীতি ঘোষণা করলেন ১৯০৪ সনে একটি সরকারী প্রস্তাব আকারে।

প্রাথমিক স্তরে কিন্তু কার্জনের সংকোচন নীতির ব্যতিক্রম ঘটলো। ১৮৮২ সনের পরেও প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি, এই উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সক্রিয় প্রসার ঘটানো রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। প্রাদেশিক রাজস্ব এবং জেলা-বোর্ডের তহবিলেও প্রাথমিক শিক্ষার দাবি সর্বাধিক। লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-বরাদ্দও শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা উচিত।

ঐ ঘোষণার সঙ্গে তিনি উন্নততর পাঠ্যক্রম, শারীর শিক্ষা, প্রকৃতি-পাঠ, পাঠ্যক্রমের সাথে গ্রামীণ প্রয়োজনের সংযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ইংরেজী পড়ার সূচনা, প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য কৃষি-শিক্ষাসহ দুই বৎসরের উন্নত শিক্ষণ, উন্নত বেতন প্রভৃতির কথাও বলেন।

কার্যক্ষেত্রে এই নীতির ফলে প্রাথমিক স্তরে সরকারী সাহায্য বাড়লো, স্কুল গৃহ, সরঞ্জাম ও আসবাবের জন্য বিশেষ বরাদ্দ হলো এবং স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা ব্যয়ের একতৃতীয়াংশের বদলে অর্ধেকাংশই সরকারী সাহায্যরূপে দেওয়া হলো। "ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যের নীতি"ও পরিত্যক্ত হলো। ফল হলো প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার। ১৯০১-২ সনে যেখানে অনুমোদিত স্কুল ছিল ৯৩৬০৪টি, সেখানে ১৯১১-১২ সনে হলো ১১৮২৬২টি। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কার্জন যুগপৎ পরিমাণগত এবং গুণগত উন্নতির নীতিই গ্রহণ করেছিলেন।

কার্জন নীতির মূল্যায়ন :—কার্জন নীতির মূল্যায়নের সময় বলতেই হবে যে শিক্ষার মূল আদর্শ কিংবা কাঠামোর কোন মৌলিক সংস্কার তিনি করেন নি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষতার নীতিতেই তিনি সরকারী উদ্যম ও সাহায্যকে নিয়োজিত করেন।

তবে উন্নত পাঠ্যক্রম, মাতৃভাষার গুরুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিশেষীকরণের দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংস্কার, শিক্ষা মানের উন্নতি, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বও এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে উচ্চতম পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ভিত্তি গঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অধিকতর দায়িত্ব, উন্নত পাঠ্যক্রম শিক্ষণ ও শিক্ষক নিয়োগের দিকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত শিক্ষার সকল দিক ও স্তরেই সরকারী মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়।

আবেগমুক্ত বিশ্লেষণ নিয়ে বিচার করলে কার্জন আমলে শিক্ষা সংস্কারের বহু দিক প্রশংসার দাবি করতে পারে। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্যকরণ, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তিনি এমন বহু কথা বলেছিলেন যা সেই সময় থেকে কার্যকরী হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা সমস্যা এত তীব্র হয়ে উঠতো না। বস্তুতঃ বর্তমানে আমরা এমন অনেক কথা বলি যা সেই যুগেই প্রত্যক্ষ

কিম্বা পরোক্ষভাবে কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণে বর্তমানের মানদণ্ডে অতীতের বিচার অসম্ভব। যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই যুগের বিচার। সেই বিচারে তদানীন্তন ভারতীয় যুগ মানসের সঙ্গে কার্জনের শিক্ষানীতির হলো সংঘর্ষ।

যে পদ্ধতিতে কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তাকে সুস্থ মনে মেনে নেওয়া ছিল জাতীয়তাবাদী ভারতের পক্ষে অসম্ভব। কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ। তিনি সরকারী অর্থ সাহায্যের সাথে সরকারী-নিয়ন্ত্রণকে সংযুক্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেও তিনি মূলত সরকারী প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত উত্তরকালে স্যাডলার কমিশনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাধিক সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় রূপে অভিহিত করেন। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব' স্বীকার করা হলো না, অথচ মানোন্নতির নামে বিদ্যালয় "নিয়ন্ত্রণের" যে নীতি গ্রহণ করা হলো, তা বেসরকারী উদ্যোগের বাধা সৃষ্টি করলো। পরোক্ষে এ নীতি হলো : উচ্চশিক্ষা সংকোচনের নীতি। এ অবস্থাটি জাতির পক্ষে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব।

কার্জনের যুক্তি ছিল যে ১৮৮২ সনে গৃহীত 'শিক্ষা প্রসারের জন্য উদারনীতির' প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল। যথেচ্ছ বেসরকারী উদ্যমের ফলে মানাবনতি ঘটেছে। স্কুলের আবহাওয়ায় রাজনীতি ঢুকেছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে আসা অনুচিত এবং প্রশাসনের ভারতীয়করণের গতিও মন্থর করা প্রয়োজন। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানোন্নয়ন বাঞ্ছনীয়।

অপরদিকে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে তখন নতুন চেতনা। গণশিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। ভারতীয় ভাষা এবং প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি নতুন করে আকর্ষণ বেড়েছে। শিক্ষায় ভাষা মাধ্যমের প্রশ্নটিও নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে। ইতিহাস ও ভূগোলের সাহায্যে দেশ প্রেমের প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসন দেশীয়করণের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি রূপ পাচ্ছে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রতি চেতনা নিবদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষা প্রসারকেই আশু প্রয়োজন বলে যখন বিবেচনা করা হয়েছে, তখন শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

বস্তুতঃ দক্ষ প্রশাসক হলেও **কার্জন ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী।** এ দেশের ভাবমানসের প্রতি সহানুভূতিহীনতা নিয়ে তিনি শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা করেছেন। ১৯০১ সনের সিমলা সম্মেলনে দেশী শিক্ষাবিদদের স্বীকৃতি দেননি। সমাবর্তন ভাষণে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। **সময়ের স্রোতকে অগ্রাহ্য করে প্রশাসনের রথচক্রের সাহায্যে তিনি শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির ভাবমানস তখন নরম পন্থার বদলে চরমপন্থার দিকে গতি নিয়েছে।** এই পরিবেশে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। **সংঘর্ষের ফলশ্রুতিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।**

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

যদিও কার্জনের শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে বিস্ফোরণের রূপ দিয়েছে, তবুও **একথা ঠিক নয় যে এই আন্দোলন কেবল কার্জন নীতিরই প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ।** প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তাবাদী দেশীয় শিক্ষাবিদ মহলে অসন্তোষ ঘন হয়ে উঠেছিল। কার্জনের নীতি তাকে ত্বরান্বিত করে এবং বিস্ফোরণের জন্য স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ করে।

আন্দোলনের পটভূমি :—১৮৬৭ সনে হিন্দুমেলা তথা জাতীয় মেলার সময় থেকেই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে চেতনার সৃষ্টি হতে থাকে। ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ' প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে জীবন ও সংস্কৃতি সংস্কারের কথা প্রচার করে। ১৮৭৮ সনে প্রতিষ্ঠিত Theosophical Society ভারতীয় জীবনাদর্শের কথা প্রচার করে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সারস্বত সমাজ (১৮৮২), কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, দয়ানন্দ সরস্বতীর ইঙ্গ-বৈদিক কলেজ হরিদ্বারে শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুল প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শকে নতুন আবেগ নিয়ে জনসমাজে উপস্থিত করে। **প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন ক্রমেই অনুভূত হয়।** ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠার বছরেই জাতীয় কংগ্রেস শিক্ষা সংস্কারের দাবি উত্থাপন করে। ১৮৯৭ সনে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে নেতৃত্ব করে।

একথা ক্রমেই বোঝা যায় যে **জাতীয় ঐতিহ্য ও জীবনের সাথে সংযোগহীন বিদেশাগত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় মূল্যবোধের বিরোধী।** এই শিক্ষার ফলশ্রুতি হয়েছে বিজাতীয়তা, অধ্যাত্মহীনতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু। **প্রচলিত শিক্ষা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে দমন করেছে, ভারতকে অনুন্নত রেখেছে।**

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকরাও প্রাচীন মূল্যবোধের জয়গান গাইলেন কেন? এর কারণ হলো পরাধীন জাতির জীবনে স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন নিপীড়িত বর্তমান থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রাচীন গৌরবের মধ্যে সান্ত্বনা অনুসন্ধান করে, প্রাচীন আদর্শ পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে।

এই পুনরুজ্জীবনবাদই (Revivalism) অবশ্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একমাত্র প্রেরণা নয়। প্রচলিত শিক্ষার অসারতা তাঁরা অনুভব করেছেন, এবং সংস্কারের পথে অগ্রসব হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চেতনা মূলত এই পথেই অগ্রসর হয়। ১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি নতুন জীবনাদর্শ তথা শিক্ষাদর্শ দেবাব চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে অগ্রসর হন। ভাগবত চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। তা ছাড়া ভারতীয় পরিচালনায় কয়েকটি বিদ্যালয়ে কিছু নতুনত্ব সংযোজিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা, জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে পাঠ্য, প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই হলো এইসব বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং জাতীয় ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ার মধ্য দিয়ে আত্মসম্ভ্রম ও দেশাত্মবোধক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত একটি পৃথক ও প্রতিদ্বন্দ্বী 'শিক্ষা ব্যবস্থা' গড়বার প্রবণতা ছিল না। এ ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে এক বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলন।

সে যুগের রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে প্রতিবাদ আন্দোলনে পরিণত করে। বুয়র যুদ্ধ, রুশ জাপান যুদ্ধ, পারস্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, তুর্কি দেশে বিপ্লবী আন্দোলন (ইয়ং টার্ক), ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা ভারতের ভাবমানসে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। নরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বিপিন—লাজপৎ-তিলক—অরবিন্দের নেতৃত্বে চরম পন্থার দিকে ঝোঁকে। তাছাড়া ভারতের শিল্পায়ন আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় বাণিজ্য সুরু হয়েছে। সুতরাং বাণিজ্যিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বিদেশীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের এই ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণে ছিল অক্ষম। তাই বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রয়োজন হলো।

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :—সমস্ত দিক থেকে চেতনার পটভূমি যখন এইভাবে প্রস্তুত, তখন এলেন লর্ড কার্জন। তিনি নিজের আমলাতান্ত্রিক কায়দায় এবং পদ্ধতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা

এই বিক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ করলো। নূতন চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাই 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' রূপে বিস্ফোরিত হলো।

কার্জনের দমননীতিই সৃষ্টি করলো আন্দোলনের আশু কারণ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে নেতারা ঘোষণা করলেন 'স্বদেশী' আন্দোলন। "ত্রিবিধ বর্জনের" (Triple Boycott) আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু ছাত্র স্কুল কলেজ বয়কট করলেন। সরকার প্রয়োগ করলেন দমননীতি। "কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার" (Carlyle Circular) বেরুলো। সুতরাং **একদিকে কার্লাইল সার্কুলার এবং অপরদিকে আশুতোষ চৌধুরীর বয়কট সার্কুলারের শক্তি পরীক্ষা হলো।** জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে National Council of Education গঠিত হলো এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য Ways and Means Committee হলো।

আন্দোলন কেবল নেতিবাচক স্তরেই থাকেনি। নিপীড়িত ছাত্রদের জন্য ইতিবাচক কিছু করারও প্রয়োজন হয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে Society for the Promotion of National Education in Bengal' গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ হলেন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করে যে **জাতির ভাগ্যলিপি রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পন্থায় ও জাতীয় কর্তৃত্বে জাতীয় শিক্ষা সংগঠনের সময় এসেছে।**

বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার হিসাবে চমকপ্রদ না হলেও একটি নূতন আদর্শ ও কর্মপন্থার সূচনা হিসাবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, পূর্ববঙ্গে ৪০টি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া সাধারণ কলেজ এবং পেশাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল **যাদবপুর কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।**

আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল না। তবুও সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, সম্পূর্ণ ভারতীয় কর্তৃত্ব, মাতৃভাষার প্রতি সম্ভ্রম, ইংরেজীর প্রতি অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্ব, বৃত্তিগত শিক্ষা এবং শিক্ষায় স্বাদেশিকতার আবহাওয়াই ছিল এই যুগের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে অন্ধ অনুকরণকে নিন্দা করা হলেও জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতেও

সরকারী স্কুলে প্রচলিত পাঠক্রমকেই সামান্য হেরফের করে গ্রহণ করা হয়। কোন আমূল পরিবর্তন হয় না।

এই আন্দোলনের সামনে সমস্যার অন্ত ছিল না। সম্পূর্ণ নূতন পাঠ্যক্রম উদ্ভাবন, সুদক্ষ শিক্ষক সরবরাহ, জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করা, প্রয়োজনীয় গৃহ ও সরঞ্জাম যোগান এবং নিয়মিত অর্থসংস্থান প্রভৃতি ছিল এমনি কয়েকটি সমস্যা। বস্তুত এইসব সমস্যার জন্যই নতুন শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয় নি।

আন্দোলনের কয়েকটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও ছিল। আবেগ-প্রাধান্য তো ছিলই। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ফলে মুসলমানদের অংশ ছিল অল্পই। নেতৃত্বের মধ্যে ছিল আদর্শগত বিরোধ। এক অংশ প্রাচীন শিক্ষার ঐতিহ্য, আর এক অংশ আধুনিক মানবিক বিদ্যা এবং তৃতীয় অংশ বিজ্ঞান, কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই তিনের মধ্যে যথাযোগ্য সমন্বয় স্থাপিত হয় নি। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ফলেই তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ তাঁদের বিরাট দান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বদলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিলেন।

সরকারী নীতির নমনীয়তাও আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অবসান করতে সহায়তা করলো। আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার কালে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন প্রবল দুশ্চিন্তা, তখন সরকার অপেক্ষাকৃত উদারনীতি গ্রহণ করলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদও জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজন বোধে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের অধিকার দিলেন। আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হলো।

শিক্ষা চেতনার মুক্তি: আন্দোলনের প্রথম পর্যায় কোন বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধ্যান ধারণা পরিচ্ছন্ন হয়েছে এবং উত্তরকালে সুগঠিত নীতির রূপ নিয়েছে। এ্যানি বেসান্ত ঘোষণা করলেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আচার অভ্যাস, পরিচ্ছদ, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি সব কিছুতে বিজাতীয় প্রভাব সৃষ্টি করে শিশুদের অন্তর করেছে বন্ধ্যা এবং সমগ্র প্রকৃতিকে করেছে অধ্যাত্ম চেতনাহীন। বিদেশাগত শিক্ষা জাতিকে বিজাতীয়ত্ব দিয়েছে। সুতরাং এ শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন। গোপাল কৃষ্ণ গোখেল চাইলেন শিক্ষা বিভাগের ভারতীয় করণ। লালা লাজপৎ বললেন যে অতীতের অতি প্রশংসা এবং অতি নিন্দা—উভয়ই বর্জনীয়। ভারত অপরকে দান করেছে এব

অপরের কাছে গ্রহণ করেছে, এই চেতনাই সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। একদিকে মৌলিকত্ব এবং অপর দিকে আত্মসম্ভ্রমের সাথে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করার মত মানসিক উদারতার সমন্বয়ই বাঞ্ছনীয়। জাতীয় শিক্ষা যেমন একদিকে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্যে অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাবে, অপরদিকে তেমনি বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করবে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২০-২২)

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় আসে অসহযোগ আন্দোলনের সমকালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটের মুখে ইংরেজ সরকার একদিকে দান করেন বিকৃত মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার এবং অপরদিকে অনুষ্ঠান করেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। জাতীয়তার আবেগে দেশ তখন উদ্বেলিত। ইংরেজদের তুর্কিনীতি ও খিলাফৎ-এর প্রশ্নে মুসলীম সমাজও বিক্ষুব্ধ। হিন্দ স্বরাজ ও খিলাফতের সমন্বয়ে স্বরু হলো ঐক্যবদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন। বয়কট অস্ত্র আবারও প্রয়োগ করা হলো। বিদ্যালয় বর্জনের ডাক দেওয়া হলো। গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন। নির্ভয়ে এবং আত্মপ্রত্যয়ে ছাত্ররা বিদ্যালয় বর্জন করলো।

এবারে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকলেন মুসলীম ছাত্র-শিক্ষক। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিয়দংশই স্থাপন করেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। ছয় মাসের মধ্যে আন্দোলন সমগ্র ভাবতে ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে নেতৃত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। শান্তিনিকেতনও এই যুগে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে গড়ে ওঠে অনেক মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, আর্ট স্কুল এবং সাধারণ কলেজ। প্রতিষ্ঠিত হয় বহু সাধারণ বিদ্যালয়। বিহার-উড়িষ্যায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৪২, বাংলা দেশে ১৯০, বোম্বাইতে ১৮৯, উত্তর প্রদেশে ১৩৭। ১৯২১ সনের মধ্যে সমগ্র ভারতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ১৩৪৯ এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ৭৮৫৭১। এবারের আন্দোলনে গান্ধীজী শিক্ষার সঙ্গে গঠনমূলক কাজও সংযুক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে সর্বনিম্ন পরিমাণ সুতো না কাটলে কোন শিশুরই শিক্ষার অধিকার নেই।

নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অভাব সত্ত্বেও জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বিকল্প পাঠ্যক্রম

এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিল। **কিন্তু এবারও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি শিক্ষা আন্দোলনের ভাগ্য নির্ধারণ করলো।** গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতার আশা অন্তর্হিত হলো। এবং সেই সঙ্গে ১৯২২ সনেই **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো।**

দুই পর্যায়ের পারম্পর্য:—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। **প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন মূলতঃ বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।** সমগ্র ভারতের সহানুভূতি থাকলেও বাংলার বাইরে দু'একটি ছাড়া উল্লেখ-যোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। **কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন ছিল অপেক্ষকৃত গভীর এবং ব্যাপকতায় সর্বভারতীয়।** বিদ্যালয়ের সংখ্যাও হয়েছিল অনেক বেশী। **মুসলীমদের অংশ গ্রহণও** ছিল উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া **প্রথম** পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল প্রাদেশিক নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, **দ্বিতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ছিল সর্বভারতীয়, আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত।** সর্বোপরি আবেগের বদলে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত যুক্তি নিষ্ঠ। তাই এই আন্দোলন শিক্ষা চেতনার অগ্রগতিতে গঠনমূলক প্রভাব রেখে গেছে।

দুইটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত নবচেতনা প্রকাশ পেয়েছে লাজপৎ রায়ের অভিমতে। ১৯২০ সনে তিনি ঘোষণা করলেন যে **বেসরকারী উদ্যমে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় সরকারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।** জাতীয় সরকারের রাজস্বের উপর সর্ব প্রধান দাবি থাকবে সর্বজনীন শিক্ষার। বেসরকারী উদ্যম ও অর্থ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে আড়ালে থাকবার সুযোগ করে দেয় মাত্র। সুতরাং **রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করাই জাতীয় শিক্ষার গ্যারান্টি।**

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মূল স্রোত যদিও ১৯২২ সনেই শেষ হয়, তবুও **তৃতীয় আর একটি পর্যায়ের উল্লেখ করা চলে। এ পর্যায়ে কাজের বদলে চেতনাই ছিল প্রধান।** স্বাধীনতার সম্ভাবনা তখন বাস্তব। সুতরাং স্বাধীন ভারতে **শিক্ষার রূপ** কী হবে তাই নিয়ে চিন্তাজগতে পরিকল্পনা চলতে থাকে, ভবিষ্যতে **জাতীয়** শিক্ষার রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। **এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি** প্রথমত **গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা** পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় ফলশ্রুতি কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত

"বেসরকারী ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি"-(১৯৩৮—৩৯) যা স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছিল।

আন্দোলনের দুর্বলতা এবং ফলশ্রুতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ব্যর্থতার পিছনে ছিল অনেকগুলি কারণ। **আবেগ প্রবণতা এবং পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব** ছিল যথেষ্ট। মতবাদে ছিল প্রচুর পার্থক্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিল অতিশয় প্রত্যক্ষ। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থারই মত আর একটি ব্যবস্থা স্থায়ী হওয়া ছিল অসম্ভব। সুতরাং এই আন্দোলনের মধ্যে **যা ছিল বিশেষত্বের পরিচায়ক, কেবল তাই দীর্ঘজীবী হয়েছে,** যেমন আর্য প্রতিনিধি সভার **গুরুকুল** কিংবা **রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন,** যা সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ঐতিহ্য রূপ দিয়েছে। তেমনি বেঁচে রয়েছে দিল্লী **জামিয়া মিলিয়া** কিম্বা লক্ষ্ণৌয়ের **দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলেমা,** যা ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য রূপ দিয়েছে। আর বেঁচে রয়েছে চিকিৎসা, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষাত্মক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, কারণ এগুলি ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, কিন্তু বিদেশী সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেনি। যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। অবশ্য নতুন দিগন্তের ইঙ্গিতে মনোজগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, তাই হলো এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে **এই আন্দোলনকে একটি একক আন্দোলন বলে আখ্যা দেওয়া দুষ্কর।** সমস্ত আন্দোলনটি গড়ে ওঠে পরস্পরের সম্পর্কহীন তিনটি বিশেষ পর্যায়ে। তাছাড়া এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ঐতিহ্যবাদী এবং আধুনিকতা বাদী, প্রাচ্য শিক্ষাপন্থী, বৈজ্ঞানিক ও কলা শাস্ত্রজ্ঞ, হিন্দু ও মুসলমান এবং এমনি আরও নানা ভাবরূপ। সুতরাং **এ আন্দোলন ছিল বিচিত্র চিন্তার এক জটিল ফলশ্রুতি। তবুও বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের মধ্যে নিম্নতম ঐক্য ছিল সকল পর্যায়েই। সেই জন্য একে একক ভাবে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' বলা চলে**

আন্দোলনের প্রভাব :—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুদূর প্রসারী। প্রত্যক্ষ আশু ফল হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে **সরকারী পঞ্চবর্ষ রিপোর্টেও (১৯১৭-২২) স্বীকার করা হলো যে এই**

আন্দোলন পুঞ্জীভূত অসন্তোষকেই প্রকাশ করেছে। সুতরাং ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য পুনর্নির্ণিত হওয়া প্রয়োজন। ঐ রিপোর্টেই স্বীকার করা হয় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে নাগরিকের সাথে তার পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান করা। সুতরাং **শিক্ষার সংস্কার এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন।** এই হলো সরকারের উপর প্রভাব। তাছাড়া এই আন্দোলনের ফলে **গণশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে।** বরোদা রাজ্যে ১৯০৬ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯১০-১১ সনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে উত্থাপিত গোখেল বিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। ঐ বিল পরাজিত হলেও রাজা পঞ্চম জর্জ'এর অভিষেক বাণীতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইনও পাস হয়।

এই আন্দোলনের প্রভাবেই **মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে** গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে **প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহ** বাড়ে। তাছাড়া সমগ্র ভারতের জন্য একটি **জাতীয় ভাষার চেতনাও** দানা বাঁধে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং দেশাত্মবোধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে **জাতি সেবার মনোভাব এবং জাতি গঠনের আদর্শ** দৃঢ় হয়। শিক্ষা **প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়করণ** দ্রুত অগ্রসর হয়।

এই আন্দোলনের প্রভাবেই **বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা** জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে গৃহীত হয়। **গণ-সাক্ষরতার প্রয়োজন** অনুভূত হয় এবং **নারী শিক্ষার অগ্রগতি** ঘটে। ভারতে **বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবণতাও** বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে **স্বাধীন চিন্তার আবহাওয়া** সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এই আন্দোলন **গবেষণার ক্ষেত্রে প্রেরণার** সৃষ্টি করে।

সুতরাং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভবিষ্যৎ চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে পলিমাটি ছড়িয়ে দেয়। **চেতনার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় তাকেই অবলম্বন করে ভবিষ্যৎ সংস্কারের চেষ্টা চলে।** বস্তুত: জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল যুগ বিভাজিকা।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Make an analysis of Lord Curzon's educational policy and account for nationalist resistance to it.

('কার্জন যুগ' শীর্ষ থেকে "কার্জন নীতির মূল্যায়নের" শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলোচনারই সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করতে হবে।)

2. Make an estimate of Lord Curzon as an educational reformer. Is a revaluation of the Curzon Policy justified in view of our present educational problems ?

("কার্জন নীতির মূল্যায়ন" শীর্ষক আলোচনার সবটাই পড়তে হবে।)

3. Trace the origin and development of the National Education Movement in its different phases.

('জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন', "আন্দোলনের পটভূমি", 'প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থিত করতে হবে, এবং পরিশেষে তৃতীয় পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষা ও পরিকল্পনা কমিশনের কথা যোগ করতে হবে।)

4. Make an analysis of the nature and characteristics of the National Education Movement, particularly bringing out the differences between the first two phases of the movement.

(কেবল কার্জন নীতির প্রতিক্রিয়া নয়, বরং দীর্ঘদিনের অসন্তুষ্টির ফল ! আর্য সমাজ, সারস্বত সমাজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, ইঙ্গ-বৈদিক কলেজ, গুরুকুল ইত্যাদির মারফত অসন্তুষ্টি এবং সংস্কার চেতনার প্রকাশ : জাতীয় ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব : পুণরুজ্জীবনবাদের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ এবং সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির ভূমিকা, সংস্কারের জন্য গঠনমূলক কাজ। কিন্তু চরম পন্থার প্রভাবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

তা ছাড়া জাতির নূতন প্রয়োজন. শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবহারিক দাবি। সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রেরণা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আদর্শ সংঘাত। আবেগ প্রবণতার আধিক্য।

ফলাফলের বিচারে বৈশিষ্ট্য—জাতীয় শিক্ষার চেতনা, প্রশাসনের ভারতীয় করণ, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি

দুই পর্যায়ের পার্থক্য—ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, বিদ্যালয়ের সংখ্যায়, বাংলা দেশ নাম সর্বভারতীয় চরিত্রে; মুসলীম অংশ গ্রহণে, পরিকল্পিত নেতৃত্বে, প্রচেষ্টার ব্যাপকতায়, চেতনার উপর প্রভাবে।

5. Why did the National Education Movement fail to establish permanent National System of Education ?

(আন্দোলনের সুরুতে চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল না, বিভিন্ন মতাদর্শের নিম্নতম ঐক্য সত্ত্বেও বিপ্লবী সংস্কার হলো না। পাঠ্যক্রম, সরঞ্জাম, অর্থ ইত্যাদির সমস্যা। আবেগ প্রবণতা, রাজনীতির প্রভাব।

এর পরে "আন্দোলনের দুর্বলতা ও ফলশ্রুতি" শীর্ষক অংশটি যোগ করতে হবে।)

6. Discuss the significance and far reaching effects of the National Education Movement. Is it correct to say that the movement opened up a new vista and irrigated the educational field for subsequent developments ? Can it be characterised as "watershed" ?

("আন্দোলনের দুর্বলতা ও ফলশ্রুতি" এবং "আন্দোলনের প্রভাব" শীর্ষক আলোচনার সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত রূপ।)

নবম অধ্যায়

শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন

১৯০৫ সনের পরে দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনা শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দেয়। প্রথমটি ছিল কার্জনীয় সরকারী নীতিতে শাসনযন্ত্রের সাহায্যে মানোন্নয়নমূলক সংস্কার। আর দ্বিতীয়টি ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আলোকিত পথে সংস্কার প্রচেষ্টা। এই দুইটি প্রভাব কখনও হয়েছে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কখনও হয়েছে পরিপূরক।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে জাতির নূতন চেতনা গোখেল বিলের মধ্যে প্রকাশ পেল। এ বিল অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সনের 'দরবার ঘোষণা' এবং ১৯১৩ সনের সরকারী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সরকার এই নীতি প্রকাশ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কার্জন নীতিরই পুনরুক্তি করা হয় ১৯১৩ সনের একটি সরকারী প্রস্তাবে। পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনে কিছু উন্নতিও হয়। কিন্তু অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষার প্রসার হয় এবং স্কুলের সংখ্যা বাড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ক্রমেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। পাঠ্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনও ক্রমে অনুভূত হয়।

উচ্চশিক্ষাস্তরে মতাদর্শের সংঘাত হয় আরও তীব্র। কার্জনের নীতি ছিল আর বেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা। কিন্তু উচ্চশিক্ষার দাবির কাছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সরকারকেও এই নীতির পরাজয় মেনে নিতে হয়। ১৯০২ সনে যেখানে কলেজ ছিল ১৪৫টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫টি, সেখানে ১৯২১ সনে কলেজ হয় ২৩১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি। নতুন চরিত্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়, যেমন— বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭), হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮), আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০), পুনার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় S.N.D.T. (১৯২০) প্রভৃতি।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো এবং গবেষণা সম্বন্ধে কার্জনের নীতি অপেক্ষাকৃত সফল হয়। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নতুন নতুন বিষয় উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়।

কার্জনের সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতিও বহুলাংশে পরাজিত হয়। এ ক্ষেত্রে **স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) অনুসারে কাজ করবার জন্য উপযুক্ত উপাচার্য খুঁজতে সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বর্জন নীতিতে বিপর্যস্ত, সেই সময়েই স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আপাতঃ বিরোধী এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। কিন্তু আশুতোষের কর্মধারা প্রমাণ করলো যে **সরকারী রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপায়ণই ভিত্তি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।** প্রচলিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী যন্ত্রকেই ব্যবহার করে তার বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের এই চেষ্টা ছিল জাতীয়তা তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই আর একটি রূপ।

স্যাডলার কমিশনের পটভূমি

স্কুল ও কলেজকে মুক্ত হস্তে অনুমোদন দিয়ে স্যার আশুতোষ **শিক্ষা সংকোচন নীতিকে পরাজিত করেন।** বিশ্ববিদ্যালয়ে **মাতৃভাষা** পড়ানোর **মধ্য** দিয়ে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কর্তৃত্বে পড়ানো, বহু পাঠ্যবিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রহণ, গবেষণার সূচনা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যতের **সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন।** দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্যের শক্তিতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **এই দ্রুত প্রসারের ফলেই বহু নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয়।** আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ও কাঠামো কি হওয়া উচিত, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের চরিত্র, বহু বিষয়ে পড়ানোর সার্থক ব্যবস্থাপনা, উচ্চশিক্ষার আদর্শ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, কলেজীয় বেস্ত শিক্ষার মান ও প্রকৃতি, মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক, সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রভৃতিই হলো নূতন **প্রশ্ন**। এই সব প্রশ্নের **উত্তর** এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই গঠিত হয় **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭), কিম্বা স্যাডলার কমিশন। উচ্চশিক্ষার প্রান্ত থেকেই সংস্কার প্রচেষ্টা সুরু হলো।**

স্যাডলার কমিশন

মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' উচ্চ শিক্ষার ত্রুটি বিশ্লেষণ করে বললেন যে এই স্তরের **শিক্ষা মূলতঃ সাহিত্যমুখী এবং সকলের পক্ষে অশুদ্ধ ও বৈচিত্র্যহীন।** পড়ানোর পদ্ধতিও যান্ত্রিক হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষার অভাবে উচ্চ শিক্ষা **মানবিক বিদ্যায় ভারাক্রান্ত।** সর্বোপরি কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন শক্তি নিঃশেষিত। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ **—উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজই ব্যাহত হচ্ছে।**

কমিশন মন্তব্য করলেন যে, **উচ্চ শিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।** কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার মান অতি নীচু। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যক্রম এবং মানই বিদ্যালয়কে অনুসরণ করতে হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একটানা ছাত্রস্রোত চলছে। মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্নমুখীতার অভাবে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষার মান নীচু হওয়ায় কলেজের প্রথম দুই বছর প্রকৃত পক্ষে স্কুল স্তরের শিক্ষাই চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা আসলে সুরু হচ্ছে কলেজের তৃতীয় বর্ষ থেকে। সর্বোপরি **বিদ্যালয়ের উপর দ্বৈত কর্তৃত্ব মাধ্যমিক স্কুলকে আরও ভারাক্রান্ত করছে।** একদিকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুমোদন (affiliation) এবং অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি (recognition) বজায় রাখতে স্কুলগুলি হিমসিম খাচ্ছে।

কমিশনের সুপারিশ :—কমিশন সুপারিশ করেন যে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন। **ইণ্টারমিডিয়েট স্তরই হবে উভয়ের মধ্যে সীমানা।** ইণ্টারমিডিয়েটের পর থেকে হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে ইণ্টারমিডিয়েটের দুই বছরেও পড়াশুনা হবে স্কুলের পদ্ধতিতে। প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে একটি **আলাদা 'প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড'**এর হাতে দেওয়ার সুপারিশ কমিশন করেন। এই বোর্ডই ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অনুমোদন, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুর জন্যে দায়ী থাকবে। এর ফলে **নিম্নতর শিক্ষার দায়িত্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তি পাবে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি দিতে পারবে।** মাধ্যমিক স্তরেও দ্বৈত প্রশাসনের অবসান

ঘটবে। সর্বোপরি পৃথক প্রশাসনে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড়ও কমবে। এই সুপারিশের মাধ্যমেই **স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা প্রথম প্রতিফলিত হয়।**

উচ্চতর স্তরে বিশেষীকরণের প্রস্তুতির জন্য ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রচলনের সুপারিশ করা হয়। বস্তুত **বিচিত্র পাঠ্যক্রম সুপারিশের মধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখীনতার প্রাথমিক যাত্রা।** কমিশন অবশ্য পৃথক দুই বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের কথা বলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহভাবে স্কুলের দশ ও ইণ্টারমিডিয়েটের দুই—**মোট ১২ বৎসর কালকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব স্তরের শিক্ষা রূপে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ১২ বৎসরের স্কুল শিক্ষার চেতনাও এই সময় থেকে দানা বাঁধতে থাকে।**

কমিশন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। মুসলীম ও নারী শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস প্রয়োজন বোধে মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুলের কথা বলা হয়। শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা' বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং 'শিক্ষা'কে একটি পাঠ্য বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশও গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োগ বিজ্ঞান, শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা, পেশা, কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষা প্রসারের কথাও বিশেষভাবে বলা হয়।

উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে **কলেজীয় স্তরেও উন্নত শিক্ষার সুপারিশ করা হয়।** ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ে **সাম্মানিক পাঠ্যক্রম** সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে এই কমিশনই **সর্বপ্রথম তিন বছরের ডিগ্রীস্তরের কথা চিন্তা করেন।** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র স্নাতকোত্তর অধ্যাপনাকে নিজ উদ্যোগ ও দায়িত্বে গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে সবক্ষণের উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধিমূলক কোর্ট, ক্ষুদ্র কার্যনির্বাহক সংস্থা, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টি, বোর্ড অফ ষ্টাডি এবং বিভাগীয় প্রধানের ব্যবস্থা করে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করা হয়। পাঠ্যক্রম ও অধ্যাপনা সম্পর্কে বোর্ড অফ ষ্টাডি এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয়। তা ছাড়া **কার্জনের নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরূপ সমালোচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টির কথাই কমিশন বলেন।**

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে সুষ্ঠু ও সংহত করার উদ্দেশ্যে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার লাঘবের কথা বলেন। ঐ উদ্দেশ্যে **ঢাকায় একটি পৃথক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়** এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টার-বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। আর বলা হয় যে **মফঃস্বলের উন্নত মানের কলেজগুলিকে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের** আদর্শে কার্যপ্রণালী রচনা করা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অপরাপর উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছিল ছাত্রদের শারীর শিক্ষার প্রস্তাব এবং এই উদ্দেশ্যে ডাইরেক্টর পদের সৃষ্টি, ছাত্রদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত, ছাত্র কল্যাণ বোর্ড প্রভৃতি। সর্বোপরি বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে স্থায়ী সংযোগ স্থাপনের কথা বলা হয়।

সুপারিশের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ :—স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ যত ভালই হোক, এর **অতি সামান্যই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলো।** শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো বদলের মৌলিক সুপারিশ সম্বন্ধেই হলো মতদ্বৈধ। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এইসব কলেজে উপযুক্ত শিক্ষক যোগান, এবং প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারমুক্ত করলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকটের যুক্তিও দেখানো হলো। তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রস্তাবটিও ছিল নানা সমস্যাকীর্ণ। সর্বোপরি প্রবেশিকা ও ইণ্টার বোর্ডের গঠন প্রণালী, ক্ষমতা এবং সরকারের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হলো। **রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিতণ্ডাকে আরও তীব্র করে তুললো।** সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা **বাংলাদেশেই সুপারিশ কার্যকর হলো** অতি সামান্য। কেবলমাত্র ঢাকাতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ১৯২০ সনে।

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থাপিত হলেও স্যাডলার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিল সমভাবে প্রযোজ্য। তাই **কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ সর্বভারতীয় গুরুত্ব পাওয়া গেল।** অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য প্রদেশে সুপারিশগুলি কার্যকরও হলো। দিল্লী, অন্ধ্র, আগ্রা ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো কমিশনের আদর্শে। **অনুমোদনধর্মী পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চরিত্র এবং প্রশাসনেও রূপান্তর এলো।** উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে শিক্ষা বোর্ড হলো। তা ছাড়া আন্ত কলেজ এবং আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমের সূচনা হলো।

সুদূর প্রসারী প্রভাব :—স্যাডলার কমিশনের সব সুপারিশই হয়তো কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। হয়তো বাস্তব অবস্থাকে পিছনে ফেলেও কিছু চিন্তা করা হয়েছিল। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে পড়ানো এবং গবেষণার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কমিশন **উচ্চশিক্ষায় আধুনিকীকরণের সূচনা** করেছেন। নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে **বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনে নতুন আদর্শ** এসেছে। কমিশনের সুপারিশ অবলম্বন করে আজও পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসন চলছে। **শিক্ষায় স্বাধীনতার কথা বলে** শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ আনা হয়েছে। ছাত্রদের সহ-পাঠ্যক্রমমূলক কাজ সমর্থনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সক্রিয়তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তদুপরি তিন

বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং ডিগ্রীস্তরে ব্যাপকভাবে সামানিক পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব করে কমিশন উচ্চশিক্ষাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের আগে ১২ বছরের শিক্ষা অর্থাৎ **দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব ভবিষ্যৎ শিক্ষা চেতনাকে প্রভাবিত করেছে।** বিশেষীকরণের সহায়ক বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সুপারিশ করে কমিশন **বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।** সর্বোপরি শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ বিজ্ঞান, কারিগরি এবং বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কাজের সমন্বয় সাধনের প্রস্তাবও ভবিষ্যতের সহায়ক হয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে স্যাডলার কমিশনের পরে **পঞ্চাশ বৎসর ধরে শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা যে সব সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে, তার অনেক গুলিরই ভিত্তি ছিল কমিশনের রিপোর্ট।** এই দৃষ্টিকোণ থেকে Mayhew'র মন্তব্যকে গ্রহণ করা চলে, "The report of the Calcutta University Commission has been a constant source of suggestion and information. its significance in the history of Indian Education has been incalculable."

সংস্কার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ:—স্যাডলার রিপোর্টের পরে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১৯ সনের **মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার** এবং দ্বিতীয় ঘটনা **অসহযোগ আন্দোলন।** শাসন সংস্কারের ফলে **প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো।** পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন সভা নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো। মন্ত্রীত্ব প্রথাও সৃষ্টি হলো। **কিন্তু প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হলো।** গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি 'সংরক্ষিত' বিষয়রূপে আমলাদের নেতৃত্বে গভর্ণরের কাছে দায়ী কাউন্সিলারদের উপর ন্যস্ত করা হলো, এবং গণজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়গুলি মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তরিত হলো। **শিক্ষাকে হস্তান্তরিত বিষয় করা হলো।**

আপাতঃদৃষ্টিতে আইন সভার নির্বাচিত সদস্য মন্ত্রীদের ক্ষমতা বাড়াতে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন আশা এলো। কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা এবং ইউরোপীয়, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলো সংরক্ষিত বিভাগে। ফলে প্রকৃত অধিকার হলো সীমাবদ্ধ এবং আকাঙ্খা পূরণের সুযোগ রইল না। তদুপরি শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত করে **কেন্দ্রীয় সরকার সরে দাঁড়ালেন। কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যেও ভাঁটা পড়লো।** সুতরাং শিক্ষার সংস্কার কেন, উপযুক্ত প্রসারও ঘটলো না।

তবুও ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে **আরও ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো।**

এদের সবগুলিই পড়ানোর দায়িত্ব নিল এবং কয়েকটি হলো আবাসিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক হলো।

এই সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো দ্বিগুণেরও বেশী। এর অন্যতম কারণ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয় কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। উভয় ক্ষেত্রেই অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের গণ আলোড়ন শিক্ষা প্রসারের জন্য বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীর একচেটিয়া আধিপত্যও আর রইল না। বিজ্ঞান শিক্ষার তাগিদে পাঠ্যক্রমেও ব্যাপকতা আসলো। মাধ্যমিক শিক্ষার 'বি' কোর্সটির অপমৃত্যু ঘটলো সত্যি, কিন্তু তার বদলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু স্থাপিত হলো।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অন্তত: নীতির দিক দিয়ে অনেক অগ্রগতি হলো। এই সময়েই সর্বপ্রথম বোম্বাই আইন সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 'প্যাটেল আইন' পাস হয়। আইনের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কয়েক বছরের মধ্যেই অন্যান্য প্রদেশেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন, আব প্রাদেশিক অর্থ ভাণ্ডারেও হলো কার্পণ্য। ১৯২৯ সনের অর্থ নৈতিক সংকটও মানুষের সঙ্গতি কেড়ে নিল। তাই ১৯২১-২২ সনে সারা ভারতে যেখানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬০০৭২টি, সেখানে ১৯৪৬-৪৭ সনে হলো মাত্র ১৭২৬৬৩টি। অর্থাৎ নতুন স্কুল হলো অল্প। কিন্তু শিক্ষাব আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে এই অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা বাড়লো অনেক। ১৯২১-২২ সনের ৬১০৫৪ ছাত্রের জায়গায় ১৯৪৬-৭৭ সনে সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩০৩৬৬৬১। সুযোগের অনুপাতে ছাত্র "সংখ্যাব" সমস্যা তদবধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ

কিন্তু শিক্ষা প্রসারের চেয়েও এই সময়ে শিক্ষা চেতনার দিকে অগ্রগতি হয়েছে অনেক বেশী। প্রথম যুদ্ধোত্তর সংকট মধ্যবিত্তেব আত্মসন্তুষ্টিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে চেতনার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে নিয়ে আসে। অপরদিকে ১৯৩৫ সনের শাসন সংস্কারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং নির্বাচিত মন্ত্রীসভাব ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটিও গুরুত্ব অর্জন করে। তা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভূমিকাও হয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় প্রচেষ্টায় দেশের শিল্পায়নের প্রকৃত সূচনাও হয় এই যুগেই। সুতরাং বাণিজ্য-শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা, নানারকম ব্যবহারিক শিক্ষা, এবং গণশিক্ষার প্রশ্নও নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সর্বশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরাতন মূল্যবোধকে ধূলিসাৎ করে, কিন্তু দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে। মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয় সংকটকে গভীরতর করে। কিন্তু স্বাধীনতার দরজায় দাঁড়িয়ে **স্বাধীন ভারতে শিক্ষার রূপরেখাও বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।**

এই পটভূমিতে রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকটের ফলে শিক্ষার অগ্রগতি ও সংস্কার ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু সমীক্ষা, সুপারিশ এবং পরিকল্পনা চলেছে। এই অবস্থাটি ধরা পড়েছে নানাবিধ সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট ও প্রকল্পে।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট :—রিপোর্টগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য স্যার ফিলিপ হার্টগ'এর নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষা কমিটির ১৯২৯ সনের রিপোর্ট। প্রাথমিক শিক্ষার যে কিঞ্চিৎ প্রসার ঘটেছে তা স্বীকার করেও কমিটি যুক্তিসিদ্ধভাবে **মন্তব্য করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী।** প্রাথমিক শিক্ষা ঠিকমত পরিকল্পিতও হয়নি, পরিকল্পনা কার্যকরও হয়নি। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা যে **মূলত গ্রামীণ সমস্যা** এবং গ্রামীণ জীবন যে বহু সমস্যা জর্জরিত, এ কথা মনে রাখা হয়নি। এই স্তরের শিক্ষায় **অপচয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি।** অন্যান্য বহু সুপারিশের মধ্যে কমিটি বলেন যে পাঠ্যক্রমের আরও সংস্কার, গ্রাম জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ, অপচয়ের প্রতিকার এবং প্রাথমিক স্তরে কমপক্ষে ৪ বছরের পাঠ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা :—এর পরবর্তী ধাপে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো ১৯৩৭ সনে গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা। "হরিজন" পত্রিকায় ১৯৩৭ সনে পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর **নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে** মাতৃভাষার মাধ্যমে, কায়িক শ্রমমূলক, উৎপাদনকেন্দ্রীক, স্বয়ং নির্ভর, ৭ বছরের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা বিচার করা হয়। ডঃ **জাকির হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষা কমিটির** ইতিবাচক রিপোর্ট ১৯৩৮ সনের হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ঘোষণা করা হয় যে **পরিবেশকে অনুধাবন করার মত জ্ঞান এবং জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হবে বুনিয়াদি শিক্ষা।**

এর স্বল্প পরে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আরও সমীক্ষার জন্য কমিটি গঠিত হয় বি, জি, খের'এর নেতৃত্বে। **খের কমিটি** সুপারিশ করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে ৬-১৪ বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে এই শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক এবং সুরু করা হোক গ্রামাঞ্চলে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠের পরে উচ্চতর শিক্ষার্থী অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। কমিটি বলেন যে সমগ্র বুনিয়াদি শিক্ষাকালকে ৫ বছরের নিম্ন বুনিয়াদি এবং ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। তদুপরি ৫ বছরের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার সুপারিশও করা হয়, যেন উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা শিল্প বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা তৈরী হতে পারে।

১৯৩৯ সনে পুনা সম্মেলনে এবং **১৯৪১ সনের জামিয়া নগর সম্মেলনে** বুনিয়াদি শিক্ষার রূপরেখাকে আর একটু উন্নত করা হয়। পরিশেষে **১৯৪৫ সনে ওয়ার্ধার জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে** প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা ও গণ-শিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি **পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।** কিন্তু এই শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে ঘোষণা করা হলেও স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত কাজ হলো সামান্যই। **স্বাধীন ভারতের জন্যই প্রশ্নটি তোলা রইল।**

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন :—মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও হার্টগ কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিরাট অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিটিব মতে অযাচিত ও অনুচিত প্রসার এবং অযোগ্য ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদাই এ অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। কমিটি তাই **নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেই বৈচিত্র্যমূলক পাঠ্যক্রম** এবং ঐ **স্তরের শেষে ছাত্রদের একাংশকে শিল্প ও বাণিজ্যিক শিক্ষায় নেওয়ার সুপারিশ করেন।** উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিকল্প পাঠ্যক্রমের কথাও বলা হয়। কিন্তু তদানীন্তন কালে এইসব সুপারিশকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ১৯৩৪ সনে উত্তর প্রদেশের **সপ্রু কমিটি।** এই কমিটি সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার সম্পর্ক বিচার করে সুপারিশ করেন যেন নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষে বৃত্তিগত শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, **স্কুল শিক্ষার সময়কালকে বাড়ানো হয়, মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম এবং তিন বছরের ডিগ্রী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।** উল্লেখযোগ্য যে সপ্রু কমিটি কেবল উত্তর প্রদেশের (সংযুক্ত প্রদেশ) জন্য গঠিত হলেও সুপারিশগুলি সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এসব সুপারিশও কার্যকর হয়নি।

এইসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারী মহলকেও প্রভাবিত করে। **১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (C. A. B. E.)** মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটি পুনঃ সংগঠনের কথা বলেন। গ্রামের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে **স্বয়ংসম্পূর্ণ নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার** কথা বলা হয়। এই স্তরের পরে উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা বিকল্প রূপে ব্যবহারিক শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ থাকবে। **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা থাকবে বিভিন্ন দৈর্ঘ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির।** এই স্তরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিতে, শিক্ষকতায়, কৃষি কিম্বা কারিগরি শিক্ষায় যাওয়া চলবে।

এ্যাবট-উড রিপোর্ট :—এদিকে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটিও ততদিনে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। ঐ সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৩৭ সনে A. Abbot এবং S. H. Wood'এর রিপোর্টের প্রথম অংশে আলোচনা করা হয় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ

শিক্ষার কথা। এই অংশে **শিশু শ্রেণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব,** প্রাথমিক স্তরে প্রবণতার স্বীকৃতি, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর বোঝা লাঘব, এই স্তরের শেষে ৩ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ এবং মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক রূপে ইংরেজী পড়া, কিন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয়।

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে এ্যাবট-উড কমিটির মন্তব্যই ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কমিটি সুপারিশ করেন যে **বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং বৃত্তি শিক্ষাকে সমমর্যাদা দিতে হবে।** সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে আলাদা স্কুলে, কিন্তু এই **দুই রকমের শিক্ষা হবে পরস্পরের সম্পূরক।** প্রাদেশিক সমীক্ষার সাহায্যে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তি শিক্ষার প্রসার দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা চলে। কিন্তু **শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা চাই।** শিল্প মালিকরা গৃহ, সরঞ্জাম ও অর্থ দিয়ে বৃত্তি শিক্ষায় সহায়তা করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের প্রশ্নে বলা হয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পরে **উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমান্তরালরূপে থাকবে তিন বছরের কোর্স।** এই শ্রেণীর কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনই বেশী। আর একাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে **উচ্চস্তরের সমান্তরালরূপে থাকবে দুই বছরের কোর্স।** তদুপরি কর্মরত সময়ে সপ্তাহে দুই বেলা করে **আংশিক সময়ের শিক্ষার** কথাও বলা হয়। কমিটির সুপারিশে কলেজীয় স্তরে বৃত্তিগত শিক্ষা, Vocational guidance এবং Career pamphlet প্রকাশ করার কথা এবং **জুনিয়র,** সিনিয়র, আংশিক সময়ের বৃত্তি শিক্ষা এবং শিল্প ও কলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সংহত করে "বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র" (composite centres) গড়বার কথাও বলা হয়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা

স্যাডলার কমিশনের আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কর্তৃত্বে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য যে সব সংস্কার পরিকল্পনা পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন ভাবে উপস্থাপিত হয়, সেইগুলিকে গ্রথিত করে একটি সামগ্রিক শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা সর্ব প্রথম উপস্থাপিত হয় C.A.B.E.'র উদ্যোগে ১৯৪৪ সনে সার্জেণ্ট পরিকল্পনা রূপে।

"যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন" শিরোনামায় (Post War Educational Development in India) প্রকাশিত এই স্কীমে শিক্ষাক্ষেত্রে তখনকার **ইংলণ্ডের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য** ৪০ বছরের কর্মসূচী প্রস্তাব করা হয়। এই সময়ের মধ্যে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল কিম্বা প্রাথমিক স্কুলের নার্সারী শ্রেণীতে ১০ লক্ষ আসনের ব্যবস্থা করা হবে। ৬ থেকে ১১ বছরের

শিশুদের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক (কিম্বা বুনিয়াদি) শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। ১১ থেকে ১৪ বছরের যেসব ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হবেনা, তাদের জন্য 'সিনিয়র বেসিক' শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। আর যারা উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত। অনুমান করা হয় যে জুনিয়র বেসিক স্তরের শতকরা মাত্র বিশ ভাগ এই বাছাইয়ের মধ্যে পড়বে। উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে দুই ধরনের। কলা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অব্যবহারিক বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য থাকবে এক শ্রেণীর স্কুল আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে প্রয়োগ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি এবং মেয়েদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের জন্য। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ছাত্র বাছাই করার ব্যবস্থা থাকবে। স্কুলের পড়া যাঁরা শেষ করবেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭ থেকে ১০ শতাংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া হবে। কলেজের স্তরে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দিয়ে তার বদলে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হবে। উচ্চ শিক্ষায় সর্ব-ভারতীয় সংহতির জন্য থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস কমিটি।

প্রয়োজন অনুপাতে কারিগরি, শিল্পকলা ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। উচ্চ বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে তিন বছরের জুনিয়ার টেকনিক্যাল, শিল্প ও ট্রেড স্কুল। এর মর্যাদা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য। (কিম্বা নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে ৬ বছরের টেকনিকাল স্কুল)। একাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার শেষে থাকবে দুই বছরের উচ্চতর টেকনিক্যাল স্কুল। এ ছাড়া থাকবে আংশিক সময়ের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ। /

কমিটি পরিকল্পনা করেন যে স্নাতকদের জন্য শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অস্নাতকদের জন্য নানা ধরণের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা ঐ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। ৯ বছর থেকে ৪০ বছর বয়সের ৯ কোটি নিরক্ষরকে বৃত্তিগত কিম্বা পুঁথিগত শিক্ষার সাহায্যে সাক্ষর করে তোলা হবে। অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মধ্যে পঙ্গু প্রভৃতির জন্য বিশেষ স্কুল, স্বাস্থ্য কল্যাণ, সামাজিক এবং প্রমোদমূলক কার্যক্রম এবং Employment Bureau প্রভৃতির কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ এবং তার নীচে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ-গুলির। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রের দায়িত্ব থাকবে প্রাদেশিক সরকারের। অদক্ষ লোকাল বোর্ডগুলির কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করবে।

সার্জেণ্ট কমিটির পরিকল্পনা সে সময়ে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।

বিশেষ করে চল্লিশ বছরের মেয়াদ, অর্থ সমস্যার অজুহাত, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে "বাছাই নীতি" প্রভৃতি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সেই একই কথা আজও নানা ভাষায় নানা স্বরে বলা হচ্ছে। অনেক বিষয়ে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল থেকে স্বাধীন ভারত আজ পর্যন্তও অনেক পিছিয়ে আছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম ব্যাপক হারে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার এবং এ সম্পর্কে সরকারী কর্তব্যের কথা বলা হয়। আবশ্যিক অবৈতনিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সে সম্পর্কে সরকারী দায়িত্বের স্বীকৃতি থাকে। বয়স্ক শিক্ষায় সরকারী দায়িত্ব এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ও এই পরিকল্পনার উল্লেখ্য দিক। বস্তুত সরকারী দায়িত্বের ব্যাপক স্বীকৃতি, পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম প্রস্তাব এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সকল স্তরের শিক্ষাকে একটি মাত্র ব্যবস্থাপনায় সুসংহত করবার দিকে প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই পরিকল্পনার তাৎপর্য অসীম। একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপরেখা এইখান থেকেই আরম্ভ হয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে সব শিক্ষা প্রয়াসই এই পরিকল্পনার কাছে ঋণী।

স্যাডলার রিপোর্টের মধ্যে সংস্কার চেতনার যে যাত্রা সুরু হয়েছিল, পরবর্তী ২৫ বছর সময়ে সেই চেতনা বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হয়। সংস্কার রূপায়নের চেয়ে সংস্কার চেতনা বিকাশের মধ্যেই এযুগের বিশেষ মূল্য। এ যুগের পরিণতি হলো সার্জেণ্ট রিপোর্ট। কিন্তু তখন দেশের স্বাধীনতা অতি আসন্ন। তাই পরিকল্পনা আর কাজে রূপ পেল না। সব কিছু রইলো স্বাধীনতার উত্তর পর্বের জন্য।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. How far was Lord Curzon's educational policy effective in the post Curzon period?

(প্রথম দেড় পৃষ্ঠার আলোচনাটি উপস্থিত করতে হবে)

2. How did the national spirit influence the growth of the Calcutta University?

(প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগ থেকে "স্যাডলার কমিশনের পটভূমি" শীর্ষক অংশের আলোচনাটি এবং সেই সাথে পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দান, বিজ্ঞান কলেজ প্রভৃতির কথা উপস্থিত করতে হবে।)

3. Analyse the defects in the system of higher education in India in the early part of the current century as discussed in the report of the Sadler Commission. What remedial measures were proposed by the Commission ?

("স্যাডলার কমিশন" এবং 'কমিশনের সুপারিশ' শীর্ষক অংশগুলির পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্ত রূপ।)

4. How did the Sadler Commission (1917-19) influence the concept and structure of education in India ?

(ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সূচনা; আলাদা প্রবেশিকা ইন্টার বোর্ড, স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা, ইন্টার স্তরে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য; দীর্ঘতর স্কুল শিক্ষা; দীর্ঘতর ডিগ্রী কোর্স; ব্যাপকভাবে সাম্মানিক কোর্স; বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হবে উচ্চতর স্তরে পড়ানো এবং গবেষণা; শিক্ষায় স্বাধীনতা ইত্যাদি।)

5. Is it correct to say that the importance of the Sadler Commission lay more in its impact upon subsequent development than in its immediate effect ?

Or.

"The Sadler Commission initiated a reform movement which developed increasingly since then." - Discuss.

Or,

"The report of the Calcutta University Commission has been a constant source of suggestion and information. Its significance in the history of Indian Education has been incalculable."—Discuss.

("সুপারিশের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ" এবং 'সুদূর প্রসারী প্রভাব' শীর্ষক আলোচনাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থিত করতে হবে।)

6. How did the constitutional reforms of 1919 and 1935 influence the course of educational development in India ?

(১৯১৯ এর সংস্কারে শিক্ষাকে প্রাদেশিক বিষয় এবং প্রদেশের মধ্যেও হস্তান্তরিত বিষয় করা হলো, কিন্তু অর্থবিভাগ রইল সংরক্ষিত। সুতরাং প্রাদেশিক ক্ষমতা বাড়লেও এবং মন্ত্রী নিযুক্ত হলেও প্রকৃত সুযোগ হলো অল্পই। কেন্দ্রীয় সরকারও সরে দাঁড়ালেন। তবুও শিক্ষার প্রসার হলো; প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হলো এবং নানা ধরনের প্রাদেশিক স্কীম তৈরী হলো।

১৯৩৫ এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতা আরও বাড়লো। এই যুগ থেকেই নানা ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা অগ্রসর হলো।)

7. Discuss the origin and development of the Basic Education scheme till the attainment of independence.

("বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা" শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই বলতে হবে।)

8. Bring out the major features of the educational reform proposals involved in the Hartog Committee and the Sapru Committee reports.

("হার্টগ কমিটির রিপোর্ট" শীর্ষক আলোচনা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এবং তার সাথে 'মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন' অংশটিতে আলোচিত হার্টগ ও সপ্রু কমিটির কথা সবটাই বলতে হবে।)

9. Modern technical and vocational education in India originated in the Abbot-Wood Report."- Discuss.

("এ্যাবট-উড রিপোর্ট" শীর্ষক অংশটির সবটাই বলতে হবে।)

10. Make an evalution of the major tenets of the Sargent Scheme for educational reconstruction in the light of our present educational plans.

("সার্জেন্ট পরিকল্পনা" শীর্ষক অংশটির সংক্ষিপ্তাকার উপস্থিত করতে হবে। তারপর বর্তমানের অবস্থার সাথে তুলনায় বলতে হবে—(ক) নার্সারি শিক্ষায় পরিকল্পনার যুগেও কিছুই হয়নি, (খ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আগ্রহ এখনও অপূর্ণ, (গ) তবে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল এবং বহুমুখী শিক্ষা চালু হয়েছিল, (ঘ) কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাটি দাড়িয়েছে, কিন্তু (ঙ) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। সুতবাং প্রচলিত শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় বিদেশী আমলের সার্জেন্ট পরিকল্পনা ঐতিহাসিক মূল্য দাবি করতে পারে।)

11. Is it correct to say that the period between 1917 and 1944 was characterised more by serious thinking than by actual reconstruction of education ?

(সংস্কার চেতনার সূচনা হয় গত শতাব্দীতেই। প্রথম আন্দোলন হলো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।

১৯১৭, স্যাডলার কমিশন—নূতন সংস্কার পর্বের সুরু। প্রকৃত সংস্কার সামান্যই।
১৯২৯, হার্টগ কমিটির রিপোর্ট। সুপারিশ সামান্যই কার্যকর হলো।
১৯৩৭--৪৫ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা স্কীমের নানা স্তর ; সামান্য প্রয়োগ।

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ - সপ্রু কমিটি।

১৯৩৭—এ্যাবট-উড রিপোর্ট।

পরিশেষে ১৯৪৪, সার্জেন্ট পরিকল্পনা। কিন্তু সামান্য প্রয়োগ।)

দশম অধ্যায়

স্বাধীনতার যুগ—শিক্ষা পরিকল্পনা

স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাধীনতা লাভের পরে দীর্ঘদিনের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দাবি স্বভাবতঃই মুখর হয়ে উঠলো। সুতরাং সকল স্তরের শিক্ষা প্রসার হলো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গণতন্ত্রসম্মত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হলো ততোধিক। তদুপরি উন্নত কৃষি এবং দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাকে আধুনিক করবার দরকারও হলো। সুতরাং ব্রিটীশ শাসনের শেষকাল পর্যন্ত যে সব পরিকল্পনা হয়েছিল, সেগুলিকে নূতন ভাবে দেখতে হলো। এই নব সমীক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গরূপে সব স্তরে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হলো।

প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ইংরেজ আমলে উৎসাহ দেওয়ার নীতি ছিল, কিন্তু সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না। স্বাধীন ভারতেও এ ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব কিম্বা আবশ্যিক শিক্ষানীতি গৃহীত হয় নি। তবে উৎসাহদানের নীতিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই স্তরে সরকারী অনুমোদিত স্কুলে সাহায্যদানের নীতিও গৃহীত হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে যেখানে অনুমোদিত প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৩০৩টি, সেখানে চারটি পরিকল্পনার পরেও সংখ্যা হয়েছে ২৯০২টি। প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা অতি নগণ্য। তদুপরি অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিম্বা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত। শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিম্বা স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন আইনও পাস হয়নি।

উল্লেখযোগ্য যে অনুমোদিত স্কুলের চেয়ে অননুমোদিত স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী। এর অধিকাংশই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত নয়। বস্তুতঃ এই ধরনের বহু বিদ্যালয়ই কলঙ্কের মত। তাই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাস করে বিধিবিধান নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষা প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা :—বস্তুতঃ আমাদের দেশে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা খুব সহজসাধ্য নয়। সমস্যা রয়েছে অনেক। সাধারণ সমস্যাগুলি হলো প্রথমতঃ উপযুক্ত জমি ও পরিবেশ যোগানোর সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত বাড়ীঘর, তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহের সমস্যা। তারপরেই উল্লেখ্য হলো ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের সমস্যা। বিত্তশালী

অংশের ব্যাপার না হয়ে, যাদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, সেই নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রমজীবীর মধ্যে যেন প্রসারিত হয়। সুতরাং দরকার আরও বহু সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়। এই সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষিকা এবং তাঁদের শিক্ষণের সমস্যা। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষণের সুযোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত নগন্য। কয়েকটি মাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে ওখানে ছড়ানো, আব অস্থায়ীভাবে মন্তেসরি শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের কথা। এখানে কে, জি, পদ্ধতিতে শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কেবলমাত্র গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে। প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষণেব জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতার 'বাল সেবিকা' শিক্ষণ প্রকল্প। তা ছাড়া রয়েছে শিক্ষিকার চাকুরির স্থায়িত্ব, আকর্ষণীয় সর্তাবলী এবং উপযুক্ত বেতনক্রমের সমস্যা। শিশুর গৃহের কাছেই স্কুল কিম্বা উপযুক্ত যানবাহন, শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পুষ্টিকর স্কুল টিফিন সরবরাহের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান হলে উপরোক্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধানও সহজসাধ্য হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো শিশু শিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জন চেতনা জাগানোর সমস্যা, দ্বিতীয়টি উপযুক্ত উদ্যোগ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাব সমস্যা, এবং তৃতীয়টি সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে প্রচুর অর্থ যোগানোর সমস্যা।।

সমস্যা সমাধানের পথ: সমস্যাটি সামগ্রিক এবং জাতীয়। সুতরাং সমাধানের চিন্তা ও পরিকল্পনাও সামগ্রিকভাবেই করতে হবে। শিশুশিক্ষাব উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু শিক্ষালয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্, পরিকল্পনাকাবী এবং প্রশাসকদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রয়োজন। জনসাধারণের চেতনা সৃষ্টির জন্য সরকাবী বেসরকারী প্রচারযন্ত্রেব সাহায্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান দরকার। গণপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন জনবসতি অঞ্চলে, বিশেষতঃ গ্রামের কৃষক ও ক্ষেতমজুর এবং সহরে শ্রমজীবীদের বস্তি অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা। "প্রতি শত শিশুব জন্য একটি বিদ্যালয়" এই হওয়া উচিত প্রতিজ্ঞা। শহরাঞ্চলে হয় ছেলেমেয়েব পায়ে হাঁটবার সামর্থের মধ্যে স্কুল করতে হবে, নইলে প্রত্যেকের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলটি হওয়া চাই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, সকলের বাড়ী থেকে সমদূরত্বে। সকল শিশু-বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক টিফিন দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মুনাফা শিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিতাড়ন প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে কলকারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং খামারের

মালিকদের আইন করে বাধ্য করা উচিত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। আইন বিধিবদ্ধ করা, শিক্ষণ-প্রাপ্তা শিক্ষিকা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, বিদ্যালয়ের লাইসেন্স নেওয়া এবং শিক্ষিকাদের বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধে বিধিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করা দরকার। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সকল ধরনের স্কুলকেই সরকারী পরিদর্শনের অধীন করা প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী সব স্কুলের জন্য অভিভাবিকা এবং স্থানীয় চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠন করা দরকার।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণকে ভারতীয় পরিবেশের উপযুক্ত করবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই সব উপকরণ উৎপাদনের জন্য সরকারী কিম্বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কারখানা দরকার। স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গ্রাম ও শহরের সকল শিক্ষিকার শিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কোন্ পদ্ধতি অথবা কোন্ কোন পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশে সর্বোত্তম শিশুশিক্ষা সম্ভব এবং তার জন্য কি কি সরঞ্জাম প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে শিশুশিক্ষাবিদদের স্থির সিদ্ধান্ত করে দেওয়া দরকার। শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষিকাদের সংগঠিত যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক এবং শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র দরকার। শিশুশিক্ষার পাশাপাশি দরকার পিতামাতার শিক্ষা এবং মাতৃমঙ্গল।

ভবিষ্যতে অবৈতনিক ও সর্বজনীন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হওয়া উচিত। তার জন্য এখনই এই স্তরের শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা বাজেটের অংশরূপে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন করা দরকার। এইভাবে সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা: ভরসার কথা যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টই তার প্রমাণ। এই রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়েছে।

কুড়ি বছরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা উপস্থিত করে ১৯৮৫ সনের মধ্যে লক্ষ্য রূপে সুপারিশ করা হয়েছে (ক) ৩—৫ বছরের শিশুদের অন্ততঃ শতকরা ৫ জনকে শিশু শিক্ষালয়ে ভর্তি করা (এই পাঁচ শতাংশের সংখ্যা হবে ২৫ লক্ষ।) (খ) ৫—৭ বছরের শিশুদের অন্ততঃ অর্দ্ধেককে ইনফ্যান্ট স্তরে ভর্তি করা। (এর সংখ্যা হবে ৭৫ লক্ষ।) সুতরাং ১৯৮৫ সনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পাঠরত শিশুর সংখ্যা হবে এক কোটি। সম্ভাব্য শিশু সংখ্যার তুলনায় এই লক্ষ্য এমন বিরাট কিছুই নয়। তবু এই সাফল্য অর্জন করতে পারলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধন্য।

কোঠারি কমিশন স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং ব্যাপক শিক্ষণ পরিকল্পনারও সুপারিশ করেন। কিন্তু এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আর্থিক দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি। সরকারী অনুদান এবং সাহায্যের ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান, গণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কৃষি সংগঠন, এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে রিপোর্ট দাখিলের পরে [illegible] বছর সময়ের মধ্যে অগ্রগতি তেমন কিছুই হয়নি।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Give an account of the present state of Pre-Primary education in India.

(আলোচনার প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্লেখ করতে হবে।)

2. What are the problems of Pre-Primary education in India? Offer suggestions for improvement, and refer to the recommendations of the Kothari Commission.

("প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা", "সমস্যা সমাধানের পথ" এবং "ভবিষ্যতের পরিকল্পনা" শীর্ষক অংশ তিনটির সারসংক্ষেপ পুরোপুরিই বলতে হবে।)

একাদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা

আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে **শিক্ষানীতির বিবর্তন আলোচনা করেছি।** পুনরুক্তি হলেও সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনাকে পটভূমি হিসেবে নিয়ে স্বাধীনতার যুগে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রসার, সমস্যা এবং সমাধানের কথা আলোচনা করবো।

প্রাথমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দৈন্যদশাগ্রস্থ অগণিত পাঠশালা-মক্তবের অস্তিত্ব ছিল। সে যুগের মিশনারীরাও সেই ঐতিহ্যকে একেবারে ধ্বংস করেন নি। **কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই এই ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজলো।** বিভিন্ন সমীক্ষায় সম্ভাবনাপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার এবং রেভাঃ এ্যাডামের জোরালো সুপারিশ সত্ত্বেও "চুঁইয়ে পড়ার নীতি" গৃহীত হলো। তৎকালীন নেতাদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। মহাত্মা ফুলে কিছু একক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরকারী তরফে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করা হলো না। অবশ্য স্থানীয় পরিবেশকে অস্বীকার করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলির ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের কাজ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও দীর্ঘদিন চুপ করে থাকতে পারলেন না। **নীতির পরিবর্তন আরম্ভ হলো লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় থেকে।** লর্ড ডালহৌসি এই নূতন নীতিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় চেতনাও প্রসারিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে দেশীয় নেতারাও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। সরকারী ভাবেও উড্ দলিলে প্রাথমিক শিক্ষায়ও উৎসাহ ও সাহায্য দানের কথা বলা হয়। ষ্ট্যানলি-র দলিলে সেস্-এর প্রস্তাব এই নীতিকে আরও শক্তিশালী করে।

বিমাতৃসুলভ সরকারী মনোভাব সত্ত্বেও ১৮৫৪ সনের পরে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। হাণ্টার কমিশনও বিস্তৃত সুপারিশ করেন। হাণ্টার কমিশনের পরবর্তীকালেই আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় চেতনা আরও বাড়ে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় বরোদা রাজ্যে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রাথমিক শিক্ষার চেতনাকেও একধাপ অগ্রসর করে নেয়। জাতীয় আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় গোখেল বিল-এ।

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতিও হয় অপেক্ষাকৃত উদার। লর্ড কার্জনও প্রাথমিক স্তরে প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক

ঘোষণা এবং ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে এই সুর শোনা যায়। **১৯১৯ থেকে ১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়।** প্রাদেশিক আইনগুলির মৌলিক চরিত্র সর্বত্রই মোটামুটি একরকম। বাধ্যতামূলক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষভাবে। শিক্ষা সেস্ এবং পরিপূরক সরকারী সাহায্য প্রস্তাব করা হয়। ৬ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রস্তাব করা হয় প্রথমে শহরাঞ্চলে এবং ছেলেদের মধ্যে। ক্রমে সংশোধনী আইনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চল এবং মেয়েদেরকেও বাধ্যতার আওতায় আনা হয়। **১৯১৯ সনের শাসনসংস্কার এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।** হার্টগ কমিটি মানোন্নয়নের প্রয়োজনে কড়াকড়ির কথা বললেও প্রসারের গতি অব্যাহত থাকে। এই কমিটি **অবশ্য অপচয় ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে এবং পাঠ্য-ক্রমের পুনর্গঠন সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করেন।** অপর দিকে জাতীয় চেতনা প্রতিফলিত হয় ১৯৩৭ সনে প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রকল্পে

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী

১৮৩৫ সনে রেভাঃ এ্যাডাম **প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক স্কুলের** কথা বলেছিলেন। বোম্বাইতে মহাত্মা ফুলেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৫২ সনে বোম্বাইয়ের রাজস্ব সমীক্ষা কমিশনার Capt. Wingate কৃষিজীবীদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সনে গুজরাটের স্কুলপরিদর্শক T. C. Hope. করের ভিত্তিতে স্কুলের কথা বলেন।

১৮৮২ সন থেকে বিষয়টি পরিচ্ছন্ন হতে থাকে। হাণ্টার কমিশনের কাছে এই সম্পর্কে বহু প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৮৮৪ সনে ব্রোচ-এর সহকারী পরিদর্শক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেন। ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বোম্বাইতে চিমনলাল শীতলবাদ এবং ইব্রাহিম রহমতুল্লা আন্দোলনও সংগঠন করেন। **১৯০৬ সনে বরোদা রাজ্যে** সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯১০-১১ সনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় **গোখেল বিল** উপস্থাপিত হয়। কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশন এবং মুসলীম লীগের নাগপুর অধিবেশনেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা হয়। তারপর ১৯১৮ সনে সর্বপ্রথম **বোম্বাইতে প্যাটেল আইন** পাস হয়। ক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ঐসব আইনের পরিবর্ধন ও সংশোধনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং সীমায়িত

প্রচেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সনে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে দ্রুত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করা হয়। ১৯৫০ সনে দশ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাংবিধানিক নির্দেশ গৃহীত হয়। তবুও অগ্রগতি হয় শম্বুক গতিতে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে ব্যর্থতার কারণগুলিও বোঝা দরকার। এ্যাডাম রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে চুঁইয়ে-পড়া নীতি গ্রহণের মধ্যে এই ব্যর্থতার বীজ। দ্বিতীয় কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গরজের অভাব। সরকার এ সম্বন্ধে আইনও পাস করেন নি। হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলিও অবহেলিত হয়। যখন প্রাথমিক শিক্ষা **বিস্তারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তখনও তথাকথিত মানোন্নয়নের নামে বিস্তারকেই বাধা দেওয়া হয়েছে।**

জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মোহ-গ্রস্ততার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে রচিত হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান। ইংরেজী ভাষার জগদ্দল পাথরও ছিল অন্তরায়। কিন্তু জাতীয় চেতনা যখন জাগলো, তখন অন্তরায় হলো বিদেশী সরকারের প্রশাসন। বারে বারে কুসংস্কার, ধর্মীয় বাধা, সমাজচেতনার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থসমস্যার অজুহাতে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। স্বাধীনতার উত্তর কালেও এই দুর্বলতা চলে এসেছে। শিক্ষা বাজেটই তার প্রমাণ। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে যেখানে মোট শিক্ষা-বাজেটের $\frac{1}{3}$ কিংবা $\frac{1}{2}$ ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, সেখানে আমাদের দেশে হয় অনেক কম।

আজও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে হাজার সমস্যা। ভারতের প্রায় $\frac{1}{3}$ গ্রামেই স্কুল নেই। সমস্যা রয়েছে গৃহ, সরঞ্জাম, শিক্ষক-সংগ্রহ, শিক্ষণ ও বেতনক্রমের। সমস্যা রয়েছে জীবনমুখী পাঠ্যক্রমের, অপচয় ও বন্ধ্যাত্বের। বয়স্ক শিক্ষার অভাব প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমতালে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচেষ্টা অগ্রসর হতে পারছে না।

বুনিয়াদি শিক্ষা: স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক স্তরে **বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতিকেই সরকারী প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়।** নূতন প্রাথমিক স্কুলকে বুনিয়াদি রূপে গড়া এবং পুরানো স্কুলকে বুনিয়াদি ধরনে ক্রমরূপায়নের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে **হস্তশিল্পকে আবশ্যিক করা হয়।** বুনিয়াদি ধরনের পুস্তক রচনা এবং শিক্ষক শিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৫৫ সনে একটি সমীক্ষা কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপরূপে এবং সমস্তরের সাধারণ শিক্ষার **সমমর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করেন।** সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে

বুনিয়াদি শিক্ষার সংযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণের সুপারিশও করেন। ঐ বছরেই পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, হস্তশিল্প এবং সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য National Institute of Basic Education স্থাপিত হয়।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতায় কোন বিশেষ কাজকে নির্দিষ্ট করে না রেখে সুতোকাটা, বয়ন, বাগানের কাজ, মিস্ত্রির কাজ, চর্মশিল্প. বই বাঁধাই, মৃৎশিল্প প্রভৃতি **নানা ধরনের প্রয়োজনীয় কাজকেই গ্রহণ করা হবে।** প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সঙ্গতি থাকবে। এইসব সিদ্ধান্তের ফলে অধিকাংশ রাজ্যসরকারই **বুনিয়াদি ও অবুনিয়াদি পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য করেছেন** এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। সর্বোপরি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে **গান্ধীজী-কল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ফলপ্রসূ হয়নি এবং রূপটিও কার্যকর হয় নি।** জাতির জীবনে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটতে পারে নি। বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবক্তা ও প্রচারক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকরাও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বুনিয়াদির বদলে ইংরেজী স্কুলকেই শ্রেয় মনে করেন। বস্তুতঃ শিক্ষায় নূতন শ্রেণী-বিভাগের এ আর একটি নমুনা। অবশ্য বুনিয়াদি শিক্ষার কিছু প্রসার নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার থেকে বুনিয়াদির প্রসার হয়েছে অনেক কম।

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সনের মধ্যে নূতন স্কুল হয়েছে মোট		১৩০৭২৮টি
কিন্তু এর মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক স্কুল		১০২১৮৬টি
আর নিম্ন বুনিয়াদি	”	২৮৫৪২টি

সুতরাং **বুনিয়াদির তুলনায় সাধারণ স্কুল হয়েছে প্রায় চারগুণ।**

এই **ব্যর্থতার কারণও আছে।** বুনিয়াদি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ। পাঠ্যক্রমে প্রস্তাবিত অনুবন্ধের মধ্যে সব পাঠ্য বিষয়কে সমভাবে গ্রহণ করাও যায় না। প্রচলিত শিক্ষণ ব্যবস্থায় অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ানোর দক্ষতাও হয় না। প্রকৃত বুনিয়াদি পাঠ্যপুস্তকও তৈরী হয় নি। হিন্দী শিক্ষার উপর অতি গুরুত্বকে সবগুলি রাজ্যে সুনজরে দেখা হয় নি। আবার ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার নীতিও সমালোচিত হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার সমতা এবং বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের প্রশ্নেও জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

প্রচলিত বুনিয়াদি স্কুলে কর্মকেন্দ্রিকতা অতি সামান্য। শিল্প সভ্যতার যুগে হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে সব কিছু শেখানোর কথাটিও সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাই শহরাঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটেনি। পরবর্তীকালে অবশ্য পাঠ্যক্রমের সংস্কার হয়েছে এবং শিল্পকেন্দ্রিকতার বদলে কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। **কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনধারার সঙ্গে এই কর্মকেন্দ্রিকতা সম্পৃক্ত হতে পারে নি।**

প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যর্থতা ধরা পড়েছে বলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি ধাঁচের করা এবং সাধারণ প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্কুলেব ব্যবধান কমানোর কথা বলা হয়েছে। **বস্তুতঃ বুনিয়াদি শিক্ষার প্রশ্নটি হয়েছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সমস্যা।** না একে রাখা যায়, না ছাড়া যায়! কোঠারি কমিশন অবশ্য বলেছেন যে, কোন বিশেষ স্তর কিম্বা বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাকে "বুনিয়াদি" নামাঙ্কিত করে সমস্যাকীর্ণ হওয়ার বদলে 'কর্মপরিচিতির' (Work Experience) মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষার মূলমন্ত্র "উৎপাদনী কর্মকেন্দ্রিকতাকে" সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাই যদি সম্ভব হয়, তবে আর পৃথকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য অস্থিরতা থাকবে না।

পরিকল্পনাকালে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

সংবিধানে মৌলিক নির্দেশের তালিকায় ৪৫ নম্বর সূত্রে সংবিধান প্রবর্তনের **দশ বৎসরের মধ্যে** (অর্থাৎ ১৯৬০) **সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্তই** বাধ্যতার কথা বলা হয়। এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। **কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতিও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।** প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির। তারা কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভ করেন। অবশ্য সাংবিধানিক নির্দেশকে রূপায়নের শেষ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

উপরোক্ত সাংবিধানিক নির্দেশ থেকে নিন্দনীয়ভাবে বিচ্যুতি হলেও বিগত পঁচিশ বছরে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সনে সাবা ভারতে প্রাথমিক স্কুল ছিল ১৩৪৯৬৬টি। ৬-১১ বছরের শিশুদের মধ্যে স্কুলে যেতো শতকরা মাত্র ৩০ জন। এদের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে দিত ৬০ শতাংশ। অপর দিকে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ১৯৫০-৫১ সনে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্কুল ছিল ২০৯৬৭১ এবং ছাত্র ছিল ঐ বয়সের ৪২·৬ শতাংশ;

১৯৫৫-৫৬ সনে হয় বিদ্যালয় ২৭৮১৩৫ এবং ছাত্র ৫২'৮ শতাংশ; **১৯৬৫-৬৬ সনে বিদ্যালয় ৪০৮৯৩০-এর বেশী এবং ছাত্র ৭৬'৭ শতাংশ; ১৯৭২'এ আনুমানিক ৮১'৯ শতাংশ। পঞ্চম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় লক্ষ্য ৯৭'১ শতাংশ।**

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে **অন্যান্য দিকে অবশ্য কিছু অগ্রগতি হয়েছে।** ১৯৫০-৫১ সনে **শিক্ষণ কলেজ** ছিল ভারতে মোট ৭৮২টি এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন ৫৮'৮ শতাংশ। ১৯৫৫-৫৬ সনে এই সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৯৩৯ এবং ৬০'২ শতাংশ; ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৪২৪ এবং ৭৩'৯ শতাংশ, বর্তমানে গড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ। **প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়** প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ৫৫৬ কোটি টাকা। চতুর্থ পবিকল্পনায় বরাদ্দ ধরা হয় ২৩৯ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রস্তাব রয়েছে ৭৪৩ কোটি টাকার। অন্ধ্র, গুজবাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস করা হয়েছে। অর্থাৎ মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরা বাদে সর্বত্রই আইন আছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করা হয়েছে। 'National Institute of Basic Education' বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা ও পরিকল্পনা করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন একটি সর্ব-ভাবতীয় পরিষদ।

কয়েকটি দুর্বলতার কথাও বলা দরকার। সারা ভারতে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মধ্যে স্কুলে নাম আছে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ৮১'৯ ভাগ। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে স্কুলে পড়ছে শতকরা ৫৫ জন। সুতরাং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত ব্যবধান খুবই বেশী। সর্বভারতীয় মানে প্রতি একমাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত স্থানে অর্থাৎ ৩'১৪ **বর্গ মাইল এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুল আছে।** কাগজ কলমের হিসেবে দেখা যায় সাধারণতঃ ৩০০ জন অধিবাসীর গ্রামেই গড়ে একটি করে স্কুল আছে। কিন্তু বাস্তবে আছে কী?

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। কিন্তু সরকারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও অন্যান্য স্কুলে বেতন দিয়ে পড়ে, এমন ছেলেমেয়েও কম নয়। শতকরা ৩৯ ভাগ শিশু বেতন দেয়। অবৈতনিক ছাত্রদেরও কাগজ এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে হয়। অবশ্য পিতামাতার সামর্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি কারণে এই আনুষঙ্গিক ব্যয়েরও তারতম্য আছে। **সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ গড়** অঙ্ক আমরা উপস্থিত করছি—

	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
প্রথম শ্রেণীতে	১'১০ টাকা	৩০'৬০ টাকা
দ্বিতীয় „	১'১৪ „	২৯'৪০ „
তৃতীয় „	২'৮০ „	৩৬'৮৪ „
চতুর্থ „	৫'৩৬ „	৫৩'৩৫ „
পঞ্চম „	৬ ৩১ „	৫০'৬০ „

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্যের চিত্রটি এই তথ্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির ত্রুটি ছাড়া এই **আর্থিক কারণেও অনেক শিশুর পড়াশুনা বন্ধ হয়।** প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয় তেমন ১০০টি ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে—

দ্বিতীয় শ্রেণীতে	৬১'২ টি ছেলে এবং	৫৬ ৪টি মেয়ে
তৃতীয় „	৫১'২ „ „ „	৪৫'৮ „ „
চতুর্থ „	৪৪ ৩ „ „ „	৩৫'৫ „ „

অর্থাৎ বহু ছেলেমেয়েই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়। এই **অপচয়ের সমস্যাটি** আমাদের দেশে বিরাট। এক্ষেত্রেও মেয়েদের মধ্যেই অপচয় বেশী।

তাছাড়া অনুত্তীর্ণতার ফলে শিক্ষাগত বন্ধ্যাত্বও বেশী।

প্রথম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় শতকরা		৪০'৩টি ছেলে,	৪৭'১টি মেয়ে
দ্বিতীয় „ „ „ „ „ „		২৬'৬ „ „	৩৩'১ „ „
তৃতীয় „ „ „ „ „ „		২২ ৬ „ „	২৬'৬ „ „
চতুর্থ „ „ „ „ „ „		২১'৭ „ „	২৫'৭ „ „
পঞ্চম „ „ „ „ „ „		১৬'৪ „ „	১৯ ৮ „ „

প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র সংখ্যা সর্বাধিক, কারণ এই শ্রেণীতে ⅓ থেকে ½ শিশুই পরীক্ষায় ফেল করে আবার পড়ে। এক্ষেত্রেও মেয়েদের হারই বেশী।

শিক্ষক-শিক্ষিকা :—সর্বভারতীয় হিসেবে ১৯৬৬ সনে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন মোট ১০৫০০০০ জন (পুরুষ ৮৫০০০০ এবং মহিলা ২০০০০০, অর্থাৎ মহিলারা ২৪ শতাংশ)। কিন্তু **শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন গড়ে ৭৩'৯ ভাগ।** বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য আছে। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য-

গুলিতেই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বাধিক—তামিলনাড়ুতে ৯৫'৭ ভাগ, কেরলে ৯০ ৮ ভাগ এবং অন্ধ্রে ৯০ ভাগ। **পশ্চিমবঙ্গে** ৩৮'১ ভাগ মাত্র। পরবর্তী হিসেব আজও পরিষ্কার ভাবে নেই।

অর্থ—প্রশাসন—নিয়ন্ত্রণ—ব্যবস্থাপনা

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে **কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক এবং নৈতিক দায়িত্ব আছে।** সম্প্রতি **সমসুযোগের নীতি** এবং প্রাথমিক স্তর থেকেই **"কমন স্কুল"** প্রথা প্রবর্তনের রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বভারতীয় **উপদেষ্টা বোর্ড'ও আছে।** তা ছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানও আছে। পরিকল্পনাখাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে সাধারণ ও বিশেষ খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। **বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমতা দূর করবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের।**

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। সংবিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য সরকারগুলির এক্তিয়ারে এবং কেবল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এজন্য শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে পরিদর্শক মণ্ডলী আছেন। স্থানীয় সেস্ ও রাজস্ব খাতে বরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান হয়। **রাজ্য সমূহে ব্যবস্থাপনা, আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।** এজন্য রয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরিদর্শকমণ্ডলী। কোন কোন রাজ্যে 'রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড'ও' আছে। সেস্ থেকে আয়, কোন কোন রাজ্যে বিশেষ ট্যাক্স এবং সাধারণ রাজস্ব খাতে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও পরিকল্পনা খাতে ব্যয় মঞ্জুর করা হয়।

রাজ্য সরকারই প্রাথমিক শিক্ষার চূড়ান্ত নিয়ামক হলেও সব রাজ্যেই প্রশাসন ব্যবস্থা কম বেশী বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। সাধারণতঃ জিলা, তহশীল, শহর ও অঞ্চল ভিত্তিতে প্রশাসন সংগঠিত। এইসব সংস্থার গঠন, ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আর্থিক সঙ্গতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তারতম্য আছে। তবে আবশ্যিকতার আইন সর্বত্র সমভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

বাংলা দেশের কথা

এ্যাডাম রিপোর্টে বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র ছিল আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বাংলা দেশেই ইংরেজদের অধিকার এলো সবচেয়ে আগে। সঙ্গে এলো ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য। প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হলো। তবু ১৮৫৪ সনের পরে কিঞ্চিৎ সরকারী উদারতা এবং বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে চেষ্টা স্থরু হলো। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় শিক্ষা সেস্ নিয়ে বিতর্কের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যাহত হলো। নূতন ধরনের স্কুল হলো অল্প সংখ্যায়; কিন্তু পাঠশালাগুলিও আত্মরক্ষার সংগ্রামে পরাজিত হতে লাগলো।

১৮৮২ সন থেকে যে চেষ্টা স্থরু হয় তার ফলশ্রুতি হলো **১৯১৯ সনের প্রাথমিক শিক্ষা আইন**। এই আইনে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। এর পরে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা প্রসারের জন্য—Biss Scheme। অপরাপর প্রদেশের তুলনায় বিলম্বিত হলেও **১৯৩০ সনে পাস হলো বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা (গ্রামীণ) আইন**। এই আইনে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হলো। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলা স্কুলবোর্ডও এই আইনেরই ফল। শিক্ষা সেস্ ও রাষ্ট্রীয় সাহায্যে, এবং জেলা সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়লো এই স্কুলবোর্ডের উপর। শিক্ষা প্রসারের চেষ্টাকে স্থসংহত করার উদ্দেশ্যে স্যার আজিজুল হকের মন্ত্রীত্বকালে নূতন পরিকল্পনাও করা হলো। কিন্তু বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে সবই হলো ব্যর্থ। বস্তুতঃ ১৯১৯ সনের আইন এবং ১৯৩০ সনের আইন (১৯৩২-এর সংশোধনীসহ) অবলম্বন করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টা শম্বুক গতিতে অগ্রসর হলো স্বাধীনতা পর্যন্ত।

স্বাধীনতা এলো বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। উদ্বাস্তু সমস্যা শিক্ষা সমস্যাকে তীব্রতর করে তুললো। কিন্তু একদিকে গণআকাঙ্ক্ষা এবং অপরদিকে সাংবিধানিক নির্দেশের চাপে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গেও বুনিয়াদি পদ্ধতিকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৯ সনে সিদ্ধান্ত হয় যে পুরাতন ধরনের স্কুলগুলিকে বুনিয়াদি ধরনে রূপায়িত করা হবে এবং সরকারী উদ্যোগ অথবা উৎসাহে নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সম্পূর্ণ বুনিয়াদি ধাঁচে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে থাকবে পাঁচটি শ্রেণী এবং ৪ জন করে শিক্ষক।

প্রথম পরিকল্পনা কালে বাণীপুরে বুনিয়াদি শিক্ষার Intensive Block প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে একটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ

কলেজ, ২টি জুনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ, জনতা কলেজ, ৩২টি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল, গবেষণা কেন্দ্র, সমাজ কেন্দ্র, লাইব্রেরী, রাষ্ট্রীয় অনাথাশ্রম প্রভৃতি। অনুরূপ আর একটি কেন্দ্র হয়েছে কালিম্পং-এ। ১৯৪৮-৪৯ সনেই প্রথম স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর প্রথম পরিকল্পনাকালে আরও কয়েকটি সিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ করে দুই ধরনের স্কুলের ব্যবধান কমানো হয়। Employment Relief Scheme অনুসারে শিক্ষক (স্পেশ্যাল ক্যাডার) দিয়ে শিক্ষক সমস্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে** সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প সংযোজিত হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনা কালে** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবরূপায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শহরাঞ্চলে বুনিয়াদি স্কুল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল **১৯৬৩ সনে গৃহীত শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-আইন** (Urban Primary Education Act 1963)। এই আইনে মিউনিসিপালিটি-গুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ উদ্দেশ্যে শিক্ষাকর ধার্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রয়োজনের হিসেব, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয় এবং সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কে অবিলম্বে পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে পরিপূরক সহকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক (তথা বুনিয়াদি) শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার হয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। নীচের তালিকা থেকে এ কথা বোঝা যাবে:

প্রাথমিক ও বুনিয়াদি সর্বমোট

	স্কুল	শিক্ষক
১৯৫০-৫১	১৪৭৮৩	৪৩১৯২
১৯৫৫-৫৬	২৩০৮১	৬৯১৭৪
১৯৬৫-৬৬	৩৩০০০	৯৮৩০৬
১৯৭৫	৪৪ হাজারের বেশী	১৬০০০০

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে এক বর্গ মাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে ব্যর্থতার কথাও মনে রাখা দরকার। কাগজ কলমের হিসেবে প্রথম

থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে ছেলেদের মাত্র শতকরা ৯৩ ভাগ এবং **মেয়েদের ৭০ ভাগকে এবং গড়ে মোট ৭৩ ভাগকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ করা হয়েছে। ৩৮০০০ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার গ্রামে কোন স্কুলই নেই।** স্কুল প্রতি গড়ে শিক্ষক আছেন তিন জন। শিক্ষক ও ছাত্রের হার ১ : ২৬। একজন শিক্ষক সম্বলিত স্কুল আছে প্রায় ৪ হাজার। **শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মাত্র ৩৮·১ শতাংশ।** গত ২।৩ বছর পশ্চিমবঙ্গে যেমন-তেমন করে কয়েক হাজার স্কুল তৈরী হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণের প্রসার হয়নি।

প্রাথমিক স্তরে প্রধান কয়েকখানি পাঠ্য বই রাষ্ট্রীয়কৃত হয়েছে, এটা সুখের কথা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় শিশুরা মাথা তুলতে পারছে না। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টি পৃথক বিষয় পড়তে হয়। বিচিত্র নয় যে অপচয়ের হার অতি বেশী। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পৌছবার পথে **অপচয় ঘটে ৩৪·৮ শতাংশ।**

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিশুর সংখ্যা ৫২ লক্ষ। এর মধ্যে দশ লক্ষ শিক্ষা-বঞ্চিত। যারা স্কুলের সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যেও ১০ লক্ষকে মাইনে দিতে হয়। তা ছাড়া ৪৪ হাজার স্কুলের মধ্যেও ৩৪ হাজারই চার ক্লাসের স্কুল।

গ্রাম ও শহরের প্রকৃত চিত্র :—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তেমনটি হয়নি। **এই রাজ্যের গ্রাম সংখ্যা ৩৮৪৭১ ; এর মধ্যে ৩৪০০০টি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল আছে।** অর্থাৎ ৪০০০ গ্রাম এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্জিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা বোধ হয় আরও খারাপ। ১৯৬৩ সনের আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে শতকরা ২ ভাগ সেস্ বসানোর অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। **এই রাজ্যে ৮৮টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ১৭টিতে অবৈতনিক শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।** বাস্তব সাফল্য অবশ্য আরও কম।

কলকাতা মহানগরীর ৬—১১ বছরের শিশুদের মধ্যে ৭৩ ভাগের জন্য "নামকেওয়াস্তে" স্কুল ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে প্রাথমিক স্তরের শিশু আছে ৪ লক্ষ, কিন্তু ঐ বয়সের ১২৫০০০ শিশু স্কুলে যাওয়ার কোন সুযোগই পায় না। কর্পোরেশনের স্কুল আছে মোট ২৬৩টি, ছাত্র ছাত্রী ৫৫ হাজার, শিক্ষক শিক্ষিকা ১৪৭৩ জন। অন্যান্য ধরনের স্কুল আছে ১০০০ হাজার। এর মধ্যে কিছু হলো বাস্তুহারা অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী ফ্রি প্রাইমারী, কিছু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ; অনেকগুলি হলো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ।

এগুলি বৈতনিক (বেতনের হার দুই থেকে সাত টাকা)। আর ব্যক্তিগত কিম্বা প্রতিষ্ঠানগত মালিকানায় আছে অনেক স্কুল। অনেক 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুল এই শ্রেণীর। এরা সরকারী সাহায্যের তোয়াক্কা রাখে না এবং নিয়ন্ত্রণও মানে না। তা ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় অনমুমোদিত স্কুল আছে কমপক্ষে ২০০টি। এই হিসেবের বাইরে অলিগলি বস্তিতে আছে অনেক "স্কুল" নামীয় কেন্দ্র। প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা ৬০০; ছাত্রছাত্রী ১ লক্ষ ২৪ হাজার।

পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও কল্পনার বিষয়। **গ্রামাঞ্চলে আইনগতভাবে শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।** বাধ্যতা সম্পর্কে একটি মামুলী সরকারী ঘোষণা আছে মাত্র। **শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সবটা অবৈতনিকও নয়, আবশ্যিকও নয়।** সেখানে শিক্ষা কিনতে হয় চড়া দামে। বিনামূল্যের শিক্ষা অতি নিম্নমানের। তাছাড়া কলকাতার মত শহরেও শতকরা ৪০টি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাই আজও চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দেও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। ছাত্রপিছু এখানে বার্ষিক গড় ব্যয় ২৪ টাকা মাত্র। মোট ব্যয়ের ৭৯.৯৬ ভাগ বহন করেন সরকার, ১১.৬৯ ভাগ স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৮.৩৫ ভাগ আসে বেসরকারী সূত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসিত হয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক আইনের সাহায্যে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯১৯ সনের আইন, ১৯৩০ সনের (গ্রামীণ) আইন, ১৯৩২ সনের Bengal Municipal Act, ১৯৫১ সনের Calcutta Municipal Act, ১৯৬৩ সনের Urban Primary Education Act, এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারা। **রাজ্যভিত্তিতে কোন আইনসিদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড আজও গঠিত হয়নি।** (যদিও আইন পাস হয়েছে)। তার ফলে গ্রাম ও শহরের কৃত্রিম ব্যবধান রয়েছে। সর্বোপরি **কলকাতাকে ১৯৬৩ সনের আইনের বাইরে রাখা হয়েছে।** মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের বিধিও নেই।

এই দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার পেতে হলে অবিলম্বে সংবিধানের ৪৫ নং ধারা কার্যকরী করা প্রয়োজন। দিল্লীর আইনের মত আইন পাস করে সমগ্র রাজ্যের জন্য অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বোম্বাই আইনের অনুকরণে attendance mechanism দরকার। এই স্তরে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যম এবং দ্বিতীয় কোন ভাষা

পড়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রয়োজন। সর্বোপরি বেসরকারী উদ্যম সম্পূর্ণ বাতিল করে অবিলম্বে Common School ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

রাজ্য বোর্ড, পুনর্গঠিত জেলা বোর্ড, শিক্ষা সেস্‌, শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ২ শতাংশ এবং সাধারণভাবে জমির উপর ৫ শতাংশ হারে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকরের ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা আরম্ভ হলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্যা

একথা পরিষ্কার যে প্রাথমিক শিক্ষা আজও সমস্যাজর্জরিত। এই সমস্যাগুলিকে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত বিভাগে আলোচনা করা চলে। **সামাজিক কারণগুলির মধ্যে** উল্লেখ করা চলে অনুন্নত অঞ্চল ও গোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা এবং রক্ষণশীলতা, পিতামাতার নিরক্ষরতা, বর্ণ-বৈষম্য, কুসংস্কার-মূলক সামাজিক আচারবিধি, গ্রামাঞ্চলে যানবাহন ও পথঘাটের অসুবিধা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি। এই সব কারণেই ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত তারতম্য রয়েছে। তাছাড়া বছরে এক শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করা চলে।

শিক্ষাগত কারণও রয়েছে অনেক। বাস্তব জীবনের সাথে প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। তাই পিতামাতা এর প্রয়োজন বুঝতে পারেন না। ছাত্রকল্যাণ-মূলক কাজ নেই। সরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধের অভাব রয়েছে। এখনও পুরানো পাঠপদ্ধতি চলছে। এ সবের ফলে শ্রেণী পরীক্ষায় **অনুত্তীর্ণতা** এবং **সম্পূর্ণ পড়া শেষ করার আগেই স্কুল ছাড়ার ফলে অপচয়** হচ্ছে প্রচুর। শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা অসন্তোষজনক হওয়ায় তাঁরাও উৎসাহ পাচ্ছেন না। সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাও নিতান্ত দায়সারা এবং আমলাতান্ত্রিক। কর্মকেন্দ্রিকতার মূল শিক্ষাগত নীতি থেকে প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষাও বিচ্যুত হয়েছে, গান্ধীজীর দর্শনও এই শিক্ষায় প্রাণবন্ত রূপ পায় নি। বহু ক্ষেত্রেই **স্থানীয় জীবন এবং শিল্পবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংযোগ ঘটে নি।** আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা অবাস্তব হয়ে উঠেছে। তাই এ শিক্ষার **প্রসার হয়েছে মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে।**

আর্থিক কারণগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী বরাদ্দ হয়েছে নৈরাশ্যজনকভাবে অল্প। যেখানে সরকারী ভাণ্ডারের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি ছিল সর্বাধিক, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অন্যান্য স্তরের শিক্ষায় বরাদ্দ হয়েছে বেশী। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও সেস অথবা ট্যাক্স বসিয়ে

অর্থ সংগ্রহ করতে গড়িমসি করেছেন। বরাদ্দ ব্যয়ের বহুলাংশই গেছে গৃহ-নির্মাণ এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে। আর্থিক সংকটের ফলে বই খাতা প্রভৃতির আনুষঙ্গিক ব্যয় বহনের ক্ষমতা দরিদ্র অভিভাকরা ক্রমেই হারিয়েছেন। সর্বোপরি দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের জন্য শৈশবেই অনেক ছেলেমেয়েকে পিতামাতার সঙ্গে উপার্জনের ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বলা চলে বহুক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-আইন থাকলেও তা দৃঢভাবে প্রয়োগের অভাব। কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে কর্মচারীদের সন্তানের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয় নি। প্রশাসন এবং পরিদর্শন দপ্তরে আমলাতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্য। সর্বোপরি বলা দরকার যে স্বাধীনতার **উত্তরকালে পুরাতন মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে**। এই সমস্ত কারণেই সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে ব্যর্থতা। তবে আশার কথা এইটুকু যে শিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের সামগ্রিক আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল "ভাগ্যবানদের জন্য শিক্ষার" চেতনা আর নেই। সকলের জন্য "কমন স্কুলের" আদর্শও প্রচারিত হচ্ছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে সমস্যাগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

(১) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরও প্রগতিশীল ও বাস্তবভাবে নির্ধারণ করা দরকার। (২) সেই অনুসারে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা দরকার। বর্তমান পাঠ্যক্রম ওজনে ভারি, শুষ্ক তথ্যবস্তুতে ভারাক্রান্ত, বাচনধর্মী ও নিষ্ক্রিয়, শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহভিত্তিক নয়। এই পাঠ্যক্রমে নমনীয়তার অভাব এবং আত্মশিক্ষার সুযোগও নেই। (৩) পাঠ্যপুস্তক রচনাও ত্রুটিপূর্ণ। পুস্তক পরিবেশন ব্যবস্থাও লজ্জাকর অব্যবস্থারই নামান্তর। (৪) ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বত্র একটি সাধারণ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। (৫) সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুযোগ নেই। (৬) পাঠপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। (৭) প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যও অবাস্তব। (৮) শিক্ষোপকরণের স্বল্পতা অন্যতম প্রধান সমস্যা ও ত্রুটি। (৯) শিশুদের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে অবহেলিত। স্কুল টিফিন কিম্বা দিবাহার ব্যবস্থা অপরের করুণার উপর নির্ভরশীল। (১০) শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করবার জন্য শিশু নির্দেশনা ব্যবস্থা (Child guidance) নেই। (১১) পরীক্ষা ও প্রমোশনের ব্যবস্থাও পুরাতনধর্মী। (১২) এইসব অবস্থার ফলে অনুত্তীর্ণতা ও অপচয় অত্যধিক। (১৩) শিক্ষক সমস্যা

এবং শিক্ষক শিক্ষণ সমস্যাও জটিল। শিক্ষণ কলেজের সংখ্যা অল্প; পাঠ্যক্রম মূলতঃ তত্ত্বমূলক; ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ কম; শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা এখনও আশাপ্রদ নয়। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ব্যক্তিগত নজর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। (১৪) এ ছাড়া রয়েছে জমি, বাড়ী, আসবাবের সমস্যা। (১৫) সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষা প্রসার, সমসুযোগ, উন্নত প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা মানের উন্নয়ন, এবং (১৬) প্রচুর অর্থসঙ্গতি ও সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব।

সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনার দরকার নেই, কারণ **সমস্যা-গুলি উল্লেখের মধ্যেই রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত।**

ভবিষ্যতের চিন্তা (কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব)

আমাদের সামনে **যুগপৎ সমস্যা রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার এবং গুণগত উন্নতির।** ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। এই প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখেই কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে, (ক) প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হবে ছয় বছর বয়সে এবং চলবে **একটানা ৭ কিম্বা ৮ বছর।** (খ পাঠ্যক্রম, পাঠপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এই সময়টিকে ২ ভাগে ভাগ করা চলবে—৪ কিংবা ৫ বছরের **নিম্ন প্রাথমিক** এবং ৩ কিংবা ২বছরের **উচ্চপ্রাথমিক** নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাকে অবিলম্বে এবং উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **অবৈতনিক করতে হবে।** প্রাথমিক শিক্ষার শেষে থাকবে—(ক) ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা, অথবা (খ) ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি স্তর সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য নিম্নরূপ।

নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার **উদ্দেশ্য হবে দায়িত্বশীল এবং সার্থক নাগরিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন।** এই বয়সের সব ছেলেমেয়েকেই স্কুলে আনতে হবে। শিশু জন্মের পরে স্কুলে ভর্তির সম্ভাব্য বছর হিসেব করে **আগেই তালিকাভুক্ত করা চলতে পারে** (Pre-Registration)। এই স্তরে **বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অপচয় এবং স্থিতিশীলতা রোধ করা।** বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয়, তাদের মাত্র ৫০ ভাগ চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ করে এবং মাত্র ৩৮ ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করে। আর সকলে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন **পঞ্চম শ্রেণীর আগে কোন অপচয় না হয় এবং শতকরা ৮০ ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করে।**

পাঠ্যক্রম থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের বোঝা কমাতে হবে। **নিম্ন প্রাথমিক স্তরে**

ভাষা, প্রাথমিক গণিত এবং প্রকৃতিপাঠের উপর **গুরুত্ব আরোপ** করা হবে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে থাকবে লিখন, পঠন, গণিত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পাঠ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন যাপনের শিক্ষা। এই স্তরে **কেবল মাতৃভাষায় দক্ষতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।** প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যাকে পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। সমাজবিদ্যাকে 'সমাজপাঠ' হিসেবে উপস্থিত করা উচিত। খেলাধুলা এবং মুক্তাঙ্গন ব্যায়ামই হবে শারীর শিক্ষার পদ্ধতি। **প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র একটি ভাষাই শিখতে হবে**—মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা। মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা আলাদা হলে, শ্রেণীতে ১০টি এবং স্কুলে ৪০টি ভিন্নভাষী শিশু থাকলেই তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ রকম ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী থেকে কোন শিশু ঐচ্ছিকভাবে আঞ্চলিক ভাষাও শিখতে পারবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অল্প বয়সের সব শিশুই সমতালে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং **নিম্ন প্রাথমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণীর জন্যই নির্দিষ্ট পূর্ব-নির্ধারিত মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) না রাখবার কথা বলা হয়েছে।** তা ছাড়া প্রতি শ্রেণীর শেষে বাৎসরিক প্রমোশন পরীক্ষার বদলে ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি 'Cycle' হিসেবে বিবেচনা করে দু'বছরের শেষে একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। তেমনি প্রয়োজনবোধে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীকেও একটি চক্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। **পরীক্ষা সম্পর্কে এই নূতন সুপারিশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া সব পরীক্ষাই হবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা।**

নিম্নপ্রাথমিক স্তরের শিশুকেও সমাজচেতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে **সমাজসেবার কাজের** কথা বলা হয়েছে। স্কুলের মধ্যে সমাজবদ্ধ জীবন, শ্রেণীকক্ষ ও আঙিনার পরিচ্ছন্নতা ও সজ্জা, স্কুল বাড়ীতে চুনকাম বা রং লাগানো প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ এবং গ্রাম সমাজের সঙ্গে পরিচয়, সমষ্টি-উন্নয়ন-প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, অক্ষম বৃদ্ধ এবং শিশুর সাহায্য প্রভৃতি নানা ধরনের কাজেই শিশুরা উৎসাহ পেতে পারে।

সর্বোপরি **এই স্তরেও কর্মপরিচিতির** (Work Experience) **উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।** কাগজের কাজ, মাটির কাজ, সুতোকাটা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজকেই পাঠ্যক্রমের অংশ বলে ধরা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে—বুনিয়াদি শিক্ষার মৌল পরিচয় হল—(ক) উৎপাদনী কাজ, (খ) পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সৃজনশীল কাজ ও পরিবেশের সমন্বয়, এবং (গ) স্কুল ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। "Work

Experience"-এর মাধ্যমে এই চরিত্র সমস্ত স্তরের শিক্ষাতেই পরিব্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং **কোন বিশেষ স্তরের কিংবা কোন বিশেষ ধরনের স্কুলকে আর বুনিয়াদি শিক্ষা তথা বুনিয়াদি স্কুল বলে অভিহিত করার প্রয়োজন নেই।**

উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা: উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবিষয় হবে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও গভীর। এই সময় শিক্ষামানের সুনির্দিষ্টতা আসবে এবং প্রণালীসম্মত পদ্ধতিতে পড়ানোর কাজও হবে বহুলাংশে নিয়মিত। পাঠ্যক্রমে থাকবে **মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী** কিংবা **সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা (ইংরেজী)**। তৃতীয় একটি ভাষাকে ঐচ্ছিকভাবে নেওয়া চলবে। অঙ্ক এবং বীজগণিতের সমন্বয়ে হবে গণিতের পড়া। **বিজ্ঞানের পড়া হবে আরও সুনির্দিষ্ট।** পঞ্চম শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ বিজ্ঞান, ভূমিবিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান; ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং প্রাণিবিজ্ঞান; সপ্তম শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান। **বিজ্ঞান পড়াকে পৃথক পৃথক বিষয়ের পড়া হিসাবেই দেখতে হবে।** তেমনি মিশ্রিত সমাজবিদ্যার পরিবর্তে **ইতিহাস, ভুগোল, পৌরবিজ্ঞান** প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে থাকবে। এই স্তরে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এ সবের সঙ্গে থাকবে সাধারণ কোন শিল্প ও কলা শিক্ষা।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে **সমাজসেবার জন্য** থাকবে স্কুলের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ, এবং জনস্বাস্থ্য ও সমষ্টি উন্নয়ন কাজ। **কর্মপরিচিতির জন্য** থাকবে বাঁশ ও বেতের কাজ, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প, তাঁতের কাজ, বাগানের কাজ কিংবা খামারের কাজ। **অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্নত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।** মাধ্যমিক স্তরে যারা আর্থিক কিংবা অন্য কোন কারণে সাধারণ শিক্ষা নিতে পারবে না, তাদের জন্য থাকবে **বিকল্প আংশিক সময়ের বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা।** ছাত্রদের প্রবণতা অনুসারেই বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রম স্থির হবে। প্রথমাবস্থায় বৃত্তিশিক্ষায় যোগদান হবে ঐচ্ছিক। তবে লক্ষ্য থাকবে ১৯৭৫-৭৬ সনে শতকরা ১০ জন এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে শতকরা ২০ জনকে আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরেও **পরীক্ষা হবে আভ্যন্তরীণ।** তবে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে থাকবে মৌখিক পরীক্ষা এবং Cumulative Record-এর ব্যবস্থা। কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না, তবে শিক্ষার মান সমীক্ষার জন্য রাজ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ উন্নত

য়নের কোন পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন। **জেলাভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ চলতে পারে।** তবে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট এবং Cumulative Card দেবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। বৃত্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যেও **বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া চলতে পারে।**

নিম্ন প্রাথমিকের তুলনায় উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল গড়বার সমস্যা বেশী। উচ্চপ্রাথমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে এই স্তরে আরও অনেক স্কুলের যোগান দিতে হবে। তাই নির্দিষ্ট স্তরের **শতকরা কত শিশুকে** কোন সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে আনতে হবে তার **লক্ষ্যও কমিশন স্থির করে দিয়েছেন।**

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের পটভূমিতেই চতুর্থ পরিকল্পনার কথা বিচার করা যাবে। নীচের তথ্যেই চিত্রটি পরিষ্কার হবে।

ব্যয়ের দিকে :—	তৃতীয় পরিকল্পনায়	= ১৭৯ কোটি টাকা ;
	চতুর্থ "	২৩৯ " "
	(এই অঙ্কটি মোট শিক্ষা পরিকল্পনার ৩০ শতাংশ)।	
লক্ষ্যের দিকে :—	১৯৭০ সনে পড়ুয়া ছিল ৫'৫৯ কোটি ,	
	১৯৭২ " " ছিল ৬'০ "	
	পরিকল্পনার শেষে সম্ভাব্য = ৬'৮২ "	

১৯৭০'এ ৬-১১ বয়সের ৭৯% শিশু স্কুলে গিয়েছে ;

পরিকল্পনার শেষে ৮৪'৯% " যাবে।

কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থা হয়েছে ৮১'৯ শতাংশের জন্য। পঞ্চম পরিকল্পনার বরাদ্দ ৭৮২'১ কোটি টাকা। স্কুলের ব্যবস্থা হবে ৯৭'১ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য। পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছিল যে করেসপণ্ডেন্স কোর্স-এর সাহায্যে ১৪০০০০ প্রাথমিক শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি।

সর্বোপরি বলা দরকার যে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ১০ বছর সময় চলে গেলেও, এবং কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলি ভারত সরকার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম, পরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবার কাজ কিছুই হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা—(১) পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে **ভর্তির যোগ্য শিশুর সংখ্যা প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে গড়ে ১৫০০০০।** তাই চতুর্থ পরিকল্পনা কালে আনুমানিক আরও ১৮ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুলের দরকার ছিল। তাহলে ৬-১১ বছরের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যেত। খসড়া পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যই স্থির ছিল। (২) পরিকল্পনার খসড়ায় ৪২ **লক্ষের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্য** স্থির করা হয়েছিল। (৩) চার-ক্লাশ স্কুলের অন্ততঃ **এক-তৃতীয়াংশকে পাঁচ ক্লাশে উন্নীত করার লক্ষ্য** গ্রহণ করা হয়েছিল। (৪) অপচয় হার কমানোর কথা বলা হয়েছিল। (৫) শিক্ষার উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থাকে উন্নত করবার কথা ছিল; (৬) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার এবং শিক্ষকদের বেতনক্রম আরও সংশোধনের আশা পোষণ করা হয়েছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা, এবং এই টাকার ৪৫ ভাগই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের আশা পোষণ করা হয়েছিল। **প্রস্তাবিত ৪৫ কোটির মধ্যে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসের জন্য, ৩ কোটি টাকা স্কুল বাড়ির জন্য, ৩ কোটি টাকা শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য এবং ১২ কোটি টাকা বই ও উপকরণের জন্য।** পরিকল্পনা খাতে এই বরাদ্দ ছাড়াও সাধারণ রাজস্ব খাতে আরও ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Discuss the growth and expansion of Primary Education in India since 1882.

("প্রাথমিক শিক্ষাচেতনার ক্রমবিকাশ"-অংশটির উপযুক্ত অংশ এবং "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী" অংশে ১৮৮২ সনের পরবর্তী পর্যায়ের কথা বলতে হবে।)

2. What attempts were made to introduce compulsory and free primary education in India? Account for the failure.

(এই প্রশ্নের জন্য কোন প্রস্তুতি সংকেত প্রয়োজন নেই। "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী" শীর্ষক অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করতে হবে।)

3. Trace the development and expansion of Basic Education in (a) India, (b) Bengal (and West Bengal) since 1937. Why is the expansion not satisfactory ?

(বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা, ওয়ার্ধা সম্মেলন, খের কমিটি প্রভৃতি—অর্থাৎ ১৯৪৭ পর্যন্ত এই শিক্ষা চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে নবম অধ্যায় থেকে উত্তর সংগ্রহ করতে হবে (১৮১ পৃঃ)। ১৯৪৭'এর পরবর্তী সময়ের জন্য এই অধ্যায়ের "বুনিয়াদী শিক্ষা" শীর্ষক অংশ ; এই শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে তথ্যের জন্য "বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি" শীর্ষক অংশের সারাংশ নিতে হবে। ব্যর্থতার কারণগুলিও এই অংশের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তথ্যের জন্য 'বাংলা দেশের কথা" অংশে দেখতে হবে বাণীপুর স্কীম ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে ঐ অংশে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আলাদা তথ্য।)

4. Discuss the development of Primary and Basic Education in Bengal (and West Bengal) in the current century.

("বাংলা দেশের কথা"—শীর্ষক অংশের সারমর্ম তৈরি করতে হবে।)

5. Give a critical account of the condition of Primary Education in the Urban and Rural areas of West Bengal.

("গ্রাম ও শহরের প্রকৃত চিত্র" অংশটির প্রথম থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন আইন সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত বলতে হবে।)

6. Make a critical analysis of the problems of Primary Education and offer suggestions for improvement.

("প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্যা" শীর্ষক অংশটির সারসংক্ষেপ উপস্থিত করতে হবে।)

7. Write a critique of the Kothari Commission scheme of Primary Education.

("ভবিষ্যতের চিন্তা—কোঠারি কমিশন" শীর্ষক সম্পূর্ণ আলোচনাটির সারমর্ম প্রয়োজন হবে। এই সঙ্গে সমালোচনাও দিতে হবে।)

8. Critically comment upon the 4th Educational Plan for India and also for West Bengal.

('চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই উপস্থিত করতে হবে।)

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা চেতনা বিবর্তনের পটভূমিতে স্বাধীনতার যুগে পরিকল্পনা, অগ্রগতি, সমস্যা ও সমাধানের কথা আলোচনা করবো।

মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ

আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে—(১) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, (২) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, (৩) উচ্চ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা। উদ্যোক্তা ছিলেন সরকারী শিক্ষা-কমিটি, খ্রীষ্টান মিশনারী, বেসরকারী অভারতীয় এবং স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়। **শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না।** ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নীতিগত বিতণ্ডাই ছিল বৈশিষ্ট্য। অথচ ইংরেজী হলো রাষ্ট্রভাষা। চাকুরিতে ইংরেজী অগ্রাধিকার পেল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আগ্রহ বাড়লো। তাই একটি সুনির্দিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং প্রশাসনেব প্রয়োজন হল। এই 'ব্যবস্থা' এবং প্রশাসন-যন্ত্রটিই প্রবর্তিত হয় ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচের সাহায্যে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি হলো ইংরেজী অধ্যুষিত, প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত, বিশ্ববিদ্যালয়মুখী, পুঁথিগত মানবিক বিদ্যা।

১৮৫৪ সনে প্রবর্তিত সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সুযোগে এবং জাতীয় চেতনার প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হয়। অচিরেই দেশীয় বেসরকারী উদ্যম প্রাধান্য পায়। মিশনারীদের সাথে এবং সরকারী প্রশাসনের সাথে দেশীয় উদ্যমের সংঘাত লাগে। এ সমস্যার সমাধান করেন ১৮৮২ সনে হান্টার কমিশন। ক্রমে **ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে।** হান্টাব কমিশনের আগে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক মধ্যবিত্তের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়মুখী মানবিক বিদ্যার মূল্য ছিল অনেক। বেকারত্বের সমস্যা তখনও আসেনি। কিন্তু ক্রমেই এই একপেশে শিক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। হান্টার কমিশনকেও তাই 'এ' কোর্স, এবং 'বি' কোর্সের সুপারিশ করতে হয়। বস্তুতঃ **এই যুগ থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার নবচেতনা আরম্ভ হয়।**

হান্টার কমিশনের পরে **মাধ্যমিক শিক্ষা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনকেও স্পর্শ করতে থাকে।** সরকারী কর্তৃপক্ষও শিক্ষিত বেকার শ্রেণী সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেন।

এই সময়েই আসেন কার্জন। **নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানোন্নয়নের জন্য তিনি সাধারণ সংস্কার করেন।** তবু মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরও প্রভাব পড়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, প্রশাসন সম্বন্ধে নূতন চেতনার **প্রথম ফলশ্রুতি প্রতিফলিত হয় স্যাডলার কমিশন রিপোর্টে।** স্বয়ংসম্পূর্ণ, দীর্ঘতর, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। তার পরে যুগপৎ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কার ঘটে। হার্টগ কমিটি, সপ্রু কমিটি, এ্যাবট-উড্ কমিটি এবং পরিশেষে সার্জেণ্ট কমিটির সুপারিশেই এই পর্যায় বিধৃত।

স্বাধীনতার উত্তরকালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কথা বলেন ১৯৪৮-৪৯ সনে **তারাচাঁদ কমিটি।** এই কমিটি সুপারিশ করেন ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছরের প্রাক-মাধ্যমিক কিংবা বুনিয়াদী এবং ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ **বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ১২ বছরের শিক্ষাপ্রস্তুতি।** এই কমিটি **বহুমুখী পাঠ্য এবং একটিমাত্র সমাপ্তি পরীক্ষার কথাও বলেন।** এই সময়ে **পশ্চিম বাংলাতেও রায়চৌধুরী কমিটি** মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্বোপরি ডঃ **রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** (১৯৪৮-৪৯) ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকেই দুর্বলতম অংশরূপে আখ্যা দেন। এই সবের ফলে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে নূতন সমীক্ষার দরকার হয়। ডঃ **লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন** (১৯৫২-৫৩)। শিক্ষা কাঠামো, পদ্ধতি, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, সহপাঠক্রম, শিক্ষক-শিক্ষণ. প্রভৃতি সব বিষয়েই কমিশন সুপারিশ করেন। সংশোধিতরূপে এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা ১৯৫৬ সন থেকে চালু হয়।

মুদালিয়র কমিশন

মুদালিয়র কমিশন প্রথমেই **মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিবর্তনের কথা বলেন।** মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—(ক) প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি, (খ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি, (গ) যুব-সমাজের চরিত্রগঠন, (ঘ) উৎপাদনী এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি এবং (ঙ) মধ্যম স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে কমিশন প্রস্তাব করেন **১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য**

পূরণ করবে। যারা উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহী, তাদের জন্য হবে **বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রস্তুতি** এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু তাদের জন্য হবে **জীবনের প্রস্তুতি।**

কমিশন প্রস্তাব করেন ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৪ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ মোট **১২ বছরের স্কুল-শিক্ষা।** এর পর **৩ বৎসরের প্রথম ডিগ্রী পাঠ।** সুতরাং কমিশন ইণ্টারমিডিয়েটকে তুলে দিয়ে ঐ পাঠ্যকে মাধ্যমিক স্তরে আনবার কথা বলেন। (অন্তর্বর্তীকালে অবশ্য ১ বছরের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থাকবে)। নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে (অষ্টম শ্রেণী) অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সাঙ্গ হবে। **ঐ স্তরের শেষে ট্রেড স্কুল এবং বৃত্তিগত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে** ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য সুযোগের কথাও কমিশন বলেন। তেমনি **উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শেষেও নানা ধরনের বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার কথা বলা হয়।**

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন যে (ক) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম হবে সকল শিশুর জন্য একই রকম। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম রচিত হবে বিশেষীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে। (খ) উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠক্রম ব্যক্তি এবং সমাজ—উভয়ের প্রয়োজন মেটাবে। এই উদ্দেশ্যে পাঠক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সামাজিক সংহতির উদ্দেশ্যে সকলের জন্য আবশ্যিক পাঠকে নিয়ে গঠিত হবে '*Core*' এবং ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে বিশেষ পড়ার জন্য থাকবে '*Periphery*' অর্থাৎ ঐচ্ছিক পাঠ্যবস্তু। সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কমিশন **ঐচ্ছিক পাঠক্রমকে ৭টি প্রবাহে ভাগ করেন।** এইগুলি হল মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান এবং চারুকলা। প্রতিটি প্রবাহে থাকবে কয়েকটি পাঠ্য বিষয়। এর মধ্য থেকে ছাত্ররা বিষয় বেছে নেবে। তবে **যে ছাত্র যে বিভাগ বাছাই করবে, তাকে সেই বিভাগের মধ্যেই হেরফের করতে হবে, দুই কিংবা ততোধিক বিভাগ থেকে ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন চলবে না।** উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রথম দুই বৎসর (নবম ও দশম শ্রেণী) 'কোর' বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, অর্থাৎ বিশেষীকরণ হবে না। **শেষের দুই বৎসরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ঐচ্ছিক বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বিশেষীকরণ সুরু হবে।** এর ফলে একদিকে যেমন প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ থাকবে, অপরদিকে তেমনি সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের এই মৌল সুপারিশ ছাড়াও কমিশন নিম্নলিখিত

বিষয়সমূহেও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন—(১) শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম ও শিক্ষণীয় ভাষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার সমন্বয়ে একটি ত্রিভাষা সূত্র। (২) পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়। (৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্থক করতে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন। (৪) পরীক্ষাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-মুখিনতা কমানোর জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭টি প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের জন্য Guidance and Counselling ব্যবস্থা প্রবর্তন। (৬) ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা প্রণয়ন। (৭) সৃজনশীল সমাজচেতনা এবং চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সহপাঠ্যমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন। (৮) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যোগ্য শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষকের যোগান এবং এই উদ্দেশ্যে বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন। (৯) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য প্রতি রাজ্যে শিক্ষা-অধিকর্তার সভাপতিত্বে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে দশজন বিশেষজ্ঞ সহ ১৫ জনের 'মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' গঠন।

মুদালিয়র কমিশনের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গে 'দে কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশনও মূলতঃ মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশকেই সমর্থন করেন। কেবল রাজ্য শিক্ষাবোর্ড গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে সংশোধনের সুপারিশই এর বিশেষ অবদান।

পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের মূল কথা ছিল ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা এবং সেই অনুসারেই পাঠক্রম প্রণয়ন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ১২ বৎসরের স্কুল-শিক্ষা সম্বন্ধে সপ্রু কমিটি, তারাচাঁদ কমিটি, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশনের দ্ব্যর্থহীন সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির "বিশেষজ্ঞরা" পাঠক্রম প্রভৃতি অন্য সব বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ মূলতঃ অপরিবর্তিত রেখে শিক্ষাকালকে করেন ১১ বছর। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা থেকে নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তিনটি পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রগতি হয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ১৯৪৭ সনে সারা ভারতে মাধ্যমিক স্কুল ছিল ১২৬৯৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৫৩৯৯। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে নিম্নরূপ।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬৫-৬৬	১৯৭২
(ক) নিম্ন মাধ্যমিক/উচ্চ বুনিয়াদী				
স্কুল	১৩৫৯৬	২১৭৩০	৭৫৭৯৮	৯৪১৯৯

(খ)	এই স্তরে (১১-১৪) মোট শিশু সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যার হার	১২ ৭ শতাংশ	১৬'৫	৩০'৮	৩৫'৩
(গ)	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	৭২৮৮	১০৮৪৮	২৭৪৭৭	৩৮৪৮৮
(ঘ)	১৪-১৭ বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতে ছাত্র সংখ্যাব হার	৫'৩ শতাংশ	৭'৮	১৬'২	২০'৮
(ঙ)	বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	—	২৫৫	২৩৮৬	৪৮৮১
(চ)	শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	৫৩	১০৭	১০৭২	১১৩৯
(ছ)	শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার—				
	নিম্ন-মাধ্যমিক স্তবে	৫৩'৩ শতাংশ	৫৮ ৫	৭৬'৯	৮৩'১
	উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৩'৮	৫৯'৭	৬৮'৬	৭৮'৬

(জ) মাধ্যমিক শিক্ষাবাবদ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা

দ্বিতীয়	"	৫১	"	টাকা
তৃতীয়	"	৮৮	"	টাকা
চতুর্থ		১৪০		টাকা

উপরোক্ত প্রসার ছাড়াও *Central Board of Secondary Education* **গঠিত হয়** এবং এই সংস্থার অনুমোদন-প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা হয় (১৭০টি কেন্দ্রীয় স্কুল সহ) ছয় শতাধিক।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল, রাজ্যস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। মিউনিসিপ্যাল সংগঠনগুলির পক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়তে কোন আইনগত বাধা নেই। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক পৌরসংস্থাই এই দায়িত্ব পালন করেন।

সমালোচনা—১১ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় লাভ-লোকসানের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে **ইংরেজ আমলের তুলনায় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছিল**। সমগ্র কৈশোর জীবনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে আনবার নীতিও স্বীকৃত হয়েছিল। পাঠক্রমে *Core-Periphery* **ব্যবস্থাও মূলতঃ শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মত**। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক চেতনা, অর্থনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক চেতনা এবং কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রবণতা এই ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

কিন্তু **লোকসানের দিকেই ওজনের পাল্লা ভারি**। শিক্ষাকালকে এক

বছর কমানো হল। সময়ের তুলনায় **পাঠ্যবস্তুর ওজন হল বেশী।** প্রতিটি পাঠ্যবিষয়েই ছিল পুঁথিগত বিস্তারের প্রবণতা। **প্রতিটি পাঠ্যবিষয় ছিল পৃথক সত্তা নিয়ে আপন মহিমায় গুরুত্বপূর্ণ।** পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হয়নি। **অল্প সময়ের মধ্যে** বিস্তর বিষয়বস্তুতে পরীক্ষা পাসের তাগিদে ছাত্ররা সেই পুরাতন মুখস্থ পন্থাই গ্রহণ করে চলেছে। শিক্ষণ ও পঠন পদ্ধতি আজও চিরাচরিত। সহপাঠক্রম-মূলক কাজ আজও গুরুত্ব লাভ করেনি, এবং অবসর বিনোদনের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণই উপেক্ষিত। অষ্টম শ্রেণীর পরেই পাকাপাকিভাবে প্রবাহ বাছাই করাও অবৈজ্ঞানিক।

১১ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষায় **পড়ার সাথে প্রয়োগের সমন্বয় হয়নি।** এ শিক্ষা তাই **জীবনকেন্দ্রিক হয়নি।** বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ কম থাকায় সাধারণ উচ্চশিক্ষার দরজায় আজও ক্রমবর্ধমান ভীড়। এ শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিও **পুরোপুরি হয়নি, প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার শিক্ষাও হয়নি।** প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংহতিও সাধিত হয়নি।

ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও অনেক ত্রুটি ছিল। স্কুল স্থাপিত হয়েছে এলোমেলো অপরিকল্পিতভাবে, এবং বহুক্ষেত্রে নানাবিধ অশুভ চাপে। **শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুযোগ-সুবিধার তারতম্যও হয়েছে।** সুতবাং শিক্ষায় সমানাধিকার স্থাপিত হয়নি। অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রবাহ নির্বাচনের ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটেছে। **অতি অল্প বয়সে বিশেষীকরণের ঝোঁকও শিক্ষাবিদদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে।** উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত **শিক্ষক যোগানের দিকটিও সফল হয়নি।** শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের হারও অঞ্চল-ভেদে ৩০ থেকে ৯০ শতাংশ। যোগ্যতা ও প্রয়োজনের তুলনায় বেতন ও মর্যাদা আজও আকর্ষণীয় নয়।

প্রশাসন ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ড ও সরকারী দপ্তরের দ্বন্দ্ব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। **সরকারী দপ্তর, বোর্ড, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক প্রভৃতি বহুবিধ প্রভুর চাপে শিক্ষকরা ব্যতিব্যস্ত।** মেয়েদের পক্ষে প্রায় সর্বত্রই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ আজও সর্বত্র হয়নি। শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বারেবারেই হোঁচট খাচ্ছে। এই পরিবেশে ছাত্র অসন্তোষ বিস্ফোরিত হয়েছে। বস্তুতঃ **প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষায় রয়েছে এক সর্বাঙ্গীণ সংকট।** তাই বিগত কয়েক বছর যাবতই এই শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষাবিদগণ ক্রমাগত মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিসংখ্যান

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত

উন্নতি অবশ্যই হয়েছে। আমরাও এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক-যৌবনকালের শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছি। আমরাও "Secondary Education for all"—এই ধ্বনিকে নীতি হিসেবে নিয়েছি। ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থে এই নীতিই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যস্থল থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে। আগামী ২০ বছরেও ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। বিভিন্ন রাজ্যে অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষানীতি বিভিন্ন রকম সাফল্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারতে অবৈতনিক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে

তত্ত্ব ও নীতির কথা বাদ দিলেও সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান বাস্তব অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫১ সনে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৩'১ লক্ষ, স্কুল ২০৮৮৪টি
১৯৬৬ „ „ „ „ =১৫৫'৭ „ „ ১০৩২৭৫টি
১৯৭২ „ „ „ „ =২১১'৬ „ „ ১৩২৬৮৭টি

কিন্তু ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী অনেক কম। ১৯৬৫-৬৬ সনে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়ে ছিল ছেলের মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ। আলাদা মেয়ে স্কুলের অভাবে শতকরা ৭৮ ভাগ মেয়েরাই পড়েছে ছেলেস্কুলে। ঐ বছর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে ছিল ছেলেদের ২৬ ভাগ এবং ৪০ ভাগ মেয়েরাই পড়েছে ছেলেদের স্কুলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেকটাই অভিভাবকদের ব্যয়ে!

পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে বেতন দিয়েছে ১৬'৪ শতাংশ ছেলে-মেয়ে। মাইনে থেকে শিক্ষা-ব্যয়ের ৭'৪ ভাগ সংকুলান হয়েছে।

অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণীতে বেতন দিয়েছে ৬৪'৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী।

বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের ৩৯'২ ভাগ।

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষালয়ে বেতন দিয়েছে ৭২ ভাগ ছাত্র ছাত্রী।

বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের ১'৭২ ভাগ।

এই হলো ১৯৬৬ সনের হিসেব। এর পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে, সে কথা আমরা পরে বলছি। কিন্তু বেতন ছাড়াও শিক্ষার অন্যান্য খরচ আছে। সপ্তম শ্রেণীতে গড়ে ছাত্র-প্রতি ব্যয় বই বাবদ = ২৭'২৯ টাকা

অন্যান্য = ১৪'৮৮ টাকা। মোট = ৪২'১৭ টাকা

অষ্টম „ „ „ „ বই বাবদ = ২৯'৩০ টাকা, অন্যান্য ১৬'৯৫ টাকা, মোট ৪৬'২৪ টাকা

উচ্চতর শ্রেণীতে এই ব্যয় আরও বেশী। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কারণে অনেক ছেলেমেয়েই স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। প্রথম শ্রেণীর তুলনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র থাকে ২৩'৬ ভাগ, সপ্তম শ্রেণীতে ১৯'৫, অষ্টম শ্রেণীতে ১৫'৪ ভাগ।

তা ছাড়া পাঠক্রমের ত্রুটি, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি প্রভৃতির ফলে অনুত্তীর্ণতার হারও বেশী। কয়েক বছর আগে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৪ এবং মেয়েদের ১৭'৩ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৩'৭ এবং মেয়েদের ১৭'৯ ভাগ, অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ৩১'২ এবং মেয়েদের ১৬'৪ ভাগ। স্কুল ফাইনালে পাশের হার সাধারণতঃ পঞ্চাশের নীচেই থাকে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০-এর সামান্য বেশী থাকলেই আজকাল "ভাল" বলা হয়ে থাকে।

তবুও গত কয়েক বছরে অবৈতনিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই বেতনহীন পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে অন্ধ্র, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থানে, শুধু মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম-বঙ্গ ও বিহারে। নাগাভূমিতে তফসিলী উপজাতি এবং মাসিক ৩০০ টাকার কম আয়সম্পন্ন পিতামাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে অন্ধ্র, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অরুণাচল, এবং শুধু মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে মধ্যপ্রদেশ ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট মনিপুর, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে।

মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

ভাষা সমস্যা :—মাধ্যমিক স্তরেও ভাষা সমস্যা মূলতঃ দুটি—শিক্ষার মাধ্যম এবং শিক্ষণীয় ভাষা। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে স্বাধীনতার আগেই স্বীকৃত হয়েছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। অবশ্য ইংরেজ চলে যাওয়ার পরে ইংরেজীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে আগেকার তুলনায় বেশী। 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাকুরির বাজার, সামাজিক আভিজাত্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

ভাষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন। মুদালিয়র কমিশন ত্রিভাষা সূত্র প্রস্তাব করেছিলেন—

মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক), ইংরেজী ও হিন্দী। (এবং ঐচ্ছিক ভাষারূপে প্রাচীন) এই অনুসারে জুনিয়র হাই স্কুলে ইংরেজী ও হিন্দী এবং অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়ানো হয়ে এসেছে। একথা সর্বজনবিদিত যে বর্তমানে যেভাবে শেখানো হয়, তাতে হিন্দী কিম্বা সংস্কৃতে কোন কার্যকরী জ্ঞান হয় না।

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আগেকার সুপারিশগুলি থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত। মাতৃভাষা (কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা), হিন্দী এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি নূতন ত্রিভাষা সূত্র প্রস্তাব করেছেন, যেমন—

(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক)।

(খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দী কিম্বা ইংরেজী।

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে— (১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজী অথবা হিন্দী, (৩) অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা।

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং উপরে লিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি।

সুতরাং দেখা যায় পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন মত দিয়েছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পড়ার কথা বলেছেন; নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তিনটি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুটি ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন।

ত্রিভাষার এই সূত্রটি রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং পার্লামেণ্টের শিক্ষা কমিটির দ্বারা আলোচিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ত্রিভাষা সূত্র সমর্থন করে বলা হয় যে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ছাড়া অহিন্দী অঞ্চলে তৃতীয় ভাষাটি হওয়া উচিত হিন্দী এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলে এটি হওয়া উচিত অন্য একটি ভারতীয় ভাষা, সম্ভব হলে দক্ষিণ ভারতীয়। মনে রাখা দরকার যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক স্তরে দুই/তিন কিম্বা ততোধিক ভাষা শিক্ষার আবশ্যিক কিম্বা ঐচ্ছিক ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং তিনটি ভাষা শেখাবার কথাতেই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত প্রণালী ও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব।

পাঠক্রম ও শিক্ষক সমস্যা: ভাষা ছাড়াও রয়েছে সাধারণ পাঠক্রম ও আনুষঙ্গিক সমস্যা। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তি শিক্ষার মধ্যেও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। বেশীর ভাগ উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলই ছিল কেবল মানবিক কিম্বা ঐ সঙ্গে বিজ্ঞান প্রবাহ নিয়ে। সবগুলি প্রবাহ সম গুরুত্ব পায়নি।

উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রবাহ ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হল। বিজ্ঞান শিক্ষক, কারিগরি, কৃষি প্রবাহের জন্য শিক্ষক দরকার হল। গ্রামীণ স্কুলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষকের জন্যই উপযুক্ত শিক্ষণের প্রয়োজন হল। কিন্তু **শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারটি চাকুরির বাজারে প্রতিযোগিতা এবং আকর্ষণীয় বেতনক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**। বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হয়েছে আরও গভীর। তাই গ্রামের স্কুলে বিজ্ঞান, ইংরেজী প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া হল দুষ্কর। মেয়ে-স্কুলে সমস্যাটি আরও গভীর।

শিক্ষক সমস্যার দ্বিতীয় দিক হল উপযুক্ত শিক্ষণের দিক। শিক্ষণকাল মাত্র দশ মাস, অথচ পুঁথিগত পাঠের বোঝা বিরাট। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারিক কাজের জন্য (Practice teaching) সময় ও সুযোগ অল্প। তাই শিক্ষণ ব্যবস্থাও মূলতঃ তত্ত্বমূলক এবং তত্ত্বকথাও ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে সর্বাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই শিক্ষণলব্ধ দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষণের সুযোগ সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া উপকরণের অভাবে এবং ছাত্র-সংখ্যার চাপে আধুনিক পাঠ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাও যায় না। **এর পরে প্রশ্ন শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত অগ্রগতি**। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি এদিকে অনেক বেশী অগ্রসর; পশ্চিম বাংলার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এখানে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন ৮০০০০। এর মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিক্ষণ-প্রাপ্ত। প্রতি বছর এই রাজ্যে অবসর নেন কিম্বা চাকরি ছাড়েন ৪৫০০ শিক্ষক। তাঁদের জায়গায় নূতন শিক্ষক নেওয়া হয়। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে বকেয়া রয়েছে বহু (backlog)। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫১০০০। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজ আছে বর্তমানে ৪১টি। এই কলেজগুলিতে শিক্ষণ পেতে পারেন বৎসরে ৬½ হাজার। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ সমস্যার সমাধান হতে এখনও অনেক দেরি। এর জন্য **প্রয়োজন আরও অনেক ট্রেনিং কলেজ**।

শিক্ষামানে অবনতির সমস্যা: বহু আগে স্যাডলার কমিশন বলেছিলেন যে উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা না হলে উচ্চশিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে না। তখন থেকে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি মানাবনতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন। দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। মুদালিয়র কমিশনও ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন এই ভরসায় যে দীর্ঘতর সময়, উন্নত পাঠক্রম এবং ছাত্র বাছাই নীতির ফলে মানের উন্নতি হবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে এ কথাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে।

অবশ্য মানাবনতির কারণও অনেক, যেমন (১) ১২ বছরের বদলে ১১ বছরের স্কুল শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারি পাঠ্যবস্তু আয়ত্ত করা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। ২) অনমনীয় প্রবাহ ব্যবস্থার ফলে ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়েছে। (৩) গাইডেন্স ব্যবস্থাও সফল হয়নি। (৪) তত্ত্বসমৃদ্ধ এবং তথ্যবহুল পাঠক্রম সকলের পক্ষে অনুপযুক্ত। (৫) শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতাও কম দায়ী নয়। (৬) পড়ানোর পদ্ধতিতেও আছে ত্রুটি। (৭) কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের জন্য (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) শিক্ষক পাওয়াও দুষ্কর। (৮) লাইব্রেরী ও লেবরেটরির অভাব কিম্বা অসম্পূর্ণতা। (৯) ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা। (১০) সহজতম পন্থায় পাস করার জন্য পাঠ্যবইয়ের চেয়ে "প্রশ্নোত্তর পুস্তকের" উপর ছাত্রছাত্রীর নির্ভরতা। (১১) ছাত্র বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা বিরতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রভাবও শিক্ষা সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

ছাত্র-বিশৃঙ্খলার সমস্যা: উপরে আলোচিত শিক্ষাগত সমস্যাগুলি অনেক সময় ছাত্র-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (indiscipline)। অবশ্য ছাত্র **বিশৃঙ্খলার আরও অনেক কারণ আছে,** যেগুলির মধ্যে **একটি অংশ সৃষ্টি হয় স্কুলের বাইরে** সমাজ-জীবনে। বিশৃঙ্খলা তখনই ঘটে যখন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষা পরিবেশের গরমিল ঘটে, অথবা উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

ভগ্নস্বাস্থ্য শিক্ষার্থী কখনোই পড়াশুনায় উদ্যোগী হতে পারে না। সে অমনোযোগী হবে, পিছিয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। যার জীবনে শৈশবকাল থেকে সদভ্যাস সৃষ্টি হয়নি, তার পক্ষেও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীর বয়স এবং মানসিক শক্তির সঙ্গে পাঠক্রম যদি সামঞ্জস্যহীন হয়, তখনই সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা। পাঠক্রম অতিরিক্ত শক্ত হলেও বিশৃঙ্খলা হবে, অতিরিক্ত নরম হলেও তাই হবে, কারণ বাড়তি মননশক্তি নানাভাবে পথ খুঁজে নেবার ব্যবস্থা করবে। অবৈজ্ঞানিক পাঠপদ্ধতি, ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তার অভাব, পড়ার সঙ্গে বিশ্রাম ও আনন্দের যথাযথ সমন্বয়ের অভাব, সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডের ঘাটতি, অতি শাসন ও নিপীড়ন প্রভৃতি নানা কারণেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিকলাঙ্গ, কিম্বা স্বল্পমেধা অথবা মানসিক পঙ্গুতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী যদি সাধারণ স্কুলে পড়ে তবে তাদেরকে কেন্দ্র করেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি প্রতিভাবান শিক্ষার্থী যদি সাধারণ পাঠক্রমে এবং স্কুলে যথেষ্ট মননশীলতার সুযোগ না পায় তবেও অমনোযোগী ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। অনেক সময় অতি সাধারণ বিষয় নিয়েও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়—যেমন আলো-হাওয়া শূন্য ক্লাস-ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বসবার এবং শিক্ষকের কথা শোনা অথবা বোর্ডের লেখা

দেখবার অসুবিধা প্রভৃতি। তা ছাড়া বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খলার অন্যতম উৎস।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্কের উপর বিশৃঙ্খলার প্রশ্নটি বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষকের পক্ষপাতমূলক আচরণ, বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্পর্শকাতর হৃদয়ে বিরূপ আঘাত, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, শিক্ষকের আদর্শহীনতা প্রভৃতি ছাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ। শিক্ষা যখন উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থী যখন আন্তরিক প্রেরণা পায়, শিক্ষা পরিবেশে যখন ভারসাম্য থাকে, ছাত্র যখন নিবিষ্টচিত্তে কাজের মধ্যে আত্মপরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায়, তখন সে নিজেই সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এ জিনিস শৃঙ্খলা, শৃঙ্খল নয়।

ছাত্র বিশৃঙ্খলার সমস্যা আজকের দিনে অবশ্য কেবল স্কুলের মধ্যেই সৃষ্টি হয় না। প্রাকযৌবন শিক্ষার্থী যখন প্রকৃতিগতভাবেই চলতি দুনিয়া সম্পর্কে জানতে চায়, যখন তার সমাজচেতনা জাগে, যখন তার কাছে আদর্শের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন বৃহত্তর সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে থাকবে নিরুদ্বিগ্ন এবং নিরুত্তাপ, এটা আশা করাই যায় না। যদি কেউ থাকে, তবে সেই অবস্থাটিকে সমাজচেতনার অভাব এবং মানসিক অসঙ্গতি বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উপায়, পদ্ধতি ও ভঙ্গি সম্বন্ধে শিক্ষা মহলে এখনও মতবৈষম্য আছে।

পরিশেষে বলা দরকার যে যৌনবিকৃতি এবং অসুস্থ যূথবদ্ধতাও বিশৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কৈশোর জীবনে ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতঃই বন্ধুবৎসল হয়। পরস্পরের সঙ্গে তারা যূথবদ্ধ (group) হয়ে উঠে, দলচেতনা প্রায়শঃই ব্যক্তিচেতনাকে ছাপিয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা হয় দলের পাণ্ডা। দলনেতৃত্ব এবং দলজীবন যদি সুপথে চালিত হয়, তবে দলের প্রতিটি সভ্যের জীবনেই আসে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পরিতৃপ্তি। কিন্তু দলনেতৃত্ব বিপথগামী হলে দলটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অসুস্থ দলজীবনের সঙ্গে যদি যৌনবিকৃতির উপসর্গটি যোগ হয়, তবে তো আর রক্ষেই নেই।

ব্যক্তিগত অসঙ্গতি থেকে ব্যক্তিগত অপরাধপ্রবণতা জন্ম নেয়। **অসুস্থ যৌথ জীবন থেকে দলবদ্ধ অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয়।** আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মপরিপূর্ণতার স্বাস্থ্যকর পথ না পেয়ে বিকৃত পথ অবলম্বন করেছে যারা, সমাজের চোখে ঘৃণিত হয়ে তারা সমাজকে প্রত্যাঘাত করতে চায় অপরাধপ্রবণতার পথে।

সামাজিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেপরোয়া আচরণ করে ছেলেমেয়েরা। তাই দলবদ্ধ মারপিট কিংবা রাহাজানি আজ ক্রমবর্ধমান।

এই পরিস্থিতির জন্য বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই বহুলাংশে দায়ী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্কুল অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকারও যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। অবশ্য স্কুলে বিশৃঙ্খলা এবং বৃহত্তর পরিবেশে "ছাত্র-যুব অসন্তোষ" এক নয়। এ বিষয় আমরা পরে আর একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব।

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্যা: সংবিধান অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব আছে অনেক। পরিকল্পনার যুগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের কাজও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সহায়করূপে রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং আলাদা একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ। মন্ত্রি-দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট N. C. E. R. T. প্রতিষ্ঠানও পাঠক্রম, পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা করছেন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষাব সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারেব। তা ছাড়া ৬০০ এর উপব নানা ধরনের কেন্দ্রীয় স্কুল এবং সর্বভারতীয় মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। বাৎসরিক বাজেট এবং পরিকল্পনা খাতে শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় বৃত্তি কিম্বা বিজ্ঞান প্রতিভা বৃত্তিও দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্বাস্তু, তপশীল, উপজাতি খাতেও বিশেষ বরাদ্দ করা হয়।

রাজ্যস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব একদিকে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রক তথা শিক্ষা বিভাগের এবং অপরদিকে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের কোন বাধা নেই। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই এ বিষয়ে দায়িত্ব নিচ্ছেন।

সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে স্কুল কমিটি। সরকারী স্কুলগুলির আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের, সুতরাং নিয়ন্ত্রণও সম্পূর্ণ সরকারী। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারী উদ্যম আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন ট্রাস্ট এবং ধর্মসংগঠনেরও স্কুল রয়েছে অনেক। বেসরকারী ব্যক্তিগত দানও মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমগ্র ভারতের জন্য সামগ্রিক শিক্ষানীতি স্থির করেন কেন্দ্রীয় সরকার, তবুও রাজ্যস্তরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য আছে। তা ছাড়াও কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য কোন স্তরেই সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ সরকার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব পালন করেন না।

আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা : মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক দিনের জমাট সমস্যা সমাধানের জন্যই মুদালিয়র কমিশন বসেছিল, এবং তার সুপারিশ অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯ বছর ধরে ঐ কাজ হয়েছে। আগেকার সমস্যার কোন কোন ক্ষেত্রে যে সমাধান না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু পর পর চারটি পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। আগের চেয়ে প্রসার অবশ্য অনেক হয়েছে; কিন্তু অর্থব্যয়ের তুলনায় প্রতিদান পাওয়া গেছে কম। হস্তশিল্পের কাজ এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পাঠ সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। গাইডেন্স ব্যবস্থার চরম দুর্বলতার ফলে ছাত্র বাছাইও ঠিকমত হয়নি। প্রবাহ নির্বাচন ব্যবস্থাকে অনমনীয় প্রকোষ্ঠরূপে বিচার করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার দিকেও স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই নির্দেশ করা গেছে। সর্বোপরি জটিল ভাষা-প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নামে নূতন আভিজাত্য গড়ে উঠেছে। গ্রাম-শহরের অসাম্য, ধনী-দরিদ্রের অসাম্য, কলা-বিজ্ঞানের অসাম্য, শিক্ষকদের বেতনক্রমের অসাম্য, বিভিন্ন মালিকানায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের অসাম্য, স্কুলের মধ্যে শিক্ষাগত সুবিধা এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার অসাম্য প্রভৃতি অসংখ্য সূত্র ধরে অসম-সুযোগ ব্যাপকভাবে এখনও রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গেও এই শিক্ষা সম্পৃক্ত হয়নি, সুতরাং চাকুরির বাজারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়নি।

অনেকগুলি সমস্যার পিছনে অন্যতম কারণ হলো অর্থসমস্যা। মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির; তবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করে থাকেন। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫১ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮৮ কোটি টাকা। এই অঙ্কটি তৃতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষা বরাদ্দের ২১·৬ ভাগ। কোন রাজ্যেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৩৪ ভাগের বেশী নয় (কেরালায় ৩৪ ভাগ)। এর মধ্যেও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি অংশ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ হয় বাজেটের ১৯ ভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষার ভাগে পড়ে এর একটি অংশ মাত্র।

সরকারী স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। **বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক।** এগুলির মধ্যে সম্পদশালী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য নেয় না, সরকারী নিয়ন্ত্রণও নামে মাত্রই মেনে চলে। এখানে ছাত্র বেতন ৫০ টাকা পর্যন্তও হয়। সাধারণ বেসরকারী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সরকারী সাহায্য সাধারণতঃ দেওয়া হয় তিনভাবে—(১) বেতনের ঘাটতি পূরণ। এক্ষেত্রে ছাত্রবেতন

এবং শিক্ষক-বেতনের মধ্যে ঘাটতি অঙ্কটি সরকারী সাহায্য হিসেবে আসে। (২) নির্দিষ্ট থোক সাহায্য (Lump Grant)। (৩) এককালীন কিম্বা বিশেষ সাহায্য। মিশনারী কিম্বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও অনেক স্কুল রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক স্কুলের বেশ ভাল অর্থভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু সাধারণ বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির অন্ত নেই। সরকারী সাহায্যের স্বল্পতার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হয় দরিদ্র পিতামাতাকেই। সর্বভারতীয় হিসেবে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ১৬'৪ ভাগ ছেলেমেয়ে বেতন দিয়ে পড়ে। বেতন থেকে শিক্ষার ৭'৪ ভাগ ব্যয় সংকুলান হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬৪'৮ ভাগ মাইনে দেয়। মাইনে থেকে সংকুলান হয় ৩৯'২ ভাগ ব্যয়।

এইসব সমস্যার প্রতিকারের জন্য কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে। (১) সরকারী নোটিশ জারি করে স্কুলের জন্য জমি সংগ্রহ। (২) সরকারী গৃহনির্মাণ বিভাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে স্কুলবাড়ী তৈরি করা। (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা থেকে লেবরেটরীর সরঞ্জাম সরবরাহ করা। (৪) অন্যান্য শিক্ষোপকরণ তৈরির জন্য সরকারী কারখানা স্থাপন করা। (৫) স্কুলপাঠ্য বইও সরকারী উদ্যোগে কিম্বা সরকারী সাহায্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা। (৬) সর্বোপরি শিক্ষাকর কিম্বা অন্যান্য পন্থায় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। ফাঁকি দেওয়া আয়করের অংশমাত্রও বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে ভারতের শিক্ষা-প্রচেষ্টা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।

সমস্যা আমাদের অনেক ; সমস্যার সমাধান না করলে অগ্রগতির সম্ভাবনাও নেই। এই পরিবেশেই কোঠারি কমিশন উপস্থিত করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চেতনা ও পরিকল্পনা।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—কোঠারি কমিশন

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেছেন এবং পাঠক্রমও বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুইটি পর্যায়ে (নিম্ন মাধ্যমিক VIII to X, উচ্চ মাধ্যমিক XI and XII) মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির দিক থেকে সমস্ত স্তরটিকেই একক-ভাবে দেখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য শক্তিশালী সাধারণ শিক্ষা, যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে কিম্বা উচ্চতর শিক্ষায় কিম্বা নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরির বিশেষ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পড়া বিষয়গুলিকে **নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে** আরও গভীরভাবে পড়তে হবে। পাঠ্যক্রমে থাকবে **তিনটি ভাষা**—মাতৃভাষা কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় কিম্বা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং অন্য কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। **গণিত ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব** দেওয়া হবে। পদার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্যিক পাঠ্য। ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান পৃথকভাবে পড়ানো হবে। তেমনি শারীরশিক্ষা, যে কোন কলা এবং নৈতিক শিক্ষাও হবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাধ্যতামূলক সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই স্তরে সমষ্টি-উন্নয়নকর্মের প্রতিই **গুরুত্ব** দেওয়া হবে। প্রতি **বৎসরে পূর্ণ দশ দিন কিম্বা সমগ্র স্তরের মধ্যে যে কোন সময়ে একসঙ্গে ৩০ দিন** বাধ্যতামূলকভাবে সমাজসেবার কাজে অংশ নিতে হবে।

(স্বাধীনতাব যুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন)

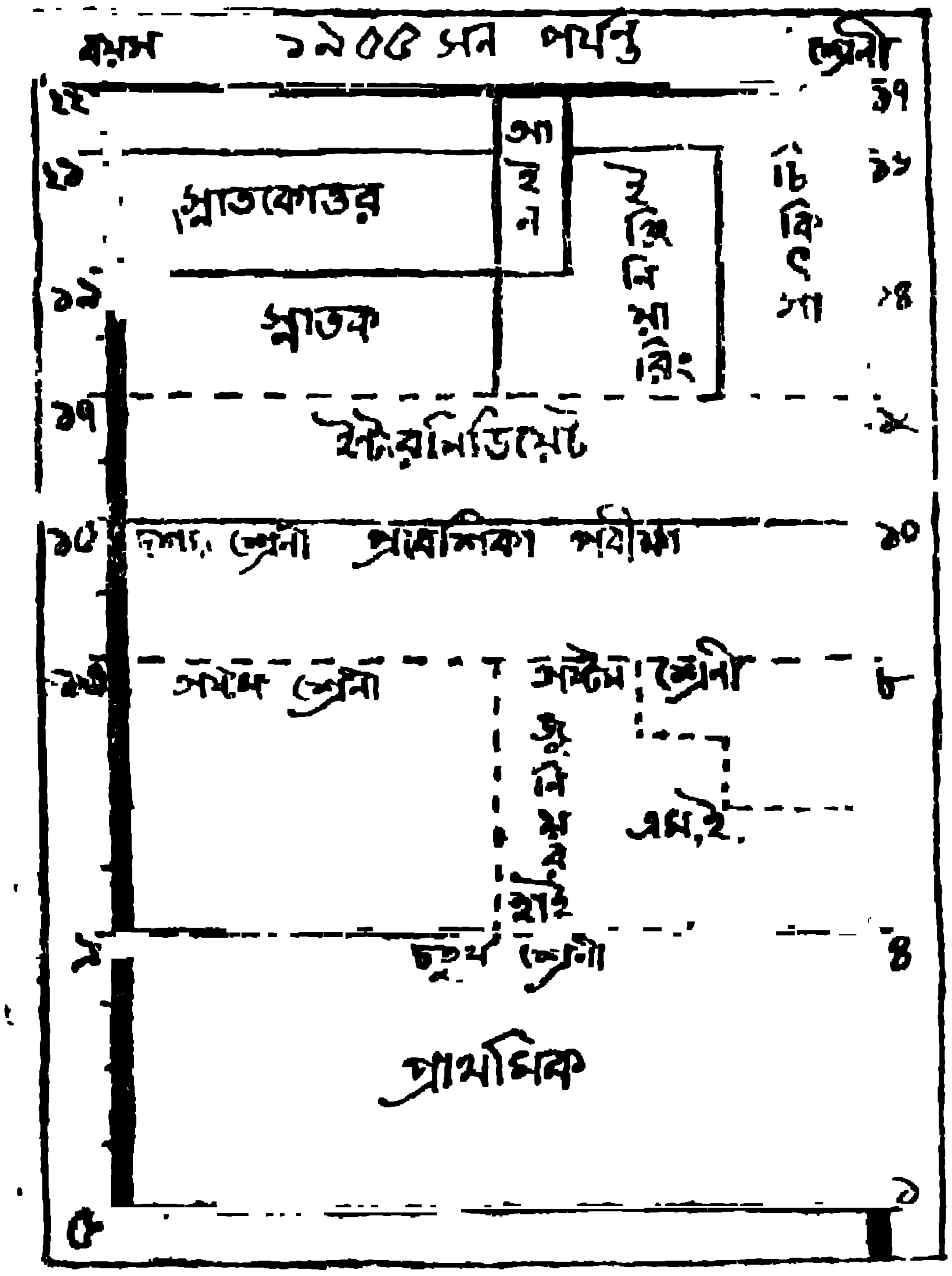

কর্মপরিচিতির জন্য থাকবে কাঠ, ধাতু, চর্ম শিল্প এবং কার্পেট তৈরি, পুতুল তৈরি, বই বাঁধাইয়ের কাজ। ছাপাখানা, দর্জি কিম্বা তাঁতের কাজ গ্রহণ করা চলবে। এই উদ্দেশ্যে স্কুলের সঙ্গে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। **নিম্নমাধ্যমিক স্তরের**

কর্মপরিচিতিকে উৎপাদনমুখী করার জন্য কৃষি-খামার কিম্বা কারখানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে। এজন্য গো-সংরক্ষণ, শস্য-সংরক্ষণকেও যথার্থ 'কাজ' বলে ধরতে হবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বিশেষীকরণের সুযোগ কিম্বা বহু-মুখিনতা থাকবে না। অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম হবে সাধারণ চরিত্রের। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পড়ার শেষে হবে **প্রথম সাধারণ বহিঃপরীক্ষা।**

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে লক্ষ্য থাকবে ক্রমান্বয়ে শতকরা ২০টি শিক্ষার্থীকে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া। এই জন্য সপ্তম/

(মুদালিয়র সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা)

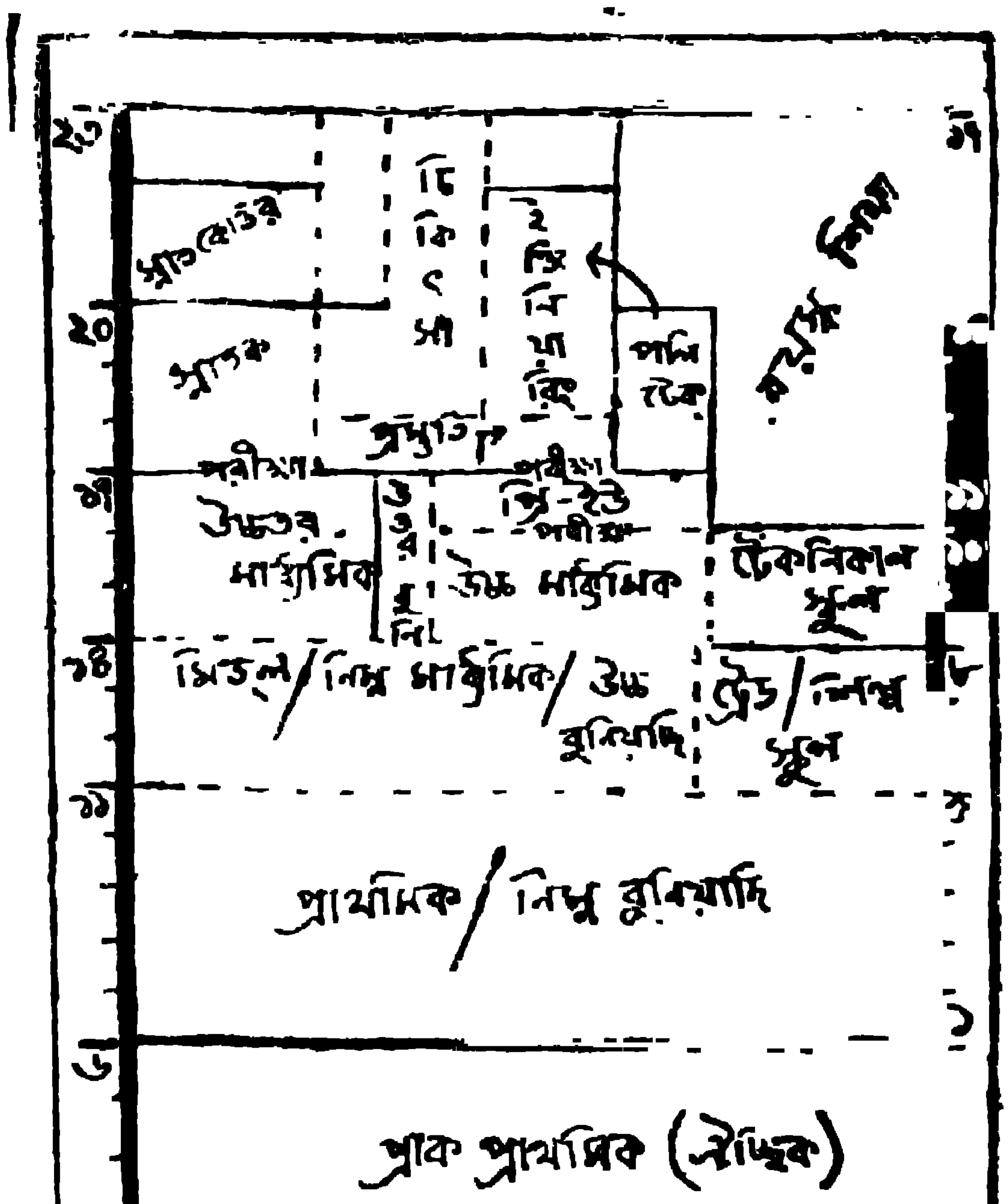

অষ্টম শ্রেণীর পরে আংশিক এবং পুরো সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রয়োজন হবে। এই বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুলে এবং **উদ্দেশ্য হবে শিল্পে নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি।**

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর—পূর্বতন স্তরের **সাধারণ শিক্ষাকে দৃঢ়তর এবং**

প্রসারিত করা এবং সেই সঙ্গেই ঐচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে **বিশেষীকরণের সূচনা করাই হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই বৎসরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। পূর্ণাঙ্গ বিশেষীকরণ কাম্য নয় বলেই বর্তমানে প্রচলিত 'প্রবাহ' ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে।** কারিগরি, বাণিজ্য, গৃহ-বিজ্ঞান, ললিতকলা এবং কৃষিপ্রবাহে শিক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের প্রকৃত স্থান পলিটেকনিক কিম্বা কারিগরি ও কৃষিবিদ্যালয়ে। ঐ রকম প্রতিষ্ঠানেই এ সবের স্থান করে দিতে হবে। সুতরাং **সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হবে বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের সাধারণ শিক্ষা।**

(কোঠারি প্রস্তাব, যা সম্প্রতি চালু করা হয়েছে)

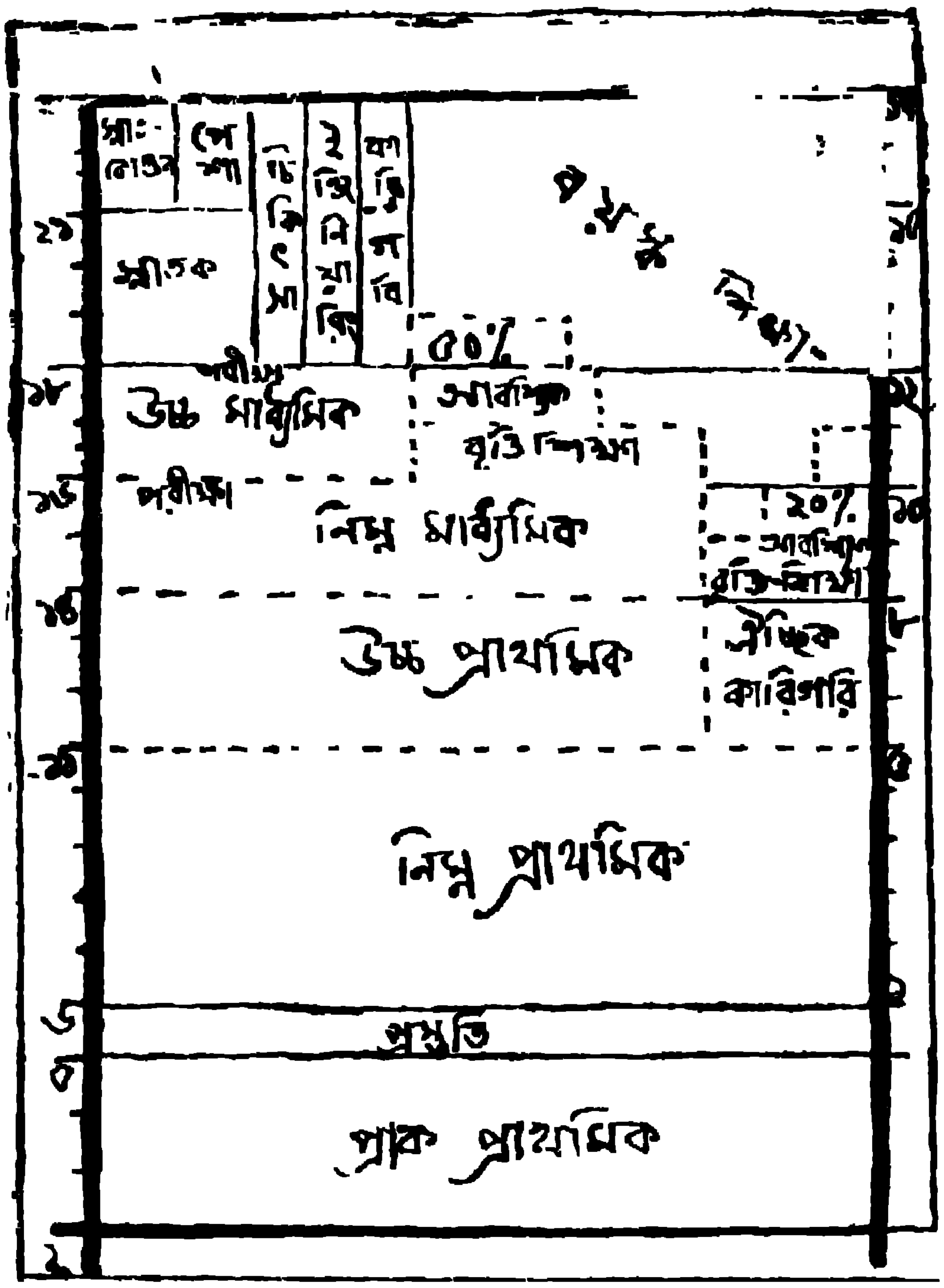

এই স্তরের **পাঠক্রমে থাকবে দুটি ভাষা।** নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পড়া তিনটি ভাষার মধ্যে যে কোন দুইটি বাছাই করা চলবে, কিম্বা যে কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষাও নেওয়া চলবে। **এ ছাড়া আরও থাকবে তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়। ঐচ্ছিক বিষয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যে কঠিন ব্যবধান থাকবে না।** ছাত্ররা দুটি বিজ্ঞান

বিষয়ের সঙ্গে একটি কলা বিষয় কিম্বা দুটি কলা বিষয়ের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান বিষয় বাছাই করবার অধিকার পাবে। (অবশ্য তিনটি বিষয়ই শুধু বিজ্ঞান কিম্বা শুধু কলা থেকেও নির্বাচন করা চলবে।) সুতরাং **সর্বমোট পাঠ্য বিষয় হবে পাঁচটি।**

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয় নির্বাচনের অধিকার থাকবে বলেই বিজ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য হবে না। তবে গ্রাম ও শহরের স্কুলে স্থান ও পরিবেশোপযোগী বিজ্ঞান-শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। **কৃষিবিজ্ঞানকেও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না।** তবে গৃহবিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি হবে ঐচ্ছিক বিষয়। পড়ার অর্ধেক সময় দেওয়া হবে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির জন্য, এক-চতুর্থাংশ ভাষার জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ শারীর-শিক্ষা এবং অন্যান্য সমপাঠ-মূলক কাজের জন্য। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে **কর্মপরিচিতি ঘটবে ক্ষেত-খামারে ও কলকারখানায় প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে।** সমাজসেবার জন্য ব্যবস্থা থাকবে **শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরে।** শিবিরজীবনে দৈনিক ছয় ঘণ্টা কায়িক শ্রম করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। দুই বছরের প্রতি বছর ১০ দিন কিম্বা একসঙ্গে ২০ দিন কাজে যোগ দিতেই হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের **আর একটি বৈশিষ্ট্য হবে পাঠক্রমে সাধারণ** (ordinary) **এবং অগ্রবর্তী** (advanced) **স্তরে বিভাগ।** অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্যই থাকবে অগ্রবর্তী পাঠক্রম। এই স্তরের প্রান্তে যে পরীক্ষা হবে তার **সার্টিফিকেটও দেবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। অভিজ্ঞানপত্রে বিভিন্ন নম্বরের শুধু উল্লেখ থাকবে, সামগ্রিকভাবে 'পাস-ফেল' এর কোন ঘোষণা থাকবে না।** ইচ্ছা হলে ছাত্ররা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারবে। বোর্ডের অভিজ্ঞান পত্রের সঙ্গে অবশ্যই থাকবে বিদ্যালয় থেকে সমীক্ষা এবং অভিজ্ঞান-পত্র। তবে সব ছাত্রই সাধারণ শিক্ষা পাবে না। বিকল্পে থাকবে ৫০% এর জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা।

বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হবে শিল্প কারখানায় আংশিক সময়ে; পলিটেকনিকে পূর্ণ সময়ে, আই-আই-টিতে, এবং স্যাণ্ডউইচ কোর্স-এর সাহায্যে। কৃষি পলিটেকনিক স্থাপন করা হবে। জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কুটিরশিল্প, প্রশাসন প্রভৃতির জন্য তিন বছরের সার্টিফিকেট কিম্বা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ১৯৬৫—৬৬ সনের তুলনায় ১৯৭০—৭১ সনে ভর্তির যে লক্ষ্য কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছিল তাই এখানে তুলে ধরছি।

	১৯৬৫—৬৬	১৯৭০—৭১
V—VII	ছেলে—৯০ লক্ষ,	১ কোটি ৪০ লক্ষ,
	মেয়ে—৩০ লক্ষ,	৭০ লক্ষ;
VIII—X	ছেলে—৪৮ লক্ষ,	৬৫ লক্ষ,
	মেয়ে—১৬ লক্ষ,	২৪ লক্ষ,
XI—XII	ছেলে—১২ লক্ষ,	১৬ লক্ষ; (এর মধ্যে বৃত্তি বিভাগে ৭½ লক্ষ)
	মেয়ে—২½ লক্ষ,	৪ লক্ষ ৭০ হাজার (বৃত্তি বিভাগে ১½ লক্ষ।)

১৯৮৫ সনের মধ্যে অন্তত নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সব শিশুকে সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই সাথেই রয়েছে শিক্ষক সমস্যা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য :—

	১৯৬৬ সনে,	১৯৭১ সনে,	১৯৭৬ সনে সম্ভাব্য
কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা	৩৬ লক্ষ	৭ লক্ষ—	১৪ লক্ষ
শিক্ষক প্রতি ছাত্র সংখ্যা	৩০	—২৫	—২৫

অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির ফলে অতিরিক্ত শিক্ষক লাগার কথা ১৯৭১ সনে ৪'১ লক্ষ; ১৯৭৬ সনে ৮'৬ লক্ষ। সুতরাং প্রতি বৎসর অতিরিক্ত শিক্ষক লাগবে প্রায় ৭৫ হাজার। অথচ ১৯৭১ সনে শিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে ৭০ হাজার জনের। সুতরাং শিক্ষণহীন শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বোচ্চ তামিলনাড়ুতে ৯৩ ভাগ, সর্বনিম্ন পশ্চিমবঙ্গে = ১৬'৩ ভাগ। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণের হার সর্বোচ্চ কেরলে = ৮৯ ভাগ, এবং সর্বনিম্ন আসামে – ১৮'৬ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে = ৪০ ভাগ।

বাংলা দেশের কথা

ইংরেজ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশেই প্রথম পড়ে। এখানেই নব জাগৃতির সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ থেকে এগিয়ে ছিল। ১৮৫৪ সনের আগেই অনেক নাম করা মাধ্যমিক স্কুল এখানে গড়ে ওঠে। উড্ ডেসপ্যাচের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশে হয়েছিল, বাংলাদেশে তেমন কিছুই হয় নি। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনেই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতি

নির্ধারিত হয়েছে। এ কথাও আবার সত্য যে বাংলাদেশ জাতীয় জাগরণের অন্যতম উৎসভূমি ছিল বলে শিক্ষার নবচেতনাও এখান থেকেই দানা বাঁধে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যেই এ চেতনা প্রতিফলিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে যত মাধ্যমিক ছাত্র ছিল, ভারতের অবশিষ্টাংশে মোট সংখ্যাও ছিল সেইরকমই। কার্জনের সংকোচন নীতি সত্ত্বেও স্যার আশুতোষের উপাচার্যত্বকালে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়ে। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সনে শাসন সংস্কারের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। এই যুগেই হার্টগ কমিটির রিপোর্ট, সপ্রু কমিটি কিংবা এ্যাবট-উড কমিটির রিপোর্ট এবং সার্জেন্ট রিপোর্ট চেতনাতে সাড়া জাগায়, কিন্তু আমূল সংস্কার কিছুই হয়না।

স্বায়ত্তশাসনের যুগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বাংলা ভাষাকে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ। এ যুগের আর একটি সমস্যা ছিল প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন। অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের আমলে এ বিষয়ে একাধিকবার আইন সভায় চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে স্কুলের চাকুরিতেও সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের ফলে গুণগত উৎকর্ষতা যে আরও কমেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তারপর স্বাধীনতা এল বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। বহু স্কুল গেল পূর্ব-বাংলায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গাগত বাস্তুহারাদের চেষ্টায় রাতারাতি গড়ে উঠলো বহু স্কুল। সরকার থেকে বাস্তুহারা শিক্ষা সাহায্য দেওয়া হলো মাত্র। বহু শিক্ষিত তরুণ পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডগ্রামেও শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। গড়ে উঠলো আরও স্কুল। স্কুলের সংখ্যা হলো আগের চেয়েও বেশী।

স্বাধীনতার অল্প পরেই পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হলো School Education Committee (রায় চৌধুরী)। এই কমিটিও দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করেন। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরে সামগ্রিক সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের চেতনাও তৈরী হতে থাকে। এর প্রথম ফলশ্রুতি হলো ১৯৫০ সনে সরকারের মনোনীত ব্যক্তির সভাপতিত্বে স্বয়ংশাসিত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন। এই পর্ষদের কাছে বিরাট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আর্থিক চাবিকাঠি রইলো সরকারী বিভাগের হাতে। সুতরাং অল্প দিনেই পর্ষৎ অকর্মণ্যতার দোষে দুষ্ট হলো। ১৯৫৪ সনে পর্ষৎ বাতিল করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসক নিযুক্ত করা হলো।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৫৪

সনে গঠিত হলো 'দে' কমিটি। এই কমিটিও মুদালিয়র প্রস্তাবিত দ্বাদশ শ্রেণীর বহুমুখী শিক্ষার কথাই সমর্থন করলেন। তবে নতুন কিছু প্রস্তাব করলেন শিক্ষা বোর্ডের গঠন এবং কাজ সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবের সারমর্ম হলো বোর্ডের স্বাধীনতা সংকোচন। নতুন বোর্ড দীর্ঘদিন পর্যন্ত গঠিত হলো না। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করলো। বোর্ড-প্রশাসক ও সরকারী শিক্ষা দপ্তরের যৌথ নিয়ন্ত্রণে পুনঃসংগঠনের কাজ আরম্ভ হলো ১৯৫৬-৫৭ সনে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন হয় কিংবা স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়, তার ফলে লাভ থেকে অপচয় হয়েছে বেশী। প্রধানতঃ মানবিক প্রবাহ দিয়ে দায়সারা গোছের এই উন্নয়ন মুদালিয়র রিপোর্টের মর্মকথাকেই ব্যঙ্গ করেছে।

তবুও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে নানা ধরনের—পঞ্চম ও ষষ্ঠ, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র হাই, কিম্বা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সিনিয়র বেসিক ; পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল। এ ছাড়া মাদ্রাসা এবং কোন কোন সংস্কৃত বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্কুল বলে ধরা হয়। তবে টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এখনও মাধ্যমিক স্কুল বলে সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়।

মালিকানার বিচারেও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে নানা শ্রেণীর। সরকারী ও সরকারী স্পনসর্ড স্কুল এবং ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অল্প সংখ্যক স্কুল আছে। কিন্তু কর্পোরেশন কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি মাধ্যমিক ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করে না। **সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্যালয়ই বেসরকারী।** এ ক্ষেত্রে রয়েছে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উদ্যোগ। **সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজও রয়েছে।**

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে এই রকম :—

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল (বুনিয়াদি সহ)

	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১৯৫০-৫১	২৩৬৮	৫৩২৯২৪	২১৫২১
১৯৬৫-৬৬	৫১৫৩	১৫২৩২২৩	৬০৫৭৩

১৯৭৫-এ জুনিয়র মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় মোট প্রায় ৮½ হাজার, শিক্ষক ৮০ হাজার। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে এই সংখ্যা যত বড়ই মনে হোক, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বয়সে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা পাচ্ছে ছেলেদের ৩১·৩ শতাংশ এবং মেয়েদের ১১·৫ শতাংশ। মেয়েদের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা সত্ত্বেও নারী শিক্ষা আজও পশ্চাৎপদ।

মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভাল। এখানে স্নাতক-নিম্ন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। শিক্ষকের অর্ধেকই স্নাতক ; এক-পঞ্চমাংশ অনার্স স্নাতক এবং অবশিষ্টাংশ স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত। **কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হতাশা-জনক।** শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের হার—নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল মাত্র ১৭৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৪০ শতাংশ। বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ. সুযোগ সুবিধার বিষয়ে, **সরকারী ও বেসরকারী এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে তারতম্য আছে।** এই তারতম্যের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের স্বার্থহানি হচ্ছে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮½ হাজার মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ছয় হাজারের বেশীই বেসরকারী।)

শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ করাও সম্ভব হয় নি। মাথাপিছু আনুমানিক ব্যয় নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৬৪ টাকা, উচ্চ বুনিয়াদিতে ৫৩ টাকা এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ৮৩ টাকা। এই বরাদ্দের অনেকটাই খরচ হয় প্রশাসন এবং দালান-কোঠার জন্য, ছাত্রকল্যাণ কিম্বা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নয়। দশ বৎসর অবলুপ্তির পরে শিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যক্রম তৈরী, পাঠ্য বই অনুমোদন, মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন এবং সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়া বোর্ডের প্রায় কোন ক্ষমতা কিম্বা দায়িত্বই নেই। সুতরাং সরকারী দপ্তরকেই এখন সর্বময় কর্তা বলা চলে। সম্প্রতি অবশ্য বোর্ড থেকেও এক ধরনের পরিদর্শন চালু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা "ব্যবস্থা"

এখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় বর্তমানে তিনটি পর্যায়—(ক) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র হাই ; (খ) নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক, (গ) নবম দশম-একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক। মাধ্যমিক স্তরের শেষে আছে স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। এই দুটিই বহিঃপরীক্ষা ; পরিচালনা করেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

সংশোধিত মুদালিয়র স্কীম পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সবগুলি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে সম ভাবে সবগুলি প্রবাহে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়নি। মানবিক প্রবাহই ছিল সর্বাধিক। তারপরে বিজ্ঞান, তৃতীয় স্থানে বাণিজ্য প্রবাহ। তিনটি প্রবাহের বেশী ছিল খুব কম সংখ্যক স্কুলেই। ইতস্ততঃভাবে কোন কোন স্কুলে

কারিগরি, কৃষি এবং চারুকলা প্রবাহ ছিল। মেয়েদের অনেক স্কুলে অবশ্য গৃহবিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৪ সন থেকে ৮+২+২ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু বিশ্বভারতীর **আছে নিজস্ব স্কুল** এবং পৃথক পরীক্ষা। তা ছাড়া **অনেক স্কুল আছে "ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার" সঙ্গে যুক্ত** (এটি কেম্ব্রিজ পরীক্ষার নব সংস্করণ এবং আভিজাত্যের অন্যতম লক্ষণ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, ইংরাজী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, হিন্দী, নেপালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা ভাষায় পরিচালিত স্কুল আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাও কয়েকটি ভাষাতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রেণীবৈষম্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতি শৈলাবাসে আবাসিক স্কুলগুলি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। মিশনারী স্কুলগুলি এবং মেয়েদের কনভেন্টও তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। কলকাতায় স্বাধীনতার যুগে গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিও নূতন শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি করছে! এখানে চলছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসন; সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে শিক্ষামন্ত্রকের। মন্ত্রীকে সাহায্য করেন শিক্ষাসচিব। কিন্তু নীতি প্রয়োগ করেন একদিকে শিক্ষাঅধিকারিক, (ডি. পি. আই) এবং অন্যদিকে শিক্ষা পর্ষৎ।

১৯৫০ সনে গঠিত প্রথম বোর্ডের গঠনতন্ত্র এবং ক্ষমতার তালিকা আদর্শ স্থানীয় না হলেও বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল। বেসরকারী তথা শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সনে নূতনভাবে গঠিত শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি মাত্র ৪ জন। তাছাড়া রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষালয়, আইনসভা প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং পদাধিকার বলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা। বোর্ডের সভাপতিও সরকার মনোনীত। সভাপতি, সম্পাদক, এবং ৫ জন সহকারী সম্পাদকই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে **বোর্ডের ক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।** পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রশ্ন করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট দেওয়াই বোর্ডের প্রধান কাজ। প্রশাসনগত দিকে বোর্ডের ক্ষমতা হলো স্কুল ও শিক্ষক অনুমোদন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন এবং বিদ্যালয়ের অন্তর্বিরোধে হস্তক্ষেপ করা। এই সূত্রেই এ্যাডহক কমিটি গঠন, প্রশাসক (Administrator) নিয়োগ প্রভৃতিও বোর্ডের দায়িত্ব। **কিন্তু বোর্ডের হাতে কোন আর্থিক ক্ষমতা নেই।** তাছাড়া স্কুল পরিদর্শকের

রিপোর্ট এবং ডি. পি. আই-এর সুপারিশের ভিত্তিতেই স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব। ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা শিক্ষকদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও নির্ভর করে বিভাগীয় রিপোর্টের উপর। তাই বোর্ড প্রায়শই থমকে থমকে চলতে বাধ্য হয়। নূতনভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার জন্য গঠিত হয়েছে একটি আলাদা কাউন্সিল।

প্রশাসনের দ্বিতীয় বাহু হলো ডি. পি. **আই-এর অধীনে পরিদর্শক বাহিনী নিয়ে গড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হলো**—(ক) সরকারী স্কুল পরিচালনা, (খ) বেসরকারী স্কুল পরিদর্শন, (গ) বেসরকারী স্কুলে সরকারী গ্র্যাণ্ট-ইন এইড দেওয়া, (ঘ) পি জি. বি. টি. পরীক্ষা নেওয়া ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া, (ঙ) স্কুলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের তদন্ত করে বোর্ডের কাছে সুপারিশ করা প্রভৃতি। কিন্তু সাহায্যবিহীন বহু স্কুল, বিশেষতঃ বৃহৎ স্কুলের উপর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ নাম মাত্র। এইসব স্কুল বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না। **প্রশাসনের নিম্নস্তরে আছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি।** বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের ও স্কুলের জন্য যাঁরা দান করেছেন এমন ১জন করে এবং ৪জন অভিভাবক প্রতিনিধি, এবং প্রতিষ্ঠাতার ১জন প্রতিনিধি—এই ১২ জন সভ্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়।

এই অবস্থায় **শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার**; যেমন—(১) দ্বৈত শাসনের অবসান করা। এ জন্য শিক্ষাসচিব, ডি. পি. আই এবং বোর্ডের ক্ষমতা সুনির্ধারিত হওয়া দরকার। (২) আরও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠন করা দরকার। বোর্ডের হাতেই আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষমতাও অর্পণ করা দরকার। (৩) সব ধরনের স্কুলের উপর শিক্ষা বিভাগ এবং বোর্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দরকার। (৪) পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে আমলাতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করা দরকার। শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টাই হবে তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। (৫) বিদ্যালয়ে সাহায্যদান ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক, উদার, সরল করা দরকার। (৬) স্কুল বোর্ড আইন ও ম্যানুয়াল সংশোধন করা দরকার। (৭) বৃত্তি শিক্ষালয়গুলিকেও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার মধ্যে আনা দরকার। (৮) আইনসিদ্ধ শিক্ষক-কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। (৯) শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার, এবং (১০) বেতন ও মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাকে উন্নত করা প্রয়োজন।

অর্থসংস্থানের সমস্যা :—পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অর্থসংস্থানের প্রশ্নটি এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের অর্থাভাব, সরকারের অর্থাভাব এবং সাহায্য দেওয়ার নিয়ম-কানুনের জটিলতার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থের উৎস হলো প্রধানতঃ সরকারী সাহায্য, ছাত্রবেতন এবং বেসরকারী দান। এখানে কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভাবই বহন করেন অভিভাবকরা। জনসংখ্যার মাথা পিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক ১৬ টাকা মাত্র। এখানে বাজেটের ১৯ ভাগ বরাদ্দ হয় শিক্ষার জন্য। এর মধ্যে একটি অংশ মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়।

সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় তিনভাবে—(১) শিক্ষকদের বেতনের ঘাটতি পূরণ বাবদ সাহায্য। নিম্নতম ১০ জনকে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে ধরে বেতনক্রম অনুযায়ী অশিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দেয় বেতন থেকে ছাত্রবেতন আদায়ের পরে যে ঘাটতি থাকে, তাই সরকারী হিসেবে আসে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শতকরা ৫৫ ভাগ স্কুলই ঘাটতি সাহায্য ব্যবস্থার অন্তর্গত নয়।

সরকারী সাহায্যের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো lump grant. এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের হদিসই করা হয় না। সাহায্যের **তৃতীয় পদ্ধতি হলো কোন বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ব্যয়ের জন্য সাহায্য। কিন্তু এই দুই খাতে সাহায্য ক্রমক্ষীয়মাণ।**

অর্থ সমস্যার সর্বাপেক্ষা ভাল সমাধান হলো সকল ধরনের সকল স্কুলকেই "ডেফিসিট" ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সাহায্য দেওয়া।

স্কুল যোগান ও ছাত্রভর্তি : পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে প্রায় ৮½ হাজার, শিক্ষক সংখ্যা ৮০ হাজার। সাধারণ সময়ে প্রতি বছর নূতন স্কুল হয় ৩০০টি ; ছাত্রসংখ্যা বাড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার এবং শিক্ষকসংখ্যা বাড়ে ২৫০০। আপাতদৃষ্টিতে এই অবস্থাকে আশাপ্রদ মনে হলেও ছাত্রভর্তির হার দেখলেই মোহমুক্তি ঘটবে। বর্তমানে ১১—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৩১ ভাগ এবং ১৪—১৭ বছরের ২০ ভাগ স্কুলে যেতে পারছে। এ ক্ষেত্রেও আছে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ছাত্র এবং ছাত্রীসংখ্যার হিসেব দেখলেই পরিষ্কার হবে :—

	ছাত্র	ছাত্রী
জুনিয়র হাই	= ১৬৬৫৬৯	৮৩৪৫০
সিনিয়র বেসিক	= ১৫০৭২	৮৬৫০
উচ্চ-উচ্চতর মাধ্যমিক	= ৮৬৬৫৪৩	৩৫২৯৩৯

সমস্যার সমাধান: পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা ও সমস্যা দূর করতে হলে দরকার (১) **শিক্ষাগত দিকে**—(ক) ভাষা সূত্রের আরও সরলীকরণ, (খ) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা পুনর্গঠন, (গ) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উপর আরও গুরুত্ব, (ঘ) কারিগরি ও বৃত্তি স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকার করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা, (ঙ) পরীক্ষার বৈপ্লবিক সংস্কার এবং অপচয় নিবারণ, (ছ) শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ ও শিক্ষকের স্বার্থ সংরক্ষণ, (জ) ব্যাহত শিশুদের জন্য স্পেশাল স্কুল তৈরি করা প্রভৃতি। (২) **নীতিগত দিকে**—(ক) সব রকম প্রাইভেট স্কুলকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা, (খ) কমন স্কুল প্রবর্তন, (গ) ছাত্র কল্যাণ ব্যবস্থা প্রভৃতি। (৩) **প্রশাসনের দিকে**—(ক) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং আরও বেশী ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠন এবং প্রয়োজন হলে জেলা ভিত্তিতে উপ-বোর্ড গঠন, (খ) আরও অনেক অর্থ বরাদ্দ এবং সাহায্য ব্যবস্থার জটিলতা দূর করা, (গ) স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে অবৈতনিক শিক্ষার দিকে এগোনো।

আরও কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথা বলা দরকার যেমন—(ক) ঘনবসতি অঞ্চলের স্কুলে স্থানাভাব, (খ) স্কুলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উপযুক্ত স্কুল বাড়ীর অভাব, (গ) লেবরেটরি, লাইব্রেরী, কমনরুম, শিক্ষকদের ঘর, বিবয় কক্ষের অভাব, (ঘ) খেলাধুলা, স্পোর্টস্ এবং সহপাঠ্য কাজের অভাব, (ঙ) স্কুল স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা।

নীতিগতভাবে কয়েকটি প্রগতিশীল চেতনা আমরাও গ্রহণ করেছি, যেমন—মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমুখিনতা, দীর্ঘতর শিক্ষা, ছাত্র বাছাই নীতি, পাঠক্রম সংশোধন, সমাজসেবা, কর্মপরিচিতি এবং শিক্ষায় সমন্বয়োগ। এই নীতিগুলিকে কাজে রূপ দেওয়াই বড় কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে **চতুর্থ পরিকল্পনার বিচার করা যায়।**

চতুর্থ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে:—৩য় পরিকল্পনায় ব্যয় = ১০৩ কোটি; ৪র্থ পরিকল্পনা = ১২৬ ২৫ কোটি টাকা।

১১—১৪ বছর (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী)—

১৯৭০ সনের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা = ১.৭০ কোটি (৩৩.৪ শতাংশ)

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল = ১.৮৪ কোটি (৪২.১%)। ১৪—১৭ বছর (নবম থেকে একাদশ শ্রেণী)—১৯৭০ সালে ছাত্রছাত্রী = ৬৫.৫ লক্ষ (১৯.৩%)। চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য = ১.০৩ কোটি (২৫.৯%)। ২৩০০০ শিক্ষকের শিক্ষণ।

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা। লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল—(ক) ১২ শ্রেণীর স্কুল, (খ) আরও সাধারণ স্কুল, (গ) প্রতি জেলায় আদর্শ স্কুল, (ঘ) বিকলাঙ্গদের জন্য স্পেশাল স্কুল, (ঙ) মেয়েদের শিক্ষা প্রসার (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে), (চ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রসার (ছ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্যই অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি। পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্য পূরণ হয়নি। কোঠারি কমিশন যে লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন, তা থেকে আমরা এখনও অনেক দূরেই পড়ে আছি।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. How and why did the concept of Secondary Education in India change in course of the last 100 years ?

(এই অধ্যায়ের প্রথমে "মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ" শীর্ষক অংশটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের মূল সুপারিশগুলি উপস্থাপন করতে হবে।)

2. Make an analysis of the major recommendations of the Secondary Education Commission (1953) and the effects there of. How were the recommendations implemented ? Was a review of the Mudaliar system called for ?

("মুদালিয়র কমিশন" শীর্ষক অংশটি এবং "সমালোচনা"র অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে বলতে হবে।)

3. Trace the development of Secondary Education in India since independence.

(পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি এবং "বর্তমান পরিস্থিতির পরিসংখ্যান" শীর্ষক অংশ দুটির সারসংক্ষেপ করতে হবে। এই অংশে আলোচিত দুর্বলতাগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য "উন্নতির" মধ্যে তত্ত্বগত

উন্নতির দিকও আছে। সুতরাং মুদালিয়র কমিশনে আলোচিত উদ্দেশ্য এবং বহুমুখী পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে নীতিগত অগ্রগতির কথাও বলতে হবে। পরিশেষে কোঠারি কমিশনে নূতন চিন্তার কথাও সামান্য উল্লেখ করা দরকার।)

4 Trace the development of secondary education in Bengal (and West Bengal) since the time of Lord Curzon.

("বাংলা দেশের কথা" শীর্ষক অংশের সারাংশের সঙ্গে একটু সমালোচনা যোগ করতে হবে।)

5. Discuss the problem of (a) languages at secondary school level, (b) curriculum and teachers, (c) standard of secondary education, and (d) students indiscipline with special reference to West Bengal.

(প্রতিটি বিষয়ই আলাদা শীর্ষক করে দেওয়া আছে। প্রয়োজনীয় অংশটির সারমর্ম উপস্থিত করতে হবে।)

6. Discuss the problems of provision, administration and financing of Secondary Education and offer suggestions for improvement.

("শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্যা" এবং আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা" শীর্ষক অংশ দুটির সারসংক্ষেপ বলতে হবে।)

7. Make an analysis of the problems of secondary education in West Bengal and offer remedial suggestions.

("পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা" শীর্ষক অংশটি থেকে সমস্যার কথাগুলি তুলে নিতে হবে। ঐ সঙ্গে দেখতে হবে প্রশাসন ও অর্থসংস্থানের পৃথক আলোচনাটি। পরিশেষে "সমস্যার সমাধান" অংশের সারমর্ম বলতে হবে।)

৮ Give an account of the suggestions made by the Kothari Commission in respect of Secondary Education and discuss their significance.

("ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—কোঠারি কমিশন" শীর্ষক অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থিত করতে হবে। পরিশেষে বলতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই নূতন এবং বলিষ্ঠ চেতনা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কাজ হয়েছে সামান্য। গত বছর থেকে সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বিতণ্ডার অন্ত নেই।)

9. Give your opinion in respect of the proposal for 10-year school education. Should the next two years be placed in an independent Junior College ?

(অধ্যায়ের শেষ অংশে আলোচিত বিষয়টি পুরোই বলতে হবে এবং নিজের কোন বিশিষ্ট অভিমত থাকলে ঐ সঙ্গে দিতে হবে)।

10. Estimate the achievements and failures of West Bengal in the field of secondary education. What are her special problems ?

11. Write a note on the administration and financing of secondary education in West Bengal.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্যা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ এবং স্বাধীনতার যুগে উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এবার আলোচিত হবে উচ্চশিক্ষার সমস্যা।

উচ্চশিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ: ১৮৪৫ সনে বাংলা প্রেসিডেন্সীর শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক F. J. Mowat সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব করেন। ১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি C. H. Cameron আবার প্রস্তাব করেন। ততদিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারিত হচ্ছে, ইংরেজীকেও রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে। ইংরেজী বিদ্যাকে চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং নূতন শিক্ষার সুগঠিত ব্যবস্থা দরকার হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনে। এগুলি গঠিত হলো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে। পরিচালনা ন্যস্ত হলো চ্যান্সেলর এবং সিনেটের উপর। কিন্তু শিক্ষাবিদরা সিনেটে স্থান পেলেন নগণ্য সংখ্যায়, বিশেষতঃ অনুমোদিত কলেজগুলির প্রায় কোন প্রতিনিধিত্বই রইল না। সরকার মনোনীত অশিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত 'লাইফ মেম্বার' আমলা দিয়েই সিনেট ভর্তি হলো। কোন সিণ্ডিকেটও ছিল না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন হলো ঢিলেঢালা।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও হলো সীমিত। এর কাজ হলো প্রবেশিকা, স্নাতক ও পেশাগত পরীক্ষা নেওয়া, সেই উপলক্ষ্যে পাঠ্যক্রম স্থির করা, এবং সার্টিফিকেট দেওয়া। উডের ডেসপ্যাচে যে সব অধ্যাপক পদ সৃষ্টির কথা ছিল, তা কার্যকরী হলো না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পড়াবার দায়িত্ব রইল না। কলেজের সংখ্যা অবশ্য বেড়ে চললো। ১৮৫৭ সন থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় মাদ্রাজে ১২টি, বোম্বাইতে ৪টি, বাংলাদেশে ১৭টি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৯টি, পাঞ্জাবে ৪টি। এই সময়ের মধ্যেই কলকাতা ও মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সী কলেজ, মাদ্রাজের তিনেভেল্লী কলেজ, লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজ গড়ে ওঠে। ভারতীয় বেসরকারী চেষ্টাও বেড়ে ওঠে। কলকাতার বিদ্যাসাগর ও সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সনে। এই সময়ে দেশীয় পরিচালনায় ছিল কমপক্ষে পাঁচটি কলেজ।

দেশীয় নৃপতিরাও নিজ নিজ রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দেশীয় ভাষাগুলি উচ্চশিক্ষা স্তরে এই সময় থেকেই অবহেলিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৪ বছর দেশীয় ভাষাকেও পাঠ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তার প্রস্তাবে ১৮৬২ সনে তাও বাতিল করা হয়। আরও উল্লেখ করা দরকার যে এ যুগের কলেজগুলি সবই ছিল আর্টস কলেজ। সে যুগের অর্থনৈতিক পরিবেশে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

হান্টার কমিশন বেসরকারী উদ্যোগকেই বেশী উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন। এর ফলেও উচ্চশিক্ষার প্রসার হয় দ্রুতগতিতে। ১৮৮১-৮২ সনে যে ক্ষেত্রে আর্টস কলেজ ছিল ৬৮টি, সেক্ষেত্রে ১৯০১-০২ সনে কলেজ হয় ১৭৯টি; অর্থাৎ আড়াই গুণ বাড়ে। এর অন্যতম কারণ হলো দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তিলক, আগারকর, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবতরণ। বিশ্ববিদ্যালয়েরও সংখ্যা বাড়লো। লাহোর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হলো যথাক্রমে ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সনে। কিন্তু এই সূত্রে বলা দরকার যে হান্টার কমিশন উচ্চশিক্ষায় বিকল্প পাঠক্রমের সুপারিশ করলেও তা কার্যকরী হয়নি। সুতরাং অগ্রগতি হলো একপেশে। দ্বিতীয়ত দ্রুত প্রসারের ফলে তখন থেকেই মানাবনতির অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। তৃতীয়ত শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির ভীতি তখন থেকেই শিক্ষাচেতনাকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে উল্লেখযোগ্য যে স্বাদেশিকতার প্রভাবে উচ্চশিক্ষা স্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়ার আন্দোলন তখন থেকেই দানা বাঁধে। বস্তুতঃ ১৯০১ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবাব নতুনভাবে ভারতীয় ভাষাকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করে।

১৮৯৮ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংগঠিত হয়। লর্ড কার্জন এসেই লণ্ডনের ধাঁচে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কার করার জন্য ১৯০২ সনের কমিশন বসান এবং সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পাঁচ বছর মেয়াদী ছোট সিনেট, আইনসম্মত সিণ্ডিকেট, সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনেই অধ্যাপক ও লেকচারার নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণার ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কার্জন যুগ কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখ্য—(১) এই যুগ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। (২) আইন পড়ার বিশেষ প্রসার ঘটে। (৩) এক্সটেনশন বক্তৃতা প্রচলিত হয়। (৪) আঞ্চলিক ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়। (৫) অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞান সংযোজিত হওয়ায় পাঠক্রমের ঐশ্বর্য বাড়ে। (৬) গবেষণার সূচনা হয় এবং (৭) পড়াশুনার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গভঙ্গ তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন উচ্চশিক্ষার চেতনাকেও প্রভাবিত করে। ১৯১৩ সন থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে বেনারস, মহীশূর, S. N. D. T., ওসমানিয়া, আলিগড় প্রভৃতি নূতন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ অধ্যয়নের জন্য "ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান" কিংবা "ভারতীয় দর্শন পরিষদের" মত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বাড়ে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মানবিক বিদ্যারই ছিল একক জয়যাত্রা। বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনেও নানা জটিলতা ছিল। সংস্কারের সুপারিশ করেন স্যাডলার কমিশন। নতুন চরিত্রের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পূর্ণ কার্যকরী না হলেও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টির প্রসারতা আসে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, কারিগরি শিক্ষার সূচনা, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতিও উচ্চশিক্ষার উপর গুণগত এবং পরিমাণগত প্রভাব বিস্তার করে। গুণগত প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হলো Teaching এবং Advancement of Learning-এর আদর্শ গ্রহণ। তদুপরি কারিগরি, বিজ্ঞান, কৃষি এবং নানা ধরনের পেশাকে অবলম্বন করে বিচিত্র পাঠধারাও প্রবর্তিত হয়।

স্বাধীনতার যুগ

স্বাধীনতার পরে সর্বপ্রথম শিক্ষা সমীক্ষা হয় উচ্চ স্তরেই। **১৯৪৮ সনেই ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।** এই কমিশন উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। উচ্চস্তরের শিক্ষায় থাকবে **ত্রিমুখী উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষা, উদার মতাদর্শের শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার শিক্ষা।** কমিশনের মতে—**বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য জগতের জন্য নেতা তৈরি।** বিশ্ববিদ্যালয়ই পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা। **অধ্যাত্ম মূল্যবোধের সঙ্গে জাগতিক মূল্যবোধের সমন্বয় হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে।** এরই মধ্য দিয়ে তৈরি হবে প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ। সাধারণ শিক্ষার সমগুরুত্ব দেওয়া হবে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতা হবে প্রশস্ত সাধারণ শিক্ষা, কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে উন্নত মানের প্রস্তুতি এবং উপযুক্ত বয়স ও মানসিক পরিপক্বতা। পাশ্চাত্যের কোন দেশে ১৮ বছরের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা যায় না। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে উন্নত শিক্ষার উপরই কলেজীয় স্তরে

মানোন্নয়ন সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিংবা কর্মক্ষেত্রের জন্য উন্নত মানের ছাত্র তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। আকাঙ্ক্ষিত উন্নত মানের জন্যই কমিশন বলেন **দীর্ঘতর ডিগ্রী কোর্সের কথা। যুগপৎ মানোন্নয়ন এবং প্রসারের কথাই কমিশন সুপারিশ করেন।**

আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করেন। তবে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় পুরাতন ধরনের Affiliating কিংবা Affiliating and Teaching University-র বদলে Residential, Unitary এবং Federal প্রভৃতি রকমের কথাও বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও উন্নয়ন সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল নীতি নির্ধারণ, মানোন্নয়ন, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। কমিশনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন, ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, সমপাঠ্যমূলক সাংস্কৃতিক কাজ, সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা সমাধানের প্রস্তাবও ছিল।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা :—কমিশন-রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল **গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নূতন চেতনা।** ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব দেখিয়ে কমিশন বলেন যে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। এই শিক্ষা গ্রামীণ তরুণকে করে শহরমুখী এবং শহরের পরিবেশে গ্রাম্য তরুণ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। **শহরকেন্দ্রিক শিল্পায়নের ফলেই শিক্ষায় এসেছে নগর-প্রবণতা।** তাই শিক্ষায় সর্বজনীনতা এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান দূর করে গ্রামজীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত **গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সুপারিশ করেন।**

এই পরিকল্পনার বিষয় ডেনমার্কের গণ-কলেজের ভাবধারা এবং **গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারা কমিশন প্রভাবিত হন।** ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। **কমিশন এই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন।** এই প্রস্তাবে উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে গ্রামীণ উচ্চ-বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যবহারিক উৎপাদনী শিক্ষা। **কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ কলেজে** সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং গ্রামজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা।

কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং গ্রামীণ শিক্ষা কাঠামোয় থাকবে ৭ কিংবা ৮ বছর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা, ৩ কিংবা ৪ বছরের উত্তর বুনিয়াদি, ৩ বছরের কলেজ এবং ২ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা। **সমস্ত স্তরেই শিক্ষা হবে গ্রামকেন্দ্রিক এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকেন্দ্রিক।**

উচ্চশিক্ষার প্রসার : বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন) পরে আবাসিক এবং ইউনিটারি সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যুগে সৃষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান (যাদবপুর, বিশ্বভারতী সমেত) সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। বোম্বাইয়ের Tata Institute of Social Science এবং দিল্লীর Indian Institute of International Studies প্রমুখ ৯টি প্রতিষ্ঠান, কিংবা হরিদ্বারের গুরুকুল-কাঙরি বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রমুখ শিক্ষাকেন্দ্রও **বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠানরূপে** সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিছুদিন আগে হয়েছে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়। University Grants Commission-ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৯৪৫ সনে– U. G. Committee নামে। কাজ হয় ৩টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৩ সনে U. G. Commission রূপে গণ্য হয়। **সর্বশেষে ১৯৫৬ সনে আইনসিদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রিত সংস্থায়** পরিণত হয়। এর কাজ হলো উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও সমন্বয় সাধন; শিক্ষা ও পরীক্ষার মাননির্ধারণ, এবং গবেষণার প্রসার। উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় সাহায্য বিতরণের দায়িত্বও এর উপর!

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত এবং পরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করে মূল উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করা হয়েছে। গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে Rural Higher Education Committee প্রস্তাব করেন গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গড়ার। ১৯৫৬ সনে গঠিত হয় উপদেষ্টা চরিত্রের National Council of Rural Higher Education। এই কাউন্সিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে Rural Institute প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। সেইভাবে **সমস্ত ভারতে ১৪টি ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।** (শ্রীনিকেতন এদের অন্যতম)। ঐ রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং উপাধি দেবে। কিন্তু বাস্তবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ

বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, গ্রামীণ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ৩ বছরের ডিপ্লোমা, ২ বছরের কৃষি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টর কোর্স প্রভৃতি। এইসব উপাধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমমর্যাদা লাভ করতে বহু বেগ পেতে হয়েছে। কোন কোন উপাধি বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ব্যবস্থায় **না হয়েছে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের সুপারিশের রূপায়ণ, না হয়েছে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিশিক্ষার রূপায়ণ।**

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উত্তরকালে তিনটি পরিকল্পনায় **সাধারণ উচ্চশিক্ষার প্রসার অবশ্যই হয়েছে।** ১৯৪৮ সনে সারা ভারতে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ছিল মোট ৫০০-র কিছু বেশী। (এর মধ্যে শুধু আর্টস্‌ ও সায়েন্স কলেজ ছিল ২৮৫টি)। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১৮টি এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার। পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি :—

	১৯৫০-৫১ সন	১৯৫৫-৫৬	১৯৬৬	১৯৭৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	৩২	৬৪	৯৭
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৯২	১১২	২৫৭	
আর্টস, সায়েন্স, কমার্স কলেজ	৫৪২	৭৭২	১৭৮৮	২৯০০
পেশা ও বৃত্তি শিক্ষার কলেজ	২০৮	৩৪৬	১০৭৭	
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১৮	৩৪	৪৪	
মোট ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে				
বিজ্ঞান ও কারিগরির ছাত্র	২৮·১ শতাংশ,	৩৩ শতাংশ,	৩৪·১ শতাংশ,	৪০·৫ শতাংশ
১৭-২৩ বছরের জনসংখ্যার				
অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র	০·৯	১·৫	২·৭	৪·০

উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সনে কলেজের সংখ্যা ৩ হাজারের বেশী, বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টি। ছাত্রসংখ্যা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৩০ লক্ষাধিক।

বাংলা দেশের কথা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসুকে স্নাতক উপাধি দানের মধ্য দিয়ে ১৮৫৮ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত যাত্রারম্ভ হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রসারও বাংলাদেশেই হয়েছে সর্বাধিক। কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই

শিক্ষা বাস্তবমুখী হয়নি। অবশ্য বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন চেতনা আসতে থাকে। বাংলা দেশের সঙ্গে কার্জনের সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কার্জনের 'নিয়ন্ত্রণ নীতি'কে পরাজিত করে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত বিকাশ ঘটে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হাতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেয়। ১৯১২ সনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক এবং ৫০ জন লেকচারার নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় স্বীকৃতি পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও উচ্চশিক্ষাব বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। রাসবিহারী ঘোষ এবং তারকনাথ পালিতের দানে বিজ্ঞান শিক্ষাব যাত্রারম্ভ হয়। ১৯১৯ সনের মধ্যেই স্নাতকোত্তর পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। স্যাডলার কমিশনের প্রশাসনিক সুপারিশগুলি বাংলা দেশে বেশী কার্যকরী হয়নি। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ ব্যতিক্রম)। কিন্তু শিক্ষাগত সুপারিশগুলি বহুলাংশে কার্যকরী হয়। সেই থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের পাঠ্যতালিকায় বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হয়েছে বিশালকায়।

স্বাধীনতার উত্তরকালে সংযুক্ত বাংলার বহু কলেজ পড়ে পূর্ববঙ্গে। কিন্তু বাস্তুহারা আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমিত সুযোগের উপর চাপ পড়ে। তখন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা হয়। "ডিস্‌পার্সাল স্কীম" অনুসারে বহু "স্পনসর্ড" কলেজ তৈরী হয়। বেসরকারী চেষ্টা চলে দ্রুততালে। ১৯৪৮ সনে যে ক্ষেত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫টি, ১৯৭৫ সনে সে ক্ষেত্রে কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই কলেজ হয়েছে ২০৮টি। পশ্চিমবঙ্গে এখন কলেজের সংখ্যা প্রায় তিনশত।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৮টি; কিন্তু উচ্চশিক্ষা সমস্যার সমাধান হয়নি। স্থানীয় চরিত্র নিয়ে কিংবা বিশেষ বিষয় অনুশীলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি। স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপযোগী লাইব্রেরী ল্যাবরেটরীর অভাব আছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির কথা সর্বজনবিদিত। অথচ ছাত্রসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান। সারা ভারতের ছাত্রসংখ্যার ১২ শতাংশই কলকাতার অধীন।

আপাত দৃষ্টিতে ছাত্রসংখ্যার যত চাপই হোক, মোট জনসংখ্যার অতি অল্প অংশই কিন্তু আজও উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে। প্রতি ১০ লক্ষ জনে মাত্র ৪'৫ হাজার জন,

অর্থাৎ হাজারে ৪৫ জন উচ্চ শিক্ষা পায়। অর্থাৎ ১৭—২২ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ের মধ্যে ৮'৫% স্নাতক স্তরে এবং '২৬% স্নানকোত্তর স্তরে শিক্ষার সুযোগ পায়। আলোচিত ৪'৫ হাজার জনের মধ্যেও মাত্র ১'১ হাজার পড়ে বিজ্ঞান বিষয়ে; '১৫ হাজার টেকনিক্যাল, '১২ হাজার মেডিক্যাল এবং বাকি সকলেই সাধারণ মানবিক কিংবা বাণিজ্য বিষয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ১৬টি ফ্যাকালটি এবং ৩৫টির বেশী বিভাগ। কিন্তু ছাত্রবণ্টনের হার নৈরাশ্যজনক। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির অংশ— আর্টস শতকরা ৫৯'২ ভাগ, বিজ্ঞান ২৩'২ ভাগ, বাণিজ্য ১৬'৮ ভাগ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি ৩'৮ ভাগ, চিকিৎসা ২'৩ ভাগ, আইন ২'১, শিক্ষা ১'৩, কৃষি ০'৩, পশুবিজ্ঞান ০'১ ভাগ এবং অন্যান্য ০'৯ ভাগ।

এই হিসেব থেকেই বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম দুর্বলতা—একমুখিনতার রূপটি ধরা পড়বে। আরও বহু সমস্যা রয়েছে; যেমন—কলেজে স্থানাভাব এবং সিফ্‌ট্ ব্যবস্থা, গবেষণাগার ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, মফঃস্বল কলেজে সাম্মানিক পাঠ্য-ব্যবস্থার অভাব, পুরাতন পাঠ এবং পরীক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষায় বিরাট হারে অকৃতকার্যতা। বহুমুখী শিক্ষাধারায় তরুণদের চালনা করার পথ নেই। অস্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যপীড়িত ছাত্রদের জন্য কল্যাণব্যবস্থা নেই। ছাত্রবিক্ষোভ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় পঠন্-পাঠনে, বিষয় ও পাঠ্য নির্বাচনে, ছাত্র নির্বাচনে, বহুমুখিনতা প্রবর্তনে এবং প্রশাসনে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন গঠন করে এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা চলতে পারে।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য: মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিংবা **উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝায় কলেজ স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত।** উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গবেষণা, চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিদ্যার প্রসার এবং নিত্যনূতন জ্ঞানক্ষেত্র জয় করা। এই উদ্দেশ্যই Advancement of Learning রূপে বিভিন্ন দেশ, এবং আমাদের দেশেও প্রচলিত। কিন্তু জ্ঞানের নূতন জগৎ উন্মেষিত হলেই হবে না, নবলব্ধ জ্ঞানের প্রচার চাই। সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের উচ্চজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের **দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান** (teaching)।

কিন্তু বিমূর্ত তত্ত্বজ্ঞান সাধনা এবং উন্নাসিকতার বদলে আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় ও জনজীবনের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের সঙ্গী। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ক্রমে ক্রমে শিল্প সভ্যতার যুগে উচ্চ

পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং **জাতীয় প্রয়োজনের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি করাও তৃতীয় উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হলো। পরিশেষে সমাজ সেবাকে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে।** সমাজসেবার আবার দুটি দিক আছে—(ক) সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "এক্সটেনশন বক্তৃতা" প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। (খ) দ্বিতীয়তঃ শিল্পবাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে নূতন বিদ্যা সৃষ্টি করা, জাতির সাংস্কৃতির জীবন উন্নত করা, জাতির জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি করা এবং জাতির নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করাই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি আদৌ সামনে রাখা হয়নি। ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারী তৈরী করাই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। পাঠক্রম ও সিলেবাস তৈরী করা, পরীক্ষা গ্রহণ করা, সার্টিফিকেট দেওয়া, কলেজ ও স্কুলগুলিকে অনুমোদন দেওয়াই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই আমাদের চিন্তায় পরিবর্তন আসতে থাকে। **স্বাধীনতা পাওয়ার পরে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও নূতনভাবে ভাবা হয়। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন বলেন ত্রিমুখী উদ্দেশ্যের কথা—** (ক) উন্নত সাধারণ শিক্ষা, (খ) বিজ্ঞানসম্মত অথচ উদার মতাদর্শের শিক্ষা, (গ) পেশাগত বিশেষজ্ঞ তৈরির শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক জগতের জন্য নেতা তৈরি করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা। অধ্যাত্ম মূল্যবোধের সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে এবং সমন্বয় করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে তৈরি হবে প্রকৃত মানুষ।

পরিশেষে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) উচ্চশিক্ষার **উদ্দেশ্যকে নিম্নানুরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :** (১) নূতন জ্ঞান আহরণ, সত্যান্বেষণ এবং নতুন আলোকে পুরাতন জ্ঞানের নব-বিশ্লেষণ ; (২) তরুণদের মধ্য থেকে প্রতিভা আবিষ্কার করে, তাঁদের দৈহিক-মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন করে, তাদের মধ্যে সুস্থ আগ্রহ এবং মনোভাব সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ; (৩) কৃষি, কলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য সুদক্ষ অথচ সমাজচেতনাসম্পন্ন তরুণ-তরুণী তৈরি করা , (৪) শিক্ষার

প্রসার করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করা ; (৫) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সমাজে শুভ জীবনের উন্মেষ করা।

কমিশন কয়েকটি আশু লক্ষ্যের কথাও বলেছেন ; যেমন—(১) সহনশীলতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে নিশ্চিত করা, (২) বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course পরিচালনা করা, (৩) স্কুলগুলির শিক্ষামান উন্নয়নে সাহায্য করা ; (৪) শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং প্রসার করা , (৫) অন্ততঃ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক শিক্ষামানের স্তরে উন্নীত করা। **এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধকরবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন**—(ক) উচ্চশিক্ষার মানোন্নতি, (খ) জনজীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জনশক্তি পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চশিক্ষার প্রসার, (গ) বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ও প্রশাসনের উন্নতি।

উদ্দেশ্যর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা ঃ—অন্যান্য দেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চরিত্র এবং কাজের অনেক পরিবর্তন এনেছে। অবশ্য নূতন জীবনের চাহিদা যে সম্পূর্ণই মিটেছে এমন নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও সংগঠনে আরও পরিবর্তন দরকার।

কিন্তু **আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।** আমাদের উচ্চশিক্ষা এখনও একমুখী 'লিবারেল শিক্ষার' বোঝায় ভারি। পাঠ্য বিষয়ও পুরানো তত্ত্বে পূর্ণ। উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে, এমন কি বিজ্ঞান ও কারিগরির ক্ষেত্রেও তত্ত্বকথার প্রাধান্য রয়েছে। গবেষণা ব্যবস্থা এখনও অনগ্রসর। সর্বশেষ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের পরিচিত হতে এখনও অনেক দেরি হয়। কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বয়স্ক শিক্ষা এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালযের ভূমিকা বেদনাদায়ক। উচ্চশিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে সীমায়িত। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায় নীরব দর্শক। ছাত্র কল্যাণের ব্যবস্থা অতি সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও বহু ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক এবং নানা দোষে দুষ্ট। পড়ানোর বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা। লাইব্রেরী, লেবরেটরির ব্যবস্থাও সীমিত। পরীক্ষার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। অর্থ সমস্যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারাক্রান্ত। অর্থবণ্টন ব্যবস্থায় অসমতাও বেশী। চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা থেকে আমরা এখনও মুক্ত নই। **উচ্চশিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে আমরা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছি।**

খুবই স্বাভাবিক যে এই অবস্থার প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপর। তারই ফল ছাত্র-বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও এবং পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার প্রকৃত কারণ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং বেকার সমস্যা। অন্য পথ না পেয়ে ছাত্ররা কলেজে ভিড় করে। কিন্তু **এখানে পড়ে দেখে ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। যা হতে চেয়েছিল, তা হতে পারেনি। বর্তমান শিক্ষায়তন এবং শিক্ষা পদ্ধতি যুব মনে আশার সঞ্চার করতে পারে না।**

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা : সমস্যার সমাধান করতেই হবে। **সমাধানের জন্য নিম্নানুরূপ ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে।** আরও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার, কিন্তু যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা নয়। ইনস্টিটিউট জাতীয় বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও বহুমুখিনতা দরকার। পাঠক্রমের আমূল সংস্কার এবং আলোচনা, সেমিনার, টিউটোরিয়ালের উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং এজন্যে আরও বেশী সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। গ্রন্থাগার এবং গবেষণাগারের সুযোগ বাড়ানো এবং গবেষণা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি প্রয়োজন। স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বই এবং অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম যোগানো দরকার। পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার মান বিদেশের সঙ্গে সমকক্ষ করা চাই। উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ সেবা প্রকল্প গ্রহণ করে জনজীবনের সঙ্গে এবং শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পেশার জগতের সঙ্গে বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং কার্যকরী সংযোগ প্রয়োজন। ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা এবং ছাত্র স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার অগ্রাধিকার, শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাস, শিক্ষক কল্যাণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার জন্য আরও অর্থ সংস্থান এবং অর্থবণ্টন ব্যবস্থাটিও প্রয়োজন ভিত্তিক করা উচিত।

প্রশ্ন হলো সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কিভাবে এবং কতটুকু চেষ্টা হচ্ছে। এই সম্পর্কে বলা চলে যে—(ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এই প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করবার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বণ্টন করবার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রচেষ্টা উৎসাহিত করবার, উচ্চ-শিক্ষার সার্বিক মান উন্নত করবার এবং ছাত্রকল্যাণ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত করবার। লাইব্রেরী, লেবরেটরি, গবেষণা ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্যও এই সংস্থা

চেষ্টা করছে। পাঠক্রম সংশোধনের জন্য একদিকে ইউ জি. সি এবং অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্তৃপক্ষও আলোচনা করছেন। এই সংস্থা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মডেল আইন তৈরী করা হয়েছে। তা ছাড়া পাঠপদ্ধতি, পরীক্ষা-পদ্ধতি, ছাত্র কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা, উপাচার্য সম্মেলন, বিভিন্ন সেমিনার ও শিক্ষক সংগঠনে। ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে। **কিন্তু যে পরিমাণে আলোচনা হচ্ছে সেই পরিমাণে কাজ হচ্ছে না।** প্রগতিশীলতা এবং রক্ষণশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এজন্য অনেকখানিই দায়ী। অনতিবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। (উচ্চ শিক্ষায় ভাষার সমস্যা এবং ছাত্র বিক্ষোভের ব্যাপক সমস্যাটি পরে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)।

উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ঃ—উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করবার আগে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রকমভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার, কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ভরশীল।

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(১) বিশ্ববিদ্যালয়, (২) পেশা ও কারিগরির ক্ষেত্রে বিশেষী-করণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক ইনস্টিটিউট (যেমন—খড়্গপুরের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট)। (৩) গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

সাধারণভাবে ইনস্টিটিউটগুলির এবং **অনেক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে**। এ জন্য রয়েছে সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের। এদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য রয়েছে C. S. I. R.; তেমনি কেন্দ্রীয় মালিকানাধীন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করে N.C.E.R.T.

মালিকানার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রীয় (যেমন—বিশ্বভারতী, আলীগড়, বেনারস প্রভৃতি) এবং রাজ্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আংশিক দায়িত্ব বহন করেন রাজ্য সরকার। রাজ্য আইন সভায় নির্ধারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি, গঠন এবং এক্তিয়ার। রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিস্তৃত নিয়মবিধি রচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকারকেও ইউ. জি. সির

অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন স্বয়ংশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) Affiliating, examining, certifying. (বর্তমানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অপ্রচলিত)। (২) দ্বিতীয় শ্রেণী হলো Affiliating, Teaching, Examining, Certifying. এই ধরনের প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশে সর্বাধিক। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো Unitary (—যাদবপুর, বিশ্বভারতী এই শ্রেণীর)। (৪) চতুর্থ শ্রেণীর হলো ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়। দিল্লী এই শ্রেণীর। (৫) পঞ্চম শ্রেণীবিভাগ করা চলে আবাসিক (Residential) এবং দিবা (Day)। বিশ্বভারতী আবাসিক শ্রেণীর। (কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্রসংখ্যার চাপ এবং আর্থিক অবস্থার জন্য শুধু আবাসিক চরিত্র রক্ষা করাই দুষ্কর। তাই অধিকাংশ আবাসিক প্রতিষ্ঠানকেই দিবাছাত্র গ্রহণ করতে হয়েছে।) **পশ্চিমবঙ্গে** বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮টি—বিশ্বভারতী (কেন্দ্রীয়), কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র ভারতী, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলি রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠান। এগুলির মধ্যে কলকাতা, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হলো Affiliating-Teaching.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় নানা বৈচিত্র্য আছে। তবে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালযের "ভিজিটর" হয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান-মন্ত্রী, আর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার থাকেন রাজ্যপাল। নিত্যদিনের পরিচালক হলেন উপাচার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারও থাকেন। এঁদের নীচে প্রশাসনের জন্য থাকেন রেজিস্ট্রার, পরীক্ষার কণ্ট্রোলার এবং কলেজ পরিদর্শক প্রভৃতি। **বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য থাকে সিনেট।** (কোর্ট, The University প্রভৃতি নামেও অভিহিত)। দৈনন্দিন প্রশাসনের জন্য থাকে **সিণ্ডিকেট**। (একে অনেক ক্ষেত্রে Executive Council ও বলে) শিক্ষাগত বিষয়ের জন্য থাকে **এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল**। তা ছাড়া থাকে বিভিন্ন বিভাগের ফ্যাকাল্টি এবং স্নাতকোত্তর পাঠের কাউন্সিল ও বোর্ড অফ স্টাডিস। প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে হলো অনুমোদিত কলেজগুলি। অনুমোদনের নিয়মাবলী, কলেজ পরিদর্শন, কলেজ পরিচালক সমিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি পন্থায় কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থান :—উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের উৎসকে

মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে—কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ, ছাত্রবেতন, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান এবং বিদেশী সাহায্য। **কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বরাদ্দ দুই ধরনের**—পরিকল্পনাখাতে এবং রাজস্বখাতে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যয় করা হয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, বিভিন্ন ধরনের বিশেষ স্কীমের জন্য, ছাত্রবৃত্তি, গবেষণা এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অনুদান প্রভৃতির জন্য। কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয় করা হয় U.G.C.; A.I.C.T.E. (কারিগরি পরিষদ); C.S I.R.; N.C.E.R.T. প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে। বৈদেশিক সাহায্য খরচ হয় প্রধানত সাংস্কৃতিক বিনিময়, বিশেষজ্ঞ আমদানি এবং বিদেশে যাওয়ার বৃত্তি প্রভৃতির জন্য, কিম্বা বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী স্কীমের জন্য। **রাজ্যস্তরে অর্থের উৎস হলো** শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দান, ছাত্রবেতন, রাজ্য সরকারের অনুদান এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ যোগ করেও উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিমল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সংশোধিত বরাদ্দ ৮৭ কোটি। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় খাতে ধরা হয় ১৮১.৭১ কোটি টাকা। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য কিছু পৃথক বরাদ্দ হয়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে টাকার অঙ্কটিকে যতই বড় মনে হোক, প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ নিতান্তই অল্প। **এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা মূলতঃ অভিভাবকের পকেটের উপর নির্ভরশীল।** নীচেব হিসাবটি থেকেই একথা পরিষ্কার হবে।

	কত ছাত্র বেতন দেয়	মোট ব্যয়ের অনুপাতে বেতন আদায়
কারিগবি প্রতিষ্ঠান—	৭২.০ শতাংশ	১৭.২ শতাংশ
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ—	৮৪ ৯ „	৪৮ ৫ „
পেশা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান—	৮৭.৯ „	২২.২ „

কোঠারি কমিশন অবশ্য অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছেন। ছাত্রপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় নিম্নানুরূভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে :—

	১৯৬৪-৬৬	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
স্নাতক (আর্ট ও কমার্স)—	৩২৮ টাকা	৭৩৩ টাকা	৯১৭ টাকা
„ বিজ্ঞান ও কারিগরি—	১:৬৭ „	১৫০০ „	২০০০ „
স্নাতকোত্তর (আর্ট ও কমার্স)		৩৫০০ „	৩৬০০ „
স্নাতকোত্তর (বিজ্ঞান ও কারিগরি)—		৫০০০ „	৬০০০ „

পশ্চিমবঙ্গে অর্থ সমস্যা ঃ—পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমস্যা হলো **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য**। ভারতের অন্যান্য বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলকাতার আয় সর্বনিম্ন। **পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই অর্থ-বরাদ্দের বৈষম্য আছে।** রাজ্য সরকারের অনুদানেও আছে বৈষম্য। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য একদিকে প্রয়োজন সার্বিকভাবে আরও অর্থ সংস্থান এবং অপরদিকে সুসম বণ্টন। **এজন্যই রাজ্যস্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দাবি উঠেছে।** এই ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থ বরাদ্দের ভারসাম্য আসবে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষামানের সমতা, বিশেষীকরণপ্রচেষ্টার উন্নয়ন, সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার এবং দায়দায়িত্ব বণ্টন সহজতর হবে।

ভবিষ্যতের চিন্তা—কোঠারি কমিশনের বক্তব্য ঃ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন। উচ্চশিক্ষার আদর্শ হবে প্রজ্ঞা ও সত্যসাধনা এবং লব্ধ-জ্ঞানের প্রসার ও প্রচার। বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতিকে নেতৃত্ব যোগাবে, বিভিন্ন পেশার জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরী করবে, সমাজ-জীবনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়নীতির সহায়ক হবে, সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যবধান হ্রাস করবে, এবং ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বস্ফুরণে সহায়তা করবে। তাছাড়া সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষণমান উন্নয়নের জন্য স্কুলগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেওয়ার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের। উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণারত শিক্ষকগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সাহায্য আশা করতে পারেন। বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রেও থাকবে দায়িত্ব।

উচ্চশিক্ষা **প্রসারের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষামানের উন্নতি।** অনুমোদিত কলেজগুলির সাজসরঞ্জাম, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের গুণাগুণ, শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং সর্বাত্মকভাবে শিক্ষামানের উন্নতির উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, সংস্কার, শিক্ষা, গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সম্বন্ধে বলেছেন। **কেবলমাত্র শিক্ষামান উন্নয়নের স্বার্থে, অথবা বিশেষ পাঠের প্রতি বিশেষ সুবিচার করার প্রয়োজনে, অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদনী কর্ম প্রবাহকে সাহায্য করার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চলবে,** একথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে **আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে** '*advanced centres*' প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি কারিগরি, একটি কৃষি এবং চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে "*Major University*" রূপে

গণ্য করে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার স্তরে ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে—**স্নাতক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা** এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সহৃদয় চিত্তে **হিন্দী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজী।** অবশ্য এই স্তরে ভবিষ্যতে হিন্দী প্রচলিত হলেও ছাত্ররা ইংরেজী শিখবেন, কমিশন সে আশা করেছেন। উচ্চশিক্ষার স্তরে **কোন ভাষাকে বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয় হিসেবে না রাখবার কথাও কমিশন বলেছেন।** কোঠারি কমিশন উচ্চ-শিক্ষার স্তরে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবা কেন্দ্র (Day Centre), সহপাঠ্যমূলক কার্যক্রম, আন্তঃকলেজ এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান, ছাত্র-ইউনিয়ন এবং ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির সুপারিশ করেছেন। সমাজসেবার কার্যসূচীতে **সমষ্টি প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, শ্রম ও সামাজ-সেবা শিবিরে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।** ছাত্র-অসন্তোষ দূর করবার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে **সর্বক্ষণের** *Dean of Student Welfare* নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশন **বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুপারিশ করেছেন।** গজেন্দ্র গদকার কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সীমিতভাবে ছাত্রদের অংশগ্রহণের কথাও বলেছেন, এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এদিকে কিছু পদক্ষেপও নিয়েছেন। আর্থিক সঙ্গতি, জনশক্তির প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রভর্তির ক্ষমতা ও শিক্ষামানের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষার্থীর সুযোগ এবং শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তির নীতি স্থির করা হবে। কমিশন সুপারিশ করেছেন বাছাই নীতি (Selective approach).

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. How, when and with what purpose were the modern Universities of India established ? How did the national movement affect the character of these institutions ?

("উচ্চশিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ" অংশের সারসংক্ষেপ—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে সীমিত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব দিয়ে ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠা ; মূলতঃ Affiliating—Examining ; পড়ানোর দায়িত্ব ছিল না ; ঢিলেঢালা প্রশাসন ; তত্ত্বমূলক জ্ঞানের

দিকে একদেশদর্শী ঝোঁক। জাতীয় চেতনার প্রভাবে বেসরকারী উদ্যোগ সূচনা; কার্জন সংস্কার এবং জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সংঘাত; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন; স্যার আশুতোষ; স্যাডলার কমিশনের প্রভাব।)

2. Discuss the major recommendations of the Universities Commission (Radhakrishnan) with special reference to the concept of Rural University. How was the concept of rural education implemented ?

("স্বাধীনতার যুগ" এবং "গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা" অংশ দুটির সারাংশ বলতে হবে। শেষে "উচ্চশিক্ষার প্রসার" আলোচনার মধ্যমাংশ থেকে গ্রামীণ ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা যোগ করতে হবে।)

3. Give an account of the growth of Higher Education in West Bengal, with special reference to the new Universities. Has there been excessive expansion of higher education in West Bengal ?

("বাংলা দেশের কথা" অংশ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের বর্ণনা এবং সমালোচনা দিতে হবে।)

4. What are the aims of Higher Education ? How far have we attained them ?

("উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য" শীর্ষক আলোচনা—Advancement of Learning, Teaching, Production of Specialists, Social Service. রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন ও কোঠারি কমিশনের বক্তব্য। এই সাথে শেষাংশের উত্তরে উপস্থিত করতে হবে "উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা" আলোচনার সারাংশ।)

5. Give a critical account of the development of Higher Education in Independent India. What are the problems in this field ?

("উচ্চশিক্ষার প্রসার" শীর্ষক আলোচনার শেষাংশ থেকে সংখ্যাগত প্রসার উল্লেখ করতে হবে; "বাংলা দেশের কথা" আলোচনার শেষার্ধ থেকে কলকাতার উদাহরণটি বিশেষভাবে সমালোচনা সহ দেওয়া ভাল; পরিশেষে "উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা" অংশ থেকে সমস্যার কথা বলা দরকার।)

6. Discuss the problems of Higher Education, with special

reference to West Bengal. Offer suggestions for solution. What attempts have so far been made in this respect, and with what success ?

("উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা" এবং "সমস্যা সমাধানের চেষ্টা" অংশের সমন্বয় করতে হবে। "বাংলাদেশের কথা" আলোচনার শেষাংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে সংযোজন করলে পূর্ণাঙ্গ উত্তর হবে।)

7 What are the types of institutions of higher learning ? Discuss in this connection the different categories of Universities. What is the normal structure of University Administration in India ?

("উচ্চশিক্ষার প্রশাসন" অংশের সারাংশই উপস্থিত করতে হবে।)

8. How is Higher Education financed in India ? What is the typical financial problem of West Bengal ? How may it be solved ?

("উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থান" এবং "পশ্চিমবঙ্গে অর্থসমস্যা" আলোচনা দুটির সারসংক্ষেপ।)

9. Write a note on the major recommendations of the Indian Education Commission (1964-66) about Higher Education. Do you think the recommendations may be implemented ?

("কোঠারি কমিশনের বক্তব্য" শীর্ষক আলোচনা পুরোটাই বলতে হবে। পরবর্তী অংশের উপর মন্তব্য করতে হবে ব্যক্তিগত বিচার অনুসারে।)

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা

আমাদের দেশে আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার সূচনা হয়েছে বিগত শতাব্দীতেই, প্রসার অবশ্য হয়েছে স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনার যুগে। কারিগরি শিক্ষাচেতনা ক্রমবিকাশের পটভূমিতেই সমস্যার কথা আলোচনা করবো।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্রমবিকাশ: প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল আধুনিক যুগের প্রাক্কালে। মিশনারীদের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার ভিত্তি ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর নূতন প্রশাসনে জমি জরিপ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজকে অবলম্বন করেই শুরু হয় আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা। বোম্বাইতে ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাস আরম্ভ হয় ১৮২৪ সনে। পুনাতে পি. ডব্লিউ. ডি-র মেকানিক্যাল স্কুল হয় এবং মাদ্রাজে জরিপ স্কুল স্থাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরেও কারিগরি শিক্ষার সূচনা হয় ১৮৪৫ সনে। মধ্য-শতাব্দীর পূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত রুড়কি কলেজ। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকারী ও মিউনিসিপ্যালিটির পূর্তবিভাগ, রেলওয়ে, স্টীমার, পাটকল, সূতাকল, এবং খনির জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। তখন থেকেই আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রকৃত সূচনা। ১৮৫৬ সনে স্থাপিত হয় কলকাতা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। ১৮৫২, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে আগ্রা, মীরাট ও বেনারস কলেজ। ১৮৬৮ সনে স্থাপিত হয় পুনা কলেজ। শতাব্দীর শেষভাগে, ১৮৮০ সন থেকে শিবপুর প্রভৃতি কলেজে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়।

এ বিষয়ে জাতীয় চেতনাও ক্রমেই উন্মেষিত হতে থাকে। ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সনেই কংগ্রেস কারিগরি এবং বাণিজ্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করে। এই শিক্ষার প্রসারও ঘটে। ১৮৮৪-৮৫ সনে যে ক্ষেত্রে সারা ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল ৪টি, স্কুল ছিল ২০টি এবং শিল্পবিদ্যালয় ছিল ৪২টি, সেক্ষেত্রে ১৯০১-০২ সনে শুধু টেকনিক্যাল এবং শিল্পবিদ্যালয়ই ৮০টি, ছাত্রসংখ্যা ৬৮৯৪। কিন্তু বিগত শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় ত্রুটির অন্ত ছিল না। স্থির-নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি কিম্বা উদ্যোগের স্থিরতা ছিল না। দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা হয়নি।

বর্তমান শতাব্দীর সূচনা থেকে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে কারিগবি শিক্ষার প্রশ্নটিও গুরুত্ব পায়। মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স অবলম্বন করে জন্ম নেয় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষ সত্ত্বেও লর্ড কার্জন কারিগরি পড়ার জন্য বৃত্তি প্রবর্তন করেন। ১৯১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বেনারস কলেজ। ঐ বৎসরই 'মরিসন কমিটি' বয়নশিল্প, খনিশিল্প, ট্যানিং, পটারী, কাগজ ও চিনিকল প্রভৃতির জন্য দক্ষ কারিগর তৈরীর উপর গুরুত্ব দেন।

ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনার অনেক প্রসার ঘটেছে। ১৯০৪ সনেই গঠিত হয়েছিল "Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education in India"। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তরুণদের ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে পাঠানো হয়। সরকারী মনোভাবও অপেক্ষাকৃত উদার হয়। ১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় Indian Institute of Science এবং ১৯২৬ সনে ধানবাদের খনিবিজ্ঞান কলেজ। ১৯২১-২২ সনে 'লিটন কমিটি' ভারতীয় কারিগর নিয়োগে বিলেতী মালিকদের সংকোচকে নিন্দা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কারিগবি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয় শম্বুক গতিতে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যুদ্ধশিল্প এবং আনুষঙ্গিক শিল্প গড়ে ওঠে। বিশ্বযুদ্ধের পরে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণা বোর্ড। ১৯৪৫ সনে হয় সরকার কমিটি এবং নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষাসংসদ। ১৯৪৭ সনে 'বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটি' দশ বছরের জন্য প্রয়োজনের সমীক্ষা করেন।

স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনার পরিপেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে গৃহীত হলো: (ক) চালু ডিগ্রী কলেজগুলির উন্নয়ন, (খ) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, (গ) স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা। বর্তমান ভারতে মূলত চার ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে: (ক) গবেষণা প্রতিষ্ঠান, (খ) ডিগ্রী কলেজ এবং টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, (গ) ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স এবং (ঘ) দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ও কারু বিদ্যালয়। শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হল—(১) জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, (২) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিগরি প্রবাহ, (৩) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, (৪) পলিটেকনিক, (৫) বি. ও. এ. টি., (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র (Vocational training centre)।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার: সরকাবী ভাষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা বলতে কেবল যন্ত্রভিত্তিক শিক্ষাই বুঝায় না। কৃষি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, বনবিজ্ঞান,

চিকিৎসা, কারিগরি, পশুপালন প্রভৃতি নানা ধরনের বিশেষীকরণের শিক্ষাকেই এই শ্রেণীতে ধরা হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা ক্রমবর্ধমান। এ্যাবট-উড্ কমিটির উত্তরকালে কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রশ্নটি আশু সমস্যা রূপে অসীম গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। মুদালিয়র কমিশনও টেকনিক্যাল স্কুল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, এবং শিক্ষানবিসি ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। **ঐ কমিশন শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার উপর বিশেষ কারিগরি শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাবও করেন।** রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন। এই সব আলোচনা ও সুপারিশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সচেতনতা এবং আগ্রহও বেড়েছে। বস্তুতঃ, **আজ বোধহয় সাধারণ মেধার এমন ছাত্র খুব অল্পই আছে যাদের কাছে কারিগরি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার দরজায় ধর্না দিত।**

শিল্পায়নের যুগে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি সহজেই গুরুত্ব পায়। পরিকল্পনার যুগে Public Sector এবং Private Sector উভয় অংশই শিল্পায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করায় বৃত্তিশিক্ষার পরিকল্পনাও আবশ্যিক হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃই সরকারী প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সবের ফলে কারিগরি শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে, নীচের তালিকা থেকে তা বুঝা যায়ঃ

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৫৬০-৬১	১৯৭৩
ডিগ্রী কলেজ—	৫৩	৭১	১১১	১৩৮
ঐ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা—	২৬৯৩	৪৩৩৭	৭০২৬	১০১০০
ডিপ্লোমা কলেজ—	৮৯	১০৯	২০৯	২৮৪
ঐ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা—	২৬২৬	৪১০৩	১০৩৪৯	১৭৫০০

৫টি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বর্তমানে চালু আছে। কলকাতা ও আমেদাবাদে দুটি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিলানীর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র এবং বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আই, আই, টি গুলিতে বাৎসরিক ছাত্রভর্তি ১২০০। আই, আই, টি এবং বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর পড়া ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে ২০০০ জনের জন্য। আরও ৬০টি কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ আছে ২৪০০ জনের। রিজিওন্যাল কলেজ আছে ১৪টি। ৮০টি কারিগরি কলেজে ৫½ বছরের মেয়াদে ডিগ্রী এবং ৩½ বছরের মেয়াদে ডিপ্লোমার জন্য স্যাণ্ডউইচ

কোর্স আছে। সর্ব-ভারতীয় স্তরে কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনা করছেন সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ। এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি আঞ্চলিক কাউন্সিল।

বাংলা দেশের কথা: ইংরেজী শিক্ষার মোহগ্রস্ততা বাংলা দেশেই ছিল সর্বাধিক। তাই এখানে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা বিলম্বিত। কিন্তু সচেতনতা যখন আসে, তা বাড়ে দ্রুত। অনেকদিন পর্যন্ত কেবল ডিগ্রীস্তরে শিক্ষার জন্যই ঝোঁক ছিল বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডিপ্লোমা স্তরে শিক্ষা বাড়তে থাকে। দেশ-বিভাগের পরে ডিপ্লোমার নিম্নস্তরে ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। এই গতি ত্বরান্বিত হয় সরকার কমিটিব রিপোর্টের পরে।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি শিক্ষায় অংশ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসবকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকারী উদ্যোগ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পদপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন, উপজাতি উন্নয়ন, পুনর্বাসন দপ্তব এবং শিক্ষাবিভাগের নিজস্ব ট্রেনিং প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, শ্রম, পুনর্বাসন ও শিক্ষাদপ্তর সমূহেরও নিজস্ব উদ্যোগ রয়েছে। ট্রেনিং কলেজ অথবা স্কুল কিংবা উৎপাদন কেন্দ্রে ডিপ্লোমা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়—এই তিন স্তরেই শিক্ষাব ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে কারিগবি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ধারণা হবে এই তথ্য থেকেই যে এখানে এখন রয়েছে ১টি টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ৬টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চস্তরের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট—যেমন বেঙ্গল ট্যানিং, বেঙ্গল টেক্সটাইল, সেরামিক, জুট প্রভৃতি ইনস্টিটিউট কিংবা প্রিন্টিং টেকনোলজির মত প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ২৪টি পলিটেকনিক। এগুলিতে ৩ বছরের L. C. E., L M. E., L. E. E., এবং দু বছরের Draftsmanship কোর্স প্রচলিত। তাছাড়া ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বহরমপুর, বেলঘরিয়াব ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটে ৪ বছরের পাঠ্যক্রম প্রচলিত। আসানসোলে রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্স। নিম্নতর স্তরে রয়েছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্কুল অথবা ইনস্টিটিউট। সর্বনিম্ন স্তরে কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান। বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো বিকলাঙ্গদের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এর সংখ্যা পাঁচটি।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই ছোট-বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বাধিক। অথচ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলের প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্কুল ও কলেজগুলি রয়েছে যত্রতত্র বিক্ষিপ্তভাবে। শিক্ষণ প্রোগ্রামেরও সমতা নেই। প্রশিক্ষকেরও অভাব রয়েছে।

জুনিয়র পলিটেকনিকগুলি আজও উপযুক্ত সম্মান লাভ করেনি। ওয়ার্কশপ এবং লেবরেটরির সুযোগের অভাব রয়েছে মারাত্মকভাবে। তাছাড়া কোন 'Follow up' ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতঃই শিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে বেকারী ও হতাশা এসে গেছে।

অবস্থার উন্নতি করতে হলে নিয়মিত সমীক্ষা, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং, শিল্পের সঙ্গে প্রশিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং প্রশিক্ষণের আরও বাস্তবমুখিনতা প্রয়োজন। শ্রীরামপুর টেক্সটাইল, বেঙ্গল লেদার, সেরামিক এবং উড্ টেকনোলজিকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রেখে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শিক্ষাদপ্তরের অধীনে আনা প্রয়োজন। এর ফলে 'বহু কর্তার' জটিলতা দূর হবে।

কারিগরি শিক্ষা থেকে সমগ্র জাতিই লাভবান হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় শিল্পপতিরা। আংশিক দায়িত্ব নিতে তাদের আইন করে বাধ্য করা উচিত। শিল্পসংগঠনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষালয় খুলে দালানবাড়ীর প্রাথমিক ব্যয় কিংবা পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন করা শিল্পপতিদের দায়িত্ব। অন্যথায় শিল্পের উপর কারিগরি শিক্ষা কর বসিয়ে অর্থসংস্থানের নূতন পথ খোঁজা দরকার। তাছাড়া জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট অংশও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

বৃত্তি, কারিগরি, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সমস্যা : আজও ভারত শিল্পায়নে এবং কারিগরি শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর নয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা এবং অশুভ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

সমস্যাগুলি কয়েক ধরনের, যেমন শিক্ষাগত এবং গুণগত, পরিমাণগত এবং প্রশাসনগত। গুণগত বিচারে প্রথম কথাই হলো পাঠক্রম। আজও উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা মূলতঃ তত্ত্বগত। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয়ও নেই। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতা ছাত্ররা পায় না। কলেজগুলির ওয়ার্কশপ এবং ল্যাবরেটরি অত্যন্ত দরিদ্র। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষানবিসির সুযোগও সীমিত। এই অবস্থার ফলে একদিকে ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতক, অপরদিকে শিল্প-মালিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। স্নাতকরা অসুখী এইজন্য যে স্নাতক উপাধির যোগ্য দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয় না। অপরদিকে মালিকরা বলেন যে স্নাতকরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য বহু ক্ষেত্রেই অযোগ্য। নিম্নস্তরের পাঠ্যক্রমও বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তৈরী করা হয় নি। 'কোর' বিষয়গুলির পাঠক্রম আরও উন্নত হওয়া উচিত। ডিপ্লোমা স্তরে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাও অল্প। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের

ওয়ার্কশপই আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত নয়। কারখানায় বাস্তব শিক্ষণ ব্যবস্থাও অপ্রচুর।

শিক্ষাগত তৃতীয় বৃহৎ সমস্যা হলো **ভাষার সমস্যা।** মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষারও মাধ্যম হতে যাচ্ছে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করবার কোন যুক্তি নেই। আই. টি. আই-গুলিতে ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা হলো ষষ্ঠশ্রেণীর বিদ্যা। জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা। এদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ কলেজের ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্সে বহু পরিমাণেই মাতৃভাষার পঠন ও পাঠন প্রচলিত হয়েছে; স্নাতক স্তরে মাতৃ-ভাষার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কারিগরির ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য অনতিবিলম্বে মাতৃভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া দরকার এবং সরকারী উদ্যোগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাঠ্য বই রচনা এবং প্রকাশ করা দরকার। পরিশেষে ডিগ্রী এবং উচ্চতর স্তরেও নীতিগত এবং আদর্শগতভাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষায় মাতৃভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পর্যায় পর্যায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ করা দরকার। তাছাড়া ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত যথেষ্ট বইয়ের যোগান রাখাও দরকার।

আর একটি শিক্ষাগত সমস্যা হলো **শিক্ষক সংগ্রহ এবং শিক্ষণ!** শিল্প-কারখানায় নিযোজিত ইঞ্জিনীয়ারের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সমযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির বেতন, ভাতা ইত্যাদি অনেক কম। তাই শিক্ষকতার জন্য প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ওয়ার্কশপে ডেমনেস্ট্রেটর পদের কথা। এদিকেও ঘাটতি আছে। ওয়ার্কশপ, শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সমস্যার ফলে কারিগরি শিক্ষার মানও নিম্নমুখী। তাছাড়া পাস করে যারা বেরুচ্ছেন তাঁরাও পুঁথিগত বিদ্যাকেই সম্বল করেন। **আমাদের যন্ত্রবিদরা বিদেশাগত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (maintenance) করতে পারছেন, যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সৃজনী প্রতিভা দেখাতে পারছেন না,** অর্থাৎ Creative Engineer তৈরী হচ্ছেন না।

শিক্ষক সংগ্রহের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে **শিক্ষক শিক্ষণের প্রশ্নটি।** তত্ত্বজ্ঞান থাকলেই ভাল পড়ানো যায় না। পাঠপদ্ধতির উপর যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। এজন্য চাই শিক্ষণ। কিন্তু আমাদের কারিগরি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। **শিক্ষণের ব্যবস্থাও খুব অপ্রতুল।** উচ্চতর কারিগরি

শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সারা ভারতে রয়েছে সামান্য কয়েকটি রিজিওন্যাল শিক্ষণ কলেজ। তার একটি আছে কলকাতার আলিপুরে। নিম্নতর স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের জন্যও আছে কয়েকটি মাত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে একটি আছে হাওড়ার দাশনগরে। এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা হলো **নির্দেশনার অভাব**। সুনির্দেশনার অভাব এবং অন্যান্য কারণে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণতাও যথেষ্ট। তাছাড়া অপচয় হয় অনেক। সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে ডিগ্রী স্তরে অপচয় ২০ ভাগ, এবং কোন কোন বিশেষ কোর্সে শতকরা ৪৪ ভাগ পর্যন্ত।

এর পরে উল্লেখ্য হলো **পরিমাণগত সমস্যা**। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সংকট এসেছে সত্য। কিন্তু দেশের সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনার বিচারে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এখনও যথেষ্ট নয়। (অবশ্য আমাদের শিল্পায়ন প্রচেষ্টাও অকালবার্ধক্য লাভ করেছে)। তাছাড়া, যতটুকু প্রসার হয়েছে, সেখানেও পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন **স্তরের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা আছে**। উদাহরণরূপে বলা যায় ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার আনুপাতিক হারের কথা। অপরাপর প্রগতিশীল দেশে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার হার থাকে ন্যূনপক্ষে ১ : ৩। কিন্তু ডিগ্রীর প্রতি আমাদের মোহের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত উভয়ের হার ছিল প্রায় ১ : ১। সম্প্রতি অবশ্য এ বিষয়ে সচেতনতা এসেছে। এর প্রতিকার না হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবেই। **পরিকল্পনা সংক্রান্ত অপর সমস্যা হলো স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে যত্রতত্র প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি**। এর ফলে শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা স্থানীয়ভাবে কাজ পাচ্ছে না। ঐ **সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষামানের** কথা। কারিগরি শিক্ষার প্রতি সাম্প্রতিক ঝোঁক সাধারণ শিক্ষার মত এ ক্ষেত্রেও যে ছাত্রবন্যা সৃষ্টি করেছে, তার ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে।

পরিমাণগত প্রসারের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সর্ববৃহৎ সমস্যা হলো শিল্পায়নের সঙ্গে প্রসারের সঙ্গতি রক্ষা। এ ক্ষেত্রে **শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেকারত্ব দেখা দিয়েছে**। সাধারণ শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষিত বেকার বাহিনী যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব করছে।

মেয়েদের জন্য কয়েকটি হস্তশিল্প শিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছে, কয়েকটি পলিটেক-নিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যেভাবে বাড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরও বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার।

প্রশাসনগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার শিল্পপতিদের উদ্যোগহীনতা এবং দায়িত্বহীনতার কথা। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য হলো বহু কর্তার জটিলতা। তৃতীয় বক্তব্য হলো যথেষ্ট অর্থসংস্থান এবং অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ের সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের পথ: সমস্যার যে উল্লেখ আমরা করেছি, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত। **সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাধানগুলি হলো**—(১) সকল স্তরে পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস; ছাত্রদের প্রয়োজন এবং শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি। (২) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান। (৩) বিভিন্ন কারখানায় ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া। (৪) নিম্ন স্তরে এখনই মাতৃভাষায় পড়াশুনা এবং অনতিবিলম্বে উচ্চস্তরেও মাতৃভাষার প্রয়োগ। (৫) সুসংগঠিত নির্দেশনা ব্যবস্থা। (৬) শিক্ষকদের বেতনহার পুনঃনির্ধারণ। (৭) শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। (৮) আরও গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষামানের উন্নয়ণ। (৯) সার্বিক সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগের সমবণ্টন। (১০) মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। (১১) আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার অনুপাতকে অন্ততঃ ১ : ৪ স্তরে উন্নয়ন। (১১) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়। এজন্য প্রয়োজন উন্নত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা। (১৩) শিল্পমালিকদের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ। (১৪) প্রশাসনের ক্ষেত্রে বহু কর্তৃত্বের অবসান, এবং (১৫) আরও বেশী অর্থসংস্থান এবং সুসম বণ্টন।

ভবিষ্যতের চিন্তা (কোঠারি কমিশনের কথা): সুখের বিষয় ১৯৬৪-৬৬ সনের জাতীয় শিক্ষা কমিশন কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধেও বিস্তারিত সুপারিশ করেছেন। বিশেষ **উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করণের** সুপারিশ (Vocationalisation of Secondary Education)। কেবল সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ (General) শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে মনে করা হবে না। **প্রাথমিক স্তরের শেষ থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরের শুরু পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে ধরা হবে।** এই স্তরে বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করে একদিকে সাধারণ শিক্ষার উপর চাপ কমানো হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও কার্যকরী করা হবে। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্য এবং চাকুরির ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে। এই হলো Vocationalisation নীতির মর্মকথা।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষার বৃত্তিকরণ হবে।** ১৮৮৬ সনের মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিশ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে

পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রই থাকবে বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এ সব প্রতিষ্ঠান হবে আংশিক কিংবা সর্বক্ষণের। স্বয়ংসম্পূর্ণতাই (Terminal) হবে এর চরিত্র, অর্থাৎ **এই শিক্ষার পরে সরাসরি কাজে ঢোকা যাবে**। যারা সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর পরে সাধারণ পড়াশুনা ছাড়বে, তাদের জন্য থাকবে Industrial Training Institute-এ ১৪ বছরে ভর্তির ব্যবস্থা। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা মিশিয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষা চালু করা হবে। গ্রামীণ তরুণদের জন্য **সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা** মিশিয়ে Further Education **ব্যবস্থা থাকবে**। তেমনি মেয়েদের জন্য সাধারণ ও গার্হস্থ্য শিক্ষা মিলিয়ে Further Education এর ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তরে শহরাঞ্চলে সর্বক্ষণের পলিটেকনিক্, গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ইঞ্জিনীয়ারিং পলিটেকনিক্; স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, প্রশাসন ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ৩ বছরের ডিপ্লোমা কিংবা সার্টিফিকেট কোর্স এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বৃত্তিশিক্ষা কোর্সের কথা এবং কর্মরত তরুণদের জন্য Correspondence Course, Sandwich Course, Short Intensive Course এবং Day Release ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। পলিটেকনিকগুলিতে মেয়েদের জন্য বিশেষ কোর্সের কথাও কমিশন বলেছেন।

এই কাজ সামাল দেওয়ার জন্য Industrial Training Institute-গুলির প্রসার, **জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে রূপান্তর,** স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে স্থানীয় কারিগরি স্কুলের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই পলিটেকনিকেব সুপারিশ করা হয়েছে।

উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠ্য বিষয়ের আরও বৈচিত্র্যকরণ এবং **কারিগরি শিক্ষাকে আরও বাস্তবানুগ এবং ব্যবহারিক শিক্ষণকে আরও কার্যকরী** করার উপর কমিশন বিশেষ জোর দিয়েছেন। ডিগ্রী ডিপ্লোমার তৎকালীন পারস্পরিক হার ১ : ১'৪ স্থলে ১৯৭৫ সনে ১ : ১'৫ এবং ১৯৮৫ সনে ১ : ৩ অথবা ৪-এর হার প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য। **এজন্য "বাছাই নীতি" বিশেষ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যুগপৎ এই শিক্ষা প্রসারেরও প্রয়োজন রয়েছে।** সেই কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়াও বাছাই করা পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা-উত্তর কোর্স এবং কর্মরতদের জন্য Correspondence Course-এর কথা বলা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্যভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা অধিকার (Directorate) সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র দেশব্যাপী কারিগরি

শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।**

কমিশন পরিমাণগত লক্ষ্যের কথাও বলেছিলেন। **উচ্চতর স্তরে** ১৯৭০-৭১ সনের মধ্যে কারিগরি ডিগ্রী স্তরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসন ব্যবস্থা এবং ডিপ্লোমা-স্তরে ৬৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসনের কথা বলা হয়েছিল। কমিশন সুপারিশ করেছেন যেন বৃত্তি ও কারিগরি ছাত্র পিছু বার্ষিক ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বাড়ানো হয় (টাকার হিসেবে) :—

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৫-৭৬	১৯৮৫-৮৬
নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি	৪১৭	৫০০	৬০০
উচ্চ „ „ „		৭০০	৮০০
স্নাতক স্তরে কারিগরি	১১৬৭	১৫০০	২০০০
স্নাতকোত্তর „		৫০০০	৬০০০

কারিগরি শিক্ষার সংকট : কিন্তু কোঠারি কমিশনের আশাবাদী রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিরাশায় নিমজ্জিত হলাম যখন শুনলাম আমাদের শিল্পবাণিজ্যে মন্দা লেগেছে, এবং দেখলাম **ক্রমবর্ধমান ছাটাই এবং বেকারত্ব। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদেরই এই বেকারত্ব আঘাত করেছে সর্বাধিক,** কারণ শিল্পে ছাড়া এদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে এদেশে বেকার ছিল সরকারী হিসেবে ৫০ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ লক্ষতে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা ৩ কোটি এবং অর্ধবেকার আরও ২ কোটির বেশি। বর্তমানে এই সংখ্যাটি আরও বেশী। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বেকারত্ব কমবার কথা। বেকারত্বের বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে আমাদের **"জনশক্তি পরিকল্পনা"** ব্যর্থ হয়েছে।

আমাদের দেশে আমাদের কারিগরদের চাকরি হয় না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ। শুধু মাত্র আমেরিকাতেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার কাজ করেন কয়েক হাজার। বিগত ২০ বছরে আমেরিকা গ্রহণ করেছে এক লক্ষাধিক ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু এঁদের শিক্ষার জন্য তাকে কিছু ব্যয় করতে হয়নি। এইভাবে আমেরিকা বাঁচিয়েছে ৪০০ কোটি ডলারের বেশি। আর কারিগর-বহির্গমনের জন্য ভারতের লোকসান হয় ৫৫ লক্ষ ডলারের বেশি।

কারিগরদের **বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য সরকারী সমাধান** হিসেবে বলা হয়েছে—(ক) ইঞ্জিনীয়ারদের স্বাধীন ব্যবসা। (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে কারখানা স্থাপন। (গ বেকার ভাতা। (ঘ) উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্টাইপেণ্ড। (ঙ) বিদেশে চলে যাওয়ার সুযোগ দান। (চ) সর্বোপরি বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সংকোচন। কারিগরি শিক্ষালয়ে ২০ ভাগ আসন কমানো হয়েছে। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে না। শঙ্কিত ছাত্ররাও অনেকে নিজে থেকেই এই পথ ছেড়েছে।

প্রকৃত সমাধান নির্ভর করে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর। শিল্পের ব্যাপক প্রসারের উপরই কর্মসংস্থান এবং বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভরশীল। বে-সরকারী শিল্পপতির উপর নির্ভর না করে আরও বেশী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণই সমাধানের পথ।

(খ) কৃষিশিক্ষা

বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞান এমন উন্নত স্তরে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে যে যথেষ্ট বিশেষীকরণ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কৃষিতে নিয়োজিত হওয়াও অসম্ভব। বস্তুতঃ **কৃষি-শিক্ষাও প্রায় কারিগরি শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কৃষি শিক্ষার ক্রমবিকাশ হয়েছে দেশের অবস্থা অনুসারে।** মরুভূমির দেশে কিম্বা জলাভূমির দেশে কৃষিশিক্ষার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। জমির প্রকৃতি, জমির মালিকানা এবং রাজস্ব ব্যবস্থা, বৃহদায়তন কৃষির সম্ভাবনা, জলসম্পদ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কৃষিশিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক জীবন এবং মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার ফলে **ভারতে কৃষিশিক্ষার চেতনা এবং বাস্তব চেষ্টাও হয়েছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে।**

ভারতে কৃষিশিক্ষার ক্রমবিকাশঃ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে **অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই** চার্লস গ্রান্ট ভারতে "উন্নত" কৃষিশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রেভাঃ এ্যাডামও প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কৃষিশিক্ষার সংযোজন প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থ-নীতির স্বার্থে পুরানো কৃষি পদ্ধতিই রক্ষা করা হয়েছে। **কিন্তু বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে** চা, রাবার, কফি'র চাষ জমে ওঠে। হর্টিকালচারাল সোসাইটিও কর্ম ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ১৮৭৯ সনে পুনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষিবিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৪-৮৫ সনে দু'টি কৃষি-স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ সনে মাদ্রাজেও স্কুল হয়। কোন

কোন উচ্চ বিদ্যালয়েও কৃষি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হতে থাকে। এইভাবেই আধুনিক কৃষিশিক্ষার সূত্রপাত হয়।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে সারা ভারতে কয়েকটি লোকক্ষয়ী দুর্ভিক্ষের ফলে "দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিখ্যাত কমিশনের রিপোর্টে কৃষিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তদনুসারে ১৮৯৭ সনে কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়—(১) কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমমর্যাদায় কৃষিশিক্ষার ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা হবে। (২) উচ্চ মর্যাদার ডিপ্লোমাদানকারী অন্তত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। (৩) কোন কোন সরকারী চাকুরিতে কৃষি ডিপ্লোমাকে আবশ্যিক করা হবে। (৪) স্কুলে বিশেষ কৃষি-পাঠ্যক্রম প্রচলিত হবে। (৫) শিক্ষকদের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তগুলি অবলম্বন করেই মাদ্রাজের স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। নাগপুর ও কানপুরে যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৮৯২ সনে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিবপুর কলেজে কৃষি শাখা খোলা হয়। উচ্চবিদ্যালয় এবং নরম্যাল স্কুলেও ক্লাস খোলা হয়। অবশ্য কেবল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ই কৃষি বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার বিষয় রূপে স্বীকৃতি দেয়।

লর্ড কার্জনের আমলে আবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়। স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কার্জন কৃষিশিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন। ১৯০১ সনে Inspector General of Agriculture পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ সনে কয়েকটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। সেই অনুসারে কানপুর ও পুনায় যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১০ সনে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পুসা কৃষি ইন্সটিটিউট। এর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার প্রশ্নটি আবার গুরুত্ব পায় ১৯২৮ সনের রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। ঐ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে "ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ" এবং 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হয়।

গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন প্রকল্পে গ্রামীণ পুনর্গঠন তথা কৃষি-শিক্ষার প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্নরূপে উত্থাপিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস ছাড়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। স্বাধীনতার উত্তরকালে সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃষিশিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন।

কৃষিশিক্ষার বিস্তার: গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের

ভিত্তিতে কয়েকটি কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার যুগে কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে এই ধরনের কলেজের সংখ্যা সারা ভারতে ১৭টি এবং কৃষি স্কুলের সংখ্যা ৩৮। তা ছাড়া ধান, পাট, আলু, আখ, মাছ এবং অন্যান্য ফসল ও বনসম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবেষণা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে **সর্বাধুনিক প্রবণতা রয়েছে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে।** স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ২১টি। কোঠারি কমিশন কৃষি সমস্যাকে ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যারূপে আখ্যা দিয়ে কৃষিশিক্ষার দ্রুত প্রসারের প্রস্তাব করেছেন। কৃষিশিক্ষা, গবেষণা এবং এক্সটেনসন সার্ভিসের সমন্বয়ে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশই কমিশন করেছেন।

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চাৎপদ। এখানে বর্তমানে রয়েছে কেবল একটি কৃষি কলেজ, ২টি স্কুল এবং একটি মাত্র ভেটেরেনারী কলেজ। সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, অর্থ সংস্থান ঃ কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(১) কৃষি স্কুল, (২) কৃষি কলেজ, (৩) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং (৪) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠানে সাধারণ তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মিশ্রণে পাঠক্রম তৈরী হয়। উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভূমিবিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি সার, জলসেচ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞসুলভ পাঠ্যের ব্যবস্থা থাকে।

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই রাজ্য সরকারের। কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রাজ্য আইন সভায় আইন করে। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্য সরকারগুলি। সাধারণতঃ রাজ্য কৃষি দপ্তরই প্রত্যক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। **উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের।**

কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান ঃ কৃষি শিক্ষায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু আমাদের কৃষিশিক্ষালয়গুলিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক কৃষিখামারের ব্যাপক অস্তিত্ব কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ অভাব রয়েছে। তৃতীয়তঃ গবেষণার কাজও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে, জমির প্রকৃতি এবং জলসেচ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালনা করা উচিত। সুতরাং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে আরও অনেক আঞ্চলিক গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। চতুর্থতঃ কৃষির

প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এক্সটেনশন সার্ভিস এবং কৃষকদের সামনে ডেমনস্ট্রেশনের প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ বলা দরকার শিক্ষক শিক্ষণের কথা। কৃষি শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে।

আমাদের দেশে **কৃষি শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন** (১) স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, (২) ছোট চাষীর পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন শিক্ষা; (৩) নিম্নস্তরে কৃষি শিক্ষার প্রসার; (৪) আরও সার উৎপাদন প্রকল্প এবং সারের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষি কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা; (৫) এক্সটেনশন ব্যবস্থার প্রসার; (৬) অর্থকরী ফসল সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ, (৭) কৃষিশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে স্থানীয় ভিত্তিতে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ; (৮) ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি শিক্ষার সামঞ্জস্য, (৯) কৃষি শিক্ষার আবশ্যিক অংশ-রূপে অর্থনীতি এবং "এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং" শিক্ষার সংযোজন।

(গ) শিক্ষক-শিক্ষণ

আমাদের দেশের প্রাচীন এবং নিজস্ব শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল সর্দার-পড়ো প্রথা। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থাটি ধ্বংস হওয়ায় শিক্ষণ ব্যবস্থাটিও ধ্বংস হয়। নূতন ভাবে শিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক কৃতিত্ব মিশনারীদের। সপ্তদশ শতাব্দীতেই পর্তুগীজ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিনেমাররা ছিলেন এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। এ দেশের ভাষায় নতুন জ্ঞান প্রসারের জন্য যে নতুন ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন হচ্ছিল, তার থেকেই শিক্ষণ প্রচেষ্টার সূচনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে এই চেষ্টায় নূতনত্ব আসে। শ্রীরামপুর শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেরী সাহেব। বোম্বাইতে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি "Lancastrian" প্রথায় ২১ জনকে প্রশিক্ষিত করেন। এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন, পুণা সংস্কৃত কলেজ এবং সুরাট কলেজে নর্ম্যাল ক্লাস খোলা হয়। মাদ্রাজে মনরো সাহেব নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন ১৮২৬ সনে। বাংলাদেশে "কলকাতা স্কুল সোসাইটি" ট্রেনিং ক্লাস স্থাপন করেন। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে রেভাঃ এ্যাডামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ একটি বড় সুযোগ নষ্ট করে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের সংখ্যাগত পশ্চাৎপদতার সূচনা এইখানে।

১৮৫৪ সন থেকে আসে পরিবর্তন। উডের দলিলে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ এবং শিক্ষক-শিক্ষণে সরকারী সহায়তা ও সাহায্যের নীতি ঘোষিত হয়। ১৮৫৯ সনে ষ্ট্যানলির দলিলে শিক্ষণের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। নর্ম্যাল স্কুলের সংখ্যা

বাড়তে থাকে। হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির পূর্বশর্ত করার সুপারিশ করেন।

উড ডেসপ্যাচের মধ্য দিয়ে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষা 'ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রশ্নটিও বাস্তব হয়ে ওঠে। Anglo-Vernacular স্কুল প্রতিষ্ঠার নীতি স্বীকৃত হওয়ায় দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়। ভার্নাকুলার এবং এ্যাংলো-ভার্নাকুলার শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ১৮২৫ সনে কলকাতায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৬ সনে মাদ্রাজ ও চুঁচুড়া, ১৮৫৭ সনে ঢাকা, ১৮৬৩ সনে পাটনা এবং পরিশেষে ১৮৮১ সনে লাহোরে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।

হাণ্টার কমিশন রিপোর্টে শিক্ষণের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার ফলে পরবর্তী ২০ বছরে শিক্ষণ সুযোগের প্রসার ঘটে। নাগপুর (১৮৯০), রাজামুন্দ্রী (১৮৯৪), লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই এবং বাংলাদেশে কার্সিয়াংয়ে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। ১৯০১-১৯০২ সনে সারা ভারতে ছিল ৬টি ট্রেনিং কলেজ (অবশ্য কেবল মাদ্রাজে 'ডিগ্রী' দেওয়া হতো।), মাধ্যমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং স্কুল (এল. টি. ডিগ্রী), শিক্ষা-অধিকর্তার পরিচালনায় সার্টিফিকেট কোর্স এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য ১৩০টি এবং মহিলাদের জন্য ৪৬টি নর্ম্যাল স্কুল।

শিক্ষণের প্রশ্নটিও লর্ড কার্জনের আমলে গুরুত্ব লাভ করে। ১৯০১ সনে সিমলা সম্মেলনে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং ১৯০২ সনে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ সম্পর্কে সুপারিশ করেন। ১৯০৪ সনে সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা করা হয় যে স্নাতকদের জন্য এক বছরের ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমার (বি. টি.) বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স প্রবর্তিত হবে এবং অস্নাতকদের জন্য থাকবে ২ বছরের এল. টি. কোর্স। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা হবে। পেশাগত শিক্ষণের পাঠ্যক্রম রচিত হবে তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ে। শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা ইতিহাস, সাধারণ ও বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে গঠিত হবে তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রম। আর এই সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ "প্রাকটিস" ব্যবস্থা থাকবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষণ-কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে থাকবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কার্জনের এই নীতিকে অবলম্বন করেই বোম্বাই কলেজ (১৯০৬), কলকাতায় ডেভিড হেয়ার কলেজ (১৯০৮), পাটনা এবং ঢাকা কলেজ (১৯০৯) স্থাপিত হয়। এই সব কলেজে স্নাতক এবং স্নাতক-নিম্নদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়। ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে শিক্ষণ-বিহীন কোন শিক্ষক রাখা হবে না। বস্তুত আমাদের বর্তমান শিক্ষণ-ব্যবস্থা বহুলাংশে কার্জন শাসনের কাছে ঋণী।

এর পরবর্তী পর্যায়ে স্যাডলার কমিশন শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে "শিক্ষা" বিভাগ খোলার সুপারিশ করেন। হার্টগ কমিটি শিক্ষণকালকে দীর্ঘতর করা, Refresher Course প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-বিভাগ সংগঠন এবং শিক্ষা গবেষণার সুপারিশ করেন। সেই থেকে সার্জেণ্ট কমিটি, মুদালিয়র ও রাধাকৃষ্ণাণ প্রমুখ সব কমিটি ও কমিশন শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব, বিশেষতঃ প্রসারের সুপারিশ করেছেন। স্বাধীনতার উত্তরকালে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল ১৯৫৫ সনে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। নানা স্তরে সম্মেলন ও সেমিনার সংগঠিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যক্রম সংশোধিত হয়।

বর্তমানে ভারতে আছে সাত ধরনের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান—(১) স্বল্পসংখ্যক প্রাক প্রাথমিক ট্রেনিং স্কুল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মন্তেসরি কোর্স, (২) এক থেকে তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ, (৩) বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ, (৪) স্নাতক-নিম্নদের জন্য এক কিংবা দুই বছরের সিনিয়র বেসিক শিক্ষণ (পশ্চিম বঙ্গে অবশ্য সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে) (৫) স্নাতকদের জন্য স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি; (৬) স্নাতকোত্তর বি. টি.-বি. এড কোর্স এবং (৭) কোন কোন রাজ্যে সার্টিফিকেট কোর্স। এ ছাড়া অঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য গৃহবিজ্ঞান শিক্ষণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তদুপরি রিফ্রেসার, স্বল্প-কালীন কোর্স, সেমিনার, সম্মেলন, সপ্তাহান্তিক আলোচনাচক্র, শিক্ষা-প্রদর্শনী, Advisory and Guidance Scheme, Career Master Course প্রভৃতিও আজ বহুল প্রচলিত। এর সাথে রয়েছে শতাধিক "এক্সটেনশন বিভাগ"। শিক্ষণ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দান করেন N. C. E. R. T.

বিগত ২৫ বছরে সাফল্য অনেক কিছু হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেক কিছুই হয়নি একথাও নিঃসন্দেহ। সাফল্য ব্যর্থতার পরিমাণগত বিচার যুগপৎ উপলব্ধি করা যাবে নীচের তালিকা থেকে:

শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার—(সর্বভারতীয় হিসেব)

	১৯৫০-৫১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৫
প্রাথমিক স্তরে	৫৮·৮ শতাংশ	৭০·৫ শতাংশ	৮৪ শতাংশ
নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর	৫৩·৩ „	৭৬·৯ „	৮৫ „
মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩·৮ „	৬৮·৫ „	৮০ „

এই গড় হিসেবটি আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চাশ শতাংশের উর্ধ্বে আছে মাত্র ৯টি রাজ্যে, এবং এদের মধ্যে চারটি রাজ্যেই ৮০

শতাংশের বেশী। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চাশোর্ধ কেবল ১৩টি রাজ্যে, ৮০ শতাংশের বেশী কেবল দুটি রাজ্যে। মাধ্যমিক স্তরেও একই চিত্র। তবে ভরসার কথা যে শিক্ষকতায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আসছেন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নূতন শক্তি যথোচিতভাবে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের কথা: বাংলাদেশে প্রাথমিক সূচনাকালে শ্রীরামপুর মিশন, কলকাতা স্কুল সোসাইটি এবং লেডীস্ সোসাইটির ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সনে সংস্কৃত কলেজের অংশরূপে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর প্রধান। শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয় মডেল স্কুল। ১৮৫৬ সনে প্র্যাট সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন চুঁচুড়া নর্ম্যাল স্কুল। এর প্রধান ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সনে H. Woodrow স্থাপন করেন ঢাকা নর্ম্যাল স্কুল। এইসব স্কুলে এফ. এ ডিগ্রীর সমপর্যায়ে ৩ বৎসর মেয়াদী পাঠ্যক্রম চালু হয়।

এ যুগের নীতি ছিল নর্ম্যাল স্কুলে ভার্নাকুলার শিক্ষক এবং শিক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষকের শিক্ষণ। ১৮৬৪ সন থেকে নর্ম্যাল স্কুলে এবং মডেল স্কুলে ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ১৮৬৭ সনে বাতিল করা হয়। হাণ্টার কমিশন শিক্ষণকে আবশ্যিক করার কথা বলেন। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮৮৯ সনে সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরই ফলে ১৮৯৬-১৯০১ সনের মধ্যে আবার প্রবেশিকা এবং এফ. এ উত্তীর্ণদের জন্য নর্ম্যাল স্কুলে ইংরেজী ক্লাশ প্রবর্তিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে সারা ভারতে ৩০৯৭টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে বাংলাদেশেই ছিল ১৪০২টি। ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকই ছিল বাংলাদেশে। বিভিন্ন স্তরের মোট ২৩০০০ শিক্ষকের মধ্যে বাংলাদেশেই ছিলেন ৯ হাজার। অথচ এখানে তেমন কোন শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কার্জনের মানোন্নয়ন নীতির ফলে শিক্ষণের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেল! কার্জন-সরকারের উৎসাহে বাংলাদেশে শিক্ষণ কলেজ করবার চেষ্টা আরম্ভ হলো। বি. টি. এবং এল. টি. কোর্স সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্ত হলো। এই অনুসারে ডেভিড হেয়ার কলেজ হলো ১৯০৮ সনে। ঢাকা কলেজ হলো ১৯০৯ সনে।

দীর্ঘদিন পরে ১৯৩৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন কোর্স প্রবর্তিত হলো। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ-বিভাগ স্থাপিত হলো ১৯৪০ সনে এবং স্নাতকোত্তর "শিক্ষা" পাঠক্রম প্রচলিত হলো ১৯৪৯-৫০ সনে। ক্রমে বহরমপুর, স্কটিশ চার্চ এবং

লোরেটো কলেজেও শিক্ষণ-বিভাগ খোলা হয়। সরকারী হুগলী ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতার উত্তরকালে, বিশেষত ১৯৫৪ সন থেকেই এ ক্ষেত্রে দ্রুতগতি প্রসার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ রয়েছে বুনিয়াদী ধরনে রূপান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষণ-কলেজ, দুইটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ-কলেজ, এবং ৪১টি (আগরতলা সহ) স্নাতকোত্তর বি. টি., বি. এড্. কলেজ। এছাড়া আছে গৃহবিজ্ঞান-শিক্ষণ কলেজ, শারীর-শিক্ষণ কলেজ, এক্সটেনশন সার্ভিস বিভাগ, Evaluation Centre, আংশিক সময়ের Career Master's Course এবং Bureau of Educational and Psychological Research.

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজগুলি মূলতঃ তিন শ্রেণীর—সরকারী, স্পনসর্ড এবং বেসরকারী। এখানে সাফল্যের মধ্যে রয়েছে স্টাইপেণ্ড ও ডেপুটেশন-ব্যবস্থা, স্নাতক স্তরে "শিক্ষা" (অনার্স সহ) এবং স্নাতকোত্তর 'শিক্ষা' বিষয়ের পাঠ প্রভৃতি। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বভারতীয় মানের চেয়ে ভাল, কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের আনুপাতিক হার অনেক কম। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষণের হার ১০ শতাংশ ছাড়ায়নি। ৫১ হাজার শিক্ষণহীনের বিরাট এক পুরাতন বোঝা (backlog) এখনও আছে। সর্বমোট প্রায় ৬½ হাজার আসনসংখ্যার তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। পুরাতন বোঝা যদিবা আংশিক সময়ের কোর্স, নৈশ কলেজ প্রভৃতির সাহায্যে হালকা করা যায়, ইত্যবসরে তৈরী হবে অনেক নূতন বোঝা। কোঠারি কমিশন রিপোর্টে যেভাবে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনা করা হয়েছে, সেভাবে অগ্রসর হলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে প্রভেদ থাকবে অনেক। সুতরাং শিক্ষণব্যবস্থার প্রসার পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম প্রধান সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা শিক্ষণের বৈচিত্র্যকরণ। কৃষি, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ কোঠারি কমিশন এসবের উপর এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তদুপরি মাধ্যমিক শিক্ষায় Vocationalisation, Work Experience'-এর জন্য বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন হবে। তৃতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো মানোন্নয়নের। এর জন্য বিষয়-বস্তুর (Content) উপর অধিকতর দখল, দীর্ঘতর সময়ব্যাপী শিক্ষণ, উন্নত প্র্যাকটিস্-টিচিং ব্যবস্থা; পাঠ্যক্রমের আরও সংস্কার, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং সর্বাধুনিক শিক্ষণ টেকনোলজির প্রয়োগ দরকার। সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ করতে হলে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষণাধীনশিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন

প্রয়োজন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য শিক্ষণ বোর্ড এবং ইংলণ্ডের মত A. T. O. প্রতিষ্ঠা করা চলে।

এই সূত্রে কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেছেন: বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজ এবং ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলের মধ্যে ব্যবধান দূর করে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের নিকটতর করার কথা। শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে "শিক্ষাকে" ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করাব সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ, তিন বছরের স্নাতকোত্তর "শিক্ষা" পাঠ্যক্রম এবং ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা-গবেষণার কথাও সুপারিশের মধ্যে আছে।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত

1. Trace the development of technical and vocational education in modern India. Why was such education delayed? ("কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্রমবিকাশ" শীর্ষক অংশ—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ত এবং জরিপ বিভাগের প্রয়োজনে সরকারী উদ্যোগ, শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিল্পদক্ষতার প্রয়োজনে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সূচনা; জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ; যুদ্ধোত্তর কালে চাহিদা; পরিকল্পিত অর্থনীতির চাহিদা।

বিলম্বের কারণ—বিদেশী শাসকের অনীহা, ঔপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতি; জাতীয় চেতনার বিলম্বিত প্রকাশ, দেশীয় শিল্পের শম্বুক গতি ইত্যাদি।)

2. What are the different types of technical and vocational institutions existent in India? What purposes do they serve? (উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল স্ট্রীম, ট্রেড স্কুল, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষণ-বিভাগ, পলিটেকনিক, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, স্বয়ংশাসিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টেকনোলোজিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রভৃতি। প্রথম পাঁচটি প্রতিষ্ঠান দক্ষ শ্রমিক তৈরী করে; পলিটেকনিকে তৈরী হয় সুদক্ষ অর্ধবিশেষজ্ঞ কারিগর, অবশিষ্টগুলিতে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হয়।)

3. Discuss the problems of technical education and suggest remedies. Why is there a crisis in this field? (তত্ত্বগত শিক্ষা, সীমিত শিক্ষানবিসি, সুসজ্জিত ওয়ার্কসপের অভাব, ভাষার সমস্যা, উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষণ, অপ্রতুল নির্দেশনা প্রভৃতি হলো শিক্ষাগত সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় ভারসাম্য-

হীনতা, অপ্রতুল শিল্পপ্রসার, শিল্পপতিদের অনীহা, ব্যর্থ পরিকল্পনা, বহু প্রশাসকের গড্ডলিকা প্রভৃতি হলো অন্য ধরনের সমস্যা। "সমস্যা সমাধানের পথ" শীর্ষক অংশেই রয়েছে সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা।

'সংকট' সম্পর্কে আলোচনায় ঐ বিষয়ের উপর আলোচিত অংশের সারাংশ প্রয়োজন।)

4 Write a short note on Kothari Commission's recommendations in respect of technical & vocational education. ("ভবিষ্যতের চিন্তা" শীর্ষক অংশের সারাংশ।)

5. Write a note on Agricultural Education in India. ('খ' অংশের সার সংক্ষেপ করে নিতে হবে।)

6. Discuss the problems of Teacher Education in India, with special reference to West Bengal. (প্রসার, backlog, শিক্ষণের বৈচিত্র্যকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ ও ব্যবহারিক দিকে গুরুত্বের সমস্যা, মানোন্নয়ন, প্রশাসন, শিক্ষণকে বাস্তবমুখী করা ইত্যাদি! ২১৬-১৮ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়া দরকার)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার চেতনা বিবর্তিত হয়েছে আপন গতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার উত্তরকালে উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত প্রসারের চেষ্টা হয়েছে। তাই প্রাক-স্বাধীনতা যুগের পটভূমিতে আমরা বর্তমানের অবস্থা আলোচনা করবো।

স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমবিকাশ

স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ছিল গৌরবের অধিকারী। মধ্যযুগে সেই ঐতিহ্য কিছু ম্লান হলেও নারী শিক্ষা সে যুগেও অবলুপ্ত হয়নি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা যে বহুলাংশে সংকীর্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রেভাঃ এ্যাডামের রিপোর্টে এই অবস্থা ফুটে উঠেছে।

কিন্তু এই অবক্ষয়ের মধ্যেই আবার নতুন যুগের সূচনা করেন মিশনারীরা। তাঁরা শিক্ষাকে অন্দরমহলেও নিতে চান। চুঁচুড়াতে ১৮১৮ সনে রেভাঃ মে'র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে এই কর্মোদ্যমের সূচনা। পরের বছর উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়। ১৮২০ সনে Calcutta Female Juvenile Society দশটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। মিশনারী উদ্যোগে নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিলেত থেকে আসেন কুমারী কুক। তিনি প্রথম বছরেই (১৮২১) ৮টি বিদ্যালয় এবং পরবর্তী দুই বছরে আরও চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সব বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া-গণিতের সাথে ইতিহাস-ভূগোল এবং সূচীকর্মও শেখানো হয়।

মিশনারীদের এই উদ্যম সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চপদস্থ আমলাপত্নীদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় Ladies' Society for Native Female Education (১৮২৪)। ভারতীয়রাও এগিয়ে আসেন। রাজা বৈদ্যনাথের ২০ হাজার টাকা দান নিয়ে শ্রীমতী উইলসন (প্রাক্তন মিস্ কুক) ১৮২৬ সনে প্রতিষ্ঠা করেন সেণ্ট্রাল স্কুল এবং দেশীয় শিক্ষিকা-শিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ক্লাশও শুরু করেন। অন্যান্য প্রদেশেও আধুনিক নারীশিক্ষার সূচনা হয়। মাদ্রাজে ১৮২১ সনে প্রথম স্কুল হয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে সেখানে স্কুলের সংখ্যা হয় ৭টি। বোম্বাইতে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২৪ সনে। পরবর্তী দশ বছরে প্রধানতঃ স্কটিশ মিশনের উদ্যোগে আরও দশটি

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর প্রদেশের নানা স্থানেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মিশনারীরা অনাথাশ্রম, কর্মাশ্রম, প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশনারীদের এই সাফল্যের পিছনে অবশ্য ছিল নবজাগরণের প্রভাব। রাজা রামমোহন রায় ব্যক্তিগতভাবে এবং মিশনারীদের সহযোগে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুব-বাংলা গোষ্ঠী সর্বাংশে নারী শিক্ষার সহায়তা করে। স্ত্রী-শিক্ষার চেতনা রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সমাজকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। কলকাতা এবং হাওড়ায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন মফঃস্বলেও পৌঁছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়া, যশোহর, বারাসত এবং বাংলার বাইরে পুণা, আমেদাবাদ, বোম্বাইতে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পুণাতে মহাত্মা ফুলে হন এ বিষয়ে অগ্রপথিক। বোম্বাইতে Students' Scientific and Literary Society নয়টি স্কুল পরিচালনা করেন। ১৮৫১ সনে আমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিতে বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সনে প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল (বেথুন স্কুল)।

শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুকূল পরিবেশের ফলে উডের ডেসপ্যাচে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সরকারী উৎসাহ ও সাহায্যের নীতি ঘোষণা করা হয়। এই যুগেই বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৮৫৫-৫৮ সনের মধ্যে তিনি ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে নবপর্যায়ে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হওয়ায় নারীশিক্ষার চেতনা হিন্দু সমাজেও প্রসারিত হয়, যদিও এ যুগে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজ এবং বোম্বাইতে পার্শি সম্প্রদায়। ১৮৭১ সনে সারা ভারতে শুধু মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৭৯০টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩৪টি। মিশনারীরা ট্রেনিং স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন, সরকারও উৎসাহ দেন। এই উৎসাহকে অবলম্বন করেই কুমারী মেরী কার্পেন্টার ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষায় অগ্রগতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানও সংশোধিত হয়। ১৮৭৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেয়। পরবর্তী বছরেই বেথুন স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। উচ্চশিক্ষায় মেয়েরা এগুতে পারে। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ও দ্বার উন্মুক্ত করে। ১৮৮১ সনে বেথুন স্কুল অনুমোদন পায় এবং দু'বছর পরে চন্দ্রলেখা ও কাদম্বিনী বসু স্নাতক উপাধি পান। ইতিমধ্যে ১৮৮১ সনে মেডিক্যাল কলেজের দরজাও মেয়েদের কাছে খুলে দেওয়া হয়।

হাণ্টার কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থাও বিবেচনা করেন। কমিশনের সুপারিশের

মধ্যে ছিল বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য, শিক্ষিকাদের বিশেষ ভাতা, মহিলা নর্ম্যাল স্কুল, পৃথক পরিদর্শনব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পাঠ্যক্রম।

কমিশনের সুপারিশ আংশিক প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটে। স্ত্রী-শিক্ষার এই প্রসারের ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী উদ্যমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উচ্চশিক্ষা স্তরে এই যুগ পর্যন্ত ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পার্শি এবং ব্রাহ্মরাই ছিলেন এগিয়ে। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা প্রাথমিক স্তরেই ছিলেন বেশী। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও হিন্দুরা ছিলেন মুসলীমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

স্ত্রী-শিক্ষার এই **প্রসারের পিছনে চালিকাশক্তি ছিল জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ**। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনও শক্তি পায়। কার্জনের আমলে এবং তার পরে মেয়েদের আলাদা স্কুল, আলাদা পরিদর্শন-ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য, যানবাহন-ব্যবস্থা, পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষিকা নিয়োগ ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন তোলে। ১৯০৪ সনে এ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠা করেন কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল। ১৯১৬ সনে মহাত্মা কার্ভে স্থাপন করেন ভারতীয় নারী-বিশ্ববিদ্যালয়। নব চেতনার জোয়ারে মেয়েরা পেশাগত শিক্ষাও নিতে থাকেন। ১৯১৬ সনে স্থাপিত হয় দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ। ১৯১৭ সনে সাধারণ কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি এবং পেশাগত শিক্ষার কলেজ ৪টি।

এর পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে নারীশিক্ষার পথে প্রতিকূলতা আরও অপসারিত হয়। মহিলারা নানা ধরনের সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৭ সনে "Women's Indian Association"; ১৯২৫ সনে "জাতীয় মহিলা পরিষদ" এবং ১৯২৭ সনে A. I. W. C. স্থাপিত হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সারদা আইন পাস হয়। গান্ধীজীর সর্বোদয় আন্দোলনের মধ্যে নারীশিক্ষার কার্যক্রম গৃহীত হয়। এ সবের ফলে ১৯২১-২২ সনের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীসংখ্যা হয় দ্বিগুণ, কলেজীয় স্তরে চতুর্দশ গুণ এবং পেশা শিক্ষায় দশ গুণ। স্বাধীনতার বছরে, ১৯৪৭-৪৮ সনে, সারা ভারতে শুধু মহিলাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১২৯৫১টি এবং এগুলিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩৫৫০৫০৩।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল ধরনের কর্ম-ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। বস্তুতঃ আজ মহিলারা বহু ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিযোগিনী। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও মেয়েরা অন্দর থেকে বাইরে এসে রুজি

রোজগারের পথ ধরেছেন। স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস, অধিকার স্বীকৃতির আনন্দ এবং অর্থ সংকট—এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবে নারী-শিক্ষাও এগিয়েছে। মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষায় গৃহবিজ্ঞান এবং সুকুমার কলার প্রবাহ দুইটি মূলতঃ মেয়েদের জন্যই প্রস্তাব করেন। ১৯৫৮ সনে ভারত সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে "জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি" স্থাপন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন যেন (১) আগামী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে একটি বিশেষ সমস্যারূপে বিবেচনা করা হয়, (২) কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নারীশিক্ষার দায়িত্বে একজন যুগ্ম শিক্ষা পরামর্শদাতৃ নিয়োগ করা হয়, (৩) প্রতি রাজ্যে যুগ্ম-শিক্ষাঅধিকর্তা হিসাবে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়, (৪) মেয়েদের স্কুলে যেন শিক্ষিকা অবশ্যই নিয়োগ করা হয়, (৫) প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়ের অভিন্ন এবং মাধ্যমিক স্তরে ভিন্নতর ব্যবস্থা যেন পাঠ্যক্রমে রাখা হয়, (৬) মহিলাদের জন্য পৃথক কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, (৭) অতি সত্বর বালিকা ও মহিলা শিক্ষার জন্য যেন স্থায়ী জাতীয় পরিষদ গড়া হয়।

এর পর ছেলে এবং মেয়ের পাঠ্যক্রম আলাদা করবার প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য গঠিত হয় শ্রীমতী হংস মেহতার নেতৃত্বে আর একটি কমিটি। কমিটি অভিমত দিলেন যে সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যেই আলাদা গুরুত্ব দিয়ে এবং আলাদা ব্যবস্থাপনায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার করা প্রয়োজন। সাময়িকভাবে পার্থক্য থাকলেও পাঠ্যক্রমে স্ত্রী-পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী পার্থক্য অবাঞ্ছনীয়। এই কমিটি ছাড়াও শ্রীভক্তবৎসলমের নেতৃত্বে আর একটি কমিটি ছঃটি অনগ্রসর রাজ্যের নারীশিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন।

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট এবং উপরোক্ত তিনটি কমিটির সুপারিশ অবলম্বন করেই স্বাধীনতার উত্তরকালে স্ত্রী-শিক্ষা অগ্রসর হয়েছে। এই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার যে না হয়েছে তা নয়। ১৯০১ সনে যেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে প্রতি শত ছাত্র অনুপাতে ছাত্রী ছিল মাত্র ১২ জন, এবং মাধ্যমিক স্তরে ছিল মাত্র ৪ জন, সেক্ষেত্রে এখন দাঁড়িয়েছে প্রতি শতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৩০ জন। ১৯০১ সনে যেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সর্বভারতে মাত্র ২৬৪ জন মহিলা, সেক্ষেত্রে এখন সংখ্যাটি হয়েছে তিন লক্ষাধিক। স্বাধীনতার উত্তরকালে রক্ষণশীলতাও অনেকটা কমেছে। প্রাথমিক স্তরে ৮৫ শতাংশ, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ৭৮ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪০ শতাংশ মেয়ে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে। পেশাগত বিদ্যালয়ে কিম্বা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়েছেন। মেয়েদের জন্য কুটির-শিল্প:

শিক্ষণ বিদ্যালয়, ট্রেড স্কুল এবং পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক রাজ্যেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীশিক্ষা এখন অবৈতনিক। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থাও হয়েছে।

কিন্তু পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আনুপাতিক প্রসারের ক্ষেত্রে এখনও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে রক্ষণশীলতা এবং সংস্কার আজও কম নয়। পিতামাতাব আর্থিক সঙ্গতিও ক্রমেই সীমিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যানবাহন এবং সহশিক্ষার সমস্যাও আছে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই আইন মানা হয়না। শ্বশুর বাড়ীতে থেকে, বিশেষতঃ মা হওয়ার পরে স্কুল-কলেজে পড়া অনেক পরিবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া বাবা মায়ের চোখে ছেলে-মেয়ের প্রভেদ এখনও দূর হয়নি।

শিক্ষাগত সমস্যাও আছে অনেক। আজও পর্যন্ত মেয়েদের ভিড় প্রধানত মানবিক বিদ্যায়। তাই শিক্ষিতা মহিলাদেব বেকাবত্ব ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। শিক্ষাকে আরও কর্মমুখীন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কবা প্রয়োজন। ম্যাট্রিক পাশ করেও অন্দরমহলে বধূ হিসেবে রয়েছেন বর্তমান ভারতে দশ লক্ষাধিক মহিলা। আর্থিক সংকটের তাড়নায় কিংবা জাতি গঠনেব আদর্শে এঁরাও যদি কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামেন, তবে অবস্থাটি মোটেই সহজ হবে না। সুতরাং মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও অনেক প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

এই সমস্ত সমস্যাগুলি বিবেচনা করেছেন কোঠারি কমিশন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উপব কমিশন গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকতা, নার্সিং, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ অধিকারের কথা স্বীকার করেও পুরুষদের সমতালে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেই কমিশন সুপাবিশ করেছেন। তাই গৃহবিজ্ঞান কিংবা সুকুমাব কলা "প্রবাহের" বদলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঐগুলি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখবার সুপারিশ করা হয়েছে। তদুপরি মেয়েদের বিজ্ঞান ও গণিত পড়ার উপব বিশেষ জোর দেবার কথাও বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কথা ঃ স্বাধীনতার উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে। অবশ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নানা ধরনের। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এখানে আছে মেয়েদেব জন্য পৃথক কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, শিক্ষণ কলেজ এবং বিশেষ শিক্ষার কলেজ। প্রাথমিক স্তরে এখানে সহশিক্ষার নীতিই সাধারণভাবে প্রচলিত। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে গ্রামাঞ্চলে ⅔ ছাত্রী এবং কলেজীয় স্তরে অর্ধেক ছাত্রীই পড়ে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বৃত্তি ও

পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ছাড়াও শিল্প-শিক্ষা, চিকিৎসা, চারুকলা, এবং বাণিজ্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। আর আছে নানা ধরনের নৃত্য-গীত বিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক। আলাদা পরিদর্শন-ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েরা উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রতিটি স্তরেই ছেলের তুলনায় মেয়ে ভর্তির সংখ্যা অল্প। এখনও মানবিক বিদ্যার বহুল প্রাধান্য। এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা এখনই তীব্র।

নারীশিক্ষায় অগ্রগতি ঃ স্বাধীনতার ফলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে নারীশিক্ষায়ও অগ্রগতি হয়েছে। সংবিধানে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত। বিভিন্ন নারীকল্যাণ-মূলক আইনও পাস হয়েছে। সর্বোপরি আর্থিক সংকট শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ সবের ফলে নারীশিক্ষার বিস্তার হয়েছে দ্রুত। তবে সামাজিক রক্ষণশীলতা আগের চেয়ে শিথিল হলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাই **নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার প্রাচীর আজও বাধা হয়ে আছে।**

১৯৫৮ সনে একটি সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে গঠিত হয় **নারীশিক্ষার জাতীয় কাউন্সিল।** এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরে নারীশিক্ষার বিশেষ বিভাগ ও প্রতিটি রাজ্যে যুগ্ম অধিকর্তা পদ সৃষ্টি করা হোক এবং নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষার পরে **সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়।** বয়স্কা নিরক্ষরদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার সুপারিশ করা হয়েছে।

নারীশিক্ষার সমস্যা ঃ—শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার আজ স্বীকৃত। গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। বহু রাজ্যেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীশিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন এসেছে! বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, পেশা ও চাকুরির দরজা আজ নারীদের কাছে উন্মুক্ত! কিন্তু নারীশিক্ষার সমস্যাও রয়েছে অনেক। সামাজিক কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা আছে। এই রক্ষণশীলতা মুসলীম, অনগ্রসর শ্রেণী কিংবা উপজাতির মধ্যে আরও গভীর। বিয়ের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে আইন থাকলেও বাল্যবিবাহ এখনও চলছে। **মায়েদের নিরক্ষরতা সন্তানদের সাক্ষরতাকে ব্যাহত করেছে।** শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু সন্তানবতী নারীদের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেস

কিংবা নার্সারী নেই। নার্সারী বিদ্যালয় কিংবা K. G.-র প্রসারও অল্প। তাছাড়া আছে **যানবাহনের সংকট।** হস্তশিল্প ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ মেয়েদের কাছে আজও সামান্য। সর্বোপরি মেয়েদের কাছেও চাকুরির বাজার আশাপ্রদ নয়। ১৯৭৫ সনের প্রথমে ভারতে তালিকাবদ্ধ চাকুরি প্রার্থীর মধ্যে মহিলারা ছিলেন ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ⅔-এর কোন উৎপাদনী দক্ষতার ট্রেনিং নেই। চাকুরি-প্রার্থী মহিলাদের ৩৮·৬ শতাংশ হলেন ম্যাট্রিক পাসের নীচে। কিন্তু ৬১·৪ শতাংশই শিক্ষিতা। তালিকাবদ্ধ হননি এমন মহিলার সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। অবস্থাটি ক্রমেই আরও জটিল হয়ে উঠবে।

বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি

বিগত শতকের প্রথমেও ভারতে সাক্ষরতাব হার ইউরোপের চেযে নিকৃষ্ট ছিল না, একথা মাদ্রাজ ও বোম্বাই রিপোর্ট এবং এ্যাডাম বিপোর্টেই দেখা যায। তখন থেকে গণশিক্ষার চেষ্টা হলে আজ আমাদের সাক্ষরতার সমস্যা এত তীব্র হতো না। কিন্তু এ্যাডামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হলো। গণশিক্ষার দেশজ ব্যবস্থাটি শুকিয়ে গেল। কিন্তু নূতন কোন গণশিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো না। এ ভাবেই সৃষ্টি হলো আমাদের বর্তমান নিরক্ষরতা সমস্যার বীজ।

জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গণশিক্ষা চেতনাও বিকশিত হলো। তাই ১৮৮২ সন থেকেই বযস্ক শিক্ষার প্রশ্নটি বাস্তব রূপ নিল। হাণ্টার কমিশনই সর্বপ্রথম বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচাব কবলেন। সে সময় থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু অর্থসংকট এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে গণশিক্ষাব চেষ্টা আবার থেমে যায়।

১৯১৯ সনে শাসনসংস্কারের ফলে প্রাদেশিক স্তরে শিক্ষা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে আসে! তখন আবার বয়স্ক শিক্ষায় নূতন চেষ্টা হতে থাকে। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে ‘গণসংযোগ নীতি’র ফলে প্রশ্নটি আরও গুরুত্ব পায়। কিন্তু ১৯২৯ সনের বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে সবই ব্যর্থ হয়। তবে এ যুগেই বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পরিচ্ছন্ন হতে থাকে।

১৯৩৭ সনের পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে কিছু কাজ হয়। ডঃ সৈয়দ মামুদের বিশেষ উদ্যোগে কয়েকটি প্রদেশে স্বল্পস্থায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলেই গণশিক্ষা আরম্ভ হয়। গান্ধীজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গণ-সাক্ষরতার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় সরকারী প্রশাসনে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা

বোর্ডের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন হয়। পরিশেষে সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৪০ বছরের মেয়াদে পূর্ণ সাক্ষরতার কল্পনা করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে গণশিক্ষা সম্বন্ধে চেতনার নব রূপায়ণ ঘটে। সাক্ষরতার সঙ্গে মৌলিক শিক্ষার (Fundamental Education) সমন্বয় করে **সমাজ-শিক্ষা** (Social Education) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে স্থান পেয়েছে **সাক্ষরতা, নাগরিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অবসর বিনোদনের শিক্ষা**। বয়স্ক শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। গ্রামীণ রেডিও কেন্দ্র, নৈশ স্কুল, জেলখানার মধ্যে স্কুল, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমান প্রচেষ্টা চলছে। জনতা কলেজের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় সমাজকর্মীরা কৃষি, হস্তশিল্প, পশুপালন, স্বাস্থ্য, সমবায় ও পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে শিক্ষা পাচ্ছেন। সম্প্রতি টেলিভিশন ব্যবহারের কথাও হয়েছে।

গণশিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। কিন্তু এজন্য তারা কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও নির্দেশনার জন্য রয়েছে National Book Trust এবং National Centre of Fundamental Education প্রমুখ সংগঠন।

পশ্চিমবঙ্গের কথা: সাক্ষরতা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং "Further Education" নীতির সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয় ১৯৪৮ সনে। সেই অনুসারে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, প্রতি জিলায় জেলা-লাইব্রেরী, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী। উন্নয়ন ব্লকের কাজের মধ্যে স্থান পেয়েছে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, গ্রামীণ ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, যুব-ক্লাব এবং যুব-শিবির, কর্মশিবির প্রভৃতি।

গণ সাক্ষরতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আছে দুই হাজারের বেশী বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র এবং সরকারী, মিউনিসিপ্যাল, এবং বেসরকারী (সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যহীন) নৈশ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলি এবং গণ-সাক্ষরতা কেন্দ্রের কাজে সাহায্য করবার জন্য আছে কয়েকটি স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ Audio-visual unit। ১২টি মডেল সমষ্টিকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এ সব কেন্দ্রে সাক্ষরতার সঙ্গে লাইব্রেরী সার্ভিস্, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্রীড়া ও প্রমোদমূলক কর্মোদ্যম, মহিলা সমিতি প্রভৃতির সমন্বয় করা হয়েছে। বাণীপুর ও কালিম্পং-এ দুইটি জনতা কলেজেও আলোচনা-সভা, বক্তৃতামালা, উৎসব ও মেলা সংগঠিত হয়। 'কথকথা', নাটক প্রভৃতি গণ-সংস্কৃতিমূলক কর্মোদ্যমকেও সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

বয়স্ক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য আছেন প্রধান পরিদর্শক, ১৬ জন সমাজ-শিক্ষা

অফিসার এবং ৮০টি উন্নয়ন ব্লকের প্রতিটিতে দু'জন করে সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী। ১১টি বেসরকারী সংগঠনের সহযোগিতায় সরকারী চেষ্টা পরিচালিত হয়।

কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বেশী, ফলশ্রুতি ততোই অল্প। বর্তমানে কেবল "পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ" সমিতিই প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যই যথেষ্ট :—

১৯৫১—পুরুষ ৩৪·২ শতাংশ, মহিলা ১২·২ শতাংশ=মোট ২৪ শতাংশ

১৯৬১— „ ৪০ „ „ ১৬·৮ „ =মোট ২৯ „

১৯৭৫— ৪২·৮ „ „ ২২·৪ „ =মোট ৩৩·২ „

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে ৫৭২ জন এবং প্রতি হাজার মহিলার মধ্যে ৭৭৬ জনই নিরক্ষর।

বয়স্ক শিক্ষার প্রসার—১৯৫১ সনে ভারতে সাক্ষরতা ছিল ১৭%। ১৯৬১ সনে সাক্ষরতা হয়েছিল ২৪%। কিন্তু সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও একই সময়ে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ২৯ কোটি ৮ লক্ষ থেকে ৩২ কোটি ৪ লক্ষতে উঠেছে। স্বভাবতঃই **সাক্ষরতার সমস্যা ভারতের বিরাটতম সমস্যা,** কারণ বর্তমানেও সাক্ষরতার হার মাত্র ২৯·৪৯ শতাংশ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে সাধারণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সনের আগেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল। বয়স্ক শিক্ষা বলতে তখন বোঝাতো সাক্ষরতা, লিখন-পঠন এবং সাধারণ গণিতের দক্ষতা এবং কর্ম-জীবন ও নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ জ্ঞান।

স্বাধীনতার উত্তরকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের **'মৌল শিক্ষা'** (ফাণ্ডামেণ্টাল এডুকেশন) প্রকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতেও গণশিক্ষা সম্বন্ধে ধ্যানধারণার পরিবর্তন হয়। সমাজ উন্নয়নের ভিত্তিরূপে **সমাজ-শিক্ষা (সোস্যাল এডুকেশন) নীতি গ্রহণ করা হয়।** এই কার্যক্রমের **পাঁচদফা কর্মসূচীর** মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা, নাগরিকতার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক শিক্ষা (aesthetic education), স্বাস্থ্য ও মৌল অর্থনীতির জ্ঞান, গ্রামোন্নয়নের জন্য নারী ও তরুণ সংগঠন প্রভৃতি। গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং audio visual aid ব্যবহারের কার্যক্রমও রয়েছে।

গণশিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। অবশ্য এ ব্যাপারে পথনির্দেশ করা, বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় করা এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার U.N.E.S.C.O-র সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সাংবিধানিক মৌলনীতির ৪৬-ধারা অনুসারে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সম্বন্ধে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের।

রাজ্য সরকারগুলি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু লাইব্রেরী সংগঠন গড়ে উঠেছে। সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রে রেডিও দেওয়া হয়েছে। টেলিভিশনও দেওয়া হবে। কিছুসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণও করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে **"জনতা কলেজ" বৎসরে তিনবার ৪ মাসের 'সমাজ কর্মী শিক্ষা কোর্স' পরিচালনা করছে।** এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য, সমবায়, পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা। বিভিন্ন রাজ্যে **'বিদ্যাপীঠ'গুলিও এই কাজে সহায়তা করছে।** গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকারাও গণশিক্ষার কাজ করছেন।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে অতি সামান্য। জীবনসংগ্রামের সাথে সম্পৃক্তরূপে গণশিক্ষার প্রচেষ্টা না হলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অসম্ভব।

প্রশ্ন

1. Trace the development of women's education in India since early 19th century. Why is it still lagging behind ?

2. Discuss the development of women's education since independence and the problems in this field.

3. Discuss the provisions for social education in West Bengal.

(প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভাগ)

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে

(কোঠারি কমিশন : জাতীয় শিক্ষানীতি)

পরাধীনতার আমলে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য জাতি সংগ্রাম করেছে। **কিন্তু স্বাধীন ভারতেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতির প্রয়োজন মেটাতে পারেনি।** জটিল জগতে জীবনযুদ্ধের জন্য এ শিক্ষা তরুণকে প্রস্তুত করে না। এ শিক্ষা সৃষ্টিধর্মী নয় বলেই "জীবনের শিক্ষা" নয়। যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তার মধ্যেও বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন দিকের মধ্যে সংহতির অভাব। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী হয়নি। জাতির প্রয়োজন অনুসারে বিচিত্রমুখী শিক্ষাধারাও সৃষ্ট হয় নি। মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে যোজন ব্যবধান। শিক্ষামানের ঘটেছে ক্রম-অবক্ষয়। গ্রামীণ-প্রতিভা উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটেছে শহরের দিকে। উচ্চশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে জাতিকে সার্থক নেতৃত্ব দিতে। তাই আজকের প্রয়োজন কেবল শিক্ষা প্রসার নয়। **আজকের প্রয়োজন সমাজের চাহিদা এবং সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সুপরিকল্পিত প্রসার।** যথার্থ প্রগতিমূলক শিক্ষাই আজ জাতির প্রয়োজন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবেশ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ভারতে চলেছে আদর্শহীনতার নৈরাজ্য। বহু সুস্থ মূল্যবোধের ঘটেছে অপমৃত্যু। নূতন মূল্যবোধ আজও গড়ে ওঠেনি। এই শূন্যতার মাঝে দেখা দিয়েছে শুভবুদ্ধির দৈন্য এবং আদর্শহীনতা। চিন্তাজগতও আজ জটিলতাগ্রস্ত। রক্ষণশীলতা ও প্রগতির দ্বন্দ্বে ভারতের গৃহ আজ দ্বিধাবিভক্ত। আর এই সুযোগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে নানা ধরনের বিষাক্ত চেতনা। এখানেও দেখা যায় বিবিধ স্বার্থের চাপ (প্রেসার গ্রুপ), রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শের টানা-পোড়েন; ধর্মীয় উন্মাদনা, গোষ্ঠীস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, আঞ্চলিক স্বার্থ আর ভাষাদ্বন্দ্ব। **ভারতের জাতিসত্তাই আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুখে।** শিক্ষাক্ষেত্রটি হয়েছে এই গভীর সংকটের প্রতীক।

জাতির আর্থিক জীবনের সাথে শিক্ষার নাড়ীর সংযোগ ঘটেনি। তাই শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েও শিক্ষার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বৃহত্তর সমাজ হয়েছে

উদাসীন। তরুণের জীবনতরণী হয়েছে নোঙ্গরহীন, পালে নেই হাওয়া। জীবন হয়েছে গতিভ্রষ্ট। **স্বাধীনতার সংগ্রামকালে যে আদর্শ জাতিকে সংহত করে রেখেছিল সে আদর্শ আজ আর নেই। নূতন কোন আদর্শও তার স্থান গ্রহণ করে নি।** এরই মাঝে গজিয়ে উঠেছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন শ্রেণীবৈষম্য। যুদ্ধধনী, কালোবাজারী এবং উন্নাসিক উচ্চ বেতনভোগীরা "ইংরেজী বিদ্যালয়" ছাড়া কোন স্কুলকে নিজ সন্তানের যোগ্য স্থান বলে মনে করেন না। দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৃহত্তম সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ভূঁইফোড় নয়াবাবুরা সঙ্গতিহীন। মুনাফার লোভে কিংবা 'চ্যারিটি' নামে এই প্রবণতাকে সচেতনভাবে বাড়িযে তুলেছেন এক শ্রেণীর শিল্পপতি। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যমের এক নব ভূমিকায় তাঁরা অবতীর্ণ। সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা এই যে, এই প্রবণতা আজ সাধারণ এবং স্বল্প আয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্তকেও গ্রাস করতে উদ্যত। তাই প্রগতিমূলক আদর্শের ভিত্তিতে সুসংহত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

কোঠারি কমিশনের পটভূমি : এই নূতন বিপদ সম্পর্কে স্বীকৃতি না এসে থাকলেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা (তথা অব্যবস্থা ও পঙ্গুত্ব) সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী মহলে স্বীকৃতি এসেছে। প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলা স্বীকার করেছেন যে শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আধুনিক যুগে সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শক্তি এবং মানবপুঁজির সংহত ব্যবহারের উপর। এবং **শিক্ষাই হলো মানবপুঁজির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।** তাই জাতির পক্ষে প্রয়োজন উদ্দেশ্যমূলক, উন্নত মানের, সহজলভ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে জাতীয় সংহতির সহায়ক। এর মধ্যে থাকবে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ পূর্ণ করবে—জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করবে—গণতন্ত্র এবং সংবিধানের মৌল নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। **এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকবে শিক্ষায় সমসুযোগের অধিকার।** বিদেশের নকল হওয়ার বদলে ভারতের সামনে বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই সমস্ত স্তর ও সমস্ত দিকের এক সর্বাঙ্গীণ সমীক্ষা ও মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য গঠিত হলো ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন। ১৯৬৪ সনে গান্ধী-জয়ন্তী দিবসে প্রতিষ্ঠিত **এই কমিশনের দায়িত্ব হলো শিক্ষার সকল স্তরে উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্তরে সাধারণ**

নীতি স্থির করা, যেন একটি সুসংহত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

কোঠারি কমিশন : ডঃ ডি এস কোঠারির নেতৃত্বে দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের কার্যপরিধি হলো ব্যাপক। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরী করা ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সম্পর্ক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পরীক্ষাব্যবস্থা, ভাষাশিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি সব-কিছুই কাজের মধ্যে ধরা হলো। তা ছাড়া পাঠ্যবই, ছাত্রকল্যাণ এবং আনুষঙ্গিক সব বিষয় কমিশনের এক্তিয়ার বলে গ্রহণ করা হলো। শিক্ষক-শিক্ষণ, সর্বস্তরের শিক্ষকদের দক্ষতা, বেতনক্রম, মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সুপারিশ করাও কমিশনের কাজ হলো। শিক্ষা-প্রশাসনে রাষ্ট্র, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করাও কমিশনের আওতায় এলো। শিক্ষার অর্থসংস্থান এবং ব্যয়ভার বণ্টনের কথাও কমিশনকে বলতে হলো। **অর্থাৎ একটি সামগ্রিক এবং সর্বাঙ্গীণ জাতীয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করাই হলো কমিশনের দায়িত্ব।**

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ক্রমপদক্ষেপ : যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কথা আজ বলা হলো, সে দিকে চেতনার সূচনা হয়েছিল অর্ধশতাব্দীকাল আগে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই চেতনা এগিয়েছে এবং কাজও কিছু হয়েছে। তবে যেহেতু রাষ্ট্র ছিল না জাতির রাষ্ট্র, সেহেতু প্রচেষ্টা হয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

ইংরেজী শিক্ষার বিজাতীয়তা, অসম্পূর্ণতা এবং জাতীয় জীবনের সাথে অসঙ্গতির অনুভূতি থেকেই জাতীয় শিক্ষাচেতনার উন্মেষ ঘটে। এই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন রূপে। বাস্তব ফলশ্রুতির বিচারে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে এই অর্থে যে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু সার্থক হয়েছে এই অর্থে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চেতনা এই সময় থেকে দানা বাঁধতে থাকে। শিক্ষা আন্দোলনের নেতারা বলেন যে জাতির ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশপ্রেমকে অবলম্বন করে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষা একদিকে **জনগণের নিরক্ষরতা দূর করবে,** অপরদিকে **জাতির প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হবে।** জাতীয় সংহতির নব মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োজন মিটিয়ে **জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।**

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের উত্তরকালে কাজ এগোয় ধাপে ধাপে। প্রাথমিক

শিক্ষার আন্দোলন, গোখেল বিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা প্রথম প্রকাশ পায়। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে আসে উচ্চশিক্ষা স্তরে মাতৃভাষা পড়া এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আন্দোলন। একই সময় গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এবং শিক্ষাবিভাগ ভারতীয়করণের চেষ্টা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে বয়স্ক শিক্ষার কাজ শুরু হয়। সর্বোপরি গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরেজী সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সমাজ-উন্নয়নের অঙ্গরূপে উৎপাদনকেন্দ্রিক সর্বজনীন শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়। নারী-শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শিক্ষাকেন্দ্রে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা হয়। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা আন্দোলনও ক্রমেই শক্তিশালী হয়।

স্বাধীনতার উত্তরকালে তারাচাঁদ কমিটি, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি সমন্বয়যোগের ভিত্তিতে বহুমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। **মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও আদর্শে বিরাট পরিবর্তন আনা হয়।** রাধাকৃষ্ণান কমিশন **বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং আদর্শকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেন।** সমাজের প্রয়োজনে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা-কেন্দ্রও গড়ে ওঠে।

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, নারীশিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষা, মাতৃভাষা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, শিক্ষা-প্রশাসন কিংবা গবেষণা—সবদিকেই নূতন চেতনার উন্মেষ হয়েছে। কিন্তু কাজের চেষ্টা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র বা রূপ কি? অর্থাৎ কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় ব্যবস্থা বলা চলে? শিক্ষার দায়িত্ব Conservation, Transmission, Creation. এই মানদণ্ডে বিচার করে প্রথমেই বলতে হয় যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার **শিকড় থাকবে জাতির ঐতিহ্যে।** এ ব্যবস্থা হবে **জাতির স্বজাত্যবোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহন।** কিন্তু এ শিক্ষা কেবল অতীত গৌরবের জের টেনে চলবে না। জীবনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে **যা কিছু বর্জনীয় তা বর্জন করবে, আবার যা কিছু প্রয়োজনীয়, তা সৃষ্টি করবে।** সুতরাং অতীতমুখী এবং ভবিষ্যৎমুখী—উভয় চরিত্রের সমন্বয় করেই এ ব্যবস্থা বর্তমানের শিক্ষার্থীকে তৈরী করবে। স্বজাত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এ ব্যবস্থা বিশ্বচেতনা হারিয়ে ফেলবে না। পরন্তু **বিজাতীয়তাকে অন্ধ অনুকরণের বদলে বিশ্বের সবটুকু ভালকে**

আত্মস্থ করে গ্রহণ করবে। যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতির পার্থিব উন্নতির সহায়ক নয়, তা কখনও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নয়। সুতরাং উৎপাদনী দক্ষতা বাড়িয়ে বর্তমান জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব। অনবরতই জাতিকে আধুনিক করে ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ-দানই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাজ।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণ, ধর্ম, আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের পক্ষে সমসুযোগ ও অধিকার থাকবে। মেধা, প্রবণতা ও দক্ষতা অনুসারে উচ্চতম শিক্ষা-স্তর পর্যন্ত যাওয়ার দরজা সকলের কাছে খোলা থাকবে অধিকার হিসাবেই। তবে সকলেই এক দরজায় ঢুকবে এমন কথা নয়। সমমূল্যের বহু পথে উচ্চতম স্তরে পৌছবার সুযোগ থাকবে। এই বৈচিত্র্যের ফলে একদিকে যেমন প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটবে, অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে জাতি হবে সম্পদশালী। এ সুযোগ নিতে বয়স নির্বিশেষে সকলেরই থাকবে সমান অধিকার। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বয়স্ক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত গ্রথিত থাকবে একটি আধুনিক জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের অসাম্যও হবে অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাধারণ জাতীয় কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। অনগ্রসর গোষ্ঠী, কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে অবশিষ্টাংশের সমপর্যায়ে উন্নীত করা হবে। আঞ্চলিক বা মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু জাতীয় সংহতির স্বার্থে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি ভাষার অনুশীলনও হবে সমগুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মর্যাদা কিংবা আর্থিক সঙ্গতি ভেদে বিভিন্ন মানের বিদ্যালয় পোষণ করা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরায়। সুতরাং সকলের জন্য সমব্যবস্থা অর্থাৎ 'কমন স্কুল' হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। ভারতের ক্ষেত্রে এই কমন স্কুল হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

একটি সার্থক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তত্ত্বগত না হয়ে জাতির বাস্তব কর্মোদ্যম এবং জীবন-সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। সুতরাং তত্ত্বগত শিক্ষার সাথে সমমর্যাদায় স্থান পাবে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনের সহায়ক সব রকম বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষা। তবেই এ শিক্ষা জাতীয় জীবনের সকল তন্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং জাতীয় সংহতিই হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মর্মকথা।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলো জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব

ছাড়া শিক্ষায় সমানাধিকার অসম্ভব। **নাগরিকের শিক্ষার জন্য আর্থিক দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের।** রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে পোষণ করা হলেই মাত্র গণতান্ত্রিক সমানাধিকার সম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই অধিকার প্রয়োগ করবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আলোচিত চরিত্রের নিরিখে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা চলে যে এতদিন পর্যন্ত এই আদর্শে পৌছবার জন্য কিছু খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে মাত্র। চেতনা ও নীতির দিক থেকে আমরা **তত্ত্বগতভাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বাস্তবে আজও আমরা তা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি।** এ সম্বন্ধে একটি বাস্তব রূপরেখা তৈরীর দায়িত্বই দেওয়া হলো কোঠারি কমিশনকে।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ

"Education and National Development" শিরোনামায় কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হলো ১৯৬৬ সনে জুন মাসের শেষে। বিশালায়তন এই রিপোর্টে একদিকে যেমন তথ্য রয়েছে প্রচুর, তেমনি নূতন অভিমত এবং প্রস্তাবনাও রয়েছে অনেক।

কমিশন বলেছেন যে বর্তমান ভারতের **সর্বাপেক্ষা গভীর সমস্যা হলো খাদ্য-সমস্যা। দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো বেকারসমস্যা।** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার এবং ক্রমবৃদ্ধি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই। **তৃতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সমস্যা।** আজও অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি প্রতিক্ষণেই বিচ্ছিন্নতার আশংকা সৃষ্টি করছে। **চতুর্থ বৃহত্তম সমস্যা হলো বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যায় ভারতের অনগ্রসরতা।** পারমাণবিক যুগে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার এত দ্রুত উন্নতি ও পবিবর্তন ঘটছে যাকে বলা চলে এক দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লব। এর সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে ভারতের পশ্চাৎপদতা কখনই ঘুচবে না। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলো **আত্মিক মূল্যবোধের সমস্যা।** সমস্যার চাপে কিংবা যন্ত্রশিল্পের পেষণে যদি আধ্যাত্মিক মূল্যচেতনা নষ্ট হয়, তবে তাও অপমৃত্যুরই নামান্তর। বস্তুতঃ বর্তমান ভারতে চলছে এক **মূল্যবোধের সংকট।** এই সর্বাত্মক সমস্যা ও সংকট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে জাতির সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বাত্মক শিক্ষা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার চরিত্রের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আজও হয়নি, সেই ব্যবস্থা বৈপ্লবিক আদর্শ রূপায়ণের অনুপযুক্ত। **শিক্ষাই হবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের বাহন।** বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাই আনবে জনগণের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং নিশ্চিন্ততা। সুতরাং আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য **প্রয়োজন এক শিক্ষাবিপ্লব।**

কিন্তু কিভাবে শিক্ষার সঙ্গে মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সংযোগ সাধন সম্ভব? মানুষের **কর্মপ্রবাহের সাথে সংযোগের পথেই জীবনপ্রবাহের সাথে শিক্ষার সংযোগ সম্ভব।** সুতরাং শিক্ষাকে লাগাতে হবে কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পে উৎপাদনের স্বার্থে। শিক্ষাই সামাজিক ও জাতীয় সমতা এবং সংহতি আনবে। সৃজনশীল শিক্ষাই সৃষ্টি করবে আত্মিক মূল্যবোধসম্পন্ন সচ্চরিত্র নাগরিক; জাতিকে উত্তীর্ণ করবে পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিকতায়। এই অর্থে কমিশন রিপোর্টের "Education and National Development" শিরোনামটি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের তৎকালীন জনসংখ্যা ৫৫ কোটি। এর অর্ধেকই হলো ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক, অর্থাৎ স্কুলে পড়বার মত বয়সের। আগামী বিশ বছরে সংখ্যাটি হয়তো আরও ২৫ কোটি বাড়বে। এখন সর্বস্তরের বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ, শিক্ষক ২৮ লক্ষাধিক এবং ছাত্রসংখ্যা ৭ কোটি (১৯৮৫ সনে এই সংখ্যাটি হয়তো হবে ১৭ কোটি)। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এই **বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তির সদ্ব্যবহারই জাতীয় অগ্রগতির একমাত্র গ্যারান্টি।** শিক্ষাক্ষেত্রে যুগপৎ পরিমাণগত প্রসার এবং গুণগত উন্নতির মাধ্যমেই এই কাজ সম্ভব।

যে কোন ভাল শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি উপাদান একান্তই আবশ্যিক। প্রথম উপাদানই হলো সাক্ষরতা। এইখানেই রয়েছে ভাষা, মানবিকবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব। **দ্বিতীয় উপাদান গাণিতিক দক্ষতা।** এইখানেই গণিত এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব। **তৃতীয় উপাদান উৎপাদনী কর্মদক্ষতা।** এই সূত্রেই বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং উৎপাদনী কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের গুরুত্ব। **চতুর্থ উপাদান সামাজিক দক্ষতা।** এর জন্য প্রয়োজন ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিকতার চেতনা। এই সূত্রেই শিক্ষার অঙ্গরূপে সমাজসেবার গুরুত্ব। সর্বশেষে **উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে,**

দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার **সমসুযোগ,** সকলের জন্য **সাধারণ স্কুল** (কমন স্কুল), বিদ্যালয়ের মধ্যে **সামাজিক জীবন, জাতি ও সমাজসেবা,** উপযুক্ত ভাষা-প্রকল্পের সাহায্যে **ভাবগত সংহতি** প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মাধ্যমে **সামাজিক ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি** এবং সর্বোপরি সমগ্র ভারতের জন্য একটি **সুসংহত জাতীয় শিক্ষাকাঠামো প্রণয়ন।**

প্রস্তাবিত শিক্ষাকাঠামো ঃ নূতন শিক্ষাকাঠামো হিসাবে কমিশন প্রস্তাব করেছেন—

—এক থেকে তিন বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হবে।

—প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য একটি শিশুশ্রেণীর ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এই বছরটিতেই স্কুলে "পড়াশুনার" প্রস্তুতি চলবে।

—পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে একটানা ৭ কিংবা ৮ বছরের। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণপদ্ধতিভেদে এই সম্পূর্ণ স্তরটিকে সুবিধার জন্য ২ ভাগে ভাগ করা চলবে। নিম্নপ্রাথমিক স্তর হবে ৪ কিংবা ৫ বছরের এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তর হবে তিন কিংবা দুই বছরের। নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাকে অনতিবিলম্বে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তরটিকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন করা হলে সংবিধানের নির্দেশ পালিত হবে।

—প্রাথমিকোত্তর স্তরে থাকবে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা কিংবা ২ অথবা ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরেব বিশ শতাংশ শিশুকে বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরেব শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। দশ বছরব্যাপী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, **কোন বিশেষীকরণ থাকবে না।**

—বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে থাকবে ২ বছরের সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক, কিংবা ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা। শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রকেই বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বর্তমানের মত বিশেষীকরণের ভিত্তিতে ছাত্রবিভাগ (প্রবাহ) থাকবে না। (অর্থাৎ ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন বিশেষীকরণই থাকবে না। শেষ দুই বছরে বিশেষ পাঠের সূচনা হলেও চরম বিশেষীকরণ হবে না।) প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে কমিশনের প্রস্তাবে রয়েছে **দুই রকমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কল্পনা—দশ শ্রেণীর এবং দ্বাদশ শ্রেণীর।**

—মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে থাকবে তিন বা ততোধিক বছরের প্রথম ডিগ্রী স্তর এবং তদূর্ধ্বে ২ বছরের দ্বিতীয় ডিগ্রী কিংবা গবেষণার স্তর। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের স্নাতকোত্তর পাঠের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতে পারে। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও থাকবে নানা ধরনের পূর্ণ সময় কিম্বা আংশিক সময়ের শিক্ষা। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে সমচেতনা এবং সমধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের নামকরণ সমগ্র ভারতে একই রকমের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি হবে সাধারণভাবে নিম্নরূপ ঃ

(২২৯ পৃষ্ঠায় ডায়গ্রামটি দ্রষ্টব্য)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা.......... ....

৫-৬ বছর বয়স	এক বছরের প্রস্তুতি-পর্ব
৬-১১ বছর বয়স—ক্লাশ I—IV/V নিম্নপ্রাথমিক ১১-১৪ ,, ,, ,, V/VI—VII/VIII উচ্চপ্রাথমিক	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।
১৪-১৬ ,, ,, ,, VIII/IX/X নিম্নমাধ্যমিক (বিশ শতাংশের জন্য ১-৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা)।	এই স্তরের শেষ অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সে দশ বছরের সাধারণ শিক্ষার সমাপ্তি এবং প্রথম সাধারণ পরীক্ষা।
১৬-১৮ বছর বয়স, ক্লাশ XI—XII—উচ্চমাধ্যমিক (৫০ শতাংশের জন্য ১-৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা)।	এই স্তরের শেষে আবার পরীক্ষা এবং স্কুলশিক্ষার শেষ।

১৮-২১ বছর বয়স—তিন বছরের স্নাতক স্তব কিংবা কারিগরি অথবা বৃত্তিশিক্ষা।
২১-২৩ ,, ,, —দুই বছরের স্নাতকোত্তর স্তর কিংবা উচ্চতর কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা।

(প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে সুপারিশগুলি আগেকার অধ্যায়গুলিতে আলাদা করে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে; তাই আর এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ঃ—১৯৬৪-৬৬ সনের শিক্ষাকমিশন রিপোর্টের মধ্যে **নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।**

(১) দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত **৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা।** নিম্নপ্রাথমিক স্তরে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীকে এক একটি চক্র (Cycle) হিসেবে

দেখবার সুপারিশও ইতিবাচক। প্রাথমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষা বাতিল করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে মত-বৈষম্য দূর করার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন যে কর্মকেন্দ্রিকতা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই পরিব্যাপ্ত হলে কোন একটি বিশেষ ধরনের স্কুল কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিকে 'বুনিয়াদি' রূপে আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বস্তুত, এই সুপারিশ কার্যকরী হলে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে।

(২) **মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পাঠ্যক্রম** এবং কেবল একাদশ বর্ষে বিশেষীকরণের সূচনার কথাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে 'প্রবাহ' ব্যবস্থার অবসান এবং ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের জন্য সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যেই বিশেষ উপযোগী ঐচ্ছিক বিষয় রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। দশম শ্রেণীর পরে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। পরীক্ষাব সংস্কার এবং অভিজ্ঞান পত্রের নূতনত্ব সম্পর্কে সুপারিশগুলিও উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি অষ্টম শ্রেণী থেকেই সাধারণ ও অগ্রবর্তী মানে (Ordinary and Advanced levels) শিক্ষাদানের প্রস্তাবনা আমাদের দেশে এই প্রথম।

(৩) উচ্চশিক্ষার স্তরে সুপারিশের মূল কথা মানোন্নয়ন। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বদলে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাকে ইউ. জি. সি-র অনুমোদন-সাপেক্ষ করা হয়েছে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামানের উন্নতি, প্রশাসন-সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিঃয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধেও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। **অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হলো** ***University Centre, Advanced Centre* এবং *Major University*** সম্পর্কীয় সুপারিশ।

(৪) কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব, এবং কৃষি-শিক্ষায় *Extension* ব্যবস্থার অগ্রাধিকার সম্পর্কীয় বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। (৫) শিক্ষকদের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই ধরনের চাকুরিবিধি, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং বেতনক্রমের সুপারিশও উল্লেখনীয়। (৬) তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় পরিমাণগত অসাম্য দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (৭) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীন সাক্ষরতায় পৌছবার জন্য কমিশন সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (৮) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কমিশন পুনর্বার ঘোষণা করেছেন। (৯) পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশেও অভিনবত্ব আছে। (১০) মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য উল্লেখের দাবি

রাখে। কমিশন দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে বলেই অদূর ভবিষ্যতে এই সব ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান সম্ভব হবে না। এই দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এইসব ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারত মৌলিক অবদান রাখতে পারে। **সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যার তাগিদে যেন মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অবহেলিত না হয়।** (১১) ভাষাসমস্যা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশও আগেকার সুপারিশগুলি থেকে একটু পৃথক এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত। মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি **নতুন ত্রি-ভাষা ফর্মুলা উপস্থিত করেছেন।** এই ফর্মুলাটি নিম্নানুরূপভাবে উপস্থিত করা যায়—

নিম্নপ্রাথমিক	মাতৃ/অঞ্চলিক ভাষা	×	×
উচ্চপ্রাথমিক	„	রাষ্ট্রীয় কিম্বা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা	×
নিম্নমাধ্যমিক	„	„	একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা
উচ্চমাধ্যমিক	„	এবং উপরিলিখিতগুলির মধ্যে একটি।	
বিশ্ববিদ্যালয় স্তর	„	কোন ভাষাশিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে না।	

স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পড়ার কথা বলেছেন। দশ বৎসর সময়সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার সুপারিশ করেছেন। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকেই যোগসূত্র হিসাবে কমিশন স্বীকার করেছেন। তাই স্কুলের স্তর থেকেই ইংরেজীর মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপাতত সর্বভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীই থাকবে ভাষামাধ্যম। তবে পরিণামে এই স্থান গ্রহণ করবে হিন্দী। কেবলমাত্র ইংরেজী অথবা হিন্দীকেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগসূত্র না রেখে কমিশন বহুমুখী যোগসূত্রের কথা বলেছেন। সর্বোপরি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুপারিশও করা হয়েছে।

কয়েকটি মৌলিক নীতি: **কোঠারি কমিশন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি মৌল নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।** এর মধ্যে কয়েকটি সুপারিশ পুরানো বক্তব্যের পুনরুক্তি এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য। সুতরাং এই সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া আমাদের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

(১) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষার **সকল স্তরে কর্মপরিচিতির কথা** (work experience)। সমাজজীবনে বাস্তব কর্মস্রোতের সাথে সম্পর্কহীন তাত্ত্বিক শিক্ষা আদৌ ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মনের সমন্বয় চাই, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার সমন্বয় চাই। তাই **উৎপাদনী শ্রমের সাথে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সংযোগের সুপারিশ করা হয়েছে**। উপযুক্ত বয়সে কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে কলকারখানায় এবং মাঠে। তখনই হবে প্রকৃত উৎপাদনী শিক্ষা।

(২) **দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো সমাজসেবা প্রকল্প** (Social Service)। সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমাজের উন্নতিই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগানো দরকার। সমাজের বাস্তব জীবন এবং সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছাড়া এই চেতনা আসে না। **এই অর্থে শিক্ষা সমাজসেবার নামান্তর মাত্র**। কমিশন তাই বয়স ও শিক্ষার স্তরভেদে বাধ্যতামূলক সমাজসেবার কথা বলেছেন এবং নানা ধরনের সেবামূলক কর্মসূচীও সুপারিশ করেছেন।

(৩) **তৃতীয়ত কমিশন অধ্যাত্ম ও নৈতিক শিক্ষার সুপারিশ করেছেন**। মানবধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মমতের সার সংকলন এবং নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পাঠকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষভাবে লেখা বইয়ের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ শ্রেণীপাঠ-পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষকরাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা দেবেন।

(৪) চতুর্থত, কমিশন সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সংগতির ভিত্তিতে পৃথক স্কুলব্যবস্থার নিন্দা করে **শিক্ষার সমসুযোগ এবং Common School প্রস্তাব** করেছেন এবং এই সম্পর্কে কার্যক্রম নির্দেশ করেছেন।

(৫) **পঞ্চমত, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করণের কথাও গুরুত্বপূর্ণ**। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ভাবমানসে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল তত্ত্বমূলক এবং মূলত উচ্চশিক্ষার সোপান। সাম্প্রতিক কালে সারা বিশ্বে প্রাথমিক স্তরের পরে এবং উচ্চ শিক্ষার নীচে সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে মনে করা হয়। কোঠারি কমিশনও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বৃত্তি শিক্ষার জন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। তাই সপ্তম শ্রেণীর শেষে বৃত্তিবিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট হারে ছাত্রভর্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বৃত্তিশিক্ষালয়ে পুরো শিক্ষার শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে।

(৬) তদুপরি কমিশন **শিক্ষার সকল স্তরে "বাছাই নীতির"** (Selective Approach) **কথা বলেছেন।** কমিশনের মতে তাত্ত্বিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা যেমন সকলের নেই, তেমনি একমুখী শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনও নেই। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাই সমাজের প্রয়োজন। তাই সমাজের প্রয়োজন, রাষ্ট্রের সংগতি এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতি স্তরে ছাত্র বাছাই করে বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে যথাযোগ্য শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর যেমন উন্নতি হবে, তেমনি সমাজের নানাবিধ চাহিদা পূর্ণ হবে।

(৭) **কমিশন বলেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কথা** (Education for Economic Growth)। যে শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করে না, সে শিক্ষা বাস্তবে নিষ্ফল। জাতীয় আয়বৃদ্ধির পথেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব। **সুতরাং যে শিক্ষা বাস্তব উৎপাদন দক্ষতায় কার্যকরী হবে, তাই প্রকৃত শিক্ষা।** বহুমুখী উৎপাদনী ক্ষেত্রে শিক্ষা যদি কাযকর হয়ে ওঠে, তবেই বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব। সুতরাং শিক্ষার সমাপ্তি এবং জীবিকার সুযোগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের সুপারিশই কমিশন করেছেন। তেমনটিই আদর্শ অবস্থা যখন প্রত্যেক অভিজ্ঞানপত্রের সঙ্গে একখানা নিয়োগপত্র দেওয়া যাবে।

(৮) এই সূত্রেই কমিশন মন্তব্য করেছেন যে **অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জনশক্তি পরিকল্পনা** করাই শিক্ষাব্যবস্থাপনা তথা শিক্ষাপরিকল্পনার মূল কথা। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন কর্মধারার ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের দক্ষতা-সম্পন্ন কত জনশক্তি প্রয়োজন, তা আগে স্থির করে সেই অনুসারে জনশক্তি বণ্টন এবং শিক্ষা ও শিক্ষণই জাতীয় উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি। "জনশক্তি পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা (Education for man power planning)" নীতিকেই কমিশন উঁচুতে তুলে ধরেছেন। অবশ্য আমরা আরও পরিষ্কার বলতে পারি "Education is man power planning."

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে দ্ব্যর্থহীনভাবে কমিশন ঘোষণা করেছেন যে **বিজ্ঞান ও কারিগরির যুগ মানব সমাজের কাছে এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে।** যে জাতি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না, তার অস্তিত্বের অধিকার থাকবে না। ভারতবর্ষকেও হতে হবে যুগের সমকক্ষ।

শিক্ষা প্রশাসন : শিক্ষার নূতন কাঠামো কিংবা নূতন নীতিই যথেষ্ট নয়। ঐ নীতি কাজে প্রয়োগ করার উপরই নির্ভর করবে ফলশ্রুতি। আর কাজে প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা। কমিশনের মতে শিক্ষা-প্রশাসন

সংগঠিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার এবং রাজ্যসরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের অংশীদারী ব্যবস্থায়। শিক্ষা পরিকল্পনায় তাই জাতীয় অগ্রাধিকার এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার (Priority) স্থির করে নিতে হবে। রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের পরিমাণ স্থির করা হবে শিক্ষার স্বার্থে। তবে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েৎ এবং মিউনিসিপ্যালিটির উপর। সরকার এদেরকে আর্থিক সাহায্য দেবেন। সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে শিক্ষক-বেতন প্রভৃতি পৌনঃপুনিক প্রয়োজনে, আর স্থানীয় অর্থ ব্যয় করা হবে উন্নয়নের প্রয়োজনে।

জিলাভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনের জন্য থাকবে আইনসিদ্ধ জিলা-স্কুলবোর্ড। জিলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং বেসরকারী শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হবে এই বোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সকল স্তরের শিক্ষাই এই বোর্ডের আওতায় আসবে। বোর্ড জিলাভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করবে এবং জিলা পরিষদের বরাদ্দ করা অর্থ বায় করবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য থাকবে স্কুল কমিটি। মূলতঃ বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গ সম্বন্ধেই দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির। **দুই রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।** এক শ্রেণীর পরিদর্শকের কাজ হবে শিক্ষামানের উন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব হবে বিদ্যালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত তদারকি। ব্যাপক শিক্ষা-পরিকল্পনার যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের জিলা প্রশাসন যন্ত্রেরও পুনর্গঠন প্রয়োজন।

রাজ্যস্তরে প্রশাসনের জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, মূল্যায়ন-সংস্থা (Evaluation Organisation), Institute of Education, শিক্ষক শিক্ষণ কাউন্সিল এবং সর্বোপরি রাজ্য শিক্ষা-পরিষদ।

সংবিধান অনুসারে উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা ছাড়া সকল স্তরের শিক্ষার দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। কিন্তু সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা, জনশক্তি পরিকল্পনা, পেশা ও বৃত্তিশিক্ষার সুব্যবস্থা, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, ব্যাপকহারে ছাত্রবৃত্তি, শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা স্থাপন, অনগ্রসর উপজাতি ও গোষ্ঠী অথবা 'বিশেষ শিক্ষা' কিংবা নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্বও কমিশন স্বীকার করেছেন। **তাই জাতীয় স্কুলবোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মডেল আইন তৈরী এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত বিবৃতির সুপারিশ করা হয়েছে। ঐ বিবৃতির ভিত্তিতে রাজ্যসরকারগুলি শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করবেন।**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানা তথা বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এই যুক্তিতে কমিশন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে স্বশাসিত বিদ্যালয় (Independent) এবং অনমুমোদিত বিদ্যালয় থাকবার অধিকার স্বীকার করেছেন। তবে এগুলিকে সরকারী দপ্তরে তালিকাভুক্ত করে নিতে হবে মাত্র। কিন্তু বলা চলে যে এই অধিকারের স্বীকৃতিই Selective Approach, Equality of Opportunity এবং Common School সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির সমাধি রচনা করতে পারে।

কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাপ্রসারের সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সনের মধ্যে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ বৎসরে উন্নীত করা হবে। ১৯৮৫ সনের পরে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায়।

কোন্ সময়ের মধ্যে কোন্ স্তরের শিশুর কত শতাংশকে বিদ্যালয়ে আনবার লক্ষ্য সুপারিশ করা হয়েছে, তা বুঝা যাবে নিম্নোক্ত হিসাব থেকে।

শতাংশের হিসাব

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
নিম্নপ্রাথমিক	৭৬'১	৯২	১০০	×	×
উচ্চপ্রাথমিক	২৯'৮	৫০'৭	৬৯ ২	৮২'৩	৯০'০
নিম্নমাধ্যমিক	১৫'৭	২৩'১	২৯'১	৩৬'০	৪৬ ০
উচ্চমাধ্যমিক	×	৯'২	১১'০	১৪'৮	২০ ৪
বিশ্ববিদ্যালয়	১'৯	২'৪			

কারিগরী ডিগ্রী ১৯১৪০ জন, ৩০০০০ জন

কারিগরি ডিপ্লোমা ৩৭৩৯০ „ ৬৮০০০ „

শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ সম্পর্কেও কমিশন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯৬৫-৬৬ সনে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে জাতীয় আয়ের ২'৯ শতাংশ মাত্র। এই অর্থের মধ্যে আবার প্রাথমিক স্তরের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩২ ৫ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৩৫ ০ এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে ৩২'৫ শতাংশ। ছাত্রপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৫০-৫১ সনে ছিল বার্ষিক ৩৭ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সনে হয়েছে বার্ষিক ৬৪ টাকা মাত্র। লোকসংখ্যা অনুপাতে মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল বার্ষিক ১২ টাকা মাত্র। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে ছাত্রপিছু বার্ষিক গড় ব্যয় ১৯৮৫ সনে

প্রাথমিক স্তরে ১০৩ টাকা থেকে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান স্তরে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত করা দরকার। কমিশনেব মতে শিক্ষার মোট ব্যয় নিম্নানুরূপভাবে বাড়ানো দবকার (কোটি টাকার হিসাবে) :—

	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬
মোট ব্যয়	৬০০ কোটি	৯৬৬'৪	১৫৫৬'২	২৫০৬'২	৪০৩৬'৪
জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে	২'৯	৩'৪	৪'১	৫'০	৬ ০
লোকসংখ্যার মাথাপিছু	১২ ১ টাকা	১৭'৪	২৪'৭	২৬'১	৫৪'০

ব্যয়েব বরাদ্দ করা সোজা, কিন্তু অর্থসংস্থান করা কষ্টকর। অর্থ সঙ্গতির উৎসরূপে কমিশন দেখতে পেয়েছেন—(ক) বিভিন্ন সূত্রে সাহায্য ও দান, (খ) জিলা পরিষদের সেস্ এবং (গ) সবকারী বরাদ্দ। বৎসরে গড়ে শতকরা ১০ ভাগ হারে রাজস্ববরাদ্দ বাড়িয়ে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ হিসাবে কমিশন ১৯৮৫ সনে মোট ৪৯৩৬ কোটি টাকা শিক্ষাব্যয়ের আশা পোষণ করেছেন।

সমালোচনা

১৮৫৪ সনে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোঠারি কমিশন শিক্ষা-ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ষষ্ঠ কমিশন। কিন্তু আগেকার কমিশনগুলিব আলোচনা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ,—অর্থাৎ কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল কেবল মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক সমীক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এইসব কমিশন-কমিটির আংশিক এবং খণ্ডিত সুপারিশের ভিত্তিতে একটি সর্বাঙ্গীণ ছবি ফুটে ওঠেনি। সেদিক থেকে কোঠারি কমিশনের কাজ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই সর্বপ্রথম একটি কমিশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষার সকল দিক সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ অভিমত এবং দীর্ঘমেয়াদী সর্বভারতীয় পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। প্রস্তাবগুলির মধ্যে ত্রুটির দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার প্রস্তাবক হিসাবে কমিশনের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একটি রূপরেখা উপস্থিত হয়েছে মাত্র, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রস্তাবেব অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করে সব রাজ্যের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রস্তাবগুলি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত হবে কিনা, তার উপরই নির্ভর করবে ভারতে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে

কিনা। সুতরাং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য আজও ভবিষ্যতের গর্ভে, বিশেষতঃ যেহেতু কমিশনের সুপারিশগুলি আজও সর্ববাদীসম্মত হয় নি এবং ইতিমধ্যেই বহু মতানৈক্য আত্মপ্রকাশ করেছে। (এই সূত্রে ১০ ক্লাশ বনাম ১২ ক্লাশ দ্বন্দ্ব আমরা পরে আলোচনা করবো।)

রিপোর্টের তত্ত্বগত দিক বহু শিক্ষাবিদের প্রশংসা পেয়েছে, আবার অনেক শিক্ষাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আলোচনা ও বিতর্কও শেষ হয় নি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিস্তার যুগে একটি প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিশনের চিন্তা সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল। জাতীয় জীবনস্রোতের সঙ্গে, জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে, উৎপাদনী কর্মস্রোতের সঙ্গে শিক্ষার একাত্মকরণ সম্পর্কে কমিশনের মৌলিক প্রস্তাবনাও প্রশংসনীয়। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তার দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপরিকল্পনা যে জনশক্তি পরিকল্পনারই নামান্তর এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থান যে পরস্পর যুক্ত একথাও তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোপরি এক 'শিক্ষাবিপ্লবের' ঘোষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (যদিও কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত পরিকল্পনা বিপ্লবাত্মক রূপ গ্রহণ করে নি।)

সর্বোপরি শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের যথোপযুক্ত অংশ ব্যয় করার উপরই সুপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করে। অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দের তুলনায় কমিশনের সুপারিশ মোটেই আকাশচুম্বী নয়। কিন্তু এই সুপারিশের সঙ্গে পরিকল্পনা-কারীদের মতবৈষম্য ইতিমধ্যেই হয়েছে। সুপারিশগুলির ব্যর্থতা চতুর্থ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে উঠেছে।

কোঠারি কমিশন রিপোর্টে ত্রুটির দিক অবশ্যই আছে। ছাত্রভর্তির নীতিটি দীর্ঘসূত্রিতার নামান্তর বলেই মনে হয়। বিশ বৎসর পরেও বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর শতকরা যে সামান্য অংশের জন্য স্কুল-কলেজে জায়গা করার কথা বলা হয়েছে, তা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থবরাদ্দের যে পরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌রা সমালোচনা উপস্থিত করেছেন যে কলেজ স্তরে আর্টস ও কমার্স বিষয়ে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি প্রস্তাবিত ব্যয় ১১ জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য; ঐ স্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরি ছাত্রের ব্যয় ৩৯ জনের প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য, এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় আর্টস ও বিজ্ঞানের প্রতিজনের জন্য যথাক্রমে ৫৮ এবং ৯৬ জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য। সুতরাং মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রসার করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হবে, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ চাহিদা মেটাতে গেলে উচ্চশিক্ষা

সংকুচিত হবে। সুতরাং বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তদুপরি L.S.E.-I.S.I. প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়েও তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করার প্রস্তাবটি খুবই ভাল। নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট হারে ছাত্রসংখ্যাকে বৃত্তিশিক্ষার দিকে নেওয়ার প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এই সূত্রে **ছাত্র বাছাইয়ের কোন্ নীতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে কমিশন পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দেন নি।** যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রবণতা, সম্ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র বাছাই করা হলে ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু তার বদলে সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি এবং অন্যান্য ধরনের কু-প্রভাবের বিষক্রিয়া ঘটলে সমগ্র পরিকল্পনাটি নূতন এক বৈষম্য সৃষ্টি করবে এবং সমাজের এক বৃহৎ অংশের কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবে।

Selective approach **সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।** "যে যেখানে সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং যাকে যেখানে জাতির সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন"—এই মৌলিক অর্থে "সিলেকশন" করা হলে আপত্তির কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ প্রগতিশীল দেশে এই ধরনের 'সিলেকশন' থাকবেই। কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার উপর থেকে চাপ কমাবার দৃষ্টিকোণ থেকে সিলেকশন নীতি প্রয়োগ করা হলে ফলশ্রুতি হবে শিক্ষা-সংকোচন। তদুপরি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা না করে সিলেকশন-পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রশ্নটি গণতন্ত্রবিরোধী।

দশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসবণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো আর্থিক ও অন্যান্য নানা কারণে এই স্তরের উপনে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। সেই ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষা Terminal ধরনেব হবে কিনা, এবং দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশের কতখানি যোগ্যতা অর্জন করবে, সে সম্বন্ধেও রিপোর্টে পরিচ্ছন্ন বক্তব্য নেই।

কোঠারি কমিশন শিক্ষাব প্রতিস্তরে কর্মপরিচিতির বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন। কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় সাধারণ পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পর্ক-হীনভাবে সপ্তাহে একটি ঘণ্টার হাতের কাজ কখনোই প্রকৃত উৎপাদনমুখী শিক্ষার উপযোগী কর্মপরিচিতি নয়। **উৎপাদনমুখী শিক্ষার চেতনা প্রকৃতই প্রগতি-মূলক ও বৈপ্লবিক চেতনা।** কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সমগ্র পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজানো, পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব কর্মপরিচিতির সম্পূর্ণ সম্পৃক্তকরণ এবং বৃহত্তর সমাজে উৎপাদনী কর্মধারার সাথে শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ সাঙ্গীকরণ। কিন্তু

ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সে ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির সঙ্গে একটি হাতের কাজ যোগ করে দায়সারা রকমের নামমাত্র কর্মপরিচিতির ব্যবস্থা হলে সমগ্র উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই কথা সমাজসেবার ক্ষেত্রেও খাটে। শিক্ষার সঙ্গে সমাজজীবনের নিশ্ছিদ্র সাঙ্গীকরণ না হলে এবং শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা না জাগলে সমাজসেবা শুধুমাত্র দরিদ্র, অধমর্ণ ও অক্ষমদের "সেবায়" পর্যবসিত হতে বাধ্য। সামান্যতম দাক্ষিণ্যের সুর থাকলে সমাজসেবার সম্পূর্ণ আদর্শটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কমিশনের আলোচনা ও প্রস্তাবনায় এই দিকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলেই মনে হয়।

সমভাবেই বলা চলে নীতি-শিক্ষার কথা। ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘর্ষের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মশিক্ষার প্রতি ইদানীং জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আছে বলেই "নীতিশিক্ষা" প্রস্তাব করে একটি আপসরফার চেষ্টা হয়েছে। জীবনবোধ থেকেই নীতিবোধের সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর সমাজজীবনে যদি নীতিহীনতার স্রোত বয়ে চলে তবে পুঁথিগত নীতিশিক্ষা নিতান্তই বিদ্রূপের মত। শিক্ষকদের পক্ষেও নীতি শিক্ষা দেওয়ার কাজটি হবে নিতান্তই দায়সারা প্রাণহীন কর্তব্য পালন।

শিক্ষায় সমসুযোগ এবং 'কমন স্কুল' ব্যবস্থার উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রিপোর্টের অন্য অংশে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বেসরকারী উদ্যমের জন্য অবাধ সুযোগ রাখা হয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের ফলশ্রুতিই সমসুযোগ এবং Common School নীতির পরাজয় হবে।

শিক্ষার সমসুযোগ ঃ এযুগে শিক্ষার সম-অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক পদবাচ্য নয়। শিক্ষায় সমসুযোগ মৌলিক নাগরিক অধিকারের অন্যতম বলেই আজ পরিচিত। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ সুযোগ প্রায়শঃই লঙ্ঘিত হয়। শিক্ষায় সমসুযোগের অর্থ সকলের জন্য এক শিক্ষা নয়। এর প্রকৃত অর্থ ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি কিংবা স্ত্রী-পুরুষ অথবা অঞ্চল নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের স্বীয় প্রবণতা ও দক্ষতা অনুসারে আত্মবিকাশের শীর্ষে উন্নীত হওয়ার অধিকার। **রাষ্ট্রের সাধ্যানুযায়ী ব্যয়ে সকলের প্রয়োজন-মত সর্বোত্তম শিক্ষার সুযোগই শিক্ষায় সম-অধিকারের মূলকথা।**

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে শিক্ষায় শ্রেণীবৈষম্যই বরং উৎকট আকারে বাড়ছে। তাই নীতিগতভাবে হলেও এ অধিকারের স্বীকৃতি

নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আর্থিক অসাম্যপূর্ণ সমাজে শিক্ষায় প্রকৃত সমসুযোগ সম্ভব নয়। জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক **রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার সব দায়িত্ব** থাকলেই সমতার আশা করা যায়। তাই কোঠারি কমিশনের সুপারিশও নরমপন্থী। তা ছাড়া বর্তমানে রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতির অভাব আছে বলেই মেধার ভিত্তিতে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ এবং ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে কমিশন 'বৈষম্য হ্রাস করার' সুপারিশ করেছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম** সরবরাহই হবে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। পঞ্চম পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষাকেও অবৈতনিক করার সুপারিশ করা হয়েছে। ১০ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, যথেষ্ট লাইব্রেরী ও বুক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোত্তম দশ শতাংশ ছাত্রকে বই কেনার জন্য সাহায্য দেবার প্রস্তাবও করা হয়েছে। ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে আর্থিক অনটনের জন্য প্রতিভাব অবক্ষয় না হয়, সে জন্য **উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকেই বৃত্তির ব্যবস্থা করা দরকার।** এর সঙ্গে থাকবে ঋণবৃত্তি (Loan Scholarship)। **বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমসুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত কিংবা সন্তোষজনক কিংবা বৈজ্ঞানিক নয়।** ক্রমবর্ধমান অসাম্যের মধ্যে বৃত্তির সামান্য অঙ্কটি হারিয়ে যাবে। তা ছাড়া প্রস্তাবিত Selective approach-টি বিকৃতি রূপ নিয়ে বৃহত্তর অসাম্য সৃষ্টি করতে পারে।

সমসুযোগ নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত রয়েছে Common School **সমস্যা।** বর্তমানে সরকারী ও বহু ধরনের বেসরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও সুযোগ যেমন অসমান, তেমনি শিক্ষকদের বেতন, চাকুরির শর্ত এবং অন্যান্য সুযোগও অসমান। পিতামাতার পকেটের শক্তিতে ভাল শিক্ষা কেনা সম্ভব। উচ্চমূল্যে কিনতে যারা অসমর্থ, তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে নিকৃষ্ট মানের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের শ্রেণীবৈষম্য এবং পিতামাতার শ্রেণীবৈষম্য ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেও শ্রেণীবৈষম্য রচনা করে। সামাজিক ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ও জিনিসটিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তাই "সকলের জন্য এক স্কুল" তথা সর্বসাধারণের স্কুল (Common School) নীতিই আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার সকল দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত না হয় ততদিন প্রকৃত Common Schoo'-ও সম্ভব নয়। তবুও কোঠারি কমিশন একে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষায় শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা করেছেন।

Common School-এর দিকে প্রথম পদক্ষেপ রূপে কমিশন প্রস্তাব করেছেন—

(ক) বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, (খ) অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, (গ) বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি এবং (ঘ) ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে Neighbourhood School নীতি কার্যকর করা। এই নীতির মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট স্কুলের চারপাশের সব শিশুই সেই স্কুলে পড়বে, অঞ্চল ছাপিয়ে অন্য কোন স্কুলে যাবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে সব স্কুলকেই সমস্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন। কমিশন তাই প্রথমে নিম্নপ্রাথমিক এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চপ্রাথমিক স্তরে এই নীতি প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন।

Common School **সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ যত দুর্বলই হোক, এই সম্পর্কে নীতিগত স্বীকৃতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে।**

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে কমিশন-প্রস্তাবিত বিশ বৎসরব্যাপী পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে অনেকগুলি "যদি"র উপর। যদি আমাদের জাতীয় আয় একটা নির্দিষ্ট হারে বাড়ে, যদি শিল্প ও কৃষির ভিত্তি আকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রসারিত হয়, যদি পেশা ও বৃত্তিমূলক কাজের যথোচিত প্রসার ঘটে, যদি সেই অনুযায়ী জনশক্তি পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা-পরিকল্পনা সাঙ্গীকৃত হয়, যদি ব্যয় সংকোচের প্রয়োজনে শিক্ষার উপরই প্রথম খড়্গের আঘাত না পড়ে, যদি মূল্যমান স্থির থাকে· এই রকম আরও অনেক 'যদি'র উপর সুপারিশগুলির কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

দুঃখের বিষয় বিগত দিনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য আশার বাস্তব ভিত্তি রচনা করে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে ভাবে ক্রমাগত টালমাটাল হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতি যে ভাবে ক্রমাগত "প্রাইভেট সেক্টর" এবং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়েছে, মূল্যমানের চক্র ক্রমাগত যে ভাবে ঘুরছে, জীবনযাত্রার মান যে ভাবে নামছে, এমন কি শিল্পজগতে পর্যন্ত বেকারীর কালোছায়া পড়েছে, সেক্ষেত্রে **'প্রাইভেট সেকটরের' মর্জির উপরই শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য নির্ভর করার সম্ভাবনা বেশী।** তাই শিক্ষাপরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার দিকে সচেতন এবং বদ্ধপরিকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টটি বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে। পার্লামেন্টের শিক্ষা কমিটিতে রিপোর্ট আলোচিত হয়। সংস্কার, মানোন্নয়ন, প্রসার—এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকেই রিপোর্টের বিচার করা হয়। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ৩ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা—অর্থাৎ মোট ১০ বছরের সাধারণ স্কুলশিক্ষা, অতিরিক্ত ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয়ে "সুসংহত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার" সুপারিশ

গ্রহণ করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে ২ বছরের পাস কোর্স এবং ৩ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা কিংবা ৩ বছরের অনার্স কোর্স এবং ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কমিশন যেক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নয়নের কথা বলেছিলেন, মন্ত্রী সম্মেলন সেখানে ১১-১২ ক্লাশ দুটিকে কলেজিয়েট স্কুল করা কিম্বা কলেজের সঙ্গে যুক্ত করবার কথা বলেন।)

মন্ত্রী সম্মেলন "neighbourhood school" নীতি প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যদিও বাস্তবে কিছুই হয় নি। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ও উচ্চশিক্ষার স্তরে পাঠ্যপুস্তক-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষা-প্রসারকে অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে যত সত্বর সম্ভব অবৈতনিক করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্তরূপে বিজ্ঞানশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিগতকরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে যুবকল্যাণ-কেন্দ্র, বাধ্যতামূলক এন. সি. সি. অথবা জাতীয় সেবা এবং সাফল্য অসাফল্যের মন্তব্যহীন অভিজ্ঞান-পত্রের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কিম্বা কলেজীয় শিক্ষা সীমায়িত করা এবং যত্রতত্র স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার প্রস্তাবটিকেও সম্মেলন সমর্থন করে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'advanced centre' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মপরিচিতি, জাতীয় সেবা, কমন স্কুল এবং উৎপাদনী-শিক্ষা নীতিকেও সম্মেলন অগ্রাধিকার দেয়।

শিক্ষক সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা এবং উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনকেও সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষণ কলেজগুলির উন্নতি, রাজ্য প্রশিক্ষণ-বোর্ড এবং "যুক্ত শিক্ষক উপদেষ্টা পরিষদ" গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক তেমনি ছাত্রমহলে আস্থা পুনস্থাপনের উদ্দেশ্যে "যুক্ত ছাত্র-শিক্ষক পরিষদ" গঠনের কথাও বলা হয়। বেতনক্রম সংশোধনের জন্য সম্মেলন থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবি করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের বর্ধিত বেতনের জন্য ব্যয়বৃদ্ধির ৮০ ভাগ বহন করতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হয়েছেন।

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে মন্ত্রী-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। উচ্চ-শিক্ষাস্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রচলনের জন্য পাঁচ বছরের সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় ভাষা সম্বন্ধে **ত্রিভাষাসূত্রই গৃহীত হয়েছে।**

জাতীয় শিক্ষা নীতি

বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে ১৯৬৮ সনের ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিক্ষানীতি আলোচিত হয় এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। ১৭টি দফার এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে যে—(১) সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি কাযকর করা হবে। (২) শিক্ষায় সমসুযোগ প্রবর্তন করা হবে। এজন্য (ক) আঞ্চলিক অসাম্য দূর করা হবে, (খ) গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে, (গ) সংখ্যালঘু, উপজাতি, বিকলাঙ্গের শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে, (ঘ) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হবে। (৩) ৭ বছরের প্রাথমিক, ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এই দুই বছর সুবিধামত কলেজ কিংবা স্কুলে যোগ করা চলবে), এবং ৩ বছরের কলেজীয় শিক্ষার ভিত্তিতে একটি সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়া হবে। ভারতের সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থাটি সাধারণ বিচারে এক রকমেরই হবে। (৪) ক্রমিক পর্যায়ে 'কমন স্কুল' প্রথা প্রবর্তন করা হবে। (৫) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course প্রচলন করা হবে। (বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য)। (৬) সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে। (৭) শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে এবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে। (৮) মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার করা হবে। কৃষি, টেকনিক্যাল এবং শিল্পশিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। (৯) গণিতের শিক্ষা হবে আবশ্যিক, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষা ও গবেষণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। (১০) মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে। (১১) কর্মপরিচিতি, জাতীয় সমাজ সেবা এবং চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। (১২) উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা এবং অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করা হবে। (১৩) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। (১৪) শারীর শিক্ষা, খেলাধুলা এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার এবং উন্নতি করা হবে। (১৫) সর্বস্তরে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ, উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ, উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক সম্মানের ব্যবস্থা করা হবে, বিজ্ঞান শিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষকদের পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে। (১৬) ত্রিভাষা সূত্র প্রয়োগ করা হবে। স্কুল স্তরের শিক্ষায় অহিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে—মাতৃভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী; এবং

হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে—হিন্দী, ইংরেজী এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা)। (স্কুলের কোন্ স্তরে কোন্ ভাষার সূচনা করা হবে এ সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি । তাছাড়া সংস্কৃতকে সম্মানজনক স্থান দিয়ে ঐচ্ছিকভাবে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেও উৎসাহ দেওয়া হবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি করা হবে। আঞ্চলিক ভাষাকেই করা হবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, অবশ্য এজন্য কোন সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ৫ বছরের সময়-সীমার প্রস্তাব করা হয়েছিল।) (১৭) শিক্ষার জন্য ক্রমিক পর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। (এজন্যও সময়-সীমা বাঁধা হয়নি।)

কোঠারি রিপোর্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা যা বলেছি, তা এই শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার অন্ত নেই, এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। তবুও ইতিহাসের বিচারে এই দলিলের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর আগে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী নীতির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বশেষ ১৯১৩ সনে। অর্ধশতাব্দী পরে এলো এই নূতন প্রস্তাব। ইতিমধ্যে অনেক কমিশন কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ বেরিয়েছে। কোন কোন সুপারিশ হয়তো পুরোপুরি কিম্বা আংশিকভাবে প্রয়োগও করা হয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সুপারিশগুলি সরাসরি গ্রহণ করে কার্যকর করবার অঙ্গীকার দেওয়া হয়নি।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন একটি সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি এবং কার্যক্রম। আলোচিত প্রস্তাবে ঐ নীতিকে কার্যকর করবার অঙ্গীকার রয়েছে। তাই ভবিষ্যতের আশা নিরাশা সত্ত্বেও দলিলখানির তাৎপর্য রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কাজ কিভাবে এগোবে, শিক্ষা পরিকল্পনা কি ভাবে করা হবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কিনা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতটা থাকবে—তার উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ। সুতরাং রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং শিক্ষা পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আমাদের করা দরকার।

প্রশ্নাবলী

1. What had been the admitted defects of the system of education in India prior to the introduction of the Kothari Reforms? Why was the Kothari Commission set up?

2. Discuss the basic features of a National System of Education. How far have we been able to achieve a national system in our country ?

3. What are the major problems of India as enunciated by the Kothari Commission ? How may education solve those problems ?

4. Discuss, after the Kothari Commission, the essential elements of a good system of education.

5. Give an account of the school system proposed by Kothari Commission with special reference to the nature of primary and secondary education.

6. Critically discuss the 3 language formula proposed by Kothari Commission.

7. What is equality of educational opportunity ? How can it be achieved ? How far may the suggestions of Kothari Commission fulfil the objectives ?

8. Write an essay on National Education Policy adopted bv India.

9. Write a critique on the recommendations of Kothari Commission.

10. Write notes on (i) Work Experience, (ii) Social service, (iii) Vocationalisation of secondary education, (iv) Education for economic growth, education for man-power planning (as enunciated by Kothari Commission).

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা

স্বাধীনতার যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বেড়েছে সন্দেহ নেই। হস্তশিল্প শিক্ষা, সমাজকর্মী শিক্ষা, সংগীত-নৃত্য শিক্ষা, বিকলাঙ্গের শিক্ষা প্রভৃতি "বিশেষ শিক্ষার" ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু অন্ধ, মূকবধির, বিকলাঙ্গ কিম্বা মানসিক ব্যাহতদের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য মোটেই সন্তোষজনক নয়।

শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। যুব-কল্যাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় উৎসব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যুব-কল্যাণ বোর্ড প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা চলে। **স্বাধীনতার পরে সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যমকে** উৎসাহ দেওযাব জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ললিতকলা এ্যাকাডেমি, সঙ্গীত-নাটক এ্যাকাডেমি এবং সাহিত্য এ্যাকাডেমি। **বৈজ্ঞানিক গবেষণার** জন্য সৃষ্টি হয়েছে Council of Scientific and Industrial Research (C.S.I.R)। এর দায়িত্ব হলো গবেষণায় উদ্যোগ নেওয়া ও সাহায্য দেওয়া, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গবেষণার সমন্বয় সাধন, এবং **'জাতীয় বৈজ্ঞানিক রেজিস্টার' তৈরী করা**, Brain-drain বন্ধ করা। **শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার** জন্য ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত National Council of Educational Research and Training (N.C.E.R.T.) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর দায়িত্ব হলো শিক্ষাগবেষণায় উৎসাহ দেওয়া, উচ্চস্তরের ট্রেনিং ব্যবস্থা সংগঠন, ট্রেনিং কলেজ এবং গবেষণা-কেন্দ্রের জন্য 'Extension Service'-এর ব্যবস্থা, পাঠ্য-পুস্তক এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে National Institute of Education এবং তার নানা ধরনের অঙ্গসংগঠন।

রাষ্ট্রের ভূমিকা :—পরিকল্পিত শিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সংযোগ অতি নিবিড়। এই প্রসঙ্গে **সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো জনসাধারণের শিক্ষা-লাভের অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের স্বীকৃতি**। সংবিধানের মৌল নীতি এবং বিশেষতঃ মৌলিক অধিকার পর্যায়ে ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর সূত্রে একথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এবং এই ত্রিশক্তির অংশীদারত্বে।

১৯৪৭ সনেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের দায়িত্ব হলো—(ক) আলীগড়, বেনারস, দিল্লী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, (খ) সর্বপ্রকার গবেষণার উৎসাহ ও সম্প্রসারণ, (গ) উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, (ঘ) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি, (ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়, (চ) সর্বভারতীয় পরিষদের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যগুলির প্রচেষ্টার সমন্বয় ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তর ছাড়াও সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলন, উপাচার্য সম্মেলন, আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড প্রভৃতি। **নীতিগতভাবে আমলা ও শিক্ষাবিদগণের যৌথপ্রয়াসের কথাই বলা হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য প্রায়শঃ আমলাদের প্রাধান্যই দেখা যায়।** শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও স্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের উপদেষ্টা হিসাবে সাহায্যকারী রয়েছে All India Council of Elementary Education, National Institute of Basic Education, All India Council of Secondary Education, University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council for Women's Education, Centre of National Fundamental Education, National Advisory Board for Physical Education এবং N C E R.T প্রভৃতি সংগঠন।

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রতি রাজ্যে রয়েছে শিক্ষামন্ত্রিদপ্তর, শিক্ষা-অধিকর্তা এবং পরিদর্শন-বিভাগ। **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের।** এ ছাড়া নারীশিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, রাজ্যভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধেও দপ্তরের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে। **মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আধা-সরকারী শিক্ষা বোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এগুলি সম্পর্কে আইন পাস করেন রাজ্যের আইনসভা।** বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী অর্থ সাহায্য পায় এবং এর পরিচালক-সভার মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি থাকেন।

স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে রয়েছে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা, তহশীল ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সংগঠন, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে গঠিত জিলা শিক্ষাবোর্ড এবং সাম্প্রতিক কালে পঞ্চায়েৎ সংগঠন। শিক্ষা-প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে

কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটি।

শিক্ষা-প্রশাসন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে হলেও সর্বভারতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে বৃত্তি ব্যবস্থা, U. G. C. এবং বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরিষদের মধ্য দিয়ে এবং সর্বোপরি আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে **প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর হস্তক্ষেপ করেন।**

শিক্ষায় অর্থসংস্থান : শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান করা হয় **মূলত: পাঁচটি উৎস থেকে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সরকারী অর্থভাণ্ডার।** কিন্তু সরকারী রাজস্ব থেকে অর্থবরাদ্দ আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়লেও **এখন পর্যন্ত অত্যন্ত অল্প।** রাজস্বভাণ্ডার ছাড়া অন্যান্য উৎস হলো **গ্রামাঞ্চলের জন্য স্থানীয় ভাণ্ডার এবং শহরাঞ্চলের জন্য মিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার, জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের দান, ছাত্রবেতন এবং সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক সাহায্য।** বিদেশে পড়াশুনার জন্য বৃত্তি, উন্নয়ন সাহায্য, সরঞ্জাম সাহায্য এবং শিক্ষক আমদানী ইত্যাদি বাবদ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় যে কত কম তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে প্রথম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪৪ কোটি টাকা, এবং রাজ্যগুলির মোট বরাদ্দ ছিল ১২৫ কোটি টাকা। এই সম্পূর্ণ অঙ্কটি তদানীন্তন জাতীয় আয়ের ১.২ শতাংশ মাত্র। ১৯৬৫-৬৬ সনেও শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল জাতীয় আয়ের ২.৯ শতাংশ। মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৯৫০-৫১ সনে ৩.২ টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সনে ১২ টাকা মাত্র। অন্য যে কোন প্রগতিশীল দেশের তুলনায় এ অবস্থাটি হাস্যকর।

এই বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথোচিত ভারসাম্য থাকেনি। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দের হিসাব থেকেই তা পরিষ্কার হবে।

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	১ম পরিকল্পনা	২য় পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনা
প্রাথমিক স্তর—	৮৫ কোটি টাকা	৯৫ কোটি টাকা	২০৯ কোটি টাকা
মাধ্যমিক স্তর—	২০ কোটি টাকা	৫১ কোটি টাকা	৮৮ কোটি টাকা
উচ্চ শিক্ষা—	১৪ কোটি টাকা	৪৮ কোটি টাকা	৮২ কোটি টাকা

তথ্য-তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে **প্রথম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব** দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই গুরুত্ব কমে যায়। অন্যদিকে **মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।** কিন্তু এক্ষেত্রেও বাড়তি বরাদ্দ খরচ হয় স্কুলগুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নয়ন,

এবং বহুমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। এই পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার জন্যও বেশী বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বাড়তি ব্যয় অধিকাংশই যায় কারিগরি শিক্ষায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যে ৬-১১ বছরের শতকরা ১০০ জন ছেলেকে এবং ৬০ শতাংশ মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা হবে। ১১-১৪ বছরের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে। অর্থাৎ এই বয়সের ৩০ শতাংশকে স্কুলে আনা হবে। (একটি লক্ষ্যও পূরণ হয় নি)। মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখিনতার পূর্ণ রূপায়ণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, হোস্টেল, ছাত্রবৃত্তি, উন্নত স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার প্রতিই গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। (চতুর্থ পরিকল্পনার কথা পরে বলা হবে)।

বস্তুতঃ তথ্যাদি বিশ্লেষণে একথাই পরিষ্কার হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা অন্যান্য স্তরে প্রসার এবং মানোন্নয়ন প্রভৃতির **যে যে ক্ষেত্রে যখন অগ্রাধিকার দেওয়ার দরকার ছিল তাই কার্যতঃ করা হয় নি।** অথচ মাথাভারি প্রশাসন-যন্ত্রের জন্য ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে।

সরকারের সীমিত দায়িত্ব : একথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে **রাষ্ট্র আজও পর্যন্ত শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব বহন করে মাত্র। আজও বেসরকারী উদ্যোগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।** এখনও পর্যন্ত শিক্ষার জন্য সমগ্র ব্যয়ের **৬৯·৬ শতাংশ বহন করেন সরকার,** ৩·১ শতাংশ জেলা বোর্ড, ৩·১ শতাংশ মিউনিসিপ্যালিটি, ১৩ শতাংশ ছাত্রবেতন বাবদে অভিভাবক। অবশিষ্টাংশ আসে বিভিন্ন দান ও সাহায্য খাতে। **মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষা আজও মূলতঃ অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল।**

বস্তুতঃ **অভিভাবকদের পকেটের উপর শিক্ষা যখন আজও এত নির্ভরশীল তখন শিক্ষায় সমসুযোগ** এবং *Common School* **সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায় 'দিল্লী দূরস্ত'।**

অসাফল্যের স্বীকৃতি : স্বাধীনতার ২০ বছর পরে এবং তিনটি পরিকল্পনা অতিক্রম করেও **আমরা ব্যর্থতা স্বীকার করেছি।** সন্দেহ নেই যে এই সময়ের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু **প্রতি স্তরে হয়েছে অপচয় এবং বন্ধ্যাত্ব।** সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি, সংবিধানের নির্দেশ নিরর্থক হয়েছে। **পাঠ্যক্রমের ব্যর্থতা সকল স্তরেই প্রমাণিত হয়েছে।** গণশিক্ষা প্রসারের শম্বুকগতি আজও ভারতকে অন্যতম নিরক্ষর রাষ্ট্র করে রেখেছে। **এগার বৎসরের বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষাবিদদের দ্বারা**

নিন্দিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় এবং শিক্ষিতের বেকারত্ব বেড়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষাও সার্থক হযে ওঠেনি। পরীক্ষাগৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছে অপ্রতুল, এবং এই অপ্রতুল অর্থও অনেকাংশে অপচয় হয়েছে। তাই শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র এবং অনুরাগীদের মধ্যে অসন্তোষ আজ সর্বব্যাপক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতির দাবি ছিল জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পরে কমিশন ও কমিটি হয়েছে অনেক। কিন্তু এঁরা সুপারিশ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে। এঁদের সুপারিশগুলি জোড়াতালি দিয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়া সম্ভব হয়নি এবং সম্ভব নয়ও। এই অসাফল্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেই ১৯৬৪ সনে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা গঠন করেছিলেন সর্বভারতীয় শিক্ষা-কমিশন, অর্থাৎ কোঠারি কমিশন (যার সুপারিশগুলি আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবকেই পরিকল্পনার দিকদর্শনরূপে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যর্থতা থেকেও বোঝা যায় যে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন এত সহজেই হওয়ার নয়।

চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার কাল শেষ হ'ল ১৯৬৬ সনে। কিন্তু বিভিন্ন সংশয় এবং বিতণ্ডার ফলে দুই বছর পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা রচনাই সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ১৯৬৯ সনে পরিকল্পনা ঘোষণা করা হ'ল।

প্রথম যখন পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করা হয় তখন মোট ২৩৭৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১২১০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৫.১ শতাংশ। (প্রথম পরিকল্পনায় ছিল ৬.. শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫.৪ শতাংশ)। সুতরাং দেখা যায় যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ নিম্নমুখী এবং অপর্যাপ্ত তো বটেই।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর্থিক মন্দা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের কথাও বাতিল হয়। পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের টাকাও কমানো হয়। শিক্ষা পরিকল্পনায় আঘাত আসে ভীষণভাবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড রাজ্যগুলির পরিকল্পনার ১০ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করবার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই মাত্র ৫ ভাগ দিতে রাজি হয়। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ধরা হয় ৮০৯ কোটি

টাকা (কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২৫৯ কোটি এবং রাজ্যগুলির ৫৫০ কোটি টাকা)। বিভিন্ন ধরনেব শিক্ষার জন্য নিম্নানুরূপ বরাদ্দ ধরা হয়েছে। (পাশে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ও উল্লেখ করা হলো)।

প্রাথমিক শিক্ষা—১১৭'৮৭ কোটি টাকা, (১৭৯ কোটি টাকা); (বরাদ্দ ছিল ২০৯ কোটি)
মাধ্যমিক ,, ১২৬'২৫ ,, ,, ; (১০৩ ,, ,,); ,, ,, ৮৮ ,,
বিশ্ববিদ্যালয় ,, ১৮১'৭১ ,, ,, ; ৮৭ ,, ,,), উচ্চশিক্ষা—৮২ ,,
শিক্ষক-শিক্ষণ ৩৩'০০ ,, ,, ; (২৩ ,, ,,);
বৃত্তি ও কারিগরি ১২০'০০ ,, ,, ; (১২৯ ,, ,,);
সামাজিক শিক্ষা ১০'০০ ,, ,, ; (২ ,, ,,);
সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম ১৫ ৬৭ কোটি টাকা ; (৭ কোটি টাকা),
অন্যান্য স্কীম ১০৪'৯১ ,, ,, ; (৬৬ ,, ,,),
মোট ৮০৯'৩৪ ,, ,, ; মোট ৫৯৬ কোটি টাকা ,

চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি লক্ষ্যের কথা প্রস্তাব করা হয়েছিল, যেমন—(১) শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির সংযোগ স্থাপন করা হবে। (২) তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে অসঙ্গতি প্রবেশ করেছে, তা দূর করা হবে। (৩) অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার প্রসার করা হবে। (৪) মাধ্যমিক স্তরে আরও কারিগরি ও বাণিজ্যিক পাঠ্যক্রম সংযোজন করা হবে। (৫) উচ্চশিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করা হবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বদলে স্নাতকোত্তর শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। (৬) এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা হবে। (৭) বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ নজর এবং কারিগার শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হবে। (৮) C.S I.R. সংগঠনের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী গবেষণার ব্যবস্থা হবে।

বলা হয়েছিল যে পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা হবে ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ, অর্থাৎ ঐ স্তরের ৯২'২ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে আসবে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে (VI-VIII) ছাত্রসংখ্যা হবে ১ কোটি ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ৪৭'৪ শতাংশ। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে (IX-XI) ছাত্রসংখ্যা হবে ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ২২'১ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রসংখ্যা হবে ১৬ লক্ষ। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই স্তরে নূতন ছাত্র ভর্তি হবে ৫ লক্ষ এবং এর মধ্যে ৩'৬ লক্ষই হবে বিজ্ঞানবিভাগে।

কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রীস্তরে ভর্তি হবে নতুন ৫৩০০ এবং ডিপ্লোমাস্তরে ১৮১০০ জন ছাত্র। সুতরাং এই সংখ্যায় নূতন আসনের ব্যবস্থা করা হবে। Correspondence ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৪০০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ২৩০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য কিছু নতুন ট্রেনিং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হবে।

বলা হয়েছিল যে মাধ্যমিক স্তরে Terminal ধরনের আরও নানাপ্রকার কারিগরি ও বাণিজ্যিক পাঠক্রমের ভিত্তিতে বহুমুখিনতা সম্প্রসারিত হবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য "বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হবে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মানোন্নয়ন করা হবে। বয়স্কশিক্ষার কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলে লাইব্রেরী ব্যবস্থা এবং নবসাক্ষরদের জন্য ব্যাপকহারে বই প্রকাশ করা হবে!

কিন্তু ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করার ফলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যকে (target) অনেক ছাটকাট করতে হয়। কত ছাত্রকে সুযোগ করে দেওয়ার আশা প্রকাশ করা হয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি :—

	৩য় পরিকল্পনার শেষে		চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য	
৬-১১ বছর—	৫.৫৯ কোটি ;	৭৯%	৬.৮২ কোটি ;	৮৪.৮%
১১-১৪ „	১.২৭ „ ;	৩৩.৪%	১.৮৪ „ ;	৪২.১%
১৪-১৭ „	৬৫.৫ লক্ষ ;	১৯.৩%	১.০৩ „ ;	২৫.৯%

কিন্তু ছাটকাট করা লক্ষ্যেও বাস্তবে পৌঁছান যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা

কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাবসহ কোঠারি কমিশনের সুপারিশকে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে কয়েকটি ঘোষণাও করা হয়, যেমন— (১) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। (৩) শিক্ষা প্রশাসন উন্নত করবার জন্য ম্যানেজিং কমিটি, জিলা স্কুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও গণতান্ত্রিক করা হবে। (৪) স্কুল শিক্ষার কাঠামো বদলানো হবে। ত্রিভাষা সূত্রই গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। (প্রাথমিক শিক্ষা ৪৫ কোটি, মাধ্যমিক ২০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ কোটি

কারিগরি ১০ কোটি টাকা)। পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছিল (১) অতিরিক্ত ১০ লক্ষ শিশুর জন্য, এবং পরবর্তী কয়েক বছরে যারা স্কুলে পড়বার যোগ্য হবে তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; অর্থাৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ। (২) প্রাথমিক স্তরে ৪২ লক্ষ শিশুর জন্য অবৈতনিক শিক্ষা। (৩) চারক্লাশের প্রাথমিক স্কুলগুলির এক-তৃতীয়াংশকে পাঁচশ্রেণীর স্কুলে উন্নয়ন। (৪) ২০০০ নূতন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন এবং এজন্য অতিরিক্ত ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ। (৫) প্রতি জেলায় মডেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। (৬) বিজ্ঞান এবং অনার্স পড়বার সুযোগ সম্প্রসারণ (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে)। (৭) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার। (৮) বিকলাঙ্গ এবং পশ্চাৎপদের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা। (৯) কৃষি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব। (১০) নূতন কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বদলে পুরাতনগুলির পুনর্বিন্যাস এবং শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। (১১) উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন। (১২) শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি। (১৩) প্রাথমিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষাব অগ্রাধিকার।

সাফল্য ও ব্যর্থতা

বিগত চারটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা অনেকটা এগিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং বয়স্ক শিক্ষাব তেমন কোন অগ্রগতিও হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাও সারা ভারতে এখনও সর্বজনীন নয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ ছেলেমেয়েব সুযোগ হয়েছে। শিক্ষায় সার্বিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে আমরা অনেক দূরে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষার প্রসার হওয়ার সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়েছে বেকারত্ব।

বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে নূতন উদ্যমে এগোতে না পারলে উপায় নেই। এজন্য দরকার শিক্ষাকে উৎপাদনী বিনিয়োগ মনে করে অগ্রসর হওয়া। এই কথাটিকে মনে রেখে পঞ্চম পরিকল্পনাটি বোঝা দরকার।

পঞ্চম পরিকল্পনায় শিক্ষা

পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাবনা পত্রে বলা হল মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের এক-দশমাংশ ব্যয় করা হবে শিক্ষার জন্য—অর্থাৎ ৩২০০ কোটি টাকা। এক-দশমাংশ ব্যয়ের প্রস্তাবে যে আশার উদ্রেক হল, সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে গেল এমন একটি বক্তব্যে, যার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্কই নেই। বলা হল যে স্বাধীনতার পর থেকে নজর দেওয়া

হয়েছে শিক্ষা প্রসারের দিকে এবং শিক্ষায় সমসুযোগ নিশ্চিত করবার জন্য। কিন্তু ঐ প্রস্তাবনাতেই প্রসার সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দেওয়া হল—

(কত শতাংশের শিক্ষা-সুযোগ করা হয়েছে)

	১৯৬৮-৬৯	১৯৭৩-৭৪ (সম্ভাব্য)
৬—১১ বছর বয়স	৭৫%	৮৫·৩%
১১—১৪ ,, ,,	৩২·১	৪১·৩
১৪—১৭ ,, ,,	১৯·১	২৫·৬
১৭—২৩ ,, ,,	৩·০	৪·৫

এই অবস্থাকে "যথেষ্ট প্রসার" বলা যায় কি? তা ছাড়া সুযোগের সমতা সকলের কাছে কতটা এসেছে একথা যে কোন নাগরিকই জানেন।

এই পটভূমিতে **পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য** হিসেবে বলা হল—

১৯৭৫-৭৬'এর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। ১১-১৪ বছরের বয়সে ১৯৭৮-৭৯'এ ৭৬%এর সুযোগ। কিন্তু ঐ সাথেই বলা হল যে শুধুমাত্র সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্যই ব্যয় হতে পারে জাতীয় আয়ের ৩।৪ শতাংশ। সুতরাং আংশিক সময়ের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে খরচ কমানো হবে; বেসরকারী স্থানীয় সাহায্যকে আবশ্যিক করা হবে।

মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে নূতন ৪০ লক্ষ ছাত্র ভর্তি করা হবে। এই জন্য ব্যয় হবে ৩২০ কোটি টাকা। কিন্তু নূতন ও পুরানো সব দায়িত্ব মিলিয়েই মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কিছুতেই ৪০০ কোটি টাকার বেশী হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সরকারী স্কুল না খুলে, বেসরকারী স্কুলে সাহায্য সীমায়িত করে, প্রমোশনে কড়াকড়ি করে, স্কুল স্বীকৃতিতে কড়াকড়ি করে সংখ্যার চাপ কমানো হবে! ডাক-যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তা ছাড়া স্থানীয়ভাবে বেসরকারী আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করা হবে।

উচ্চশিক্ষার স্তরে পরিকল্পনাকালে ছাত্রসংখ্যা বাড়বে ১৬ লক্ষ! এদের জন্যই ব্যয় হবে ৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং ঐ ছাত্রছাত্রীকে আংশিক সময়ের কোর্স, পত্রযোগে শিক্ষা এবং প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে তৈরী করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে পরীক্ষায়ও যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হবে। নূতন কলেজ খোলা, ছাত্র ভর্তি ইত্যাদির ব্যাপারে এবং পরীক্ষায় কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি আত্মপ্রচেষ্টায় পড়া এবং বেসরকারী সাহায্য সংগঠন করা হবে।

লক্ষ্যমাত্রার বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—

(ক) শিক্ষা প্রসারের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা ;

(খ) স্কুল কলেজের ব্যবস্থার বদলে স্কুল-কলেজ বহির্ভূত পন্থায় পড়ার ব্যবস্থা করা ;

(গ) সরকারের সার্বিক দায়িত্বের বদলে বেসরকারী উদ্যমের উপরই উত্তরোত্তর নির্ভর করা।

শিক্ষা প্রসার সম্পর্কে এই সীমাবদ্ধ নীতির বিপরীতে বলা হল গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার কথা। প্রস্তাব করা হল যে,

(১) স্বল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধের দিকে নজর রেখে সারা ভারতে গড়া হবে ৫০০০ মডেল প্রাথমিক স্কুল। এজন্যই ব্যয় হবে ১৭৫ কোটি টাকা।

(২) প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে মাত্র ১টি করে (প্রতিটিতে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে) মডেল মাধ্যমিক স্কুল গড়া হবে।

(৩) উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি এ্যাডভান্সড্ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সর্বোত্তম মানের এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৫ ভাগ কলেজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

এইসব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ নিকৃষ্টমানের প্রতিষ্ঠান-গুলিও ভাল হয়ে উঠবে।

এই প্রস্তাবনা-পত্রের ভিত্তিতে পঞ্চম শিক্ষা পরিকল্পনার যে খসড়া করা হয় তার মূল কথা হল—

(ক) প্রাথমিক স্তরে ৯৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা ;

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৪৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা,

আংশিক সময়ের জন্য আরও ৭৮ লক্ষের শিক্ষা,

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার সম্ভাব্য বিস্তার ; কিন্তু প্রায় অর্ধেক সংখ্যাকেই বৃত্তি-শিক্ষায় নিয়ে যাওয়া ;

(ঘ) উচ্চশিক্ষার স্তরে ৫০ ভাগের জন্য নিয়মিত কলেজ শিক্ষা, ২০ ভাগের জন্য সান্ধ্য ক্লাস, ২০ ভাগের জন্য পত্রযোগে শিক্ষা এবং বাকি ১০ ভাগের জন্য "প্রাইভেট" শিক্ষা।

(ঙ) কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাত্রা হ্রাস এবং উৎপাদনী দক্ষতার দিকে বেশী নজর; কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বদলে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণের দিকে গুরুত্ব।

খসড়ায় তত্ত্ব হিসেবে প্রস্তাব করা হল—(ক) উৎপাদনী কর্মে নিয়োগের দিকে বিশেষ গুরুত্ব, (খ) নিম্নতম সাধারণ প্রয়োজন মেটানো; পশ্চাৎপদ অঞ্চল কিম্বা গোষ্ঠীর প্রতি বেশী নজর, "অপ্রয়োজনীয়" ব্যয় হ্রাস, বেসরকারী আত্মনির্ভরতা এবং মানোন্নয়ন; উন্নয়নমূলক কাজের সাথে বয়স্ক শিক্ষাকে যুক্ত করা।

কিন্তু মানোন্নয়নের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং বৃহৎ আকারের "প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত" শিক্ষার কথা বলে শিক্ষা উন্নয়নের মূল সুরকেই ব্যাহত করা হয়েছে।

সর্বোপরি প্রথম প্রস্তাবিত ৩২০০ কোটি টাকা বরাদ্দকে কমিয়ে করা হয় ২২০০ কোটি টাকা এবং আরও কমিয়ে ১৭২৬ কোটি টাকা এবং পরিশেষে আরও কম। মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা বরাদ্দও ক্রম ক্ষীয়মাণ। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের ৬·৯ ভাগ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ৫·১ ভাগ এবং পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাব হল ৪·৬ ভাগ।

এ কথা সহজেই বলা চলে যে এই পরিকল্পনার শেষেও সাফল্যের মাত্রা লক্ষ্যস্থল থেকে অনেক দূরেই থাকবে। তা ছাড়া আর্থিক সংকটের ফলে পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করাও যায়নি। বাৎসরিক বরাদ্দ করে চলতে হচ্ছে।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the role of the Union Govt. in education in India.

2. How is education financed in India? What are the problems in financing?

3. Make a synoptic study of the first four plans of educational development.

4. Bring out the salient features of the Draft 5th Plan for Education and add your comments.

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

আমরা ইতিহাস আলোচনা করেছি, এখনকার অনেক সমস্যাও আলোচনা করেছি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রটিই স্পর্শকাতর, চঞ্চল এবং গতিশীল। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয় শিক্ষা সংকটে। তাই শিক্ষা 'সমস্যার' কোন স্থায়ী তালিকা করা যায় না। নিত্য নূতন সমস্যা এসে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সংকট আনে। সুতরাং চলতি (current) সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। তেমন কয়েকটি সমস্যা আমরা আলোচনা করছি।

(১) **ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও জাতীয় সংহতির সমস্যা**—প্রাচীনকালে মানুষের সব চেতনাই ধর্মচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্ম-প্রভাবিত। আধুনিক সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ফলশ্রুতি ঘটেছে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতায়। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। এর অর্থ বিভিন্ন ধর্মের সহ-অবস্থান, ধর্মাচরণের ব্যক্তিগত অধিকার এবং কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকার না করা।

ভারতের আধুনিক শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিচ্ছন্নভাবে গৃহীত হয় ১৮৫৪ সনে। মিশনারী অত্যুৎসাহিতার সামনে হিন্দু মুসলীম উভয় সম্প্রদায়কে নিশ্চিন্ত করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তখন এই নীতির উদ্ভব। সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনর্ঘোষিত হয়। হাণ্টার কমিশনও ঐ নীতি অপরিবর্তিত রাখেন। যে ভাবেই সূচনা হয়ে থাক, বহু ধর্মের ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতিই দরকার।

কিন্তু সরকারী স্কুল কিংবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হলেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকার কখনও কেড়ে নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনায় ছাত্রসমাজ "উচ্ছৃঙ্খল" হয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগে কার্জন গভর্ণমেণ্ট স্কুলে "নীতি শিক্ষার" প্রশ্ন তুললেন। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা কিংবা বাধ্যতামূলক নীতিশিক্ষার প্রস্তাব বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতিই অপরিবর্তিত রয়েছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছে। শিক্ষায়ও ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্কুলে স্বেচ্ছামূলক ধর্ম নীতি শিক্ষার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন তত্ত্বের প্রশ্নকে (dogma) প্রাধান্য না দিয়ে সকল ধর্মের সার 'নীতিশিক্ষা' এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে উদার তত্ত্বালোচনার সুপারিশ করেছিলেন। বস্তুতঃ গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথও 'মানবধর্মের' উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলেছিলেন। মুদালিয়র কমিশন কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্মশিক্ষার দাবি অগ্রাহ্য করে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাই সুপারিশ করেন।)

কিন্তু ইদানীং জাতীয় সংহতি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নূতন গুরুত্ব পেয়েছে। "Emotional Integration" সম্পর্কিত শ্রীপ্রকাশ কমিটি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যানুসন্ধানের পথে জাতীয় সংহতির কথা বলেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে "সম্পূর্ণানন্দ কমিটি" আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। অধ্যাত্মপ্রভাবের সাহায্যে "ধ্বংসাত্মক" জড়বাদের গতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি সরাসরি ধর্মশিক্ষার সুপারিশ করেন। কিন্তু কোঠারি কমিশনের মতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। অবশ্য কমিশন বাধ্যতামূলক "নীতিশিক্ষার" সুপারিশ করেছেন। সকল ধর্মের মধ্যে নৈতিকতার যে আবেদন আছে, তার 'সার' সংকলনই হবে এই শিক্ষার পাঠ্যবস্তু। সাধারণ শিক্ষকরাই ক্লাশ রুটিনের মধ্যে নীতিপুস্তক অনুসারে নীতিপাঠ দেবেন।

ছাত্রছাত্রীর নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু নীতি শিক্ষার পদ্ধতি কী হবে? নীতিবোধ জীবনবোধের অংশ মাত্র। মূল্যবোধের সঙ্গে নীতিবোধ সম্পৃক্ত। নীতিতত্ত্বই নীতিবোধ জাগায় না। ব্যবহারিক অনুশীলনই নীতিচেতনা আত্মস্থ হওয়ার গ্যারান্টি। সুতরাং অনৈতিক পরিবেশে নীতিশিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বকেই দ্বিখণ্ডিত করবে। বয়স্কদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুস্থ নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টিই এই ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন। স্কুলের নীতিশিক্ষা এই পরিবেশের পরিপূরক হতে পারে মাত্র।

শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কেও এই সাবধানতার প্রয়োজন। স্কুলের বাইরে গোষ্ঠী, বর্ণ কিংবা সম্প্রদায় ভিত্তিতে সংঘাত চললে কিংবা ধর্মভিত্তিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সম্পর্কে অরাজকতা সৃষ্টি হলে স্কুলের মধ্যে শিক্ষকের অধ্যবসায়কে বিষাক্ত আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সাংবিধানিক নীতি কিংবা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ শুধু দলিলেই পর্যবসিত হতে পারে।

বস্তুতঃ, ভারতে জাতীয় সংহতির একমাত্র পথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা, সহ-অবস্থান, আবেগমুক্ত এবং যুক্তিশীল ভাবের

আদান প্রদান। শিক্ষক ছাত্র, সমাজসেবী-রাজনীতিবিদ সকলেরই সম্মিলিত এবং সচেতন প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই সূত্রেই বলা দরকার ধর্ম নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এই জটিলতা মাঝে মাঝেই অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু যে কোন আলোড়নই হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। ধর্ম-সংগঠনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ আসা উচিত। এই সঙ্গে বেসরকারী, বিশেষতঃ গোষ্ঠীগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সচেতনতা দরকার। বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। অবশ্য শিক্ষার জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

(২) **ভাষা সমস্যা**—জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষাসমস্যা। এ সমস্যা শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের ভাষাসমস্যার বীজ রয়েছে অতীত ইতিহাসের গর্ভে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে আজকের ভাষাসমস্যার রূপটি সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় "প্রাকৃত" যদিও কিছুকাল শিক্ষার বাহন হয়েছিল, তবুও সাধারণভাবে সমগ্র প্রাচীন কালে উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল বৈদিক ভাষা তথা সংস্কৃত ভাষা, সাধারণের মাতৃভাষা নয়। গণশিক্ষার বাহন অবশ্য ছিল মাতৃভাষা। মধ্যযুগেও উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত, আরবী কিংবা ফারসী, সাধারণের মাতৃভাষা নয়। সংস্কৃত ও ফারসীই ছিল Link Language. আর লৌকিক ভাষার মধ্যে ছিল হিন্দী এবং উর্দু ভাষা। শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে এই ছিল আমাদের অতীত দুর্বলতা। অবশ্য গণশিক্ষার বাহন বরাবরই ছিল মাতৃভাষা।

১৮৩৫ সনে পটপরিবর্তন ঘটলো। মেকলে-বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্তে ইংরেজীই হলো শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী ও প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের সময় মাতৃভাষার দাবি শোনা যায়নি। যুব-বাংলা গোষ্ঠী মাতৃভাষার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সমাজচ্যুত। যাই হোক, ইংরেজীই হলো শিক্ষার মাধ্যম এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা। আমাদের বর্তমান ভাষাসমস্যার সূচনা হল এখান থেকে।

মাতৃভাষার মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া চলতে পারবে, এ কথা বলা হলো ১৮৫৪ সনে। ইংরেজী অবশ্য রইলো আবশ্যিক পাঠ্য। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক ভাষা স্থান পেলো। ইংরেজী রইলো প্রথম স্থানে, মাতৃভাষা দ্বিতীয় স্থানে এবং প্রাচীন ভাষার (সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসী) স্থান হলো তৃতীয় পর্যায়ে। কিন্তু মাতৃভাষার স্থান

স্বীকৃত হলেও বাস্তবে রূপায়িত হল না। আমাদের তদানীন্তন চেতনা এবং কর্ম-জীবনের চাহিদাই এ জন্যে দায়ী।

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিলেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত হয় নি। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলো। জাতীয় চেতনার সাথে জাতীয় ভাষার চেতনাও বিকশিত হতে থাকে। ক্রমেই আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়া ও পড়ানোর দাবি সোচ্চার হয়। এই চেতনা পূর্ণতা পায় জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সময়। ভাষার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি দুইটি—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার চেতনা এবং সর্ব ভারতের জন্য একটি ভারতীয় ভাষা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে এই ধারাতেই ভাষা-চেতনার বিকাশ ঘটেছে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা, একটি সর্বভারতীয় সংযোগরক্ষাকারী আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা—এই ত্রিভাষা চেতনা এই যুগে দানা বাঁধে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যুগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই আঞ্চলিক ভাষাকে 'মাধ্যমিক শিক্ষার' বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন ভাষাও ঐচ্ছিক ভাষারূপে প্রচলিত থাকে। বাকি থাকে শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র।

দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইটি যুগপৎ পরিণতির ফলে একদিকে যেমন সর্বভারতীয় ঐক্য এবং চেতনাও সংঘবদ্ধ হয় এবং সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা গঠিত হয়, অপরদিকে তেমনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ে। এই যুগপৎ পরিণতিই স্বীকৃত হয় স্বাধীন ভারতের সংবিধানে। একদিকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে হিন্দীকে স্বীকার করা হয় এবং অপরদিকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বর্ণিত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্বীকার করা হয়। ইংরেজীকে রাতারাতি বিদায় না করে ১৫ বছরের আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয়।

এই সাংবিধানিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা সূত্রের উদ্ভব। মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাব হল—(১) মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ, (২) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে আরও দুইটি ভাষা—ইংরেজী ও হিন্দী পড়া। (অবশ্য কোন দুইটি ভাষার যুগপৎ সূচনা নয়), (৩) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক দুইটি ভাষা পড়া, (৪) প্রাচীন ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ। ১৯৫৬ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ত্রিভাষা ফর্মুলা স্থির করেন। ১৯৬১ সনে রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ত্রিভাষা-নীতি গৃহীত হয়। জাতীয় সংহতি পরিষদও এই ফর্মুলা সমর্থন করেন। তদনুযায়ী ১৯৬৩ সনে "ভাষা-বিল"-এ ত্রিভাষা নীতিই স্থান

পায়। কিন্তু ইংরেজীর পূর্বনির্ধারিত আয়ুষ্কাল যখনই শেষ হয়ে আসে, সমস্যার গভীরতা তখনই ধরা পড়ে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষাসমস্যাটি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চশিক্ষা, বিদেশভ্রমণ, সরকারী চাকুরি প্রভৃতির সমস্যা। সুতরাং ভাষাসমস্যাটি বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার অংশবিশেষ, শুধু সাংস্কৃতিক সমস্যাই নয়। বস্তুত **শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাষাসমস্যার তিনটি বিশেষ দিক**—(১) রাষ্ট্রভাষা আবশ্যিকভাবে শিখবার প্রয়োজনীয়তা এবং যদি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ইংরেজী পূর্ণ গৌরবে বিকল্প রাষ্ট্রভাষারূপে থাকে, তবে যুগপৎ দুইটি ভাষাই গ্রহণ করা কিংবা একটিকে বাছাই করার সমস্যা। (২) শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ। (এই সূত্রে ভাবতে হবে বৃহত্তর অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের মাতৃভাষার কথা)। (৩) বিদ্যালয়জীবনে মোট কয়টি ভাষা আবশ্যিকভাবে শিক্ষণীয় এবং ঐচ্ছিক ভাষার স্থান।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। ইংরেজীর প্রবক্তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ইংরেজী অপরিহার্য। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং উচ্চতর শিক্ষায় library language হিসেবে ইংরেজী অদ্বিতীয়। ইংরেজী হল একটি সর্বভারতীয় সংযোগ-রক্ষাকারী ভাষা (link-language)। এই দাবির মধ্যে ইংরেজী-প্রবণতার সুর মিশ্রিত। বস্তুতঃ স্বাধীন ভারতে ইংরেজী প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার উত্তর-কালে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণেরও বেশী ; (এবং ইংরেজী-স্কুলের দশভাগ মাত্র ছাত্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।) ইংরেজী-প্রবণতা একটি নূতন আভিজাত্যের লক্ষণ এবং এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণও যুক্ত। কিন্তু ইংরেজী link-language হলেও কতজন ভারতীয় ইংরেজীতে শিক্ষিত? **সুতরাং শিক্ষাগত কারণ যতটুকু রয়েছে, ততটুকু পর্যন্ত ইংরেজীর দাবি স্বীকার্য।** ইংরেজী ঐচ্ছিক ভাষারূপে গ্রহণ করলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

হিন্দী সম্পর্কে বলা চলে যে উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার জন্য হিন্দীর এখনও অনেক উন্নতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ভাষা কিংবা আধুনিক উচ্চশিক্ষার ভাষারূপে সংস্কৃতের দাবি আজ আর গ্রহণীয় নয়। ঐচ্ছিক ভাষারূপে সংস্কৃতের স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার মাধ্যমরূপে আঞ্চলিক ভাষার (তথা মাতৃভাষার) স্বীকৃতি সর্ব-স্তরেই কাম্য।

সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো—(১) সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে,

২) সংযোগকারী ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী কিংবা হিন্দী (অথবা দুইটি) সম্পর্কে, ৩) অন্যান্য আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক ভাষা পাঠ সম্পর্কে, (৪) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাষার সূচনাকাল সম্পর্কে, এবং (৫) কোন ভাষা কত বছর পড়া প্রয়োজন সেই সম্পর্কে। এই সম্বন্ধে সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হতে পারে মাতৃভাষা, আবশ্যিকরূপে একটি সংযোগকারী ভাষা এবং যে কোন একটি ঐচ্ছিক ভাষা। তা ছাড়া একটির ভিত্তি শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত আর একটির প্রচলন অবাঞ্ছনীয়।

ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্যা পারস্পরিক সন্দেহ এবং প্রয়োজনবোধের স্বল্পতা। **বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পূর্ণ মর্যাদার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ভাষার সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বীকৃতিই ভাষাসমস্যা তথা জাতীয় সংহতির অন্যতম বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে পারে।**

এই সম্পর্কে বর্তমান অবস্থাটি কী? বাংলা দেশের বাইবে, বিশেষ করে হিন্দীভাষী কোন কোন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বাতিল করা হয়েছিল এবং মাতৃভাষার একক দাবি স্বীকার করা হয়েছিল। এর ফলে সে সব জায়গার ছাত্ররা অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে অসুবিধেয় যে না পড়েছে এমন নয়। তাই নূতন করে ইংরেজীর প্রতি দরদ বেড়েছে। **পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে** ইংরেজী রয়েছে আবশ্যিক পাঠ্যভাষা রূপে। আর শিক্ষার মাধ্যম রূপে সরকাবী ভাবে ইংরেজী আজও আছে, যদিও বাংলায় উত্তর দেওয়াব অধিকার ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় অধ্যাপককে বাংলা ও ইংরেজী দুইটি ভাষাই ব্যবহার করতে হয়। **স্নাতকোত্তর স্তরে** শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ের মাধ্যমই এখনও (অন্তত ১৯৭৮ পর্যন্ত) ইংরেজী। (পড়ানোর সময় বাংলা ব্যবহার করা অধ্যাপকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল)।

সমস্যার সমাধান রূপে বলা চলে যে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকেই (আমাদের এখানে বাংলা) শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকার করা। (ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হলে অন্যান্য ভাষার মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক কলেজ পরিকল্পনা করা চলতে পারে।) স্নাতক স্তরে ইংরেজীকে আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক ভাগে ভাগ করা ভাল। আবশ্যিক পাঠক্রম হবে সহজ এবং শিক্ষার মানও উঁচুতে রাখার দরকার নেই। ঐচ্ছিক পাঠক্রমটি যথেষ্ট উচ্চমানের হওয়া দরকার।

স্নাতকোত্তর স্তরেও নীতিগতভাবে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাতারাতি এই কাজ করবার পথে অন্তরায় আছে বলেই নানারকম বিতণ্ডার সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজীর সমর্থকরা বলছেন যে বিজ্ঞান

ও টেকনিক্যাল (ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী প্রভৃতি) বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয় ; এবং এগুলিতে এমন অনেক শব্দসম্ভার এবং ভাববৈচিত্র্য আছে যা আমাদের আঞ্চলিক ভাষার বর্তমান অবস্থাতে নেই। এই প্রশ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়ান্ত বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কথিত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক হলেও ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে নিজেদের ভাষাতেই এইসব বিষয় পড়ানো হয়। তাহলে আমাদের দেশেই বা হবে না কেন? প্রশ্ন হলো উপযুক্ত পরিভাষার ব্যবহার, প্রয়োজন হলে টেকনিক্যাল বিষয়ে দু'একটি ইংরেজী শব্দ কিম্বা ফর্মুলার ব্যবহার এবং ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার সমস্যা। ইংরেজীকে বাতিল করলে শিক্ষার সর্বনাশ হবে, এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত হলেও গ্রন্থাগারে যথেষ্ট ইংরেজী কিম্বা অন্যান্য ভাষার রেফারেন্স বই রাখা দরকার।

উচ্চশিক্ষা স্তরে ভাষা সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ হলো— (১) দশ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন, (২) কিছুদিন পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজীর ব্যবহার চলতে পারে, তবে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাই চলবে বেশী ; (৩) ক্রমান্বয়ে সকল শিক্ষককেই দুই ভাষা জানতে হবে এবং ছাত্রদের আঞ্চলিক ও ইংরেজী ভাষা—উভয়ের মাধ্যমেই পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে ; (৪) অহিন্দী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে হিন্দী কিম্বা উর্দু ভাষাতেও কলেজ চলতে দেওয়া উচিত ; (৫) আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার ; (৬) প্রাচীন ভাষা এবং ইংরেজীকে ঐচ্ছিকভাবে পড়বার যথেষ্ট সুযোগ রাখা দরকার, (৭) শুধু ইংরেজীই নয়, রুশীয় প্রভৃতি অন্যান্য ভাষারও যথেষ্ট চর্চা প্রয়োজন।

কমিশনের এই সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে পাঁচ বৎসর সময় সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলা হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণায় কোন সময় সীমার উল্লেখ না করে **আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম করবার কথা বলা হয়েছিল।**

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করবার সিদ্ধান্তটি অনতিবিলম্বে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘোষণা করা দরকার। নির্দিষ্ট সময়-সীমাও ঘোষণা করে ধাপে ধাপে আঞ্চলিক ভাষাকে যোগ্য আসন করে দেওয়া উচিত। কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক কৌলীন্যের সাথে জড়িত ইংরেজী-প্রীতি ক্রমেই বাড়ছে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন পাঠ্যক্রমেও এ কথা পরিষ্কার হয়েছে। সুতরাং ভাষার সমস্যাটি আরও বেশ কিছুদিন জীবন্ত থাকবেই।

(৩) **পরীক্ষা সংস্কারের সমস্যা**—এই সমস্যার মূলে রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দুটি চেতনা। পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন নেই, একথা কেউ বলেন না। দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সমাজচেতনা, আর্থিক জীবনযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি যে ত্রুটিপূর্ণ এ বিষয়েও দ্বিমত নেই। তাই বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-সংস্কারের অনেক সুপারিশ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) বহিঃ-পরীক্ষা এবং অন্তঃপরীক্ষার সমন্বয়; (২) বহিঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে Objective Type প্রশ্ন সংযোজন; (৩) রচনাধর্মী প্রশ্নের স্বল্প ব্যবহার, এবং সমগ্র পাঠ্যবস্তু থেকে ছোট ছোট প্রশ্নের অবতারণা; (৪) একটি মাত্র পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যনির্ধারণ না করে ক্রমিক অবনতি-উন্নতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয়বাহক Cumulative Record ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি।

পরীক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীচু ক্লাসের লিখিত পরীক্ষায় আজকাল মাঝে মাঝে Objective Test দেখা যায়। মাধ্যমিক এবং কলেজীয় পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু 'পরীক্ষাব্যবস্থার' কোন মৌলিক পরিবর্তন এখনও হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যে Evaluation Unit গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ফলশ্রুতি নেই।

পরীক্ষাঘরে বিশৃঙ্খলা সূত্রে ছাত্রদের অভিযোগ—(১) প্রশ্নপত্র অবোধ্য কিংবা দ্ব্যর্থবোধক; (২) পাঠ্যক্রম বহির্ভূত; (৩) প্রশ্নপত্র কঠিন (এবং সত্যানুসন্ধান করলে দেখা যাবে কোন কোন ক্ষেত্রে 'suggestion' বহির্ভূত); (৪) কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়ানো হয় নি, এমন বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক প্রশ্ন ইত্যাদি।

এইসব অভিযোগ প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড এবং শিক্ষাপ্রশাসন কর্তৃপক্ষের। সচেতন প্রচেষ্টায় এই অভিযোগের সহজ এবং প্রত্যক্ষ প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু এগুলিই পরীক্ষা সম্পর্কীয় মূল সমস্যা নয়। শিক্ষার প্রকৃত ফলশ্রুতির পরিমাপক হিসাবেই পরীক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। এই সূত্রে ইংলণ্ডের G. C. E., ফ্রান্সের কিংবা রাশিয়ার পদ্ধতি থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি।

পরীক্ষাসমস্যার সমাধান কয়েকটি পন্থায় সম্ভব—(১) পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা চলে। এই সূত্রে আমেরিকার ক্রেডিট ব্যবস্থার উল্লেখ করা চলে। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। (২) স্কুল কিংবা কলেজগুলির উপর অন্তঃপরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া চলে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাধারণ মানের সমস্যা, এমন কি দুর্নীতির সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। (৩) কোঠারি কমিশন

প্রস্তাব করেছেন পাশ বা ফেল চিহ্নবর্জিত সার্টিফিকেট প্রথা প্রচলনের। কিন্তু এ প্রস্তাব বিপদ এড়াবার সহজ পন্থা মাত্র।

পরীক্ষা-প্রথা সংস্কারের জন্য রাশিয়ার কার্ড প্রথা এবং মৌখিক পরীক্ষা কিংবা ইংলণ্ডের **Advanced-Ordinary** স্তরে **Elective** প্রথার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। বস্তুত: টিউটোরিয়াল ও সেমিনার শিক্ষণ-পদ্ধতি, **Cumulative Card, Objective Testing,** রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার, অন্তঃপরীক্ষা এবং বহিঃ-পরীক্ষার সমন্বয়, মৌখিক পরীক্ষা, সাধারণ ও বিশেষ মানে পৃথক পরীক্ষা প্রভৃতির সমন্বয়ে পরীক্ষা সম্পর্কে বর্তমান অসন্তোষ দূর করা যায়। অবশ্য এমন ছাত্র থাকবেই যাদের কাছে কোন প্রশ্নপত্রই সহজ বিবেচিত হবে না। সহজেই অনুমেয় যে এই ধরনের ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার অযোগ্য। তাদের সম্পর্কে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া পরীক্ষা-প্রথা যদি রাখাই হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে আত্ম-সমর্পণের প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

অবশ্য সম্প্রতিকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে ব্যাপক অসাধুতাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। ছাত্রদের এই মনোভাবের পিছনে নীতিভ্রষ্টতা যেমন আছে, তেমনি আছে সামাজিক ও আর্থিক হতাশা এবং কিয়দংশে রাজনৈতিক প্রভাব। মূল্যবোধের পরিবর্তন ছাড়া এর সমাধান সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সম্ভব নয়। তবু মাতৃভাষার প্রচলন, প্রশ্নপদ্ধতির উন্নতি, নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিতে উন্নতি, ইণ্টার্নাল, সেসন্তাল এবং এক্সটার্নাল নম্বরের সমন্বয়ে মান নির্ধারণ ইত্যাদির সাহায্যে সীমাবদ্ধভাবেও কিছু উন্নতি সম্ভব। শিক্ষা পর্ষৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবস্থার চাপে নিত্য নূতন পন্থায় পরীক্ষা সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। "রিভিউ" কায়দাটি তেমনই একটি পন্থা। তা ছাড়া আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারও নিতান্তই লজ্জাকর। সুতরাং আমূল পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সেমস্টার প্রথার প্রস্তাব থাকলেও কার্যকর হচ্ছে না, কারণ পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া ঐ ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। এমন কি প্রথম ও দ্বিতীয় 'পার্টে' স্নাতকোত্তর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও সব বিষয়ে এখনও সম্ভব হয়নি।

পরীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন ব্যবস্থায় কিছু অভিনবত্ব আছে, যদিও এই ব্যবস্থায়ও 'মূল্যায়ন' নীতিকে অস্বীকার করা হয়েছে, পাস-ফেলের সমস্যার দিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে মাত্র। নূতন ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা এবং শারীর শিক্ষা, কর্মশিক্ষা প্রভৃতির প্রাকটিক্যাল পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবহারি-

পরীক্ষা হবে এক্সটারনাল এবং ইন্টারন্যাল—দুই স্তরেই। কি রকম এবং কতটা অনুসন্ধানী পরীক্ষা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বাস্তব প্রয়োগের পরে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে।

লিখিত পরীক্ষায় ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রুপওয়ারী পাসের প্রথা চালু করা হয়েছে। গ্রুপের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ২০ নম্বর পেলেও চলবে। কিন্তু সমস্ত গ্রুপটির হিসেবে শতকরা ৩৪ পেতেই হবে। প্রশ্ন হল—তিনটি বিষয়ের গ্রুপে মোট ১০০ নম্বর যদি পেতেই হয় তবে তার মধ্যে যে ছাত্র একটি বিষয়ে ২০ পাবে, সে বাকি দুটি বিষয়ে ৪০ করে পাবেই এমন আশা করা যায় কি? বিজ্ঞান গ্রুপে এই রকম সম্ভাবনা কিছু থাকলেও ভাষা এবং সমাজ বিজ্ঞান গ্রুপে তেমন আশা করা খুবই কষ্টকর। সুতরাং এক্ষেত্রেও সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার লম্বা বহর চলতে বাধ্য।

(৪) **ছাত্র বিক্ষোভের সমস্যা**—বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কিম্বা পরীক্ষার ঘরে ছাত্র বিক্ষোভ আজ নিত্যকার ঘটনা। এগুলিও বিক্ষোভের আংশিক প্রকাশ মাত্র। জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা, সামাজিক তথা শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি, ছাত্রজীবনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই বিস্ফোরণ ঘটে। এইজন্য একতরফা ছাত্রদের দায়ী না করে **বিক্ষোভের অন্তর্নিহিত কারণগুলির বিশ্লেষণ দরকার**। ছাত্রবিক্ষোভের কারণ অনেক। তার মধ্যে ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত কারণগুলিই প্রধান। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে, নূতন কোন সুস্থ মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। চেতনার জগতে নৈরাজ্য বাস্তব জগতেও এনেছে নৈরাজ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে সমগ্র জাতি এক ভাবগত ঐক্যে আবদ্ধ হয়েছিল। সেই ঐক্য গেছে ভেঙ্গে। তখনকার ত্যাগমন্ত্রের বদলে এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও আদর্শভ্রষ্টতা। চারপাশে সংস্কৃতি-হীনতা, শিক্ষাহীনতা, মূল্যহীনতা, অর্থকৌলীন্য এবং অসৎপথে অর্জিত সামাজিক সম্ভ্রমের পরিবেশে যে তরুণ বড় হয়ে ওঠে, তার পক্ষে বিক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান যুগের তরুণ স্বভাবতঃই সমাজ সচেতন। শোষণ, পীড়ন এবং মানবিক আদর্শের অপমৃত্যুতে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। যে ছাত্র অপুষ্টি ও রোগে জর্জরিত, বাড়ীতে পড়াশুনা করবার মত জায়গাটুকু যার নেই, ট্যুইশন করে যার শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করতে হয়, বই ও শিক্ষা সরঞ্জাম থেকে যে বঞ্চিত, শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা যে পায় না, সহপাঠক্রমিক কাজ এবং আনন্দময় অবসর যাপনের সুযোগ যার নেই, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ যার অনিশ্চিত, তার পক্ষে শিক্ষার মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। স্বভাবতঃই সে বিক্ষুব্ধ।

শিক্ষা প্রশাসনও আজ গলদে ভরা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে চলেছে নানা স্বার্থ, এমন কি গোষ্ঠীস্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থেরও সংঘাত। শৃঙ্খলাহীনতার এই চিত্র যদি সমাজের সকল স্তরেই প্রসারিত হয়ে থাকে, তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে কি হবে ?

বিক্ষোভের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ অবশ্য শিক্ষাগত। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা আজ অনেক ব্যাপক, অথচ কলেজে স্থানাভাব। বিভিন্নমুখী ব্যবহারিক এবং অর্থকরী শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ। যারা কলেজে প্রবেশাধিকার পায় তারাও দেখে সরঞ্জামের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, মামুলি শিক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের অভাব। অর্থের মানদণ্ডে শিক্ষকেরও আজ সামাজিক মর্যাদা নেই, তাই ছাত্রের কাছেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদা পান না। সর্বোপরি পরীক্ষার খড়্গ রয়েছে মাথার উপর। পাস করলেও অন্নচিন্তা।

বস্তুতঃ **ছাত্রসমাজে আজ অসন্তোষ স্বাভাবিক**। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন এবং সর্বশেষে কোঠারি কমিশন সমগ্র বিষয়টি সহানুভূতিশীল গঠনমূলক দৃষ্টিতে দেখবার প্রস্তাব করেছেন। বস্তুতঃ সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অসঙ্গতি দূর হলেই অসন্তোষ দূর হবে, কারণ **অসংগতিই বিক্ষোভের মূল**।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—(১) শিক্ষার প্রসার, বহুমুখিনতা এবং যোগ্যতানুসারে শিক্ষার সুযোগ, (২) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং প্রতিনিয়ত নবীকরণ; (৩) ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং আবাসিক ব্যবস্থার প্রসার; (৪) গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ; (৫) ছাত্র নির্দেশনার ব্যবস্থা; (৬) হেলথ্ সার্ভিস; (৭) আরও বেশী সংখ্যায় বৃত্তিদান, অবৈতনিক শিক্ষা এবং আংশিক আয়ের ব্যবস্থা, (৮) ছাত্র স্বায়ত্তশাসন; (৯) শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক; (১০) শিক্ষা প্রশাসনে ছাত্রদের অংশীদারত্ব; (১১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা; (১২) যথেষ্ট ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা।

ছাত্র ও যুব কল্যাণ ব্যবস্থার ব্যাপারে বিদেশের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। আমেরিকা-ইংলণ্ড-রাশিয়ায় কলেজের ভিতরে ও বাইরে ছাত্রদের সাহিত্য ও চারুকলা সংগঠন, বিতর্ক ও বক্তৃতা সংগঠন, শরীর চর্চা ও শিক্ষাভ্রমণের সুযোগ, অবসরকালীন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রভৃতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত এবং এজন্য অর্থ বরাদ্দও করা হয় প্রচুর। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত সামান্যই করা হয়েছে। মাঝে মাঝে বিতর্ক ও

রচনা প্রতিযোগিতা, রি-ইউনিয়ন, বাৎসরিক স্পোর্টস, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় খেলাতেই আমরা সীমাবদ্ধ।

কোঠারি কমিশন ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবাকেন্দ্র, নানাধরনের সহপাঠক্রমের কাজ, ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ, সমাজসেবা প্রভৃতির সুপারিশ করেছেন। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে Dean of Student Welfare নিয়োগেরও সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের কথা সর্বত্রই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ আরম্ভও হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকে প্রকৃতভাবে উদ্দেশ্যমূলক এবং ফলপ্রসূ করতে না পারলে এসবও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ছাত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিও নানা জটিলতায় ভরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব পাস হয়েছে আইনসভায়। কিন্তু সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখবার উদ্দেশ্যে কয়েক ধরনের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও সংখ্যাগত বিচারে কমানো হয়েছে। বস্তুতঃ ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নটি এখন খুবই জটিল। তা ছাড়া ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিও নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ হতে বাধ্য। যে সব সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্র-প্রতিনিধিত্ব চালু করা হবে, নির্বাচন পর্যায়ে ছাত্র উত্তেজনার সঙ্গে হয়তো সেই সমস্যাই আরও বাড়বে। সর্বোপরি এমন অভিমতও আছে যে ছাত্র-প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত হলেও তাদের ভূমিকাকে সীমায়িত করা দরকার।

বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীদারের ভারসাম্য ও সহযোগিতাই শিক্ষাপ্রশাসনের বড় গ্যারান্টি। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সংঘর্ষও অস্বাভাবিক নয়।

৬। **জনশক্তি পরিকল্পনা, ছাত্রবাছাই এবং শিক্ষিত বেকার:**—বিগত ২৫ বছরে সবস্তরে শিক্ষার প্রসার হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসার হয়েছে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ আনুপাতিকভাবে শিক্ষা প্রসারের হার থেকে বেকারত্ব প্রসারের হারই বেশী। ১৯৭১ সালের আদম সুমারীর ভিত্তিতে পরিচালিত সমীক্ষায় জানা যায় যে ১৯৭১-এর এপ্রিল পর্যন্ত দেশে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসাবিদ—ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্যা ছিল ১৬২০০০। (আরও ৩২ হাজার, এঁদের মধ্যে ২২ হাজার মহিলা, চাকুরির চেষ্টাই করেন না।) সাহিত্য ও বাণিজ্য বিষয়ের ডিগ্রীধারী বেকার ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার (এঁদের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার চাকুরিপ্রার্থী)।

প্রশ্ন হল, তবে কি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অতিমাত্রায় শিক্ষিত লোক তৈরী হচ্ছেন যাঁদেরকে গ্রহণ করবার মত চাকুরির সংস্থান করা সম্ভব নয়? এ কথাও সত্য নয় কারণ, ৬-১১ বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে ৮০% পড়তে পারছে। মাধ্যমিক স্তরে ২০% ছেলেমেয়ে সুযোগ পাচ্ছে। উচ্চতর স্তরে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ ছেলেমেয়ে পড়বার সুযোগ পায়। সুতরাং অতিরিক্ত সংখ্যায় শিক্ষিত তৈরী হয়েছে বলেই বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে, একথা সত্য নয়। বস্তুতঃ শিক্ষার সুযোগই এখনও সীমিত। তাই প্রতি বছর স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায়। যারা সুযোগ পায়, তাদেরও জন্য লেখা থাকে ভবিষ্যতের বেকারত্ব।

এর দুটি কারণ। প্রথমতঃ শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাইয়ের (selection) কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেই। সীমিত সুযোগের মধ্যে যে যেখানে পারে, ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়ে। ছাত্রের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষেত্রের চাহিদার বাছ-বিচার থাকে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা হলো উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচনের নীতি (selective approach)।

কিন্তু নির্বাচন যেন এমন না হয় যে স্বল্পসংখ্যক মেধাক্রম ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে অন্যদের কাছে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশের অর্থনৈতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তির হিসেব অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা, এবং সেই ভিত্তিতে সমসুযোগের নীতিতে ছাত্রদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অনুসারে বাছাই করলে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করা যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়ের সাথে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ হলে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য আনা সম্ভব।

এই সূত্রেই বলতে হয় আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার মৌলিক ত্রুটির কথা। প্রগতিশীল অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়কে অর্থনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়, কারণ শিক্ষার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা এবং জাতীয় আয় বাড়ে। বস্তুতঃ সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে শ্রমশক্তিরও সার্বিক পরিকল্পনা দরকার, এবং সেই ভিত্তিতেই জনশক্তিকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আরও উৎপাদনক্ষম করে তোলা দরকার। সুতরাং শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্বিক "জনশক্তি পরিকল্পনা" হিসেবে গ্রহণ করলে উপযুক্ত "সিলেকসনও" সম্ভব এবং বেকারত্ব ঘোচানোও সম্ভব। কিন্তু "প্রাইভেট সেকটর" অর্থনীতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করলে এইভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব কী?

প্রশ্নাবলী

1. Is religious instruction compatible with National Integration? What is the relation between religious instruction and education in morality? What methods may be adopted for the moral development of children?

2. What are the salient features of the Language problem in school education? Write a note on the 3-language formula of Kothari Commission. How far has West Bengal deviated from that formula?

3. Discuss the question of language in Higher Secondary and University Education.

4. How far is it true to say that the problem of examination is more a socio-economic problem than a pedagogical problem? Apply your practical experience to suggest a solution of the problem.

5. Write a note on student-unrest. Can studeuts' participation in educational administration establish a healthy state of affairs?

6. What is "selective approach" in education? What are the preconditions to pedagogical selection? Explain the concept of man-power planning.

চতুর্থ অধ্যায়

দশ ক্লাস—বারো ক্লাস

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রস্তাব যখন নেওয়া হল, তখন সারা দেশ আলোড়িত হয়েছিল দুটি প্রশ্নে : ১০+২ ব্যবস্থা করা ঠিক কিনা, এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে উচ্চতর মাধ্যমিকের দুটি বছর স্কুলে কিম্বা কলেজে থাকবে ? দুই বছরের ঐ শিক্ষাকে স্কুলে দেওয়ার প্রস্তাব যেমন সমর্থনপুষ্ট ছিল, তেমনি কলেজে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের দাবিও ছিল জোরদার। আলাদা জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও কেউ কেউ বলেছিলেন।

দুটি বছরকে কোথায় রাখা হবে—এই নিয়ে বিতর্কের ঝড় চললো অনেকদিন। বিতর্কের আড়ালে আসল সমস্যাগুলিই প্রায় চাপা পড়বার উপক্রম হল। সাধারণ লোকের কাছে এমন মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক যে দুটি বছরের স্থান নির্ণয়ই যেন একমাত্র সমস্যা। অথচ আসল সমস্যা ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় এবং সেই সাথে ঐ দুটি বছরের স্থান নির্ণয়।

দশ ক্লাস শিক্ষা

সাধারণ মানুষ মনে করেছেন, দশ ক্লাস ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনই প্রস্তাবিত সংস্কারের সার কথা। অনেকেই বিদ্রূপ করে বলেছেন যে ইংরেজ আমলের সেই ম্যাট্রিকুলেশন ব্যবস্থাতেই তো ফিরে যেতে হল ! তবে মাঝখানে কয়েকটা বছর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে গিনিপিগ বানিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিকের "এগার বছরের" পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হল কেন ?

কিন্তু দশ ক্লাসের ব্যবস্থায় ফিরে গেলেও সেই ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষায়ই ফিরে যাওয়া বোঝায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিগত পরিবর্তন যদি করা হয়, তবে স্কুল শিক্ষার সময়কালের দৈর্ঘ্য এক হলেও শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থাটি কিন্তু এক থাকে না।

শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তিনটি উপাদানের প্রভাবে—সমাজদর্শন. রাষ্ট্রদর্শন, এবং শিক্ষাদর্শন। যুগের প্রভাবে এইসব ক্রম-পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিও পরিবর্তিত হয়। যুগ-মানস এবং যুগ-চাহিদা অনুসারেই সৃষ্টি হয় শিক্ষাব্যবস্থা। যুগ বিবর্তনের সাথে সাথে যে শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তিত হয়ে নূতন নূতন চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাই হল

সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা। যুগের পিছনে পঙ্গুর মত যে শিক্ষাব্যবস্থা নিস্প্রাণভাবে চলতে থাকে, তাকেই আমরা ধিক্কার দেই।

এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করা দরকার।

(১) অনেকেই বলেছেন যে উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাটি মাত্র ২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠার সময় ঐ ব্যবস্থাকেই "ভাল" বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ২০ বছর সময়ের মধ্যে ঐ ব্যবস্থাটি "মন্দ" প্রমাণিত হল কি করে ? তা ছাড়া একটি শিক্ষাব্যবস্থার ভাল-মন্দ বিচারের জন্য ২০ বছর সময় যথেষ্ট নয়। উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার সার্থকতার জন্য যা কিছু করণীয় ছিল, তাও করা হয়নি। সর্বোপরি ঐ ব্যবস্থাটি বাতিল করবার মত যথেষ্ট যুক্তি ছাড়াই এবং উপযুক্ত সময় ধরে "ট্রায়াল" দেওয়ার আগেই বাতিল করা হয়।

এই সমালোচনার সূত্রে মাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট যে কোন এক সময় একটি ব্যবস্থাকে ভাল বলা হলেও পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 'মন্দ' বলা যাবে না, এমন হতে পারে না। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে ২০ বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষাই যথেষ্ট। নূতন প্রয়োজনের তাগিদে পুরানো ব্যবস্থা বাতিল করা যাবে না, এমন হতে পারে না। সর্বোপরি অতীতে ভুল হয়ে থাকলেও সেই ভুল সংশোধন করা যাবে না এমন তো নয়ই।

(২) দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনায় অনেকে বলেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থায় উপর্যুপরি পরিবর্তন আনলে অস্থিরতাই সৃষ্টি হবে। সুতরাং ঘন ঘন পরিবর্তন ঠিক নয়।

এই সূত্রে শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও দ্রুততালে বদলানো দরকার। সমাজ-প্রয়োজন এগিয়ে গেলেও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে দুয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়, তার ফলে সমাজের গতিও হয় শ্লথ, শিক্ষারও কোন সামাজিক মূল্য থাকে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হল, সমাজ-প্রয়োজন তথা শিক্ষা-প্রয়োজনকে কিভাবে বিচার করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি

সাম্প্রতিক শিক্ষা চেতনায় পৃথিবীর সবগুলি প্রগতিশীল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে নাগরিক জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এবং **চরম বিশেষজ্ঞতাবর্জিত** "সাধারণ শিক্ষার" স্তর হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আধুনিক নাগরিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হল অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান, কিছু গাণিতিক দক্ষতা, বিজ্ঞান—বিশেষ করে বিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে চেতনা,

দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়, পৌরজীবন যাপনের উপযোগী সামাজিক চেতনা, দেশের উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। শিক্ষার এই পর্যায় **সকলের পক্ষেই সমানভাবে আবশ্যিক**। এই সর্বজনীন সাধারণ ভিত্তির উপরই গড়ে উঠবে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষীকরণের শিক্ষা ও দক্ষতা।

সোজা কথায় বলতে গেলে ১০+২ স্কীমের প্রথম দশ বছরের শিক্ষা হবে সর্বজনীনভাবে সাধারণ এবং অভিন্ন প্রকৃতির। পরবর্তী দুই বছরকে ধরা উচিত উত্তরকালের শিক্ষা কিম্বা কর্মজীবনের জন্য নিজ নিজ জায়গা ও পথ স্থির করবার উদ্দেশ্যে "ওরিয়েন্টেশন" স্তর হিসেবে। বস্তুতঃ ১৮ বছর বয়সের আগে চরম বিশেষীকরণের ব্যবস্থা কোন প্রগতিশীল দেশেই নেই, কারণ আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার যুগে উৎপাদনী দক্ষতার জন্য বিশেষ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে সাধারণ শিক্ষার ভাল কাঠামো দরকার। তাই ১৫।১৬ থেকে ১৭।১৮ বছরের শিক্ষাকালে কিছু কিছু বিশেষীকরণ শুরু করা হলেও সাধারণ শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়।

দশ বছর কালের সাধারণ শিক্ষার পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক সঙ্গতি, সামাজিক অবস্থান এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতা নির্বিশেষে "কমন স্কুল"। সকলের জন্য যে নিম্নতম অভিন্ন জ্ঞান ও সামাজিক দক্ষতা দরকার, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই দশ বছর স্কুলের পাঠক্রম নির্বাচন করতে হবে।

এই স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হলেও সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি। সেই আকাঙ্ক্ষিত সমাজে নিজস্ব ভূমিকা পালন করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীকে তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য। এজন্য তাদের প্রয়োজন হল—(১) প্রাকৃতিক জগৎ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সামাজিক সমস্যাবলীর বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণার জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান। (২) সামাজিক ও আর্থিক জীবনের জন্য নিম্নতম দক্ষতা। (৩) নিজেকে এবং সমাজকে কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত করবার জন্য সার্থক বিজ্ঞান-চেতনা। (৪) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের জীবনে সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন উৎপাদনী কাজে অংশ নেওয়ার মত মানসিকতা তৈরী করা। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষাপর্বে এইসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পড়া ও পড়ানোর কাজ চালাতে হবে।

আমাদের দেশে ১৪ বছর বয়স অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা পর্যন্ত সর্বজনীন ব্যবস্থার আশু লক্ষ্য রয়েছে, যদিও কাজের ক্ষেত্রে ঐ লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে।

একথাও ঠিক অষ্টম শ্রেণীর পরে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সাধারণ পড়াশুনা ছেড়ে দেয় কিম্বা কোন বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে চাকুরির চেষ্টা করে। তাদের বেলাতেও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বাকি বছরগুলিতে বৃত্তিশিক্ষার সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষাও অব্যাহত রাখতে হবে, নইলে তাদের বৃত্তিশিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ। একথার উল্টোদিকও আছে। যেহেতু অষ্টম শ্রেণীর পরে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে বৃত্তিশিক্ষায় যোগ দেবে সেহেতু নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষাকেই বৃত্তি-দক্ষতার দৃষ্টিতে দেখা হোক, একথাও ঠিক নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেষীকরণের যে পথই নির্বাচন করা হোক, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন)।

অবশ্য একথাও ঠিক যে কাজ ও কথা অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা ও উৎপাদনী শিক্ষার মধ্যে যে ব্যবধান দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, এমনকি স্কুলস্তরেও যে ব্যবধান পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই ব্যবধানটিও দূর করতে হবে। উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও হাতের দ্বৈততা যেমন ভাঙ্গবে, তেমনি ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে তাদের শিক্ষার সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপাদনী মূল্য আছে, এবং তাদেরও আছে যথেষ্ট গুণ এবং সামাজিক মূল্য।

পাঠক্রম

সুতরাং উৎপাদনী শিক্ষার স্পর্শ সমেত নিম্নমাধ্যমিক স্তরের অভিন্ন সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমে থাকা উচিত—(১) এক কিম্বা একাধিক ভাষা; (২) গণিত; (৩) বিজ্ঞান [(ক) প্রকৃতি বিজ্ঞান—পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন; (খ) জীব-বিজ্ঞান], (৪) সমাজ বিজ্ঞান [(ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল—প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ পাঠসহ, (গ) অর্থনীতি ও পৌরনীতির সরলীকৃত পাঠ]; (৫) সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপাদনী কাজ; (৬) শারীর শিক্ষা; (৭) নান্দনিক শিক্ষা (aesthetic education) এবং (৮) বিচিত্রধর্মী সমপাঠ্যমূলক কাজ।

ভাষার প্রশ্নে বলা দরকার যে, স্কুল স্তরের সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষাই (কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা) হওয়া উচিত অবিসম্বাদিত ভাবে শিক্ষার প্রথম ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। কোনও অঞ্চলের মধ্যে সুগঠিত কোন ভাষা গ্রুপ থাকলে এবং সেই ভাষাটি যথেষ্ট উপযুক্ত হলে সেই ভাষাভাষিদের জন্য তাদের ভাষাকেও প্রথম ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেওয়া উচিত।

মাতৃভাষা সম্বন্ধে যেক্ষেত্রে বলা চলে "অবশ্য", যে কোন দ্বিতীয় ভাষা সম্বন্ধে সেক্ষেত্রে বলা চলে "উচিত", যেহেতু একাধিক ভাষার চর্চা যেমন জ্ঞানের পরিধি

বাড়াতে সাহায্য করে, তেমনি পারস্পরিক পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা (link language) হিসেবে নামাঙ্কিত **কোন ভাষাকেই চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়,** কারণ এখনও পর্যন্ত সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা বলতে একবাক্যে গ্রহণীয় ভারতে কিছুই নেই। (ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে পরিচিত ভাষা, বৃহত্তর জনতার মধ্যে সংযোগকারী ভাষা নয়। তেমনি হিন্দীও আজ পর্যন্ত সারা ভারতে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত সংযোগকারী ভাষা হয়নি)। বস্তুতঃ ভাষার প্রশ্নটি কেবল শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক এবং আর্থিক জীবনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিক বিকাশের ধারার স্বেচ্ছাগ্রহণের পথেই ভাষা সমস্যার সমাধান দরকার। একটি দ্বিতীয় ভাষা রাখা দরকার, এ বিষয়ে হয়তো মতদ্বৈধ নেই। দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী ভাষার মধ্যে স্বেচ্ছা নির্বাচনই দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার উপর সমগুরুত্ব দেওয়াও ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে গুরুত্বের হার হওয়া উচিত ২ : ১। (এ বিষয়ে অন্যান্য অগ্রবর্তী দেশের উদাহরণ আমাদের কাজে লাগবে)।

এই সূত্রেই প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃতের দাবি সম্বন্ধে। সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠ্য করবার দাবি যাঁরা করেন, তাঁদের যুক্তি এই যে সংস্কৃতই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের জন্য সংস্কৃত পড়া দরকার আবশ্যিকভাবে।

এই প্রস্তাবের যাঁরা বিরোধী তাঁদের যুক্তি হল যে কোন একটি ভাষাই মাত্র একটা সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক নয়। জীবনের সাথে জড়িত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মিশে থাকে শিল্প, কলা, ভাস্কর্য এবং আরও নানা মাধ্যমে। বর্তমান ইউরোপে যদি গ্রীক ও ল্যাটিন আবশ্যিকভাবে না পড়েও ছেলেমেয়েরা তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হারিয়ে না থাকে, তবে ভারতের ছেলেমেয়েরাই হারাবে, এমন কথা নয়। সুতরাং অন্যতম ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবেই সংস্কৃতের স্থান হওয়া উচিত। তবে স্নাতকোত্তর স্তরে যারা বাংলা কিম্বা সমগোষ্ঠীর ভাষা পড়বেন, তাঁদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের জ্ঞানকে বেশী মূল্য দেওয়া উচিত, যেমন—চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভর্তির জন্য দেওয়া হয় জীববিজ্ঞান কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির বেলায় দেওয়া হয় পদার্থবিদ্যা ও গণিতের উপর। (মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাসে সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবেই রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই অন্য কোনও ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত পড়তে হবে। সুতরাং প্রকারান্তরে এখানে সংস্কৃত হল অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আবশ্যিক। তার ফলে পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীকে আবশ্যিকভাবেই তিনটি নির্দিষ্ট ভাষা পড়তে হচ্ছে।)

নব-প্রবর্তিত পাঠক্রম

ভাষা নির্বাচন সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪ সন থেকে প্রবর্তিত দশ ক্লাস স্কুলের পাঠক্রম উপস্থিত করা চলে।

১। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে রয়েছে—(ক) প্রথম ও (খ) দ্বিতীয় ভাষা, (গ) গণিত, (ঘ) জীবনবিজ্ঞান, (ঙ) ইতিহাস, (চ) ভূগোল, (ছ) কর্ম শিক্ষা, সমাজসেবা, শারীর শিক্ষা। প্রতিটি পত্রে ১০০ নম্বর হিসেবে ৭০০ নম্বরের পরীক্ষার ভিত্তিতে পাঠক্রম।

২। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমে রয়েছে (ক) প্রথম, (খ) দ্বিতীয় এবং (গ) তৃতীয় ভাষা। [তৃতীয় ভাষাটি হবে একটি প্রাচীন ভাষা কিম্বা একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা, কিম্বা প্রথম ভাষা ছাড়া অন্য যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যারা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করেনি তাদের জন্য বাংলা ভাষা। শেষোক্ত বিকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীদের কাছে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা গ্রহণীয় হয়েছে], (ঘ) গণিত, (ঙ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (চ) জীবন বিজ্ঞান, (ছ) ইতিহাস, (জ) ভূগোল (ঝ) কর্মশিক্ষা ইত্যাদি। সুতরাং এই স্তরে চালু করা হয়েছে প্রতি পত্রে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে ৯০০ নম্বরের পাঠক্রম।

৩। নবম ও দশম শ্রেণী অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমে রয়েছে ৮টি বিষয়ের আবশ্যিক এবং একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের পড়া। বিস্তৃত তালিকাটি হল—(ক) দুইটি পত্রের প্রথম ভাষা [যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা কিম্বা ইংরেজী], (খ) একটি পত্রের দ্বিতীয় ভাষা (বাংলা কিম্বা ইংরেজী), (গ) এক পত্রের একটি তৃতীয় ভাষা [প্রাচীন ভাষা, আধুনিক বিদেশী ভাষা, প্রথম ভাষা ছাড়া অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় গ্রুপের মধ্যে যে কোন গ্রুপ থেকে একটি নির্বাচন করা চলবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে যাদের বাংলা থাকবে না, তাদের জন্য বাংলাই হবে তৃতীয় ভাষা], (ঘ) গণিত, (ঙ) প্রকৃতি বিজ্ঞান, (চ) জীবন বিজ্ঞান, (ছ) ইতিহাস (জ) ভূগোল, (ঝ) কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি। সুতরাং আবশ্যিক পাঠ্য হল ১০০০ নম্বরের পরিমাপে ৯টি বিষয়।

এছাড়া ঐচ্ছিক ভিত্তিতে একটি অতিরিক্ত বিষয় পড়া চলবে। ঐচ্ছিক বিষয়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(ক) তত্ত্বমূলক বিষয় (এ্যাকাডেমিক) এবং (খ) বৃত্তিমূলক বিষয়। দুটি শ্রেণীর অন্তর্গত তালিকাবদ্ধ বহু বিষয়ের মধ্য থেকে যে কো একটি গ্রহণ করবার স্বাধীনতা ছাত্রছাত্রীর থাকবে। (কিন্তু সব স্কুলে সব বিষ পড়ানোর ব্যবস্থাও থাকবেনা। প্রতিটি স্কুলই একটি দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং কাগজে কলমে বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকলেও বাস্তবে সেই সুযোগ হবে খুবই সংকুচিত।

পাঠ্যক্রমের সমালোচনা

অনেক বাবা-মাকেই বলতে শোনা যায় যে অনেকগুলি বিষয় এবং বইয়ের বোঝার নীচে ছেলেমেয়েরা চাপা পড়ছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে জ্ঞান জগতের গভীরতা, জটিলতা এবং পরিধি অনবরতই বাড়ছে। যতটুকু সাধারণ জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে নাগরিক জীবন যাপন করা চলতো, আজ আর তেমন চলে না। তা ছাড়া আমাদের শিশুরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিশুদের চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট নয়। রাশিয়ায় দশক্লাস স্কুলে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকা থেকেই বোঝা যায় যে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঐসব দেশে কত ব্যাপকভাবে বিচার করা হয়। (এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৩—৬৪ পৃষ্ঠায় তালিকাটি দ্রষ্টব্য)।

এ ক্ষেত্রে সমস্যা হল পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণকে বাদ দিয়ে জ্ঞাতব্য বস্তুকে ছিমছাম করে নেওয়া (ইংরেজীতে যাকে বলে rationalisation) এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পড়ানো। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পুরাতনের পেছুটান আমাদের চিন্তা ও কাজকে ব্যাহত করছে। বিষয়বস্তুর বিবরণধর্মী বিস্তারের ঝোঁকই আমাদের পাঠ্যবস্তুকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলিই এক্ষেত্রে বিশেষ উদাহরণ।

নূতন পাঠক্রমে আবশ্যিক-ঐচ্ছিক (Core-periphery) ব্যবধান না রাখাও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা কর্মজীবন—যেখানেই ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিকোত্তর পবে প্রবেশ করুক, নিম্নতম সাধারণ শিক্ষার পুঁজি নিয়েই সকলকে যেতে হবে। সুতরাং অভিন্ন এবং সকলের পক্ষে আবশ্যিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও সাম্প্রতিক মতবাদে সমর্থিত।

স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও **মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্তন** প্রশংসনীয়। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষা, কর্মশিক্ষা ইত্যাদির নম্বর সম্পর্কে স্কুলে ক্রমিকভাবে পর্যায়ক্রমে তথ্য সংরক্ষণ এবং ফাইনাল পরীক্ষায় ঐ তথ্যকেও বিবেচনা করার প্রস্তাবও নূতনত্বের পরিচায়ক। বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালীদের পক্ষে বাংলা পড়বার ব্যবস্থা করাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু পাঠ্যবিষয়ের তালিকাটি একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে **ভাষা**

শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলকে "ভারত ও ভারতবাসী" নামে আখ্যা দিয়েও মানসিকতাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে, কারণ ভারতের ইতিহাস পড়তে গেলে ভারতবাসীরই ইতিহাস পড়তে হবে। আর 'ভারত ও ভারতবাসী' আখ্যা দিয়ে বহির্বিশ্বকে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবন বিজ্ঞানকে যেমন "বিজ্ঞান" বিভাগের অন্তর্গত করে দেখানো হয়েছে, এখানেও তেমনি ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদিকে "সমাজ বিজ্ঞান" বিভাগের অন্তর্গত রূপে বিচার করলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত হত। তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা ভারতকে জানবে, কিন্তু ভারতের আর্থিক পরিবেশ জানবার জন্য অর্থবিজ্ঞানের কিছুই পড়বে না, এমনও ঠিক নয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের সমাজ-জিজ্ঞাসাই ভোঁতা হয়ে পড়বে।

কর্মশিক্ষা-সমাজসেবার বিষয়টি বিশেষ আলোচনার বিষয়। শারীর শিক্ষার বিশেষ মূল্য এবং দরকার আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে শারীরশিক্ষাকে পরীক্ষার বিষয় করতে হবে, এমনও কথা নয়। স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থায় শহরাঞ্চলে কোন জমি-জায়গাই নেই, গ্রামাঞ্চলে জমি থাকলেও কোন উপকরণ নেই। ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি, শিক্ষক কিম্বা জিমনাসিয়ামের বন্দোবস্ত প্রায় নেই বললেই হয়। উপযুক্ত পরিবেশ, উপকরণের যোগান, শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়া রাতারাতি বিষয়টিকে পরীক্ষাধীন করায় দায়-সারা কাজই হতে বাধ্য। সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো ভালবাসে। সেই প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিয়েই পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। সর্বোপরি বলা দরকার যে শারীরশিক্ষার প্রশ্নটি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে জড়িত। আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ জীবনযাত্রার নিম্নতম মানেরও নীচে জীবন নির্বাহ করে। তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়ে অর্ধভুক্ত অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে হাজির হয়। সুতরাং সাধারণ স্কুল-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সাথে স্কুল টিফিন কিম্বা মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হলে শারীরশিক্ষার কার্যক্রম সফল হতে পারে।

সমষ্টি মানুষ এবং সমাজের কাছে ব্যক্তি মানুষ ঋণী—এই চেতনা জাগানোর মধ্য দিয়ে এবং বাস্তব জীবনধারার মধ্য দিয়েই সমাজীকরণ সম্ভব। গণতান্ত্রিক সমাজীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজসেবার প্রকল্প নেওয়া দরকার। কোন অনুকম্পার দৃষ্টিতে "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার মনোভাব নিয়ে সমাজসেবার কাজে এগোলে মূল আদর্শই পণ্ড হবে। তবে স্থানীয় পৌর জীবনের নিত্যকার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেও সমাজসেবার স্বাদ কিছুটা পাওয়া সম্ভব।

"কর্মশিক্ষা" সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়েই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা পরিষ্কার হবে।

কর্মশিক্ষা

তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় চেতনা সাম্প্রতিককালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা চেতনা। পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী চেষ্টা এ ক্ষেত্রে হচ্ছে। তবে আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুসারে ঐ চেষ্টার প্রকৃতিগত তারতম্যও হচ্ছে। কোথাও "শ্রমের মর্যাদা", কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষার "বৃত্তিমুখিনতা" (vocational orientation), কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষার "বৃত্তিগতকরণ" (vocationalisation) নামে নানাধরনের শিক্ষা প্রচেষ্টা চলছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই চেষ্টাটি চলেছে "**পলিটেকনাইজেশন**" (Polytechnisation) নামে।

সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ। অবসরভোগী শ্রেণীর অবসান করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা। প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকই কোন না কোন ক্ষেত্রে একজন উৎপাদক। বস্তুতঃ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষ হিসেবে প্রয়োজনীয় মানসিকতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীকে বড় করে তোলা যেমন সোভিয়েত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তেমনি উৎপাদনী শ্রমের মানবিক পুঁজি এবং উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করাও সোভিয়েত শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য। উৎপাদন প্রথার সাথে পরিচয় ঘটলে এবং সাধ্যমত উৎপাদনী কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে শ্রমের মর্যাদা বোধ জন্মে, এই প্রত্যয় জন্মে যে মানুষের শ্রমই সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং এমন দক্ষতা জন্মে যা নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা সহ উৎপাদনী জগতে অংশ গ্রহণ করা যায়।

উৎপাদনী শ্রমের এই ভূমিকা আয়ত্ত করা সম্ভব যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে *ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগের অভ্যাস আয়ত্ত করা যায়।* জীবনের স্তরভেদে এই অভিজ্ঞতা চলতে থাকে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক কাজ সম্পূর্ণ সাঙ্গীকৃত হয়ে যায়। এই চেতনাটিই পলিটেকনাইজেশন তত্ত্বের মূল কথা।

সোভিয়েত রাশিয়ায় **প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকেই** শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চেতনা পরিব্যাপ্ত। এই স্তরের বিশেষ লক্ষ্য হল কাগজ কাটা, মাটির কাজ, এমনি আরও নানান ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে "কাজ" সম্বন্ধে শিশুদের আগ্রহ বাড়ানো এবং হাত, পা, চোখের জড়তা কাটিয়ে কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করা। এই স্তরের শিক্ষায় সৃজনমূলক "কাজই' বড় কথা, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বড় নয়।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মনে নানা সমাজ-রহস্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে। বাজারে দোকানে যে সব জিনিস বিক্রি হয়, সেগুলি কোথা থেকে আসে, কে তৈরী করে, কিভাবে এবং কি দিয়ে তৈরী করে—এসব প্রশ্ন তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে। সুতরাং পলিটেকনাইজেশন কার্যক্রমে এই স্তরের প্রোগ্রাম হল বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া, উৎপাদন প্রথা এবং বণ্টন প্রথার সাথে পরিচিত হওয়া। এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ক্লাসের পড়া এবং পাঠ্য বই থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় শিশু যা দেখছে, বইপত্রেও তাই জানতে পারছে। **পুঁথিগত বিদ্যা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগের সম্পূর্ণ সংহতিই পলিটেকনাইজেশনের মর্মকথা।**

তৃতীয় স্তরে, অর্থাৎ **নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে** ছেলেমেয়েরা গায়ে পায়ে আরও বড় হয়ে ওঠে, বুদ্ধি এবং অনুসন্ধিৎসাও বাড়ে, সর্বোপরি হাতে কলমে কিছু করবার জন্য টগবগ করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ছেলেমেয়েদের এই সময় সুযোগ করে দেওয়া হয় স্কুল ওয়ার্কসপ কিম্বা স্কুল খামারে। লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হয় উৎপাদনী হাতের কাজ। শিক্ষকদের মধ্যেও সম্পৃক্ত হয় দুই ধরনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শিক্ষণকালে যে কোন একটি উৎপাদনী কাজ কিম্বা যন্ত্রবিদ্যার সাথে পরিচিত হওয়া শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক অঙ্গ।

মাধ্যমিক স্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শুধু স্কুল ওয়ার্কসপে নয়, বাস্তবভাবে সাধারণ কলকারখানা এবং কৃষি-খামারে উৎপাদনী কাজে অংশ নিতে হয়। বছরের মধ্যে এক কিম্বা একাধিক দফায় স্কুলের দেয়ালের বাইরে বৃহত্তর উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের জগতে প্রকৃত উৎপাদক হিসেবে অভিজ্ঞতা নেয়। বীজবপন এবং শস্য আহরণের মরশুমে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় কৃষি-কাজে, খামার বাড়ীতেই শিবির স্থাপন করে। কর্মক্ষেত্রেই চলে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা কিম্বা প্রবীণ শ্রমিক-কৃষকের "লেকচার"। এইভাবে কাজের অভিজ্ঞতা সমগ্র শিক্ষাক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শিক্ষাকে সমাজধর্মী এবং উৎপাদনধর্মী করে তোলে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় যে জিনিসটি যেমনভাবে সম্ভব, আমাদের দেশে তেমনটি সম্ভব নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক জীবন, অর্থনীতি এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সাথে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের পার্থক্যই এর কারণ। সেখানে সমস্ত উৎপাদনী কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং সামাজিক উদ্যোগে। কলেকারখানায় কাজ করে ছেলেমেয়েরা যদি কাঁচামালের অপচয় করে, তবুও কোন ব্যক্তিগত মালিকানার "ক্ষতিপূরণের" প্রশ্ন নেই। সেখানে পড়া এবং

কাজকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে পলিটেকনাইজেশন কার্যক্রমে। আমাদের এখানে এখনও পড়া ও কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সুতরাং রাশিয়া, চীন কিম্বা পূর্ব জার্মানী ইত্যাদির মত পলিটেকনাইজেশন কার্যক্রমের বাস্তব পরিবেশও আমাদের নেই।

কোঠারি কমিশনের "কর্ম-অভিজ্ঞতা"

কোঠারি কমিশন বিষয়টির অবতারণা করেছেন **"কর্ম-অভিজ্ঞতা"** (Work Experience) নামে। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের একটি বিস্তৃত তালিকাও দেওয়া হয়েছিল ঐ কমিশনের রিপোর্টে। সর্বোপরি কমিশন জোর দিয়ে বলেছেন যে কর্ম-অভিজ্ঞতার দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে, পিছনের দিকে নয়, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় অর্থনীতি এবং কুটির শিল্পের বদলে বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবে। কারিগরি জগতের সাথে পরিচিত হবে।

কমিশন একথাও বলেছিলেন যে দীর্ঘদিনের পুঁথিগত তাত্ত্বিক শিক্ষার মোহ ছেড়ে রাতারাতিই আমরা কর্ম অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকবো, এমন আশা করা যায় না। সুতরাং এই কার্যক্রম চালু করার পূর্বশর্ত হলো—(১) অভিভাবকদের মানসিক প্রস্তুতি। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী গণসংযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সদ্ব্যবহার দরকার। উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী হলে ধনতান্ত্রিক পরিবেশ ও আবেষ্টনীর মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। (২) দ্বিতীয় প্রয়োজন হল শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণ। পুঁথিগত শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, এবং আলাদাভাবে কর্ম অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষজ্ঞ "ট্রেনার" তৈরীর বদলে শিক্ষক-ট্রেনার তৈরী করাই হবে কাম্য। (৩) কোন্ কোন্ ধরনের কাজে নিশ্চিত এবং আশু ফলপ্রসূতা রয়েছে এবং স্কুল পরিবেশে কোন্ কাজ কতটা গ্রহণীয় এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা এবং নিরীক্ষা দরকার। (৪) প্রতি স্কুল কিম্বা স্কুল-গুচ্ছের জন্য শহরাঞ্চলে ওয়ার্কসপ এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি দরকার। আর দরকার উপকরণ কিনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ। **এই পূর্ব-শর্তগুলি পূরণ করে ক্রমিকপর্যায়ে কর্ম-অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ করা উচিত।**

পশ্চিমবঙ্গের "কর্মশিক্ষা"

কিন্তু উপরোক্ত শর্তগুলি পূরণ না করেই এবং যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রোগ্রামকে "কর্মশিক্ষা" নামে চালু করা তো হয়েছেই, বাধ্যতামূলকভাবে

পরীক্ষার বিষয়ও করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসারকে এইভাবে উপস্থিত করা চলে—"সুষ্ঠু সমাজজীবনের জন্য দরকার সামাজিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী দক্ষতা। সামাজিক দক্ষতা বলতে বোঝায় সহযোগিতামূলক সমাজে যৌথ-জীবন যাপনের ক্ষমতা। উৎপাদনী দক্ষতা বলতে বোঝায় সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে দরকারী জিনিস উৎপাদনের ক্ষমতা। বইয়ের বিদ্যায় যে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব, কাজের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তব করে তোলাই কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। কাজ করতে শেখা, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা, কাজের জগতে যা কিছু জানবার আছে সেই বিষয়গুলি জানতে শেখাই কর্মশিক্ষা। শিক্ষা ও কাজের সমন্বয়ই কর্মশিক্ষা।

সামাজিক জীবনে যে সব উৎপাদনী কাজ চলে, সমাজজীবনে যার মূল্য আছে, সেগুলির সাথে পরিচয়ের সূত্রে এবং সেইসব কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে সমাজ-চেতনা; শ্রমের মর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব। কাজ করার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে কর্মজগতে প্রবেশ করবার মত দক্ষতা এবং মানসিকতা লাভ করা সম্ভব।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পত্র-পত্রিকায়ই বলা হয়েছে যে রাতারাতি সব ছেলেমেয়ে সুদক্ষ উৎপাদক হয়ে উঠবে, এমন নয়। কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কলকারখানা, জমি-খামার, ব্যাঙ্ক, যানবাহন, সংবাদ-ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হলে সত্যিকারের কাজের আগ্রহ আসবে, মনের প্রসারতা আসবে, যারা কাজ করছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে। নবম-দশম শ্রেণীতে তারা অপেক্ষাকৃত জটিল কাজে অংশ নিতে পারবে।

তত্ত্ব হিসেবে এই বক্তব্যগুলি সুখপাঠ্য হলেও কর্মশিক্ষার যে বাস্তব প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ফলে উপরোক্ত তত্ত্বই হারিয়ে যাবে। (১) বলা হল—"বইতে যা পড়বে, কাজে তার সত্যতা যাচাই করবে এবং কাজটি শিখবে"। কিন্তু কর্মশিক্ষা প্রকল্পের পটভূমিতে পাঠ্য বইগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে বইতে পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত কাজগুলির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কর্মশিক্ষার অর্থ দাঁড়াবে সপ্তাহে দু'-একটি ঘণ্টার জন্য যেমন তেমন কিছু কাজ করা। অর্থাৎ বইয়ের বিদ্যা এবং হাতের কাজের মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধানটি থেকেই যাবে। (২) কোঠারি রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কারিগরির সাথে সম্পৃক্ত করেই কর্ম-অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করা হবে। কিন্তু বাস্তব

ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক স্কুলেই যেসব "কাজ" চালু করা হয়েছে, তার সাথে আধুনিক শিল্প-কারিগরির কোন সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত কাজগুলি ভবিষ্যত-মুখী না হয়ে পশ্চাৎমুখীই হয়েছে। (৩) গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি হয়তো জমি-বাগান করে কাজের হিসেব রাখতে পারছে, শহরে অনেক ক্ষেত্রেই টবের ফুলগাছই হয়েছে কর্মশিক্ষার উৎপাদনী দিক। এই ধরনের কাজের সাথে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। (৪) মেয়েদের স্কুলে সেলাই, উলের কাজ ইত্যাদিই হচ্ছে কর্ম-শিক্ষার ক্ষেত্র। কিন্তু এগুলি মেয়েদের শিক্ষায় প্রচলিত ছিল যুগ যুগ ধরে, উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় "ক্রাফ্ট" শিক্ষাতেও চালু ছিল। তবে আর নূতনত্ব এল কোথায়? (৫) কলকাতার মত শহরাঞ্চলের কোন কোন ধনী স্কুল জীবন-বিজ্ঞান কিম্বা অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ কাজের যোগান দিতে পেরেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছোট-খাট যান্ত্রিক বিষয় কিম্বা কারিগরিতেও ছেলেমেয়েরা অংশ নিতে পারছে। কিন্তু এমন ভাগ্য রয়েছে শতকরা দুটি স্কুলেরও নয়। গ্রাম-শহরের অসংখ্য স্কুলেই যে কোন ধরনের দায়সারা "কাজ" করিয়ে কিম্বা কাজের "রেকর্ড তৈরী করে" দায়িত্ব শেষ হচ্ছে।

বুনিয়াদি শিক্ষায় বলা হয়েছিল "উৎপাদন কেন্দ্রিক" শিক্ষার কথা—যেখানে উৎপাদনী কাজকে অবলম্বন করেই জ্ঞানজগৎ তৈরী হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সংশোধন করে "কর্মকেন্দ্রিক" করবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে না হল উৎপাদনকেন্দ্রিক, না হল প্রকৃতপক্ষে কর্মকেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রের মরুভূমিতে বুনিয়াদি শিক্ষার স্রোতটি শুকিয়ে গেল। বর্তমানে যে ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হল তার সাথে বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য আছে। কিন্তু যেভাবে এই প্রকল্প কার্যকর হতে যাচ্ছে, তার ফলে পার্থক্যটিও ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং আমূল সংস্কার না করলে কর্মশিক্ষা প্রকল্পও শুকিয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় অচিরেই হয়তো সমস্ত ব্যবস্থাটি "পুনর্বিবেচনার" দরকার হবে।

সমাজসেবা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের যে প্রস্তাব ছিল, বাস্তব প্রয়োগের বেলায় প্রকল্প কিন্তু সেখান থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। কোন এক নির্ধারিত দিনে গ্রামের একটি রাস্তার পাশের আগাছা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়েই সমাজীকরণ হয় না একথা বুঝতেই হবে।

কর্মশিক্ষা নামেই হোক, কর্ম-অভিজ্ঞতা নামেই হোক, **উৎপাদনী কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যিকভাবেই দরকার। তেমনি দরকার সমাজসেবা কিম্বা শারীরশিক্ষা।** কিন্তু যা করা হবে, তা যেন উদ্দেশ্যকে সত্যিই পূরণ করে। উদ্দেশ্য

প্রয়োজন এবং ফলপ্রসূতা বিচার করে সবগুলি প্রকল্পকে নূতনভাবে দেখবার দরকার হলে ত' করতেই হবে।

মূল্যায়ন

নূতন দশ বছরের শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যেই দু'বছর বয়স পূরণ করেছে। সার্বিক মূল্যায়নের সময় এখনও হয়নি। তবে সাধারণভাবে কিছুটা বিচার করা সম্ভব।

কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষা (নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে) রূপে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সেখান থেকে **বিচ্যুতি হয়েছে।** আগেকার মতই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম-দশম শ্রেণীর দুটি পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করা হয়েছে। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীও প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বস্তুতঃ পঞ্চম শ্রেণীটি 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। এখনও আইনের দৃষ্টিতে এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্তই প্রাথমিক শিক্ষা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষাপর্ষৎ নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক শিক্ষা।

পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে কিছু বিচ্যুতি। প্রথমতঃ ভাষার ক্ষেত্রে (যেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে) ; দ্বিতীয়তঃ কর্মশিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্বন্ধে, তৃতীয়তঃ নান্দনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। কোঠারি রিপোর্টে এবং 'শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় পর্ষদের' অভিমতে নান্দনিক শিক্ষার কার্যক্রমকে যে মূল্য দেওয়া হয়েছিল, এখানে তেমনটি হয়নি।

কিন্তু ইতিবাচক দিকও যথেষ্ট আছে। সাধারণ শিক্ষার অভিন্ন পাঠক্রম অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষাকাল দশ বছর হলেও পাঠক্রমের বিচারে **বর্তমানের মাধ্যমিক আর পুরানো ম্যাট্রি-কুলেশনে কিম্বা স্কুলফাইনালে পার্থক্য অনেক।** আগেকার ম্যাট্রিক স্তরে আবশ্যিক পাঠ্য ছিল ইংরেজী, বাংলা, গণিত, প্রাচীন ভাষা। এছাড়া দুটি পত্র ছিল ঐচ্ছিক। স্বাধীনতার পরে স্কুল ফাইনাল শিক্ষায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কখনো ইতিহাস ভূগোল হয়েছে আবশ্যিক, মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (গণিত ছাড়া) ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানের পাঠক্রমে ছেলেমেয়ে সবার জন্যই সবগুলি বিষয়ই আবশ্যিক এবং সাধারণ। ঐচ্ছিক নির্বাচনের সুযোগ থাকবে কেবল অতিরিক্ত পাঠে।

মৌখিক পরীক্ষা, ক্রমিক মূল্যায়ন, প্রশ্ন রচনার ধারা (যদিও পর্ষদ প্রচারিত নমুনা প্রশ্নাবলীর মধ্যেই অনেক ত্রুটি রয়েছে) এবং পরীক্ষায় গ্রুপ ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে কিছু নূতনত্ব আনা হয়েছে। হয়তো কিছু ভাল ফলশ্রুতি সম্ভব। কিন্তু আজও পর্যন্ত

প্রয়োগের স্তর থেকে নূতন ব্যবস্থাটি অতিক্রান্ত নয়। সুতরাং চূড়ান্ত ফলশ্রুতির বিচার সম্ভব আরও উত্তরকালে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর কথা

১২ বছরের স্কুল শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবনার সূচনা হয়েছিল স্যাডলার কমিশনের যুগ থেকেই। কমিশন সুপারিশ করেছিলেন (ক) ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা। (খ) এই ১২ বছরের শেষ দুটি বছরকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায় হিসেবে গণ্য করা, (গ) ইণ্টার-মিডিয়েটের শেষ সীমানাই হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বসর্ত। (ঘ) ইণ্টারমিডিয়েটের দুটি বছরে পাঠ্যক্রমে থাকবে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের পক্ষে উপযোগী পাঠ্যবিষয়। (ঙ) ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতর স্তর হিসেবেই বিচার করতে হবে। (চ) এজন্য আলাদা মাধ্যমিক ও ইণ্টার বোর্ড গড়তে হবে প্রশাসনের জন্য। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনিবেশ করবার সুযোগ থাকবে। (ছ) তবে কমিশন চেয়েছিলেন আলাদা দু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ।

এর পরে হার্টগ কমিটি যদিও পরিষ্কার করে বলেননি, তবুও মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেন। সপ্রু কমিটিও দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেন। সার্জেণ্ট কমিটি বলেছিলেন ১১-১৭ বছরের জন্য একটানা মাধ্যমিক শিক্ষা। **মাধ্যমিক স্কুল হবে দু'রকমের।** এক ধরনের স্কুলে থাকবে মূলতঃ মানবিক ও তাত্ত্বিক বিষয়। অন্য ধরনের স্কুলে থাকবে প্রয়োগ বিদ্যা, বৃত্তিগত শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, গৃহবিজ্ঞান। **কমিটি ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে স্কুল শিক্ষাকেই দীর্ঘতর করবার কথা বলেন।** সর্বশেষে মুদালিয়র স্কীমে আর ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের প্রশ্নই রইলনা। মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টে ১২ বছরের স্কুল শিক্ষাই ছিল সুপারিশ। তবুও পরিণামে প্রবর্তিত হয় ১১ বছরের স্কুল শিক্ষা এবং বহুমুখী পাঠ্যক্রম।

দশ ক্লাসের পরবর্তী দুবছরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ছিল— (১) এই দু'বছরের শিক্ষাও হবে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার অগ্রবর্তী স্তর। তাই নামকরণ হল উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। (২) পাঠ্যক্রম হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষার দৃষ্টিতে অর্থাৎ উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষাই হবে পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে ঝোঁক থাকবে। **কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিশেষীকরণের** শিক্ষা হবে না। সুতরাং আগেকার হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থার মত প্রবাহ বিভাগ (Stream division) থাকবে না। (৩) হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থার টেকনিক্যাল, বাণিজ্য, গৃহ

বিজ্ঞান, চারুকলা এবং কৃষি প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়ের পড়া হবে পলিটেকনিক ধরনের বিদ্যালয়ে। সুতরাং ১১-১২ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা হবে মূলতঃ মানবিক বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের সাধারণ শিক্ষা। (৪) পাঠ্যক্রমে থাকবে দুটি আবশ্যিক ভাষা (একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা); তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়। বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের একটি তালিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছেমত বাছাই করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে আর্টস ও সায়েন্সের বৈষম্য থাকবে না। সুতরাং কলা বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান বিষয়কেও নেওয়া চলবে। মেয়েদের জন্য কোন আলাদা পাঠ্যক্রম থাকবেনা। তবে গৃহবিজ্ঞান, সঙ্গীত, চারুকলা ইত্যাদি থাকবে ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকায়। এই স্তরে কর্মঅভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে হবে ক্ষেত খামার এবং কল কারখানায় প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যে। সমাজ সেবার জন্য থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরের ব্যবস্থা। সর্বোপরি "সাধারণ" (অর্ডিনারী) এবং 'অগ্রবর্তী' (এ্যাডভান্সড্) স্তরে পড়া চলবে। তা ছাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের সমপর্যায়ে এবং সমান্তরাল ভাবে থাকবে বিকল্প কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম।

কোঠারি কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পরে দীর্ঘ আলোচনার শেষে এই দুটি বছরকে "স্কুল শিক্ষা" হিসেবেই বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অভিন্নভাবে ১০+২ স্কীম প্রবর্তন করার। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক রাজ্যেই ইতিমধ্যে বিচ্যুতি ঘটেছে। কোন কোন রাজ্যে এখনও ইণ্টারমিডিয়েট ব্যবস্থাই চলেছে। কোন কোন রাজ্যে আবার এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে দু'বছরের করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ থাকা সত্ত্বেও একটি **আলাদা কাউন্সিল গঠন করে দুটি স্তরকে আলাদা হিসেবেই বিচার করা হয়েছে**। এই দু'বছরের শিক্ষার প্রকৃতি কি হবে, সে বিষয়টিই এখনও পরিচ্ছন্ন নয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দুটি বছরের শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করা চলে:—

দুটি বছরের প্রস্তাবিত শিক্ষাকে **কেউ কেউ আমেরিকার কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের শিক্ষার সাথে তুলনা করেন**। কম্প্রিহেনসিভ শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবিষয়গুলি আবশ্যিক (Solid) এবং ঐচ্ছিক (Elective) বিভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে কেবল ভাষা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও আছে; আর ঐচ্ছিক বিষয়ের দীর্ঘ তালিকায় মানবিক ও বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়াও বৃত্তি ও পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে। কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে এই স্তরটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর চারবছরের। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিও টার্মিনাল ধরনের। সুতরাং

প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের শিক্ষার সাথে তুলনা করা যায় না।

অনেকে আবার এই দুটি বছরের শিক্ষাকে **আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষার সাথেও তুলনা করেন।** কিন্তু আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষা হল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষা বর্ষের জন্য। আর আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে একাদশ ও দ্বাদশ শিক্ষা বর্ষের জন্য। আমেরিকার জুনিয়র কলেজ সুরু হয়েছিল সাধারণ শিক্ষাকে (জেনারেল এডুকেশন) মজবুত করার উদ্দেশ্যে। ক্রমে ক্রমে অবশ্য অনেক জুনিয়র কলেজই বৃত্তিমূলক টার্মিনাল শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছে। অনেক কলেজ রূপান্তরিত হয়েছে কমিউনিটি কলেজ হিসেবে। আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল তেমনটি হবে না। আমেরিকার অনেক ক্ষেত্রেই কলেজের প্রথম দুটি বছরকে জুনিয়র কলেজ অর্থাৎ সিনিয়র কলেজের প্রথম চক্র হিসেবে দেখা হয়। আমাদের এখানে তেমন প্রস্তাব নেই। **মোট কথা প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষার মতও হয়নি।**

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সাথে আমাদের **পুরানো ইণ্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি আছে।** পুরানো 'ইণ্টার' শিক্ষায় স্যাডলায় কমিশনের সুপারিশগুলি পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছিল না। বাংলাদেশে কলেজের শিক্ষায় ২+২ ব্যবস্থাই চালু ছিল। অধিকাংশ কলেজেই প্রথম দু'বছরের ইণ্টার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কলেজীয় ভঙ্গিতে ও পদ্ধতিতে এবং ডিগ্রী স্তরের শিক্ষকদের দায়িত্বেই। তা ছাড়া ইণ্টার স্তরকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অংশ হিসেবেই চালানো হয়েছিল। এই স্তরকে ডিগ্রী স্তরে প্রবেশের প্রাকসর্ত এবং প্রস্তুতি পর্যায় হিসেবেই ধরা হয়েছিল। নূতন ব্যবস্থায়ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব অংশত কলেজের উপর দেওয়ার ফলে একই ধরনের ফলশ্রুতি হবে, অর্থাৎ স্কুল শিক্ষারই অগ্রবর্তী স্তর হিসেবে যে প্রকৃতির কথা স্যাডলার কমিশন ও কোঠারি কমিশন বলেছিলেন, সেই সুপারিশ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুটি বছরের পড়া হবে স্কুলেই! সুতরাং অবস্থাটি হবে এক মধ্যপন্থী জগাখিচুড়ি।

পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে তেমনটিই। ইণ্টার পাঠ্যক্রমে ইংরেজী ও মাতৃভাষা ছিল আবশ্যিক। আর বাছাই করতে হত তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়। প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের সাথে এ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ইণ্টার পাঠ্যক্রমটি ক্রমে ক্রমে ইণ্টার আর্টস, ইণ্টার বিজ্ঞান, ইণ্টার বাণিজ্য—এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও ভাগা-ভাগির দেওয়ালটি তেমন শক্ত ছিলনা। বিজ্ঞান থেকে কলা কিংবা বাণিজ্য বিভাগে

যাওয়ার সুযোগ থাকলেও অন্য দুটি বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আসা চলতনা। তা ছাড়া ইণ্টার স্তরে অনুসৃত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতেই সাধারণভাবে কলেজীয় স্তরে বিষয় নির্বাচন করতে হত। তা ছাড়া ইণ্টার-কোর্সের সমান্তরাল এবং সমপর্যায়ে কারিগরি, বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিলনা, যেমন বর্তমানে পরিকল্পনা করা হয়েছে সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার বিকল্পে বৃত্তিমূলক উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার। **সুতরাং পুরানো ইণ্টার-কোর্সের সাথে নুতন ব্যবস্থার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও সেই ব্যবস্থাকেই হুবহু ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এমন বলা যায় না।**

প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিলেতের **গ্রামার স্কুল** শিক্ষারও কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তবে বিষয় নির্বাচন, অর্ডিনারী ও এ্যাডভান্সড্ স্তর নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার স্বাধীনতা প্রভৃতির বেলায় গ্রামার স্কুলে যে নমনীয়তা আছে, আমাদের এখানে তেমন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। তবে 'সাধারণ' ও 'অগ্রবর্তী' স্তরের ব্যবস্থাটি হয়েছে বিলেতেরই অনুকরণে।

নূতনভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করবার সময় আমরা অন্যান্য দেশের উদাহরণ এবং আমাদের পুরানো অভিজ্ঞতা থেকে শিখবো, এটা খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় সব দেশেই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত (নিতান্ত কম হলেও ১৭ বছর)। তেমনি প্রকৃতিগতভাবে এই 'শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা' হিসেবেই বিচার করা হয়। বৃত্তিমুখিনতা মিশ্রণের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত তারতম্য আছে দেশ থেকে দেশে। কিন্তু আমাদের দেশে হায়ার সেকেণ্ডারীর "ষ্ট্রীম" ব্যবস্থার যে সংশোধন দরকার ছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত।

নূতন পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করে দেখা হয়েছে—(১) সাধারণ (অর্থাৎ এ্যাকাডেমিক), (২) কারিগরি। সমান্তরাল দুই ধরনের ব্যবস্থার কথা সার্জেণ্ট কমিটি বলেছিল। কোঠারি কমিশন কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে অভিন্ন এবং মূলতঃ "সাধারণ" হিসেবে বিচার করে বৃত্তি, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়কে পলিটেকনিকে দেওয়ারই কথা বলেছিলেন।

অবশ্য দুইটি ভাগে ভাগ করা হলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত যোগাযোগ থাকবে, যেন প্রয়োজন মত স্থান পরিবর্তনের সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের থাকে। সাধারণ পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলিকে দ্বিতীয় ধরনের পাঠ্যক্রমের মধ্যেও অংশতঃ জুড়ে দিয়ে যোগসূত্রের চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমটি হয়েছে এই রকম :—(১) দুটি ভাষা এবং (২) বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলি থেকে

ঐচ্ছিকভাবে আর তিনটি বিষয়। (এই ঐচ্ছিক তালিকায় স্থান পেয়েছে—ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাব শাস্ত্র, কারবার সংগঠন, কারবারী অর্থনীতি, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরেজী, পৌরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, শিক্ষা, দর্শন, অর্থনৈতিক ভূগোল, পুষ্টিবিজ্ঞান, গৃহবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, বাংলা, গণিত, জীব বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, হিন্দী, সংস্কৃত)। দুটি আবশ্যিক বিষয় (ভাষা) এবং তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়ের পাঠক্রমে প্রতিটিতে থাকবে দুটি পত্র। (সুতরাং মোট নম্বর ১০০০)। এ ছাড়া অতিরিক্ত পড়বার সুযোগ থাকবে ঐচ্ছিকভাবে। কোন ছাত্র তার নিজস্ব বাছাই করা ঐচ্ছিক বিষয়ের বাইরে অন্য যে কোন বিষয়ে সাধারণ মানের একটি পত্রের পড়া করতে পারবে। এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্য থেকেই একটি অথবা দুটি বিষয়ে 'এ্যাডভান্সড' মানে পড়তে পারবে অতিরিক্ত হিসেবে।

দুটি ভাষা এবং তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়বার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তার সাথে ইণ্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত বাছাইয়ের যে সুযোগ রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইণ্টার-মিডিয়েটের সাথে পার্থক্যও হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের এইটুকু স্বাধীনতার ব্যাপারে কোঠারি সুপারিশের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ও যেভাবে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমন সুপারিশ কোঠারি কমিশনে ছিলনা। শারীর শিক্ষা ও সমাজসেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কোঠারি রিপোর্ট থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। ঐ রিপোর্টে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম শিবিরে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনী কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত প্রথম খসড়ায় কর্মশিক্ষা ; শারীর শিক্ষা ; এন, সি,সি ; জাতীয় সেবা প্রকল্পে যোগ দেওয়ার উপর যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, চূড়ান্ত দলিলে সেই গুরুত্ব আর থাকেনি। এর ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে মূলতঃ তাত্ত্বিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়মুখী।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিশাখার (**Vocational Branch**) পাঠ্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে নীতি ও চিন্তাই এখনও পরিস্ফুট নয়। সাধারণভাবে এ পর্যন্তই ঠিক হয়েছে যে প্যারা মেডিকেল, প্যারা ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি, চারুকলা ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ শাখায় পাঠ্যক্রমটি বিভক্ত হবে। তবে যে কোন শাখাই ছাত্ররা বেছে নিক, সাধারণ শাখার দুটি ভাষার একটি করে পত্র এবং ঐচ্ছিক তালিকার যে কোন তিনটি বিষয়ের একটি করে পত্রের পড়া করতে হবে। এই পাঁচশ নম্বরের পাঁচটি পত্রের পাঠই হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার দুইটি বিভাগের যোগসূত্র। যোগসূত্র রক্ষা করবার ব্যবস্থাটি সমর্থনযোগ্য এই কারণে যে (ক) বৃত্তিবিভাগের ছাত্রছাত্রীরও উন্নত সাধারণ

শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং (খ) যোগসূত্র থাকলে বিভাগ পরিবর্তনের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। বৃত্তিবিভাগের বিভিন্ন শাখার সাথে সেই সেই শাখায় উচ্চতর শিক্ষার সম্পর্ক এবং সংহতি কিভাবে থাকবে, সে বিষয়টিই এখনও পরিচ্ছন্ন নয়। বিস্তৃত পাঠ্যক্রমও এখনও নিশ্চিতভাবে তৈরী হয়নি। সুতরাং শিক্ষাগত দিক থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ সাফল্য এবং ব্যর্থতার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার সুযোগ এখনও নেই। পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃতি, বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ধরণ দেখেই মাত্র অভিমত গঠন করা সম্ভব হবে।

তবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

(১) প্রথমেই বলা দরকার পৃথক একটি পর্ষদ গড়বার যুক্তি সম্বন্ধে। ১১—১২ ক্লাসের শিক্ষা যদি মাধ্যমিক শিক্ষাই হয়, তবে প্রশাসনের বেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক কাউন্সিল গড়বার যৌক্তিকতা কি? সহজেই অনুমেয় যে এই স্তরটিকে একটি পৃথক স্তর হিসাবেই বিচার করা হয়েছে।

(২) কাউন্সিল গঠনের পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। কিছু মনোনীত এবং কিছু পদাধিকারের ভিত্তিতে গৃহীত সদস্য নিয়ে গঠিত কাউন্সিলে বৃহত্তর শিক্ষাজগতের অভিমত পৌঁছবার সুযোগ অত্যন্ত কম, গণঅভিমতের তো কথাই নেই। বিভিন্ন স্বার্থের টানা-পোড়েনের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট।

(৩) ইতিমধ্যেই টানা-পোড়েনের পরিচয় মিলেছে ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে। একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (কোন ভাষাই বাধ্যতা-মূলক ভাবে নয়) পড়বার যে প্রস্তাব ছিল, তার সমর্থন মিলবে কোঠারি রিপোর্টে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপস রফাই করতে হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম ভাষাকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক ভাবে প্রথম ভাষা করতে হয়েছে।

(৪) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একই পাঠ্যক্রম স্কুল এবং কলেজেও অনুসরণ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বোঝা যায় যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার যোগসূত্র এবং সেতু হিসেবেই বিচার করা হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন কমিশন বলেছিলেন টার্মিনাল ধরনের শিক্ষার কথা।

(৫) একই স্কুলে মাধ্যমিক স্তরের জন্য এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের জন্য দুইটি ভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের খবরদারির ফলে প্রশাসনিক জটিলতা আসতে বাধ্য। তেমনি জটিলতা আসবে একই কলেজে দুটি কর্তৃত্বের ফলে।

(৬) আট শতাধিক স্কুলে নূতন কোর্স চালু করবার প্রস্তাব রয়েছে। অথচ উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে তার অনেক বেশী। সুতরাং নূতন ব্যবস্থায় উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতির জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য। একই স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবেই। তা ছাড়া স্কুল এবং কলেজে একই পাঠ্যক্রম পড়িয়েও বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষক ও কলেজ শিক্ষকের মধ্যে তারতম্য কোন অবস্থাতেই নীতি সম্মত নয়। কলেজের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিশ্চয়ই কোন দায়িত্ব থাকবে না।

(৭) স্কুলের সংকীর্ণ বাড়ী ও ক্যাম্পাসে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ১০-১১ বছরের শিশুদের সাথে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর তরুণদের পড়াশুনা ও মেলামেশার ব্যাপারটি কতটা মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান সম্মত, সেকথাও ভাবতে হবে।

(৮) বৃত্তি বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব করা হয়েছে ঐ পাঠ্যক্রমটিও স্কুল ও কলেজে ছড়িয়ে দেওয়ার। যেসব স্কুলে উপযুক্ত ওয়ার্কশপ্ আছে, সেখানে বৃত্তি পাঠ্যক্রম চালু হতে পারে। বিকল্পে থাকবে বিশেষীকরণের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান অবস্থায় সাধারণ স্কুলে বৃত্তি শিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণ আছে।

(৯) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'মাধ্যমিক' হিসেবেই বিচার করা হলে একটি মাধ্যমিক বোর্ডের প্রশাসনে আনাই উচিত ছিল। আর আলাদা একটি স্তর হিসেবে বিচার করলে আলাদা প্রশাসনে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াই উচিত ছিল।

(১০) তার বদলে কিছুটা স্কুলে জায়গা করে দিয়ে, কিছুটা কলেজে জায়গা দিয়ে (accomodate করে) বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সীমানার মধ্যেই "নিম্নতম ব্যয়ে" কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এভাবে কোন মহৎ কাজ হয় না। প্রশাসনিক জটিলতার ফলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো সমস্ত ব্যবস্থাটি "পুনর্বিবেচনার" দরকার হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরকে একটি আলাদা এবং বিশিষ্ট স্তর হিসেবে যদি বিচার করাই হয়, তবে বর্তমানের সমাধান পদ্ধতিগুলিকে "সাময়িক" হিসেবে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আলাদা দুই বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে নেওয়াই সমাধানের সর্বোত্তম পথ। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই দুই বছরের শিক্ষা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে নিয়ে কোন দোদুল্যমানতা কিম্বা গড্ডলিকা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

সর্বশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়ন

উপরে যে আলোচনা করা হল, তার ভিত্তি ছিল +২ স্তর সম্বন্ধে পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত। ইতিমধ্যে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থাটি বাস্তব রূপ নিয়েছে এবং যে সব সমস্যার কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নূতন অনেক সমস্যা এবং প্রশ্নও সৃষ্টি হয়েছে।

তা ছাড়া দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা নিরীক্ষাও দু'বছরের জন্য হয়েছে। নূতন ধরনের পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নূতন সমস্যা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রটিও নূতন সমস্যা থেকে মুক্ত থাকেনি। সুতরাং নূতন করে সর্বশেষ পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়ন দরকার।

+২ স্তরের কথা—কোঠারি কমিশন রিপোর্টে ১১-১২ শ্রেণীর পড়া সম্পর্কে যে সব নীতির কথা বলা হয়েছিল, তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক বিচ্যুতি ঘটেছে। পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রেই ত্রুটি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বস্তুতঃ ঐ রিপোর্টে +২ স্তরের শিক্ষার যে প্রকৃতির কথা বলা হয়েছিল, তার অনেকখানিই

নব প্রবর্তিত ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ থেকেই একথা পরিষ্কার হবে।

১। যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তেমনভাবে ব্যবস্থা করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একশ'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া নিতান্ত অল্প কয়েকটি বৃত্তির কথাই ভাবা হয়েছে। এই স্তরে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের যে পেশাগত সুযোগ সৃষ্টি করা যেত, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়নি। তা'ছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে কয়টি ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে সেইসব ধারায় শিক্ষা পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধেও বিরাট সন্দেহ থাকায় + ২ স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাটি জন্মক্ষণেই পঙ্গুত্ব পেয়েছে। আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী হয়নি।

২। সাধারণ শিক্ষার ধারাটি বিজ্ঞান, কমার্স ও আর্টস—এই তিনটি প্রবাহে পরিষ্কার বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি ধারায় সর্ব্বোচ্চ ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং প্রকারান্তরে পুরানো উচ্চতর মাধ্যমিকের "প্রবাহ" ব্যবস্থাই নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও প্রবাহের সংখ্যা হয়েছে ৭টির বদলে ৩টি—অনেকটা পুরানো ইণ্টারমিডিয়েটের মত।

৩। বিভিন্ন প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের কোন মানদণ্ড স্থির করে দেওয়া হয়নি। স্বভাবতঃই ছাত্রভর্তির ঝোঁক হিসেবে প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বাণিজ্য বিভাগ এবং পঙ্গুর মত পিছনে চলেছে কলাবিভাগ। অবস্থাটি কোঠারি কমিশন সুপারিশের পরিপন্থী।

৪। কোটারি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ঐচ্ছিক বিষয়ের একটি বড় তালিকা থেকে ছাত্ররা ইচ্ছেমত বিষয় নির্ব্বাচন করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের জন্য ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে প্রতিটি স্কুলে ঐচ্ছিক বিষয়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ছাত্রদের কাছে বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রটি হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তদুপরি কোন্ বিষয়ের সাথে কোন্ বিষয় নিতেই হবে কিম্বা নেওয়া চলবে (অর্থাৎ কম্বাইন করা চলবে) সে সম্বন্ধে একটি বাধ্যতামূলক ছক প্রতিটি স্কুল কলেজেই তৈরী হয়েছে। স্বভাবতঃই বিষয় নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা আরও খর্বিত হয়েছে।

৫। একথা ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মান যথেষ্ট উঁচু হওয়া দরকার। কিন্তু একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং অপরদিকে কলেজীয় শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে বিচ্ছিন্নভাবে + ২ স্তরের কথা

ভাবা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। মাধ্যমিক শিক্ষার সিলেবাসের সাথে উচ্চতর মাধ্যমিক সিলেবাসের ভারসাম্য কিম্বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তেমনি সামঞ্জস্য থাকেনি ডিগ্রী স্তরের সিলেবাসের সাথে।

৬। ইতিমধ্যেই নানাদিক থেকে সমালোচনা উঠেছে যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস বিষয়বস্তুর বোঝায় ভারি। এবং দু'বছর সময়ের মধ্যে ঐ সিলেবাসের বিষয়বস্তু পুরোপুরি পড়ানো সম্ভবপর নয়। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা অভিযোগ করছেন যে কাউন্সিল নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে উপযুক্ত বই লেখা অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে শুধু রসায়নের বই সম্পর্কে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। এইক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ৬০০। গ্রন্থকাররা বলছেন কোন ভাবেই ৮০০ পৃষ্ঠার কমে চলেনা।

কিন্তু একটি পাঠ্যবিষয়েই যদি এত বেশি সংখ্যক পৃষ্ঠার দরকার হয়, তবে দুটি আবশ্যিক, তিনটি ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত কোন বিষয় পড়বার ইচ্ছা থাকলে পৃষ্ঠাসংখ্যার বোঝা যে বেশী হবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রতিকার হিসেবে সিলেবাস ইচ্ছেমত হাল্কা করে দিলে মানাবনতির আশঙ্কা থাকবে। এর একমাত্র প্রতিকার হলো মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেজীয় স্তরের সিলেবাসে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি ধারাবাহিকতায় নিয়ে আসা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে, পুনরুক্তি বন্ধ করে এবং বাচনশীলতা ত্যাগ করে সিলেবাসের "র‍্যাশনালাইজেশন"। তিনটি স্তরের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে এই দায়িত্ব পালন করলে প্রতি বিষয়ে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একটানা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সিলেবাস প্রণয়ন করা সম্ভব।

৭। + ২ স্তরে প্রশাসনিক সমস্যা ইতিমধ্যেহ প্রকট হয়ে উঠেছে। কোঠারি সুপারিশে বলা হয়েছিল— (ক) এই স্তরটি সম্পূর্ণ ই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটি থাকবে না। নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলে একটি আলাদা ইউনিট হিসেবে +২ স্তর গড়া হবে এবং এ জন্য আলাদাভাবে পৌনঃপুনিক সাহায্য দেওয়া হবে। তার বদলে এই স্তরটিকে (আর্থিক দায়ের কথা বিবেচনা করে) স্কুলে ও কলেজে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল ও কলেজে পৃথক প্রশাসনও গড়ে ওঠেনি।

এর ফল হয়েছে ক্ষতিকর। (ক) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হয়েছে। স্কুল নির্বাচনের কাজটিও সবক্ষেত্রে শিক্ষার স্বার্থকে সামনে রেখে করা হয় নি। (খ) নির্বাচিত স্কুলগুলির অভ্যন্তরে মাধ্যমিক শিক্ষক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষি

সৃষ্টি হয়েছে। (গ) একই স্তরের জন্য স্কুল ও কলেজে কার্যরত শিক্ষকদের বেতন ক্রমের পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে স্কুল শিক্ষকদের অসন্তোষ। আবার আবশ্যিক যোগ্যতার প্রশ্নে স্কুল ও কলেজের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকায় কলেজ শিক্ষকদের মধ্যেও অসন্তোষ। (ঘ) একই পাঠ্যবস্তু স্কুল ও কলেজে পড়ানোর ফলে কলেজের দিকেই ছাত্রছাত্রীর ভিড় হয়েছে বেশী। অথচ ছাত্রছাত্রীর অভাবে অনেক স্কুল অন্ততঃ গত বছরের জন্য এই কোর্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। (ঙ) কলেজ শিক্ষকরা +২ স্তরে পড়ানোর কাজকে বহুলাংশে "চাপিয়ে দেওয়া বাড়তি কাজ" বলেই মনে করেছেন। (চ) স্কুল ও কলেজে সর্বত্রই আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর কাজ হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থায় কোন শিক্ষাস্তরের প্রতি সুবিচার সম্ভব নয়। (ছ) এক বছর অনিশ্চিতভাবে কাজ করবার পরে হাজার হাজার দরখাস্তকারীর মধ্য থেকে শিক্ষক বাছাইয়ের জন্য ইণ্টারভিউয়ের কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে। যারা ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার আশায় একবছর কাজ করেছেন, তাঁদের বঞ্চিত করাও মুস্কিল হবে। সুতরাং নূতন লোকের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া খুবই অসুবিধেজনক হবে। যথার্থ নির্বাচনের বদলে ইণ্টারভিউয়ের মাধ্যমে যদি বর্তমান অবস্থাটিকেই "নির্বাচনী অনুমোদন" দেওয়া হয়, তবে সমস্ত কাজটিই হবে হাস্যকর (অবশ্য নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরেই মাত্র এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া চলবে)। (জ) পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে বলা হয়েছে যে সাম্বৎসরিক আভ্যন্তরীণ অভীক্ষা এবং কোর্সের শেষে ফাইনাল পরীক্ষার সমন্বয়ে ফলাফল বিচার করা হবে এবং শিক্ষাগত সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রেড্ প্রথা চালু করা হবে। কিন্তু একটি পরীক্ষা না হলে গ্রেড্ প্রথা কিম্বা আভ্যন্তরীণ সমীক্ষার ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া যায় না। (ঝ) কর্মশিক্ষার প্রকল্প যে +২ স্তরে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না, সে বিষয়টি ইতিমধ্যেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। (ঞ) শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ এবং স্কুল কলেজে সাহায্য বরাদ্দের নীতি স্থির না করলেও চলবে না।

এগারো-বারো ক্লাশের শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার (ক) পাঠ্যবস্তুর ওজনের দোহাই দিয়ে কিছু কিছু অংশ যেমন তেমন ভাবে বাদ দেওয়া নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যবস্তুর সরলীকরণ। (খ) বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের আরও স্বাধীনতা এবং বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলার মধ্যে প্রাচীর না তুলে তিনটির প্রতিই সমগুরুত্ব আরোপ করা। (গ) বৃত্তি বিভাগকে বাস্তব কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করা এবং মেধাবী ছাত্রের কাছেও আকর্ষনীয় করে তোলা।

(ঘ) এই স্তরটিকে স্কুল স্তর হিসেবেই বিবেচনা করা। এবং এই স্তরের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। (ঙ) স্কুলের মধ্যেও এই দুটি বছরের শিক্ষাকে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন করা। (চ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের উপর শুধু এই স্তরের শিক্ষারই দায়িত্ব দেওয়া এবং তাঁদের জন্য আলাদা বেতনক্রম নির্ধারণ করা। (ছ) আংশিক সময়ের বদলে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা। (ঝ) এই স্তরের জন্য যথোচিত আর্থিক বরাদ্দ করা। (ঝ) একটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনেই সমগ্রভাবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ন্যস্ত করা উচিত। সেই কাজ এখনই সম্ভব না হলে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন দরকার। (ঙ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের অধিকার স্বীকার করে নিয়েও সাধারণভাবে সর্বভারতীয় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

মাধ্যমিক স্তরের কথা—নবপ্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরটির বয়স ইতিমধ্যে তিন বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই স্তরের শিক্ষাতেও বেশ কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। **অসঙ্গতির মূলতঃ তিনটি দিক—**

(১) **সিলেবাসের অসঙ্গতি।** শিক্ষক মহল থেকে ইতিমধ্যেই ভাষা শিক্ষা এবং ভাষার পাঠ্য সম্বন্ধে সমালোচনা উঠেছে। বিজ্ঞানের সিলেবাস সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে সিলেবাসের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় সংশোধনের কাজ সুরু হলে অবস্থা উন্নত হতে পারে।

(২) **কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অসঙ্গতিঃ** যে ধরনের কাজ নিয়ে তথাকথিত কর্মশিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ মহলেই প্রশ্ন উঠেছে। তা ছাড়া কর্মশিক্ষার পরীক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে প্রহসনের সমতুল্য হয়েছে। সুতরাং কর্মশিক্ষা প্রকল্প, সমাজসেবা প্রকল্প প্রভৃতিও ঢেলে সাজানো দরকার।

(৩) **পরীক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতিঃ** যেভাবে গ্রুপ ভিত্তিতে পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষাবিদ মহলে সমালোচনা উঠেছে। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সকল কেন্দ্র তথা সব স্কুলের মধ্যে সমতা রক্ষা করবার প্রশ্নটিও জটিলতা সৃষ্টি করছে। সুতরাং মৌখিক পরীক্ষার প্রথাটিকে সত্যিকারের পরিমাপ ব্যবস্থায় উন্নীত করা দরকার।

(৪) **স্কুলের অনুমোদন প্রসঙ্গে অসঙ্গতি।** স্কুল অনুমোদনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড সব ক্ষেত্রে বাস্তবে একই রকম থাকেনি। নানা সুড়ঙ্গ পথে অনেক

অযোগ্য স্কুলও অনুমোদিত হয়েছে। অনেক স্কুলকে সার্বিক অনুমোদন না দিয়ে মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের অধিকারদানের পদ্ধতিটি নানা ধরনের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করছে। সুতরাং সাময়িক সুযোগের বদলে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে সবগুলি উপযুক্ত স্কুলকেই অনুমোদন এবং সরকারী সাহায্য দেওয়া দরকার।

৫। **প্রশাসনগত অসঙ্গতি**। বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাটি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বহু স্কুলের পরিচালক সভাও নানা জটিলতার ফলে পঙ্গু হয়েছে, কিম্বা স্থানীয় রেষারেষির কেন্দ্রভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং স্কুল প্রশাসনের ব্যবস্থাও সংশোধিত হওয়া দরকার।

৬। **বোর্ড সংগঠনে অসঙ্গতি**। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান গঠন এবং কাজের ধারাও সহস্র ত্রুটিতে পূর্ণ। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মক্ষেত্রের নব রূপায়ন এবং বোর্ডের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন দরকার।

উচ্চতর শিক্ষাস্তরের কথা : উচ্চশিক্ষার স্তরেও নানা রকম নূতন উপসর্গ সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে ১৯৭৫ সালের সংশোধনী আইন। এই সংশোধনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের গঠন এবং সদস্য পদের এমন হেরফের করা হয়েছে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধিকার খর্বিত হয়। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাটিও এমনভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য আইন পাস করা হয়েছে যে প্রতি পদে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং আইন সভার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সুখের বিষয় এইসব সংশোধনী আইন এখনও কার্যকর হয়নি। তা সত্ত্বেও সমস্ত বিষয়টির পুনর্বিবেচনা দরকার।

ইতিমধ্যে সারা ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জগতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হতে বাধ্য। নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ১০+২+৩ ব্যবস্থা সম্পর্কে নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রাপ্ত এবং সারা ভারতের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থা হিসেবেই স্বীকৃত (যদিও বিভিন্ন রাজ্যে কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ইতিমধ্যেই হয়েছে)। নূতন কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে নূতনভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তদুপরি সমগ্র

ভারতে একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে কিম্বা স্থানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হবে—এই প্রশ্নটির সমাধানও দরকার। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অংশতঃ স্বীকার করে সম্প্রতি অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছে যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ৩+২ অথবা ২+২ অথবা ২+৩ বছর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী গান্ধীবাদী শিক্ষানীতি অনুসরণ করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় গান্ধীবাদের বাস্তব রূপ কি হবে, সে সম্বন্ধে এখনও ধারণা পরিস্ফুট করা হয় নি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবিষয়ের ওজনের কথা এবং সিলেবাস সংশোধনের প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন। সংশোধনের কাজ খুবই জরুরী। কিন্তু সংশোধনের ধারা এবং চরিত্র সম্পর্কে ধ্যানধারণা এখনও পরিচ্ছন্ন করা হয় নি। অবশ্য গণসাক্ষরতার প্রতি জোর দিয়ে তিনি একটি অনাদৃত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, একথাও স্বীকার করতেই হবে।

শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়টিও নূতন গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মহলে এমন ধারণাই দানা বাঁধছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বভারতীয় অভিন্নতা এবং শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তথা কেন্দ্রীকতার ঝোঁক বাড়বে। রাজ্য বিধান সভাগুলিতেও কয়েকটি আইন পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সরকারী তথা আমলাতান্ত্রিক ঝোঁক বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত সৃষ্টি হচ্ছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক পার্লামেণ্টারী নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। দশটি রাজ্য বিধান সভা নিবাচনের ফলে প্রশাসনিক চিত্রে আরও পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রীয় শাসনে যে দল অধিষ্ঠিত, মহারাষ্ট্র থেকে সুরু করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গে সেই দলের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। সভাবতঃই, প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ তথা রাজ্যগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নূতন ভাবে দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষাকে যৌথ তালিকায় রাখা কিম্বা না রাখা, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রযোজন, প্রকৃতি ও পরিধি এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সব রাজ্যের প্রতি সমতা প্রদর্শনের প্রশ্নটি নূতনভাবে শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে দেখা দিতে বাধ্য। অবশ্য ভবিষ্যত কর্ম প্রবাহের গতি প্রকৃতি ও নীতির উপরই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নির্ভর করবে।

প্রশ্নাবলী

1. Write a note on the supposed nature of the re-patterned secondary education. How far has that nature been reflected in the new curricular organisation ?

2. Discuss the innovations made in the new pattern of secondary education in West Bengal.

3. Compare the Work Education programme in West Bengal with Work Experience programme proposed by Kothari Commission and with Russian Polytechnisation.

4. Discuss the nature of the +2 stage of education and compare it with Intermediate Education.

5. Do you think that the location of the +2 stage in West Bengal has been proper ? Give your arguments.

6. Discuss the anomalies already apparent in the Madhyamik stage of education in West Bengal.

7. Analyse the curricular and administrative problems in relation to +2 education at present in West Bengal and offer suggestions for improvement.

8. How may the recent political changes in India be reflected in educational administration ?

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়—ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব।
দ্বিতীয় অধ্যায়—ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব।
তৃতীয় অধ্যায়—সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব

কোঠারি কমিশন রিপোর্টে বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষাচেতনার প্রভাব পড়েছে। অবশ্য ১৮১৩ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেড় শতাধিক বছরের শিক্ষা ইতিহাসে নানা উৎস থেকে নানা ধরনের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে। কিছু প্রভাবের উৎস ছিল আমাদেরই সমাজবিবর্তন। কিছু আমরা বিশ্বের শিক্ষাচেতনা থেকে নিয়েছি। আর কিছু আমাদের রাজনৈতিক অসহায়তার সুযোগে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বিচিত্র প্রভাবকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি—যেমন: (১) ঐতিহ্য (২) রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, (৩) শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রভাব এবং (৪) শিক্ষাদর্শনের প্রভাব।

জড়বাদের বিকাশ সত্বেও **প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ** আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। তপোবন আশ্রম, গুরুকুলের আদর্শ কিংবা দেশজ পাঠশালার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে আজও আমরা উঁচুতে তুলে ধরছি। আজও অনেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের জয়গান করছেন। কোঠারি কমিশনের উপরও এই প্রভাব পড়েছে।

ভারতীয় সমাজের বর্ণবৈষম্য আজও পর্যন্ত শিক্ষায় সমানাধিকারকে ব্যাহত করছে। হিন্দু মুসলীম সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় আজও ঘটেনি।

রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দুই শত বৎসরের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন। ১৮৩৫ সনে গৃহীত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতিও ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল।

ইংলণ্ডের শিক্ষাচেতনা দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা এবং চাকুরিতে ইংরেজী শিক্ষার অগ্রাধিকারের নীতিও ভারতীয় শিক্ষায় এনেছে সুদূর-

বিস্তারী প্রভাব। ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচে এসেছে একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষা-পরিকল্পনার ছক। আমাদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হয়েছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে। ইংলণ্ডের স্কুলবোর্ডগুলির মত ১৮৮২ সনে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের অনুকরণেই প্রচলিত হয়েছিল "ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য নীতি"। স্যাডলার কমিশনের উপর ইংলণ্ডের হ্যালডেন কমিশনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সর্বোপরি হ্যাডো কমিটির রিপোর্ট থেকে ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইন পর্যন্ত তাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছে ১৯৪৪ সনের সার্জেণ্ট পরিকল্পনায়।

ইংরেজ-শাসনের প্রভাব শুধু তত্ত্ব ও নীতির ক্ষেত্রেই পড়েনি, স্কুল সংগঠন ও প্রশাসন ব্যবস্থায়ও পড়েছে। গ্রামার স্কুলের অনুকরণে হাই স্কুল হয়েছে। পাবলিক স্কুলের অনুকরণে পাবলিক স্কুল গড়ে উঠেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী এবং বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ এ দেশেও প্রচলিত হয়েছে।

অন্যদিকে রয়েছে **জাতীয়তাবাদের প্রভাব**। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ এই প্রভাবেরই ফল। নারীশিক্ষার প্রসার, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবি, বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রকল্প, সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা এবং শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের দাবি প্রভৃতি সব কিছুই জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব।

রাজনৈতিক প্রভাবের আর একটি দিক হলো শিক্ষাক্ষেত্রে **গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ**। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষার প্রসার, শিক্ষায় সমসুযোগ, শিক্ষায় বহুমুখীনতা এবং 'কমনস্কুল' চেতনা প্রভৃতি সবকিছুই রাজনৈতিক প্রভাবের প্রকাশ।

রাজনৈতিক প্রভাবের সর্বাধুনিক অভিব্যক্তি হলো শিক্ষাকল্পনায় **আন্তর্জাতিক প্রভাব**। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে আমরা চাইতে পারছি। রাশিয়ার "পলিটেকনাইজেশন তত্ত্ব" থেকে আমরা গ্রহণ করছি "কর্মপরিচিতি" নীতি, কিংবা ডেনমার্কের 'গণকলেজ' (পিপ্‌ল্‌স্ কলেজ) প্রভাবিত করেছে আমাদের বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পনাকে। আমেরিকার "সাধারণ শিক্ষা" আন্দোলন, কম্প্রিহেন্‌সিভ্ স্কুল প্রভৃতি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

এর পরে উল্লেখযোগ্য **ধর্মীয় প্রভাব**। আবার ধর্মীয় প্রভাবের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রত্যুত্তর হলো "শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি"। এ দুটিই

আমাদের শিক্ষায় আছে। শিক্ষায় **সামাজিক প্রভাবের** নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় দিকই আছে। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও বর্ণ বৈষম্যের ফলেই স্ত্রীশিক্ষা ও গণশিক্ষার প্রসার হয়নি। সামাজিক স্তরভেদ শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। দরিদ্র ও ধনীর শিক্ষা পৃথক হয়ে গেছে। স্বাধীনতার উত্তরকালে এই শ্রেণীবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে আমরা শিক্ষায় সমসুযোগ, বাধ্যতামূলক সমাজসেবা এবং কর্মপরিচিতির কথা বলছি। **অর্থ নৈতিক প্রভাবের** ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে পেশা, বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষির বিকাশ। পরিকল্পিত শিক্ষা, উৎপাদনী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিগতকরণ, শিক্ষার সঙ্গে জনশক্তি পরিকল্পনার ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা,—সব কিছুই অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও কর্মকাণ্ডের প্রভাবে।

শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাবও কম উল্লেখযোগ্য নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আন্দোলন, শিশুকেন্দ্রিকতার আন্দোলন, বহুবিধ আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আন্দোলন এবং আধুনিক যুগের সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলন (অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে Psychological Tendency, Scientific and Technological Movement, Sociological Tendency) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সচেতন কিংবা অচেতন অবস্থায় আমাদের প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন রিপোর্টের উপরও পড়েছে এর প্রভাব। এইসব রিপোর্টকে অবলম্বন করেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষা দর্শন এবং আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রভাবে দৃশ্যত এবং অদৃশ্যত আমাদের চিন্তাধারা অবিরত বিবর্তিত হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে অর্ধ-শতাব্দীকাল আমরা জন লক-এর শিক্ষাতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। 'বেন্থাম ও মিল' এর উদার-নীতিবাদ তথা উপযোগিতাবাদও আমাদের অতি দ্রুত প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে "লিবারেল" শিক্ষাধারাই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আবার বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই **প্রকৃতিবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের প্রভাব** দেখা যায়। এক্ষেত্রেও যুব বাংলা গোষ্ঠীর মধ্যেই সাড়া জাগে সর্বপ্রথম। রুশোর প্রভাব এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে। আজও পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাচেতনায় হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব অনস্বীকার্য। শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের পীড়ন, শাসন ও বন্ধনের বিরুদ্ধে বলেছেন। প্রকৃতিবাদের সঙ্গে যৌথভাবে এসেছে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের চেতনা। পেস্তালৎসির শিক্ষণ পদ্ধতির ছোঁয়া লেগেছে পাঠ্যক্রম ও শ্রেণীকক্ষে। কিন্তু ভাববাদী

দর্শন আমরা কখনো ত্যাগ করিনি। পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যার আধিক্য এবং হার্বার্টের শিক্ষণপদ্ধতি আজও আমরা ত্যাগ করিনি। বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রোয়েবেল্-এর কিণ্ডারগার্টেনকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি। মন্তেসরি পদ্ধতিকেও আমরা গ্রহণ করেছি। সর্বশেষে আমরা নিয়েছি রাশিয়ার "ক্রেস" এবং পলিটেকনাইজেশনের ভাবাদর্শ।

বিদেশী তাত্ত্বিকদের মধ্যে সর্বশেষ প্রভাব পড়েছে জন ডিউই'র তত্ত্বের। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের উপর ডিউই-তত্ত্বের প্রভাব ধরা যায়। অবশ্য এঁরা ডিউই'র মতবাদকে সংশোধন করে নিয়েছেন। চারুকলা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন। কর্মকেন্দ্রিকতার বদলে গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন শিল্পকেন্দ্রিকতা।

সাম্প্রতিক কালের বাটাভিয়া, ড্যালটন, প্রোজেক্ট পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। কখনো কখনো প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করাও হয়। তবে নীতিগতভাবে প্রোজেক্টের ভিন্ন সংস্করণ 'বুনিয়াদি' পদ্ধতিকেই আমরা জাতীয় পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছিলাম। বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে খেলার ছলে শিক্ষা, সহপাঠ্যমূলক কাজ, মুক্ত শৃঙ্খলা, ছাত্র-স্বায়ত্তশাসন, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম প্রভৃতি সব কিছুকেই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। বস্তুতঃ বিশ্বের প্রভাব, বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব আমরা গ্রহণ করেছি নানাভাবে।

প্রশ্ন ও পাঠ নির্দেশনা

1. Discuss the different influences which contributed towards the growth of present education in India. (আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি ঐতিহ্যের প্রভাব, ঔপনিবেশিক জীবন এবং জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব; গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিকতার প্রভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন ও শিল্পায়নের প্রভাব; শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব,—১ থেকে ৪ পৃষ্ঠা পড়া দরকার)।

2. Make an analysis of the impact of nationalism, democracy and internationalism upon modern Indian education.

3. How did religious, social and economic factors influence modern Indian education ?

4. Make a brief review of the influence of the Great Educators upon the principles and methods of education in India.

(প্রথম উত্তরের বিশেষ বিশেষ অংশের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করে শেষোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর তৈরী করতে হবে)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব

বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশই অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি পৃথিবীর সকল দেশের কাছেই যুগপৎ বহু সমস্যাও এনে দিয়েছে। প্রতিটি দেশই নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে সমস্যার মোকাবিলা করছে এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভও করছে। **বস্তুত বর্তমান পৃথিবীতে এক দেশের, বিশেষত উন্নত ও প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করবে, এতে আশ্চর্যের বা দোষের কিছু নেই।** মহাশূন্য-বিজ্ঞানে রাশিয়ার প্রথম সাফল্য আমেরিকার শিক্ষাচেতনাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। 'ইউনেসকো'-প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রকল্পগুলি অনগ্রসর কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষ ও ডেনমার্ক, রাশিয়া কিংবা সাম্প্রতিককালের জাপানী শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। **কিন্তু ভারতের উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী।** এই প্রভাবের প্রকৃতি ও গভীরতা বুঝতে হলে প্রথমেই উভয় দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কথা জানা দরকার।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা

ইংলণ্ডের চলতি শিক্ষাব্যবস্থাটি গঠিত হয়েছে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই আইনের পিছনে ছিল দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস।

ইংলণ্ডে শিক্ষা-বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অন্যান্য সব দেশের মতই ইংলণ্ডেও সমাজবৈষম্যই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা ছিল দুই স্তরে বিভক্ত। অভিজাত সমাজের জন্য ছিল অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ল্যাটিন-গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবাধীন **গ্রামার স্কুল**। বিত্তবানদের দানে অথবা ব্যক্তিগত মালিকানায় এইসব স্কুল গড়ে ওঠে। কালক্রমে এদের মধ্যেই কোন কোন উচ্চমানের আবাসিক বিদ্যালয় "পাবলিক স্কুল" হিসেবে পরিচিত হয় এবং সম্পদশালীদের একচেটিয়া হয়ে পড়ে।

দরিদ্রদের জন্য ছিল "ডেম্" স্কুল, "কমন ডে স্কুল" ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং চার্চ-পরিচালিত অবৈতনিক চ্যারিটি

বিদ্যালয়। সাধারণের শিক্ষা ছিল নিম্নপর্যায়ের (এলিমেণ্টারী)। **শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন সামগ্রিক ভূমিকা ছিল না, কোন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না।**

কিন্তু যুগের প্রভাব ইংলণ্ডের উপরও পড়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব, বেন্থাম ও মিল-এর দর্শন এবং শিল্পবিপ্লব এনেছে সমাজ জীবনে নূতনত্ব। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে শিক্ষার দাবিও ভাষা পেয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে দাবি উঠেছে। পরিশেষে ১৮৩২ সনে যখন পার্লামেণ্টারী শাসনসংস্কারের ফলে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হলো, এবং আইনসভায় জনসাধারণের ভাষা পূর্বাপেক্ষা মুখর হয়ে উঠলো, তখনই শিক্ষার জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রবর্তিত হলো। এইভাবে **১৮৩২ সনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পদার্পণ ঘটলো।** এই সামান্য সূচনা থেকে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই শিক্ষা ইতিহাসের মূল কথা।

সূচনা কালে অবশ্য শিক্ষার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র ছিল না। দুইটি ধর্মীয় সংগঠন—ন্যাশন্যাল সোসাইটি এবং বাইবেল সোসাইটির হাতে বরাদ্দ অর্থ তুলে দিয়েই সরকার দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। তারপর **১৮৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্লামেণ্ট মনোনীত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি।** কর্মকর্তা মনোনয়নের অধিকার প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হওয়ায় শিক্ষাসমস্যা দলীয় রাজনীতির অংশ হয়ে পড়ে।

সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ সনে 'নিউক্যাস্‌ল্ কমিশন' প্রস্তাব করেন যেন ছাত্র হাজিরার অনুপাতে সাহায্য দেওয়া হয়, পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে স্থানীয় করভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়া হয় এবং উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই সুপারিশ অনুসারে ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষাকোড তৈরী হয়।

কিন্তু ততদিনে ইংলণ্ডের বাস্তব পরিবেশ আরও এক ধাপ এগিয়েছে। সমাজ-মানসের পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো ১৮৬৭ সনে আর এক দফা শাসন সংস্কারে। নিম্নবিত্তরাও ভোটাধিকার পেলেন। তাঁরা শিক্ষার অধিকারও চাইলেন। **১৮৭০ সনে পার্লামেণ্টে পাশ হলো প্রাথমিক শিক্ষা আইন।** এই আইনের ফলে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্বই সরকারের হাতে এলো না। চার্চ প্রমুখ স্বেচ্ছাসংগঠনের স্কুলগুলি তাদের পরিচালনাতেই রইল এবং সরকারী সাহায্যও পেতে লাগলো। কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে

প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হলো। **এইজন্য সৃষ্টি হলো সমগ্র দেশব্যাপী "স্কুল বোর্ড"।**

বিশেষ লক্ষণীয় যে ১৮৭০ সনের পরে ইংলণ্ডে চালু হলো **দুই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়।** "বোর্ডস্কুলে" অনিচ্ছুক ছাত্র সম্পর্কে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলো না। অপরদিকে 'ভলাণ্টারী' স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা রইলো বাধ্যতামূলকভাবে। এই থেকে সুরু হলো একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সংঘর্ষের মূল বিষয় হলো—(ক) বোর্ড স্কুলের প্রয়োজনীয়তা, (খ) বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা এবং (গ) স্থানীয় করের উপরও ভলাণ্টারী বিদ্যালয়ের অধিকার।

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে ১৮৭০ সনেই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আইনগত-ভাবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হলো না। ১৮৭৬ সনে একটি আইনেব বলে (স্যাণ্ডনের আইন) হাজিরা-কমিটি গঠন করা হয় এবং শিশুকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পিতামাতাকে দায়ী করা হয়। ১৮৮০ সনে আর একটি আইনের সাহায্যে (ম্যাণ্ডেলাস্ আইন) মাথাপিছু সাহায্যেব পরিমাণ এমনভাবে স্থিব করা হয় যেন কার্যত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হতে পাবে। পরিশেষে **১৮৯১ সনে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয়।**

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন-ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও সুসঙ্গত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সনে আর একটি কমিশন গঠিত হয় (রিচার্ড ক্রস কমিশন)। কিন্তু ততদিনে ইংলণ্ড সামনের দিকে আরও একধাপ এগিয়েছে। সমাজের যে স্তর ১৮৭০ সনে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার পেয়েছিল, তারা উচ্চতর শিক্ষার দাবি করতে থাকে। জনমতের চাপে স্কুল বোর্ডগুলিও প্রাথমিকোত্তব স্তরে পড়াবার ব্যবস্থা করতে থাকে। বিভিন্নদিকে বিচ্ছিন্ন অগ্রগতির ফলে নানা বিতণ্ডাও সৃষ্টি হয়। সুতরাং আবার একটি কমিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সনে **(ব্রাইস্ কমিশন)।**

এই কমিশন সুপারিশ করলেন স্কুল বোর্ডের হাতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দিয়ে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হোক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর। জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীপদ এবং মন্ত্রীর সহায়ক "শিক্ষাপরিষদ" গঠন করা হোক।

শিক্ষামন্ত্রীত্ব সৃষ্টি করে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির মধ্যে আনবার বিরুদ্ধে তখনও রক্ষণশীল অভিমত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাই মন্ত্রীত্ব সৃষ্টি হলো না। কিন্তু স্কুলবোর্ড তুলে দিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কমিটির হাতে

(লোকাল এডুকেশন্যাল অথরিটী, সংক্ষেপে এল. ই. এ.) প্রাথমিক, প্রাথমিকোত্তর, নিম্নকারিগরি প্রভৃতি সবরকম শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো। **মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যমের সূচনা হলো ১৯০২ সনের আইনের মধ্য দিয়ে।** উপকৃত **হলেন** মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী।

আলোচনার এই পর্যায়ে একটি জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাধ্যমিক গ্রামার স্কুলগুলি আগের মতই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু ১৯০২ সনের পরে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার শেষে গ্রামার স্কুলে ভর্তি হওয়ার দাবি সোচ্চার হতে থাকে। **এরই ফলে ১৯০৭ সনে আরম্ভ হলো ফ্রী প্লেস পরীক্ষা।** (অর্থাৎ প্রাথমিক পড়াশুনার শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাছাই করা সর্বোত্তম ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য গ্রামার স্কুলে আসন সংরক্ষিত থাকবে। এদের জন্য ব্যয়ভার বহন করবে এল. ই. এ.।) এইভাবে দুইটি স্তরের মধ্যে ক্ষীণ সম্পর্ক স্থাপিত হলো মাত্র। (যে ৭৫ শতাংশ গ্রামার স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেল না, তাদের জন্য বড় বড় শহরের এল. ই. এ-গুলি নূতন এক ধরনের আধা-মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এর নাম হলো সেনট্রাল স্কুল। সহজেই অনুমেয় যে **এইগুলিই হলো বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য মাধ্যমিক স্কুল। পরবর্তীকালে এদেরই নাম হলো মডার্ণ স্কুল।**) এই ব্যবধানও দীর্ঘ দিন রাখা সম্ভব হলো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন চেতনা সঞ্চার করলো। এই চেতনা প্রতিফলিত হলো **১৯১৭ সনের আর একটি শিক্ষা-আইনে** (ফিসার আইন)। প্রস্তাব করা হলো যে যোগ্যতাসম্পন্ন সকলের কাছেই মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র টেকনিক্যাল শিক্ষা একসূত্রে গ্রথিত থাকবে। নার্সারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হবে। **নার্সারীর পরে শিক্ষাকাল হবে প্রাথমিক—মাধ্যমিক—কন্টিন্যুয়েশন, এই তিন স্তরে পরম্পরায় গ্রথিত।**

যুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হলো। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় ছিল মধ্যবিত্তের দাবি। এবার হলো শ্রমিকশ্রেণীর দাবি। বস্তুত মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সর্বজনীন করার দাবি উঠলো। ১৯২৬ সনে **'হ্যাডো কমিটি'** সুপারিশ করলেন যেন সমস্ত শিশুর কৈশোর জীবনকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ প্রকারান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকলের কাছে

উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করলেন। গ্রামার স্কুলের সঙ্গে মডার্ণ স্কুলগুলিকেও স্বীকৃতি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়।

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৩৮ সনে 'স্পেন্স কমিটি' প্রস্তাব করলেন যেন ছাত্রদের প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী **তিন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়।** কমিটি অভিমত দিলেন যে শিশুদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(ক) যাদের বিমূর্ত এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রবণতা আছে, খ) যাদের কারিগরি ও যান্ত্রিক দক্ষতার সম্ভাবনা আছে এবং (গ) যাদের ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা আছে। এই তিন শ্রেণীর জন্য যেন তিন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়—যেমন, (ক) প্রথম শ্রেণীর জন্য তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রম অবলম্বন করে গ্রামার স্কুল, (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগবিদ্যার সমন্বয়ে টেকনিক্যাল হাই স্কুল, (গ) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পতাত্ত্বিক মডার্ণ হাইস্কুল। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে সাধারণ পরীক্ষার ফলাফল এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করে তিন ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে।

এই রিপোর্ট ভিত্তি করে ১৯৪১ সনে 'সিরিল নরউড কমিটি' প্রস্তাবিত ত্রি-ধারা শিক্ষায় পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করেন এবং ১৯৪২-৪৪ সনে 'ম্যাকনেয়ার কমিটি' শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয় সুপারিশ করেন।

ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে স্বশাসিত নানা ধরনের বিদ্যালয় এবং "পাবলিক" স্কুলগুলির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কের কথাও ভাবতে হয়। স্বশাসিত বিদ্যালয় ছিল নানাশ্রেণীর। কোন কোন বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য গ্রহণ করতো। এদের বলা হলো সহযোগী Associated স্কুল। কোন কোন আবাসিক বিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ আসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। আবার সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী বিদ্যালয়ও ছিল। এইসব স্কুল সম্পর্কে গঠিত 'ফ্লেমিং কমিশন' (১৯৪২-৪৪) **প্রস্তাব করলেন এমন ব্যবস্থা যেন স্বশাসিত থেকেও এরা সর্বাঙ্গীণ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হতে পারে।**

১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন

এইসব রিপোর্টের ফলশ্রুতিই হলো ১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইন। এই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে আইনের সাহায্যে একটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। **শিক্ষা ব্যবস্থাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং মাধ্যমিকোত্তর (further) স্তর পরম্পরায় ভাবে থাকবে।** প্রথম স্তরের শিক্ষার নাম হবে প্রাথমিক শিক্ষা।

পূর্ণ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ **সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তর এবং মাধ্যমিক স্তরের ৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে।** (পরে এই বয়ঃসীমাকে ১৬ বছরে উন্নীত করা হয়েছে)। বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষার পরেও অন্ততঃ এক বছর থাকবে আংশিক সময়ের শিক্ষা। যত শীঘ্র সম্ভব এই continuation শিক্ষাকেও ১৮ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হবে। নার্সারী শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা যুবশিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্বন্ধেও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা সকলের কাছে উন্মুক্ত হলো, সেইহেতু গ্রামার স্কুলে ভর্তির জন্য ফ্রী প্লেস পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

১৯৪৪ সনের আইনে চার্চের সঙ্গে আপস করা হয়। ভলাণ্টারী স্কুলগুলিকেও স্থানীয় শিক্ষাকরের অংশীদার করা হয়। রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয়েও স্বীকৃত ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (অবশ্য অনিচ্ছুককে অব্যাহতি দেওয়ার বিধিও রয়েছে।) এইভাবে রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয় (maintained school) এবং চার্চপোষিত বিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের সংঘর্ষ আপসে মীমাংসা হয়। উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়কেই এক কাঠামোর মধ্যে আনা হয়।

এই রকম আপস হয় স্বশাসিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পাবলিক স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও। এই বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যবিহীন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর বিদ্যালয় এল. ই এ. থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। দ্বিতীয় এক শ্রেণী সরাসরি মন্ত্রীদপ্তরেব সাহায্য ভোগ করে। আর এক শ্রেণী সাহায্য গ্রহণ না করে স্বাধীনতা ভোগ কবে। অবশ্য সকল শ্রেণীর পক্ষেই মন্ত্রীদপ্তরে তালিকাভুক্ত হওয়া এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীন হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এইসব সাধারণ বিদ্যালয় ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গদের জন্য স্পেশ্যাল স্কুলের ব্যবস্থা আলোচিত আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই সবপ্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষামন্ত্রী-দপ্তর স্থাপন করে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য দুইটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ইউ জি. সি-র উপর। আর প্রাথমিক, মাধ্যমিক, continuation কিংবা further education, নানা ধরনের টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ গুলিকে। তা ছাড়া

নার্সারী স্কুল, স্পেশ্যাল স্কুল, যুবকল্যাণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিকল্পনা তৈরী এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ -কেই।

নানা সংঘর্ষের পরে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকে স্থানীয় উদ্যোগ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যৌথ-প্রশাসনে একটি শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় ছকে নিয়ে আসা হয়েছে বলেই মন্তব্য করা হয়—"The Education Act of 1944 constitutes the most important single progressive step ever taken in Educational history" ১৮৩২ সন থেকে একশত বছরে শিক্ষা-আন্দোলনের ধাপে ধাপে বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিকে আংশিক পদক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু একটি সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পদক্ষেপ এই প্রথম।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৪৪ সনের আইন এবং তৎপরে গৃহীত কয়েকটি সংযোজনী কিংবা সংশোধনী আইনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে ইংলণ্ডের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। সাম্প্রতিক ব্যবস্থার কাঠামোটি নিম্নরূপ।

২ থেকে পূর্ণ ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত—নার্সারী বিদ্যালয় কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নার্সারী শ্রেণী, কিংবা গৃহশিক্ষা।

৫ থেকে পূর্ণ ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুশিক্ষা (ইনফ্যান্ট ক্লাশ)।

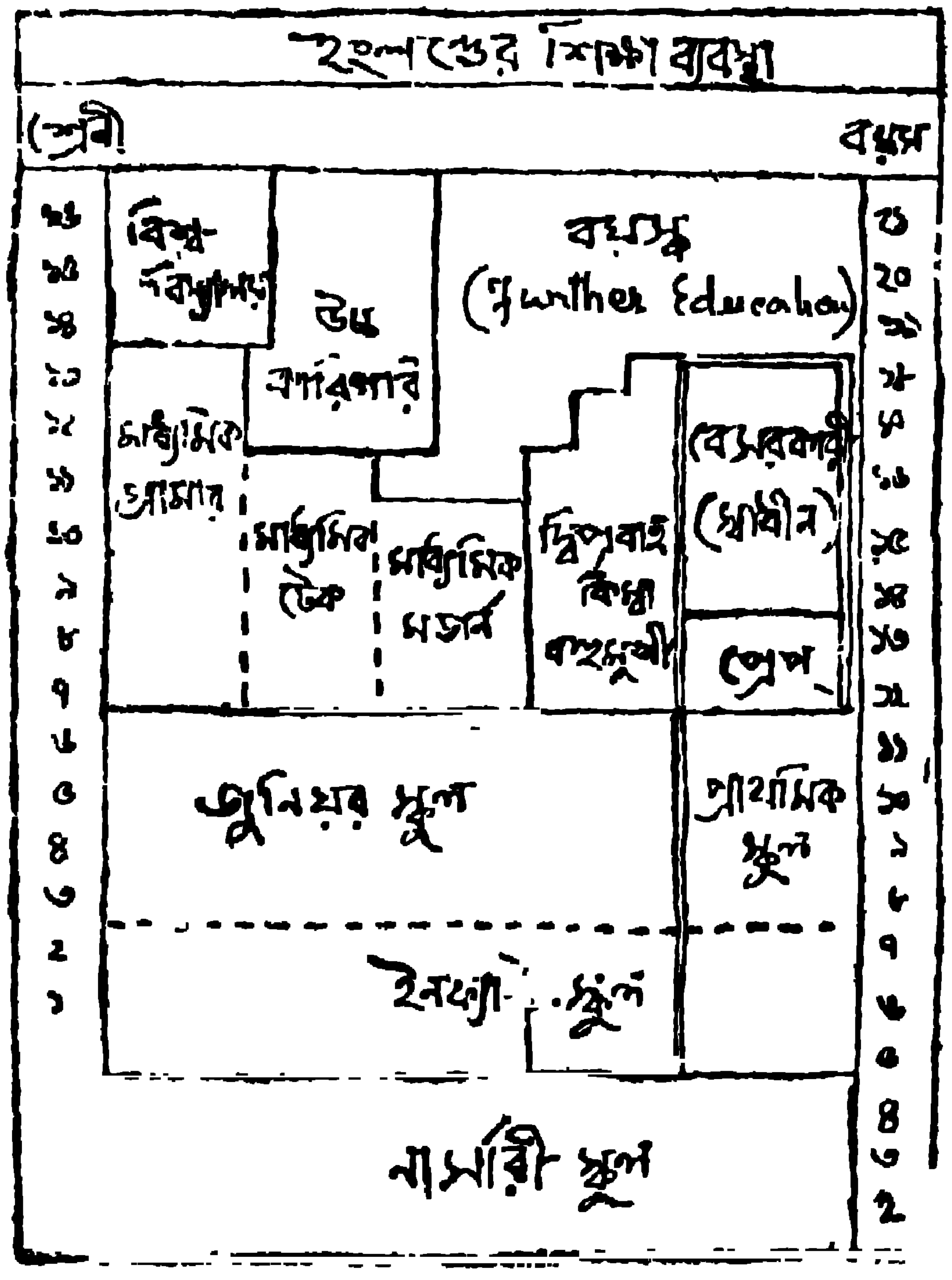

৭ থেকে দশোর্ধ বৎসর = প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণ ঘটে সাধারণত ১০½ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি পর্যন্ত বলা হয় **প্রথম স্তরের শিক্ষা**। এর মধ্যে নার্সারী শিক্ষা এখনও সর্বজনীন নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২৫০০০ এর মত। এর মধ্যে অর্ধেক বিদ্যালয় শিশু-শ্রেণী ও প্রাথমিক স্তর সহ ৫-১১ বছরের ছাত্র গ্রহণ করে। এক-চতুর্থাংশ শুধু ৫-৭ বছর পর্যন্ত শিশু-বিদ্যালয়। অবশিষ্টাংশ কেবল ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরে রয়েছে, (ক) ১১ থেকে ১৫-১৬ বছর পর্যন্ত সহজ সাধারণ শিক্ষার জন্য **মডার্ণ স্কুল**। সংখ্যায় এই শ্রেণীই সর্বাধিক। বর্তমানে রয়েছে ৪ হাজারের বেশী বিদ্যালয়। (খ) ১১ থেকে ১৬ কিংবা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে **গ্রামার স্কুল**। এই স্তরের শেষে সাধারণ পরীক্ষা। ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। বর্তমানে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩০০ শতের বেশী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এল ই. এ কর্তৃক পরিচালিত স্কুলগুলির নাম "কাউন্টি" স্কুল। (গ) ১১ থেকে পূর্ণ ১৬ কিংবা ১৮ বছর পর্যন্ত সাধারণ ও কারিগরি মিশ্রিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে **টেকনিক্যাল হাই স্কুল**। এগুলি গ্রামার স্কুলেরই সমতুল্য। এখানে পড়া শেষ করে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় যাওয়া চলে। বর্তমানে এই শ্রেণীর স্কুলসংখ্যা ৭ শতের বেশী।

এই তিন শ্রেণীর পৃথক চরিত্রের বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে তিন শ্রেণীর সমন্বয়ে **বহুসাধক বিদ্যালয় (কম্প্রিহেনসিভ)** অথবা যে কোন দুইটির সমন্বয়ে **নানা ধরনের দ্বি-মুখী বিদ্যালয় (বাইলেটারাল)**। ইংলণ্ডে গড়ে প্রতি ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সরকারী স্কুলে শিশুশ্রেণী থেকে মডার্ণ স্কুলের বয়ঃসীমা পর্যন্ত **অর্থাৎ ৫-১৬ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক**। এর উর্ধ্বে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশিষ্ট স্তর এবং তৃতীয় স্তরের শিক্ষা অর্থাৎ টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং Advanced Further Education প্রভৃতি সব শিক্ষাই ঐচ্ছিক ও বৈতনিক।

সাধারণ শিক্ষার কয়েক ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে মূক ও আংশিক মূক, বধির ও আংশিক বধির, ক্ষীণদৃষ্টি, দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গ কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনদের জন্য রাষ্ট্রপোষিত নানা ধরনের ৭০০ **শত বিশেষ বিদ্যালয়**।

এক্ষেত্রে ১৬+বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষান্তে বৃত্তিগত শিক্ষণ কিংবা further education এর ব্যবস্থাও আছে। **রাষ্ট্রপোষিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে স্বশাসিত বিদ্যালয়সমূহ।** এ ক্ষেত্রেও রয়েছে ১-৪ বছরের জন্য নার্সারী বিদ্যালয়, ৫-৮এর জন্য নানা ধরনের **প্রাইভেট স্কুল;** ৯-১৩এর জন্য পাবলিক স্কুলের Prep Section (অর্থাৎ প্রস্তুতি-বিভাগ), ১৪-১৮ পর্যন্ত "স্বশাসিত" কিংবা "পাবলিক" মাধ্যমিক বিদ্যালয়। (বেসরকারী এই সব স্কুলকে বলা হয় ভলাণ্টারী স্কুল)। **এইসব স্কুলে ভর্তি হওয়া ঐচ্ছিক। এগুলি বৈতনিক বিদ্যালয়।** বর্তমানে এর সংখ্যা ৪০০০। তার মধ্যে মাত্র ১৭৯ আছে এল. ই. এ. সহায়তাপুষ্ট "Direct Grant" গ্রামার স্কুল, ৩২৮টি আছে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, ("এইডেড্") এবং অবশিষ্টাংশ হলো সাহায্যহীন স্বশাসিত বিদ্যালয়। এ ছাড়াও আছে ১২টি স্পেশ্যাল স্কুল এবং কিছু প্রোগ্রেসিভ স্কুল। **সব স্বশাসিত বিদ্যালয়ই তালিকাভুক্ত এবং পরিদর্শনাধীন।** এদের মধ্যে ১৫০০টি আছে স্বীকৃত উচ্চমানের বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে যেখানে রাষ্ট্রপোষিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৬০০০, সেখানে স্বশাসিত বিদ্যালয় রয়েছে ৪০০০। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বে-সরকারী কায়েমী ও শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ধারার শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণী বৈষম্যমূলক বলে সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জোর আন্দোলন চলছে। এখন কম্প্রিহেনসিভ স্কুল গড়ে উঠছে। সমস্ত স্কুলকেই কম্প্রিহেনসিভ করবার জন্য আইন প্রস্তাবিত হয়েছে।

ইংলণ্ডে পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা হয় নি। সংস্কার করা হয়েছে। ১৫।১৬ বছর বয়সে ছাত্রছাত্রী সাধারণ বিদ্যালয় ছেড়ে চাকুরীতে ঢুকতে পারে, কিংবা টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে, নানা ধরনের পূর্ণ সময় অথবা আংশিক সময় অথবা সান্ধ্য-বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক পড়া শেষ করে উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে।

মাধ্যমিক পাঠান্তে পরীক্ষার নাম **জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জি সি. ই.)।** বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক সংগঠন এই পরীক্ষা পরিচালনা করে। কয়টি বিষয়ে এবং কোন কোন মানে পরীক্ষায় বসবে, এই সম্পর্কে ছাত্রদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত করার অধিকার আছে। সাধারণ মানের (ordinary level) পরীক্ষাগুলি দিতে হয় সাধারণত ১৬ বছরে এবং উন্নতমানের (advanced level) পরীক্ষা দিতে হয় ১৮ বছরে। শতকরা ১৪টি ছাত্রছাত্রী পাঁচ বা ততোধিক

বিষয়ে সাধারণ মানে পাস করে। শতকরা ৬২টি উন্নত মানে পাস করে দুই বা ততোধিক বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিম্নতম যোগ্যতা হলো দুটি বিষয়ে উন্নত মানের পাস। শিক্ষণ কলেজের নিম্নতম যোগ্যতা ৫টি সাধারণ মান। কিন্তু বাস্তবে ৩/৪ অংশের রয়েছে ২টি উন্নত মান এবং অর্ধেকের রয়েছে অন্তত ১টি উন্নত মান।

মাধ্যমিক স্তরের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু অংশই পড়ে মডার্ণ স্কুলে। বস্তুত ছেলেদের ৮৮% এবং মেয়েদের ৮৫% উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর না হয়ে মডার্ণ স্কুল স্তরেই পড়া শেষ করে। এদেরও অভিজ্ঞান-পত্রের দাবি সোচ্চার হওয়ায় ১৯৬৫ সনে পাঁচ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষান্তে একটি পৃথক **পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রবর্তন করা হয়েছে।**

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে লিখন, পঠন, গণিত, প্রকৃতিপাঠ ও সমাজবিদ্যা এবং শারীর শিক্ষা। স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রকেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের শেষে সাধারণ পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। এ জন্যই সম্প্রতিকালে ১১ বৎসর বয়সে সাধারণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলের কাছে উন্মুক্ত, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নয়। কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত। তাছাড়া প্রেপ স্কুলগুলি পাবলিক স্কুলের সোপান বিশেষ। এখানে পাঠ্যক্রমও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে কোন সাধারণ পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করে মাধ্যমিক স্তরে যেতে হয় না। অবশ্য এগুলি বৈতনিক বিদ্যালয় এবং বিত্তবানদের জন্যই সংরক্ষিত বলা চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ, ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যালয়-সংগঠনের কথা আগেই বিস্তৃত বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এইটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি-কোণ থেকে ১১ বছর বয়সে শিশুদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কারণ এই বয়সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত আদৌ পরিস্ফুট হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ রয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা

ইংলণ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাও সুসংগঠিত। জি. সি. ই. পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে সাধারণ মান কিংবা সাধারণ ও উন্নতমানের সমন্বয়ে ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১৮ বছর বয়সে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া চলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষণকাল ২ বৎসর। অবশ্য অতিরিক্ত দক্ষতার জন্য আরও এক বছর বাড়ানো চলে। সাধারণভাবে বলা চলে যে জি. সি. ই. উত্তীর্ণদের জন্য শিক্ষণকাল ৩ বছরের। এই সময়ে সাধারণ পাঠ, পেশাগত তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করা হয়। অন্তত একটি ঐচ্ছিকভাবে নির্বাচিত স্কুলপাঠ্য বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতেই হয়। পেশাগত তত্ত্বশিক্ষার পাঠ্যক্রমে রয়েছে শিক্ষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-ইতিহাস, স্কুলস্বাস্থ্য, বিশেষ শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি। ১২ সপ্তাহ-ব্যাপী শ্রেণীপাঠে শিক্ষকতার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। বয়স্ক শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে ১ বছরের শিক্ষণ-সুযোগও রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষণকাল ১ বছরের। এঁদের জন্য পাঠ্যক্রম পূর্বালোচিত পাঠ্যক্রমেরই মত। আভ্যন্তরীণ এবং লিখিত ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতক-শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ কিংবা শিক্ষণ-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ ছাড়া ইংলণ্ডে ট্রেণিং কলেজ রয়েছে ১৫০টি। শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীরূপে রয়েছে ১৭টি আঞ্চলিক শিক্ষণ-পরিষদ (এরিয়া ট্রেণিং অর্গানাইজেশন্—এ. টি. ও.)। পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা পরিচালনা করাই এদের কাজ। জাতীয় ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ। শিক্ষণ-সার্টিফিকেট দেয় মন্ত্রীদপ্তর। মন্ত্রীদপ্তর থেকে সরাসরি কিংবা ইউ জি. সি. মারফৎ কলেজগুলি সাহায্য পায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষণ-কলেজ পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ হয় ৫০ ভাগ। প্রতিটি কলেজেরই রয়েছে পরিচালকসভা। সুতরাং মন্ত্রীদপ্তর, উপদেস্টা-পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, এ টি. ও. এবং কলেজগুলির যৌথ উদ্যমে শিক্ষণ

ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারিত হয় "বার্ণহাম কমিটির" সুপারিশ অনুসারে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলেই সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, নৌ এবং বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও গৃহবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। কৃষি ও হর্টিকালচারের জন্য রযেছে বিশেষ কাউন্টি স্কুল। তাছাড়া কারিগরি বিদ্যালয় রয়েছে বহু ধরনের। সপ্তাহে নিম্নতম একদিন সান্ধ্যক্লাশের ভিত্তিতে ৩।৪ বছর পড়ার পরে ডিগ্রীস্তরে পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। সাধারণ মানের আংশিক সময়ের বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ রয়েছে। উন্নতমানের ২ থেকে ৪ বৎসরের পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কলেজ রয়েছে। উন্নত মানের কারিগরি শিক্ষার জন্য আছে ২৫টি রিজিওন্যাল কলেজ। Advanced Technology-র জন্য আছে বিশ্ববিদ্যালয় মানের দশটি কলেজ এবং ৬টি জাতীয় কলেজ।

জি. সি. ই. পরীক্ষায় উন্নতমানে সাফল্যের ভিত্তিতে ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেট ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় যোগ দেওয়া যায়। জি. সি. ই. পরীক্ষায় সাধারণ মানে সাফল্যের ভিত্তিতে নানা ধরনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া further education পর্যায়ে কর্মরত অবস্থায় সর্বসময় কিংবা আংশিক সময় কিংবা সান্ধ্য বিদ্যালয়ে শিল্প, কলা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

উচ্চশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার কাল ৩ বছর। ইংলণ্ডে বর্তমানে আছে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যক্রমে বিশেষীকরণ স্থির করে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ডিগ্রীদানের একমাত্র মালিক। কিন্তু সম্প্রতি Robbin Committee-র সুপারিশ অনুসারে Council for National Academic Awards গঠিত হয়েছে।

ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকারী প্রশাসন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে। যুব-কেন্দ্র বা ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় যুব-প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দেওয়া হয়। যুব-নেতা তৈরীর জন্য রয়েছে জাতীয় কলেজ। যুবকল্যাণ-সংস্থা প্রচুর সরকারী সাহায্য ভোগ করে।

বয়স্কশিক্ষা

বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থাও রূপায়িত হয় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে শ্রমিক সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতায়। Workers' Educational Association ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষা প্রচেষ্টা চালায়। তেমনি Women's Institute, Y.M.C.A, Y.W.C A. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও কর্তব্য পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি Extra Mural বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে। Ruskin College-এর মত কয়েকটি সর্বসময়ের আবাসিক বয়স্ক কলেজও রয়েছে। সর্বোপরি ১৯৪৪ সনের আইনে পূর্ণ অথবা আংশিক সময়ের অবসরকালীন শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এল ই. এ.-গুলির উপর। গ্রামাঞ্চলে Continuation শিক্ষার অংশরূপে কাউন্টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃত্তিগত শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, অবসর বিনোদনের শিক্ষা—এই তিন ধারায় এখন বয়স্কশিক্ষা প্রচেষ্টা প্রচলিত।

শিক্ষা-প্রশাসন

১৯৪৪ সনের আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন সরকারী-বেসরকারী যৌথ দায়িত্বের নীতি গৃহীত হয়েছে, তেমনি **শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃত্বের যৌথ দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে**। ইংলণ্ডে এককেন্দ্রীয়শাসনতন্ত্র (ইউনিটারী)। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় মন্ত্রীদপ্তরই প্রশাসনের কেন্দ্র, আর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থানীয় প্রশাসক। ইংলণ্ডে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য যথেষ্ট প্রাচীন। শাসনযন্ত্রের মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুত মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও এইসব প্রতিষ্ঠানের হাতে ব্যাপক দায়িত্ব দেওয়া ছিল। **১৯৪৪ সনের আইনের সাহায্যে দায় ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।**

ইংলণ্ডে **শিক্ষা-প্রশাসনের কেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী** (যিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অন্যতম)। মন্ত্রীদপ্তরের দায়িত্ব হলো দেশব্যাপী পরিকল্পনা তৈরী করা এবং কাজে রূপদানের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার দিক-নির্দেশনা ও উন্নয়ন। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা বলবার এবং নিয়ন্ত্রণের চরম অধিকার আইনগতভাবে মন্ত্রীদপ্তরের রয়েছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে—যেমন, (ক) শিক্ষার সুযোগ, মান এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, (খ) পিতামাতা ও শিক্ষকের স্বাধিকার নিশ্চিত করা; (গ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেণ্ট) নিশ্চিত করা; (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা; (ঙ) অবৈতনিক শিক্ষার স্তরে অবৈতনিকতা

নিশ্চিত করা এবং বৈতনিক স্তরে বেতন নিয়ন্ত্রণ এবং ভাতা, সাহায্য ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা; (চ) বিদ্যালয়ের গৃহ ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।

শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন সচিব ও কর্মচারীদের সহায়তায়। তাছাড়া মন্ত্রীদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন এক শ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক (Her Majesty's Inspectors—H.M.I.)। মন্ত্রীদপ্তরকে সাহায্য করেন দুইটি উপদেষ্টা-পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষিত হয় ইউ. জি. সি-র মারফৎ। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে তালিকাভুক্ত করেন মন্ত্রীদপ্তর। তাদের মর্যাদা সম্পর্কে চুক্তি এবং তদনুযায়ী সাহায্যও দিয়ে থাকেন মন্ত্রীদপ্তর। **বস্তুত ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন না, বিদ্যালয়ের মালিক নন এবং শিক্ষকও নিয়োগ করেন না। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকার রয়েছে সেখানেই।** অবশ্য খেয়ালখুশীমত কিছু করবার উপায় নেই, কারণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। তাই দুই স্তরের সহযোগিতায়ই শিক্ষা-প্রশাসন পরিচালিত হয়।

১৯৪৪ সনের আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আইনসিদ্ধভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হলো County Council এবং County Borough Council। বর্তমানে কাউন্টি কাউন্সিল আছে ৬২টি, কাউন্টি বরো কাউন্সিল ৮৩টি এবং লণ্ডন একটি পৃথক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, অর্থাৎ মোট ১৪৬টি। এগুলি সাধারণ স্বায়ত্বশাসন-প্রতিষ্ঠান। এদের শিক্ষা-কমিটির সঙ্গে স্থানীয় বেসরকারী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ) **এল. ই. এ**। প্রতিটি এল ই এ. তার প্রধান কর্মসচিব নিয়োগ করে। এল. ই. এ.-র শিক্ষানীতি রূপায়িত করাই তাঁর দায়িত্ব। তাঁর অধীনে রয়েছেন অন্যান্য কর্মচারী এবং বিদ্যালয়-পরিদর্শকবৃন্দ (এরা LEA Inspector—H.M.I. নন্)। এল, ই. এ. শিক্ষাবাজেট তৈরী করে। পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিলের দায়িত্ব রয়েছে এল, ই. এ-র জন্য অর্থসংস্থান করা। সুতরাং কাউন্সিলের একটি সাধারণ কর্তৃত্ব থাকলেও দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে এল. ই. এ. প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংশাসিত।

কাউন্টি ও কাউন্টি-বরো কাউন্সিল ছাড়াও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সুসংহত করার জন্য রয়েছে **'ডিভিশন্যাল অথরিটী'**। কাউন্টি কাউন্সিল, বরো কাউন্সিল, বিদ্যালয় পরিচালক সভার প্রতিনিধি, শিক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণভাবে এল. ই. এ.-র নির্দেশেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে।

এল. ই. এ-র প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে— ক) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) ব্যবস্থার সুসংহত পরিচালনা, (খ) নার্সারী-শিক্ষায় উৎসাহ ও সাহায্য দান, (গ) স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরি, (ঘ) স্থানীয় শিক্ষাকর আদায় ও বণ্টন, (ঙ) অঞ্চলের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয় ও চার্চ-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, (চ) বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, ছ) বিদ্যালয়-পরিচালকসভার সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ এবং এল ই, এ, ও শিক্ষক-সমিতির যৌথ পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষকের বেতনক্রম ও কাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন, (জ) ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থাপনা, (ঝ) মন্ত্রীদপ্তর থেকে সরকারী সাহায্য গ্রহণ ও বণ্টন। (শিক্ষার ৬০ ভাগ ব্যয় বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার) এবং ঞ) স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা-মানের উন্নয়ন। প্রতিটি এল. ই. এ.-এর নীচে স্কুলে রয়েছে পরিচালক-সভা Board of Governors or Management)। পরিচালক-সভার দায়দায়িত্ব নির্ভর করে বিদ্যালয়ের চরিত্রের উপর। বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার দায়িত্ব ও অধিকার অনেক বেশী। স্কুলের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য একান্তই প্রয়োজন। ইংলণ্ডে সর্বশেষ রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমানের পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। সেই থেকে এ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তন ঘটেছে কয়েকটি পর্যায়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে। প্রতিটি পর্যায়ের সংস্কারই তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আপসরফার এক একটি অভিব্যক্তি। আমূল পরিবর্তন কোন পর্যায়েই হয়নি। শিক্ষার বিবর্তনও হয়েছে ধাপে ধাপে নানা আপসরফার মাধ্যমে। ইংলণ্ড তাই ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরি তথা প্রয়োগবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। তেমনি ইংলণ্ডে জাতীয়তার প্রভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্ভব হয়েছে। একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারে বিশ্বাসী ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগত মালিকানার সুযোগ রক্ষা করেছে।

গণতন্ত্রের প্রভাবে শিক্ষার সর্বজনীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। এই অভিব্যক্তি ঘটেছে শিক্ষার বহুমুখীনতা তথা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কশিক্ষা-পরিকল্পনা, ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন প্রভৃতিতে। কিন্তু **আভিজাত্যের ঐতিহ্য আজও ইংলণ্ডে রয়েছে ; আর রয়েছে শ্রেণীবৈষম্য।** তাই রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একটি বেসরকারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষিত হয়েছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমনি হয়েছে কেন্দ্রীকতা ও বিকেন্দ্রীকতার মধ্যে একটি আপস।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা

"নয়া পৃথিবীর" জন্মক্ষণ থেকে সমাজ ও অর্থ নৈতিক বিবর্তনের ফলে আমেরিকার জাতীয় চরিত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমি হিসেবে এই সব উপাদানের কথা আলোচনা না করলে চলে না।

শিক্ষাবিবর্তনের পটভূমি

পশ্চিম গোলার্ধ আবিষ্কারের পরে ইউরোপ থেকে নানা জাতির, নানা ধর্মের ও নানা ভাষার লোক নানা উদ্দেশ্যে আমেরিকায় বসতি করতে গেলেন। কেউ গেছেন ধর্মীয় পীড়ন থেকে বাঁচবার জন্য, কেউ গেছেন জীবন সংগ্রামের তাগিদে, কেউ বা গেছেন ভাগ্য-অন্বেষণে। ইউরোপের নয়া অভিজাত সমাজ থেকে ভাগ্যান্বেষীরা গেছেন, আবার দরিদ্রতম শ্রমজীবীও গেছেন। তাই প্রায় ২০০ বছর ধরে আমেরিকা ছিল বহু জাতি ও বহু ভাষার দেশ। আজও আছে বহু ধর্ম। এইসং বিচিত্র উপাদান মিশ্রণের মধ্য দিয়ে একটি **'আমেরিকান জাতীয়সত্তা'** সৃষ্টি হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তারই ফলশ্রুতি হলো স্বাধীনতা সংগ্রাম।

এই বিবর্তনের ফলে ইউরোপীয় সমাজ থেকে মার্কিন সমাজ হলো একটু পৃথক। জন্মগত আভিজাত্য এখানে থাকলো না। তার বদলে এলো অর্থগত আভিজাত্য। সামাজিক গতিশীলতা (সোশ্যাল মবিলিটি) এখানে অনেক বেশী হলো। অবশ্য ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তাই আমেরিকার শিক্ষাবিবর্তনে ইংলণ্ডের প্রভাব পড়েছে। আবার অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, বিশেষত ফ্রান্স ও জার্মানী থেকেও আমেরিকা ভাবধারা গ্রহণ করেছে।

উপনিবেশ গড়ার দিনগুলির জীবনযাত্রার প্রভাব আমেরিকান চরিত্রে পড়েছে নানাভাবে। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীগুলি আত্মনির্ভর

হতে বাধ্য হয়েছিল। এই স্বয়ম্ভরতার সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি ছিল স্থানীয় গোষ্ঠী-সংগঠন। এ থেকেই আমেরিকায় স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে সদাসর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছে। তাই নিত্য নতুন ভাঙ্গাগড়ার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকানদের চরিত্রে!

পূব থেকে পশ্চিমে উপনিবেশের সীমানা প্রসারের দিনে সীমান্ত পরিবেশের অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে **বাস্তব-প্রবণতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতি নির্ভরতা** ভাবমানসে এসেছে প্রাগ্‌ম্যাটিক দর্শন। অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রামের মাঝে শিক্ষাকে জীবন-সংগ্রামের সহায়ক মনে করা হয়েছে বলেই বিমূর্ত শিক্ষার বদলে মূর্ত ও উপযোগী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। জীবনযুদ্ধে বাঁচার জন্য দক্ষতা ও কর্মপ্রবণতার মূল্য ছিল বলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। তাই সমাজ-ব্যবস্থা হয়েছে গণতান্ত্রিক। আবার ব্যক্তি উদ্যমের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল বলেই সমাজ হলো প্রতিযোগিতামূলক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নাতীত অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ রইলো।

ঔপনিবেশিকরা আমেরিকায় পেলেন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করেই হলো অতি দ্রুত শিল্পায়ন। এই উৎপাদনী কর্মোদ্যমের ফলে বিজ্ঞানের প্রতি, প্রয়োগবিদ্যার প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হলো তার প্রতিফলন হলো শিক্ষাচেতনায়। বিশেষীকরণের ঝোঁক বৃদ্ধি পেল, উৎপাদন দক্ষতার প্রস্তুতিকেই শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হলো। বৃহদাকার শিল্পের কল্যাণে সমাজ-জীবনে তীব্র শ্রেণী-বৈষম্য ঘটলো। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়লো।

প্রথম দুই শত বছরের জীবনে আমেরিকার সঙ্গে পুরাতন বিশ্বের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ঐ যুগেই আমদানী হলো নিগ্রোরা। সৃষ্টি হলো আর একটি সমস্যা। বিগত শতকের ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সম্পূর্ণ শতাব্দীব্যাপী চললো বিচ্ছিন্নতার যুগ (Isolationism)। এ যুগেই তৈরী হলো বর্তমান আমেরিকা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে আমেরিকা আবার উপস্থিত হলো বিশ্বের দরবারে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকা পৃথিবীর এক অংশের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো। আজ চলেছে তার বিশ্ব নেতৃত্ব রক্ষার সংগ্রাম। আমেরিকার জীবনেতিহাসের মধ্যে সঞ্চিত এই উপাদানগুলিই তার শিক্ষা-ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন

আগেই বলা হয়েছে যে ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম ভাগে ইউরোপের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর আমেরিকার নির্ভরতা ছিল খুব বেশী। তার ফলে ইউরোপের

শিক্ষা-চেতনা আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে। উচ্চমধ্যবিত্ত এবং অভিজাত সম্প্রদায় ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষার "ল্যাটিন গ্রামার স্কুল" ঐতিহ্য আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছেন। সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিত্তবানদের জন্য ল্যাটিন গ্রামার স্কুল। প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়।

কিন্তু অপরদিকে জীবনসংগ্রামে রত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষও নিশ্চেষ্ট বসে থাকে নি। তাদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্বায়ত্ত-শাসনের মাধ্যমে জনতাই এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছে। এইভাবে সমাজের দুই অংশের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ধরনের শিক্ষাপ্রচেষ্টার সূচনা হয়। কালক্রমে এই দুই রকম প্রচেষ্টা পরস্পরের সঙ্গে সংহত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের' জন্মকাল থেকে আমেরিকার নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা। স্বাধীনতার পর (১৭৭৬ সনের উত্তরকালে , মার্কিন রাষ্ট্রের আওয়াজ হলো স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র ও স্ব-শাসন। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই আদর্শ প্রতিফলিত হলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলনের (Enlightenment movement) প্রভাব আমেরিকাতেও পড়ে। এর ফলে যে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটে, তার নেতৃত্ব করেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ মনীষীরা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক চেতনা "একাডেমি আন্দোলনে" রূপ নেয়। প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক-কেন্দ্রিক তত্ত্বসর্বস্ব উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয় এ্যাকাডেমি। এ্যাকাডেমির শিক্ষা সর্বজনের কাছে উন্মুক্ত হলো। পাঠ্যক্রমে গৃহীত হলো বাস্তব জীবনের উপযোগী নূতন পাঠ্যবিষয়। গণিত ও বিজ্ঞানের বিশেষ স্থান করা হলো। এইভাবে মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটলো। শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং আধুনিকীকরণ আরম্ভ হলো। ল্যাটিন স্কুল তথা রক্ষণশীলদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এ্যাকাডেমি টিকে থাকলো। কিন্তু বৈতনিক বিদ্যালয় বলেই এতে সাধারণ দরিদ্রের সুযোগ হলো না। শিল্প ও বাণিজ্যকে অবলম্বন করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হচ্ছিল, এই স্কুল তাদের প্রয়োজন মেটালো। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন স্তরভেদ নূতন আকারে রয়ে গেল।

এর পরবর্তী অধ্যায় হলো মনরো নীতির উত্তরকালে ২৫ বৎসর (১৮৬০ সন পর্যন্ত)। আমেরিকার সীমানা তখন প্রশান্ত মহাসাগরের তটে পৌঁছেছে। বিরাট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে, বাণিজ্য ও শিল্পের জয়যাত্রা আরম্ভ

হয়েছে। শিল্পের জন্য শিক্ষিত ও সুদক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়েছে। গণতান্ত্রিক চেতনাও বেড়েছে। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে এবং নূতন সম্ভাবনা সদ্ব্যবহার করার আকাংক্ষায় সর্বসাধারণের শিক্ষা তথা 'কমন স্কুল' আন্দোলন দানা বাঁধলো। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন হোরেস্ ম্যান, হেনরী বার্ণার্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এই আন্দোলন কিন্তু যুগপৎ রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং এ্যাকাডেমিগুলির বাধার সম্মুখীন হলো। **এ্যাকাডেমি ছিল বেসরকারী এবং বহুলাংশে ব্যক্তিগত মালিকানায় মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান, গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু কমন স্কুল আন্দোলন দাবি করলো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সম-অধিকার।** নূতন বিদ্যালয় হবে অবৈতনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, স্থানীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত, সকলের নিকট উন্মুক্ত আমেরিকার নিজস্ব সর্বজনীক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবস্থা সম্ভব কেবল রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয়ে। সুতরাং সে দাবিও উঠলো।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করলেন সকল বেসরকারী বিদ্যালয়ই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। তাদের হাতে ভবিষ্যতের নাগরিকদের শিক্ষা ন্যস্ত করা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে নাগরিকদের প্রকৃষ্ট শিক্ষার উপর। এই শিক্ষাব্যবস্থাপনায় আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও ছিল শক্তিশালী। সংবিধানের দোহাই দেওয়া হলো। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পরে অগ্রগতির আন্দোলন আরও শক্তিশালী হলো। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করার অধিকার আছে কিনা—এ প্রশ্নের মীমাংসা হলো সুপ্রীম কোর্টে। **রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হলো। সৃষ্টি হলো সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য রাষ্ট্রপোষিত ৪ বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে "আমেরিকান হাই স্কুল"।**

গত শতাব্দীর শেষভাগ ছিল আমেরিকান হাই স্কুলের সুবর্ণযুগ। কিন্তু ইতিমধ্যে জীবনের জটিলতা বেড়েছে, শিল্প-বাণিজ্যে জটিলতা বেড়েছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বিচিত্রমুখী শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে বৃত্তি, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরি ও কৃষির জন্য নানা ধরনের উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষায় সমসুযোগ এবং সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি শক্তিশালী হয়েছে। একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপরদিকে সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষার দাবি করা হয়েছে। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে নূতন বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। আমেরিকান হাই স্কুলের এই বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের দাবি পুরণের ক্ষমতা ছিল না। **তাই সৃষ্টি হলো কম্প্রিহেনসিভ স্কুল।** কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, তথা গণতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি। এটি আমেরিকার নিজস্ব সৃষ্টি। (কম্প্রিহেনসিভ স্কুল সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে)।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসরকারগুলিই শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক। রাজ্যগুলি সংবিধান অনুসারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ ও প্রয়োজনে পার্থক্য রয়েছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-কাঠামো বিভিন্ন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোন একক শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাকাঠামো নেই। বিভিন্নতা রয়েছে বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স, বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ, (কোথাও দৈর্ঘ ৬ থেকে ১৬ বছর, কোথাও বা ৬ থেকে ১৮ বছর), বিদ্যালয়-জীবনের স্তরবিন্যাসেরও। (কোথাও আছে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৫ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, কোথাও আছে ৬ বছরের প্রাথমিক এবং ৬ বছরের মাধ্যমিক, কোথাও বা শেষোক্ত ৬ বছরকে ৩ বছরের জুনিয়ার হাই এবং ৩ বছরের সিনিয়র হাই হিসেবে ভাগ করা হয়।) তবে সাধারণভাবে যে দুই ধরনের ব্যবস্থা বেশীসংখ্যক রাজ্যে রয়েছে সেই অনুসারেই আমরা কাঠামো বিশ্লেষণ করছি। শিক্ষাকাঠামো মোটের উপর নিম্নরূপ :

(ক) দুই থেকে চার বৎসর বয়স—নার্সারী বিদ্যালয়।
চার থেকে ছয় বৎসর বয়স—কিণ্ডারগার্টেন।

প্রাকপ্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষা রাষ্ট্রীয় উৎসাহ পেলেও বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং ৬ বছর পর্যন্ত বাবা-মার কর্তৃত্বে গৃহশিক্ষা আইনগতভাবে এখনও স্বীকৃত।

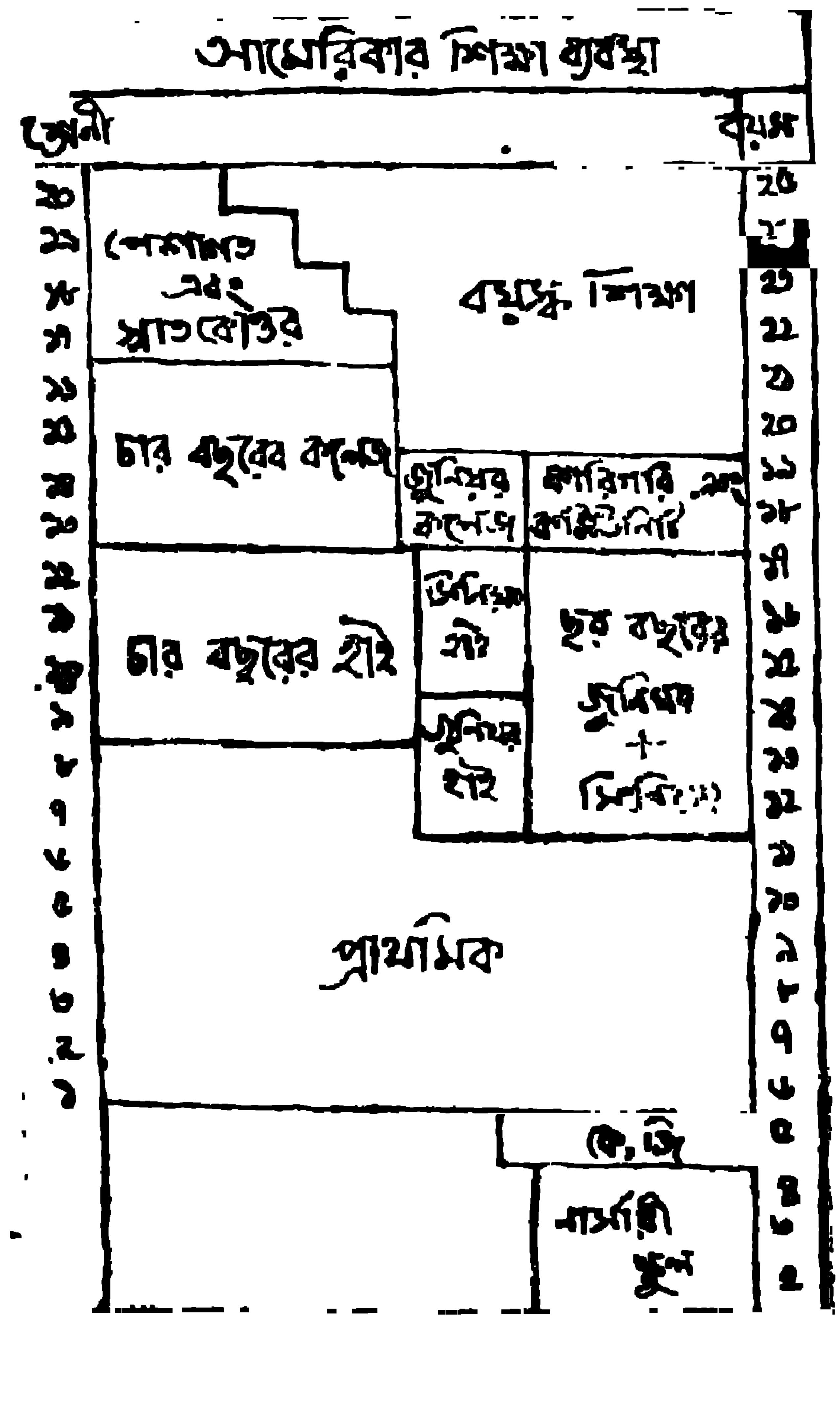

(খ) ৬ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত ৬ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষা; ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৩ বছরের সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষা। বিকল্পে ৬ বছরের প্রাথমিক ও একটানা ৬ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। অথবা ৮ বছরের প্রাথমিক ও ৪ বছরের মাধ্যমিক কিংবা বিকল্পে ৮ বছরেব প্রাথমিক ও ৪ বছরের বাধ্যতামূলক continuation শিক্ষা।

শিক্ষা-কাঠামোর স্তরবিভাগ যেমন-ভাবেই হোক না কেন, সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয় ৬ বৎসর বয়সে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয়

১৮ বছর বয়সে। **সাধারণ বিচারে তাই ৬ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক,** অর্থাৎ সমগ্র কৈশোর জীবন তথা মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরই সর্বজনীন বাধ্যতার অন্তর্গত।

(গ) **১৮ বছরের পরে উচ্চশিক্ষা।** এর মধ্যে কলেজীয় স্তরের প্রথম দুই বছরকে বলে 'জুনিয়র কলেজ স্তর' এবং পরবর্তী ২ বছর 'সিনিয়র কলেজ স্তর'। শেষোক্ত স্তরের শেষেই স্নাতক-উপাধি।

(ঘ) ১৮ বছরের পরে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষার বদলে ১।২।৩ বছরের নানা ধরনের টেকনিক্যাল কোর্স, নর্ম্যাল স্কুল কিংবা টিচার্স কলেজও আছে।

(ঙ) স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভব।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ

মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ আলোক-সম্পাত প্রয়োজন।

(ক) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য **জুনিয়র হাই স্কুল আন্দোলন।** বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শিক্ষাবিদরা শিশুর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স অর্থাৎ স্কুলের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর জীবনকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যেই এই তিনটি শ্রেণীর পৃথক সত্তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের মতে কৈশোর জীবনের এই প্রথম পর্যায়কে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত কারণে বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে। তাই এ সময়ে সাধারণ পাঠ্যক্রমকে আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করা হয়। পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইংরেজী, সাধারণ গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞানের মিশ্রিত পাঠকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কিছু হাতের কাজও শেখানো হয়।

জুনিয়র হাই স্কুলের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—(ক) শিশুদের সহজাত প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আগ্রহ আবিষ্কার, (খ) বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটানো, যেন সিনিয়র হাই স্কুল স্তরে তারা সুবিবেচনার সাথে পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারে, (গ) শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সংহতিসাধন, (ঘ) শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার দিক নির্দেশনা (গাইডেন্স), (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ সাধন করা, (চ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ, (ছ) শিশুদের সমাজীকরণ। যেহেতু এই স্তরটিকে প্রবণতা ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের

স্তর বলে মনে করা হয়, সেইহেতু জুনিয়র হাই স্কুলে সহপাঠ্যমূলক কাজের স্থান অনেক বেশী। অবশ্য সব রাজ্যে জুনিয়র হাই স্কুল স্বীকৃতি পায়নি।

(খ) আমেরিকার শিক্ষা-ইতিহাসে **দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো "জুনিয়র কলেজ" আন্দোলন।**

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন হতে থাকলো। শিক্ষামানেরও কিছু অবনতি হল। আবার বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অতি দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশেষীকরণের প্রশ্নও বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সার্থক বিশেষী-করণের শিক্ষার জন্য মৌলিক সাধারণ শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রযোজন। অথচ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শিক্ষাবিদরা অনুভব করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষায় মানের যে অবনতি ঘটেছে, তার প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিশেষীকরণের শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই **সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে ঐ শিক্ষা দীর্ঘতর করার এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়।** প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এই আন্দোলন সফল হয়। কলেজীয় জীবনের প্রথম দুই বছরকে বিশেষীকরণের স্তর হিসাবে বিবেচনা করার বদলে সাধারণ শিক্ষার অগ্রবর্তী স্তর হিসেবে মনে করাই এই আন্দোলনের মূল কথা। অর্থাৎ **স্কুলে ১২ বৎসর পড়ার শেষে শিক্ষাজীবনের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসরকে দৃঢ়তর সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সময়রূপে মনে করা হয়।** এর অর্থ বিশেষ শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা নয়, গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষাবর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপের এই আন্দোলনই 'জুনিয়র কলেজ আন্দোলন' নামে পরিচিত। শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে এই দুইটি বৎসরের স্থান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে চার বছরের ডিগ্রীকলেজের প্রথম দুই বৎসরকে পৃথক সত্তারূপে জুনিয়র কলেজ এবং শেষ দুই বৎসরকে সিনিয়র কলেজ রূপে দেখা হয়েছে। কোথাও এই দুইটি বছরকে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে ৮+৪+২ কিংবা ৬+৬+২ অথবা ৬+৪+৪ স্কীম চালু হয়েছে। কোথাও আবার দুই বছরের আলাদা জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জুনিয়র কলেজ আন্দোলন প্রথম অবস্থায় সাধারণ শিক্ষাকে দীর্ঘতর এবং দৃঢ়তর করার আন্দোলনরূপেই দানা বেঁধেছিল। **কিন্তু কালক্রমে জুনিয়র কলেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন এসেছে।** ১৯২৯-৩২ সনের বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের সময় দেখা গেল যে বহু তরুণেরই চার বছরের পূর্ণাঙ্গ কলেজীয় শিক্ষা

শেষ করার আর্থিক সঙ্গতি নেই। অথচ তারা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে দীর্ঘতর কিছু আকাঙ্ক্ষা করছে। এইসব ছাত্র প্রচুর সংখ্যায় জুনিয়র কলেজে যোগ দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ এবং জুনিয়র কলেজের শিক্ষাই হবে তাদের পক্ষে শেষ শিক্ষা, সেইহেতু জুনিয়র কলেজকেও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হলো। এই কলেজের Terminal Function স্বীকৃত হলো। বহু ধরনের বৃত্তিগত, পেশাগত এবং দক্ষতাগত পাঠ্যক্রম জুনিয়র কলেজে গৃহীত হলো। বর্তমানে বহু জুনিয়র কলেজ terminal এবং vocational কার্যক্রম ছাড়া বয়স্কশিক্ষার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে এইভাবে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে অনেক জুনিয়র কলেজই Community College নাম পেয়েছে।

(গ) আমেরিকার সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় **তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে "সাধারণ শিক্ষা" আন্দোলনে** (General Education Movement)। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার দ্রুত উন্নতি এবং দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বিশেষীকরণের প্রতি অতি মাত্রায় ঝোঁক এসেছিল, একথা নিঃসন্দেহ। অতি বিশেষীকরণের এই প্রবণতার ফলে শিক্ষা তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এসেছিল অতি সংকীর্ণতা। বিশেষীকরণের ক্ষেত্র ছাড়া বৃহত্তর জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং আগ্রহহীনতার বিপদ সৃষ্টি হলো। বয়স্ক নাগরিকের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রার জন্য যে সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে, সভ্য সমাজের মানুষ হিসেবে যে সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের প্রয়োজন রয়েছে, এ কথাই প্রায় অস্বীকৃত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো। এমন কি সাধারণ কলেজগুলি উদার মানবিক শিক্ষাক্ষেত্রের বদলে বিশেষীকরণের প্রস্তুতিক্ষেত্রে পরিণত হলো। বিশেষীকরণের চাপে জ্ঞানক্ষেত্র হলো খণ্ডিত এবং সংকীর্ণ। সামাজিক ভাবমানসে পারস্পরিক আদান-প্রদানের অভাবে সমাজিক সংহতিই ভাঙ্গবার উপক্রম হলো। বিশেষীকরণের প্রবণতা স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রেও ঢুকলো।

শিক্ষাবিদগণ প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন যে বিশেষীকরণের যেমন মূল্য আছে, তেমনি অতি বিশেষীকরণের বিপদ আছে। পিতা অথবা মাতা হিসাবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, সভ্য সমাজের মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের সমশিক্ষার ভিত্তি প্রয়োজন। সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতির সর্বনিম্ন জ্ঞান প্রতিটি নাগরিকেরই থাকা প্রয়োজন। সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় (Common), Non-specialised, Non-vocational মৌলশিক্ষাই (Core) "সাধারণশিক্ষা" অর্থাৎ General Education-এর মূল তাৎপর্য।

এই সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে -(ক) গণতান্ত্রিক নীতিবোধ সঞ্চার করা, ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, (খ) গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে নাগরিকের যোগ্য ভূমিকা পালনের শিক্ষা দেওয়া, (গ) ব্যক্তিমানুষ ও বৃহত্তর মানব সমাজের সৌহার্দ এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া, (ঘ) মানুষেব জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও অবদান অনুভব করতে সাহায্য করা, (ঙ) ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা, (চ) আবেগ-প্রক্ষোভের সুস্থ ভারসাম্য নিশ্চিত করা, (ছ) সাহিত্য ও চারুকলার মূল্য অনুভব করা, (জ) পারিবারিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য ও কর্মদক্ষতার শিক্ষা অর্জন করা এবং (ঝ) সুষ্ঠু চিন্তাশক্তির বিকাশ করা।

প্রস্তাবিত **সাধারণ শিক্ষা "বিশেষ শিক্ষার" পরিপন্থী নয় বরং পরিপূরক,** কারণ সাধারণ শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপরই বিশেষ শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে। এই শিক্ষা কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষাও নয়। প্রাথমিক হতে স্নাতক স্তর পর্যন্ত এ শিক্ষা বিস্তৃত থাকবে। পাঠ্যক্রম ও সমপাঠ্যক্রমমূলক কার্যসূচীর সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে ও বাইরে সর্বদাই সাধারণশিক্ষার প্রভাব থাকবে।

এই সাধারণ শিক্ষানীতিকে অবলম্বন করেই পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ গণিত, সমাজবিদ্যা, আবশ্যিক হস্তশিল্প, সমপাঠমূলক কার্যক্রম, "কনস্ট্যাণ্ট" পাঠ্যবিষয় এবং কারিগরি পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাধারণ পাঠ্যক্রমের সংযোজনার ব্যবস্থা হয়েছে।

(ঘ) আমেরিকার শিক্ষায় **চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার মান নির্ধারণ, তথা পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত্ব।**

শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। তাই আপন গতিতে এবং প্রবণতা অনুসারে শিশুর অগ্রগতির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর সম্ভাবনা, প্রবণতা ও ক্ষমতা ভিন্ন বলেই সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষামান নির্ধারণের রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্লাশ-প্রমোশন পরীক্ষার পরিবর্তে "গ্রেড-ক্রেডিট্" প্রথা প্রচলিত হয়েছে। সারা বছরে শিশুর কাজ অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি বিষয়ে তাকে ক্রেডিট্ দিয়ে থাকেন। সমগ্র বৎসরে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় ও সমপাঠ্য-মূলক কার্যক্রমে সংগৃহীত ক্রেডিট্ই প্রমোশন নির্ধারণ করে।

স্কুলপাঠের শেষে সাধারণ বহিঃপরীক্ষার যে পদ্ধতি ইংলণ্ডে কিংবা আমাদের দেশে রয়েছে, তেমন কোন **সাধারণ "ফাইনাল" পরীক্ষাও আমেরিকায় নেই।** স্কুলগুলিই সার্টিফিকেট দিতে পারে। কিন্তু অধীত বিষয়ে অর্জিত মান (স্ট্যাণ্ডার্ড)

।বং শিশুর দক্ষতার একটা সাধারণ পরিমাপের প্রয়োজন যখন দেখা দিল, তখন কার্ণেগি ইউনিট" প্রবর্তন করে সমস্যার সমাধান করা হলো। স্থির হলো যে সপ্তাহে ।াচ দিন, প্রতি দিন ৪৫ মিনিটের ঘণ্টা হারে সমগ্র শিক্ষাবর্ষে একটি পাঠ্যবিষয় নয়মিত ক্লাশে পড়লে বৎসরান্তে ছাত্রের জমার খাতায় একটি কার্ণেগি ইউনিট যাগ হবে তার ক্রেডিট্ হিসাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ৪ বছর এইভাবে নিয়মিত ।ড়লে এক একটি বিষয়ে হবে ৪টি ইউনিট। চারটি পূর্ণ ইউনিট যারা সংগ্রহ করতে ।ারবে তাদেরকেই সেই বিষয়ে উপযুক্ত মানসম্পন্ন বলে ধরা হবে। ১৫।১৬টি উনিটকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ কলেজে ভর্তির যোগ্যতা বলে গ্রহণ করা হবে। কার্ণেগি ফাউণ্ডেশন প্রস্তাবিত এই ক্রেডিটের নাম হয়েছে কার্ণেগি ইউনিট।

কিন্তু এতেও সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান হলো না, কারণ বিদ্যালয়ের গুণগত শ্রেণী-ভেদের ভিত্তিতে ইউনিটের মূল্যভেদ হতে বাধ্য। অথচ প্রতিটি বিদ্যালয়ই সার্টিফিকেট দেবার অধিকারী হওয়ায় ভাল এবং খারাপ স্কুলের দেওয়া ইউনিট ক্রেডিটের আপাতমূল্যের প্রভেদ নেই, যদিও বাস্তব মূল্যের প্রভেদ আছে। কলেজ-গুলি তাই সব স্কুলের অভিজ্ঞান-পত্রকে সমমূল্য না দিয়ে ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করে চললো। এই ক্ষেত্রেও **বিকল্প সমাধান এলো Accrediting System-রূপে।** কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের মান-নির্ণয়ের পরিবর্তে স্কুল ও কলেজগুলির মান-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করলেন। উন্নত মানের স্কুলের ক্রেডিট নিম্নমানের স্কুলের ক্রেডিট থেকে মূল্যবান—এই হলো তত্ত্ব। এইসব প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর তাদের নিরীক্ষার ফলাফল পুস্তিকাকারে, স্বীকৃত বিদ্যালয়ের (এ্যাক্রেডিটেড স্কুল) তালিকারূপে প্রকাশ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঐ তালিকা মেনে নেয়।

এ্যাক্রেডিটিং প্রথা যে বিদ্যালয় ও কলেজগুলির মধ্যে উন্নতির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল "স্বীকৃত" বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই যে উন্নত শিক্ষামানের অধিকারী এমন নিশ্চয়তাও নেই। সুতরাং আমেরিকার "পরীক্ষা" পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও ছাত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে—এ কথা নিঃসন্দেহ হলেও মাননির্ধারণ-সমস্যার যে বৈজ্ঞানিক সমাধান হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ফলশ্রুতি বা কার্যকারিতা যাই হোক, আলোচিত চারটি বৈশিষ্ট্য যে আমেরিকার শিক্ষাবিবর্তন তথা সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্যবিশেষে ৬ থেকে ৮ বৎসর। এখানে সাধারণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শিশুর আত্মপরিচিতি ও অনুধাবনশক্তি বৃদ্ধি; প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি; ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্যের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির শিক্ষা এবং আনন্দময় পরিবেশে দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভ জীবনের স্বাস্থ্য, স্থিরতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি। এর সাথে আছে লিখন-পঠন-গণিতের দক্ষতা, ন্যায়নীতি সহানুভূতি সৌন্দর্যপ্রীতি সঞ্চার। ১৯৪৬ সনে Commission for Educational Foundation এই উদ্দেশ্যকে "Skill Objective" রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের উপযোগী মৌলিক দক্ষতা অর্জনই হবে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞানে, আচরণে অনুভূতিতে, কাজে, সামাজিক সহযোগিতায়, ব্যক্তিগত প্রবণতায়। সুতরাং সংক্ষেপে বলা চলে যে সামাজিক দক্ষতা এবং সুনাগরিকতার শিক্ষাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, মৌলগণিত, আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতির মিশ্রিত পাঠ, প্রকৃতি পরিচয়, শারীর শিক্ষা, হাতের কাজ প্রভৃতি। পাঠ্যক্রম মূলত অনুবন্ধ-পদ্ধতিতে তৈরী। পাঠ-পদ্ধতিতে "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" নীতিই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তাই আধুনিক সমস্ত পাঠপদ্ধতিই আমেরিকায় কমবেশী প্রচলিত। প্রতিটি শিশু আপন গতিতে ক্রমবিকাশের সুযোগ পায় বলে বাৎসরিক পরীক্ষার বদলে অন্য পন্থা অবলম্বন করা হয়।

রাষ্ট্রপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। এই স্কুলগুলি সাম্প্রদায়িকও নয়। তাই রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ। তবে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করে ঐচ্ছিকভাবে চার্চবিদ্যালয়ে ধর্মীয় পাঠ গ্রহণের জন্য ছুটির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে **ব্যাপকভাবে বেসরকারী উদ্যমও স্বীকৃত। তাই চার্চ কিংবা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থারও বিদ্যালয় পরিচালনার, তথা বৈতনিক শিক্ষাদানের অধিকারও আছে।** স্কুলনির্বাচনের অধিকার রয়েছে পিতামাতার। কিন্তু যে স্কুলেই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক।

মাধ্যমিক শিক্ষা

অনেক আগেই অমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৭টি মৌলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল,—যেমন—স্বাস্থ্য, মৌলিক দক্ষতা, সুস্থ পারিবারিক জীবনের শিক্ষা, নাগরিকতা, বৃত্তিগতদক্ষতা, নৈতিক চরিত্র, সৌন্দর্যবোধ। বর্তমানে এর সামান্য রদবদল হয়েছে মাত্র।

১৯৪৪ সনে Educational Policies Commission-এর রিপোর্ট ("Education for All Youth") নাগরিকতার শিক্ষা, বৃত্তির প্রস্তুতি, বৌদ্ধিক বিকাশ, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনে "Commission On Life Adjustment Education" মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের সকল দিকে সামঞ্জস্যের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের আলোচনায় পূর্বোক্ত Seven Cardinal Principles of Life Adjustment মোটামুটি স্বীকৃত হয়।

বর্তমানে একথাই মোটামুটি স্বীকৃত যে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ ধরনের কাজ—Terminal Education, General Education, Pre-professional Education, Life Adjustment Education. **যুগপৎ এই চার রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমেরিকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হলো কম্প্রিহেনসিভ স্কুল।** মাধ্যমিক শিক্ষার দৈর্ঘ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় এখানে বেশী। বহু ধরনের পাঠ্যকে পাঠ্যক্রমে সমমর্যাদায় স্থান দেওয়া হয়েছে। তেমনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা—যুগপৎ এই দুইটি উদ্দেশ্য পূরণ করাই কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের লক্ষ্য। কম্প্রিহেনসিভ স্কুল ছাড়া **টেকনিক্যাল, বাণিজ্যিক, গৃহবিজ্ঞান, কৃষি পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে বিশেষীকৃত হাই স্কুলও আমেরিকায় অনেক আছে।** রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি **সমসুযোগের ভিত্তিতে প্রবাহবিহীন সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান।** অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই অবৈতনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। তবে ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় পাঠের জন্য চার্চ স্কুলে যাওয়ার রীতি আছে।

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত স্কুলের ছাত্রসংখ্যাই বেশী, কিন্তু নানা ধরনের বৈতনিক প্রাইভেট স্কুলও রয়েছে অনেক। তবে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স পর্যন্ত যে কোন স্কুলে সন্তানকে পাঠাতেই হবে। বেসরকারী স্কুলগুলিও রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সাধারণভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম মেনে চলে। ইংলণ্ডের মত আমেরিকাতেও continuation শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু ১৮ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে নানা ধরনের পাঠ্য কিম্বা বিশেষীকরণের হাই স্কুল থাকায় বৃত্তি এবং শিল্পশিক্ষার স্কুলগুলিই 'কন্টিনিউয়েশন' শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করে। ২৭টি রাজ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ও বিভিন্ন

বয়সের জন্য এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। আর রয়েছে চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা।

শিক্ষক-শিক্ষণ ঃ—সমগ্র আমেরিকায় এক ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই, কারণ প্রতিটি রাজ্যেরই নিজস্ব ব্যবস্থা স্থির করার অধিকার আছে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা আছে; যেমন—শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি প্রয়োজন। এই স্তরের শেষে প্রাথমিক স্কুলের জন্য শিক্ষণকাল ১ থেকে ৪ বছর এবং মাধ্যমিক স্কুলের জন্য ৪ থেকে ৫ বৎসর। শিক্ষণের মাননির্ধারণ এবং অভিজ্ঞানপত্র দানের ক্ষমতা কেবল রাজ্য শিক্ষাকর্তৃপক্ষের। সমগ্র আমেরিকার জন্য কোন নির্ধারিত মান নেই। প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব সর্বনিম্ন মান ঘোষণা করে। বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক চুক্তি ছাড়া পরস্পরের অভিজ্ঞান পত্র স্বীকারযোগ্য নয়।

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে নানা ধরনের। শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য আছে দুই বছরের নর্ম্যাল স্কুল। রাজ্যশিক্ষাবোর্ডই এইগুলি পরিচালন করে। আর রয়েছে টিচার্স কলেজ, সাধারণ কলেজের শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ। এগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—উভয় স্তরের জন্যই ৪ এবং ৫ বছরের পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ বছরের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫ বছরের শিক্ষণকেই যদিও আদর্শরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও বাস্তবে ১ থেকে ৫ বৎসরের নানা ধরনের শিক্ষণক্রম প্রচলিত আছে।

পাঠ্যক্রমে রয়েছে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্তুতির মিশ্রণ। সাধারণতঃ পেশাগত প্রস্তুতির জন্য এক-ষষ্ঠাংশ সময় ব্যয় করা হয়। চার বৎসরের টিচার্স কলেজে স্থান পেয়েছে সাধারণ শিক্ষা, অন্তত একটি বিষয়ে বিশেষীকরণ, পেশাগত শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা। সাধারণত শেষ দুইটি বছরে শিক্ষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-ইতিহাস, শিক্ষণপদ্ধতি এবং শ্রেণীব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারিক শিক্ষকতার ভিত্তিতে পেশাগত শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র শিক্ষণকালের $\frac{3}{5}$ সময় ব্যয় হয় সাধারণ শিক্ষায়, $\frac{1}{5}$ বিশেষীকরণের এবং $\frac{1}{5}$ পেশাগত শিক্ষায়। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ স্বীকৃত। তবে অভিজ্ঞান-পত্র দেবার অধিকার কেবল রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা

আগেই বলা হয়েছে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের বিচিত্র পাঠ্যক্রম বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার চাহিদা অনেকটা মেটায়। বিশেষীকরণের জন্য রয়েছে আরও নানা

ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর আছে কন্টিনিউয়েশন শিক্ষাব্যবস্থা। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে বহু ধরনের বৃত্তিগত শিক্ষাক্রম সমগ্র আমেরিকাতেই রয়েছে। ১৯১৪ সনের Smith Lever আইন, ১৯১৭ সনের Smith-Hughes আইন এই ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা-বোর্ড এই শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও গৃহবিজ্ঞান শিক্ষাব জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আছে। কেন্দ্রীয় অর্থানুকূল্যে ১৪-১৮ বছর বয়সের তরুণদের জন্য বাধ্যতামূলক আংশিক সময়ের কন্টিনিউয়েশন শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রতিরক্ষা-শিল্পের জন্য কিংবা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের জন্য ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা চালু আছে।

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষায় বেসরকারী ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন শিল্পগুলির নিজস্ব ট্রেণিং ব্যবস্থা রয়েছে। আর আছে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও নানা ধরনের টেকনোলজিক্যাল ইন্স্টিটিউট। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা, তথা প্রয়োগবিদ্যা আমেরিকায় সুসংগঠিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে আমেরিকা গ্রহণ করেছে—(ক) পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের শিক্ষা, (খ) সৃজনীচিন্তা ও কল্পনার শিক্ষা, (গ) সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বৌদ্ধিক শিক্ষা, এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির শিক্ষা। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে বহু ধরনের—যেমন ল্যাণ্ডগ্রাণ্ট কলেজ, লিবারেল আর্টস্ কলেজ, টিচার্স কলেজ, জুনিয়র কলেজ, কমিউনিটি কলেজ, পেশাগত "স্কুল", বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আনুমানিক ৪৫% হলো সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫% জুনিয়র কলেজ, ১৬% পেশা কলেজ এবং ১৪% শিক্ষক কলেজ। **উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যম আমেরিকায় অত্যন্ত প্রকট।** প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠানই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার পরেই স্থান বেসরকারী যৌথসংস্থা প্রতিষ্ঠানের। প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যমের স্থান তৃতীয়। চতুর্থ স্থানে ক্যাথলিক চার্চ। সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহ। এমন কি জুনিয়র কলেজও শতকরা প্রায় ৫০টি বেসরকারী।

উচ্চশিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই স্বশাসিত, স্বয়ম্ভর এবং সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই সমগ্র আমেরিকায় কোন নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষামান নেই। অতি

উন্নত মানের পাশাপাশি রয়েছে অতি নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান। তবে এ ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বয়স্ক শিক্ষাপ্রচেষ্টা

যেখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক, সেখানে বয়স্ক-নিরক্ষতার প্রশ্ন বড় নয়, বরং **সাক্ষর বয়স্কের উন্নততর শিক্ষাই বয়স্ক-শিক্ষার মূল কথা।** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রে কাজ করে। মাধ্যমিক স্কুলের বয়স্কশিক্ষা-প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ের Extension বক্তৃতা, Correspondence Course, Workers' Educational Association-এর নিজস্ব কাজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর আছে নানা ধরনের বাণিজ্য-কলেজ, বেসরকারী করেসপণ্ডেন্স স্কুল, কৃষিবিভাগের সমবায় ও গৃহবিজ্ঞান এক্সটেনসন সার্ভিস্, প্রতিরক্ষা-বিভাগের শিক্ষাপ্রকল্প, লাইব্রেরী প্রোগ্রাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নানা ধরনের কারিগরি শিক্ষাপ্রকল্প। পূর্ণ কিংবা আংশিক সময়ের শিক্ষায় একদিকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো যায়, কারিগরি শিক্ষার উচ্চস্তরে যাওয়া যায়, আবার সাধারণ শিক্ষার মানও বাড়ানো যায়।

শিক্ষা প্রশাসন

আমেরিকায় শিক্ষা প্রশাসন চলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী। আমেরিকার সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে সীমাবদ্ধ তালিকাভুক্ত ক্ষমতা। এই তালিকায় যা নেই, তাই অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা বলে ধরা হবে। ঐ তালিকায় শিক্ষার স্থান নেই। সুতরাং **সংবিধান অনুসারে শিক্ষা হলো রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার।** কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার আইনসম্মত ক্ষমতা নেই। তবুও সমগ্র জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। জাতীয় সংকট অথবা জরুরী অবস্থাতেই হস্তক্ষেপের সুবিধে হয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৯-৩২-এর অর্থনৈতিক সংকট, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই কেন্দ্রীয় তৎপরতা বেড়েছে। বস্তুতঃ জাতির স্বার্থে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে দুর্বলতা দূর করা, সমসুযোগ নিশ্চিত করা, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজ্যের কিংবা সমগ্র দেশের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় উদ্যোগ এসেছে পরোক্ষভাবে।

সংবিধানসম্মতভাবে **কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে**—যেমন, এস্কিমো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা, বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষা, হাওয়ার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, কংগ্রেস-লাইব্রেরী পরিচালনা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শিক্ষা, বিশেষ ধরনের শিক্ষা, আনবিক গবেষণামূলক শিক্ষা প্রভৃতি। তাছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। ভূমিদানের ভিত্তিতে ল্যাণ্ডগ্র্যাণ্ট কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত বলে এই সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় অধিকার স্বীকৃত রয়েছে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় অন্যান্য বিভাগের মাধ্যমে (কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ নেই) নানা ধরনের শিক্ষা-প্রকল্প চালু করা হয়। ল্যাণ্ডগ্র্যাণ্ট কলেজ, কৃষিগবেষণা কেন্দ্র এবং কৃষি ও গৃহ-বিজ্ঞানের 'এক্সটেনসন' কাজ পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ। প্রতিটির জন্য বিশেষ আইন পাস করা হয়েছে। বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগের অধীন Federal Children's Bureau মাতৃমঙ্গল ও শিশুরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। শিল্পবিভাগের সঙ্গে যুক্ত Federal Board of Vocational Education বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা উন্নতির জন্য দায়ী। Office of Indian Affairs রেড্-ইণ্ডিয়ান শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় Insular Bureau প্রতিরক্ষা-শিক্ষণের জন্য দায়ী। বস্তুত **কৃষি, বৃত্তি, পেশা, প্রতিরক্ষা, বিশেষ অঞ্চল অথবা বিকলাঙ্গদের শিক্ষাক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।** কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালিত হয় বিশেষ শিক্ষা-প্রকল্পের সাহায্যে। প্রকল্প গ্রহণ-বর্জনের অধিকার রাজ্যগুলির আছে। কিন্তু গ্রহণ করলেই আসবে প্রভূত অর্থসাহায্য। আর অর্থসাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে আসবে কেন্দ্রীয় খবরদারি।

রাষ্ট্রপতির যেমন বিভিন্ন বিভাগীয় সচিব আছেন তেমনি কোন শিক্ষাসচিব নেই, কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠাই সংবিধানসম্মত নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে শিক্ষাবিভাগের সমতুল্যভাবে রয়েছে "ফেডারেল অফিস অফ এডুকেশন"। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান "শিক্ষা-কমিশনার" হলেন শিক্ষাসচিবের সমতুল্য। অফিস অফ এডুকেশনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা, গবেষণা পরিচালনা করা, জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা, রাজ্যসমূহের অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে বিতরণ করা, শিক্ষাপত্রিকা প্রকাশ করা, রাজ্যগুলির প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করা এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থা পরিচালন করা। রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বালোচিত প্রত্যক্ষ

দায়িত্বগুলি পালন করাও এর কাজ। সুতরাং **প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সাংবিধানিক সুযোগ কম হলেও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে।**

সংবিধানের ভাবার্থে শিক্ষা সম্পূর্ণই রাজ্যের বিষয়। রাজ্যগুলিও এই অধিকার সম্পর্কে অতি সচেতন। একদিকে স্থানীয় সংগঠনের উপর দায়িত্ব দিতে, অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্ব সমর্পণ করতে রাজ্যগুলি বরাবরই গররাজি। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আপসে প্রশাসন সংগঠিত। রাজ্যের ক্ষমতার বিরাট তালিকা—যেমন, রাজ্যশিক্ষানীতি নির্ধারণ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি, বয়স্কশিক্ষা পরিচালনা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, কেন্দ্রীয় সাহায্য বিলি প্রভৃতি। রাজ্যের জন্য পাঠ্যক্রমে "কোর" নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাজ্য কর্তৃপক্ষের।

এই দায়িত্ব পালনের জন্য **প্রতি রাজ্যে আছে রাজ্য শিক্ষা বোর্ড। প্রতিটি বোর্ডে আছেন এক প্রধান কর্মসচিব,** এবং তাঁর অধীনে আছেন বিশেষজ্ঞদল, পরিদর্শক এবং সাধারণ কর্মচারী। বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসচিবের উপাধি, ক্ষমতা এবং নিয়োগপদ্ধতি বিভিন্ন। তবে সাধারণভাবে তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা কমিশনার নামেই পরিচিত। রাজ্যশিক্ষাবোর্ডগুলির দায়িত্বের মধ্যে আছে—(ক) শিক্ষা-আইন প্রয়োগ, (খ) সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, (গ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ পরিচালনা এবং শিক্ষকদের সার্টিফিকেট প্রদান, (ঘ) লাইব্রেরী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যালয়গৃহ অনুমোদন, (ঙ) রাজ্য শিক্ষা-বাজেট তৈরী এবং সাহায্য প্রদান, (চ) কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন প্রভৃতি। রাজ্যের শিক্ষানীতি কার্যকর করাই শিক্ষা কমিশনারের দায়িত্ব। তাছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান, শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রকাশনা, গণসংযোগ রক্ষা করাও তার কাজ।

সর্বনিম্নস্তরের প্রশাসন রয়েছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে। উপনিবেশ গড়ার যুগে যখন ছোট ছোট গোষ্ঠী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তখন থেকেই স্বশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য তথা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় অনেক পরে। এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় সংস্থাগুলি শক্তিমান। তদুপরি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আগেই সামাজিক সংস্থাগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা চালাচ্ছিল। নিজেদের এই ভূমিকা সম্বন্ধে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সচেতন ও স্পর্শকাতর। তাই সাংবিধানিক অর্থে

রাজ্যকর্তৃপক্ষই শিক্ষানিয়ন্তা হলেও ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের পথে আইনসম্মতভাবে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির হাতে বহু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়েছে।

কিছুদিন আগেও স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে পাশাপাশি ছোট অঞ্চল জুড়ে দিয়ে অঞ্চলের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল তথা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি শুধু শিক্ষা-প্রশাসক প্রতিষ্ঠান নয়, পৌর প্রতিষ্ঠানও বটে। অর্থাৎ অন্যান্য পৌরদায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষাও এদের একটি দায়িত্ব। প্রতিটি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (লোকাল অথরিটি = এল. এ) একটি শিক্ষাকমিটি গঠন করেন। কমিটির নাম এবং সভ্যসংখ্যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। প্রতিটি এল. এ. তার Superintendent of Education নিয়োগ করেন। এই নিয়োগপদ্ধতিও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করাই এল. এ-এর কাজ। সেই নীতি কাজে প্রয়োগ করাই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের দায়িত্ব।

আমেরিকার ক্ষুদ্রতম "অঞ্চলকে" বলে জিলা (ডিস্ট্রিক্ট)। প্রতিটি জিলায় নির্বাচিত স্কুল ট্রাস্টির দায়িত্ব হলো বিদ্যালয়ের গৃহ সরঞ্জাম ও আসবাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, স্থানীয় অর্থভাণ্ডার তৈরী করা এবং শিক্ষকদের বেতন সুনিশ্চিত করা। জিলার উচ্চতর স্তরের অঞ্চলকে বলে টাউন অথবা টাউনসিপ। টাউন-বোর্ডের ক্ষমতা জিলা-স্কুলবোর্ডের ক্ষমতার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। "কাউন্টি" হলো প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাভাবিক স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল। কাউন্টি-স্কুলবোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত এবং বহুক্ষেত্রে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও নির্বাচিত। কাউন্টি-বোর্ডের ব্যাপক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা-আইন প্রয়োগ, সাধারণ শিক্ষা প্রশাসন, পরিদর্শন, বিদ্যালয় উন্নয়ন, পাঠ্যক্রম সংগঠন প্রভৃতি। কাউন্টির সমপর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্ত অঞ্চল হলো 'সিটি'।

সাধারণভাবে এল, এ'র দায়িত্ব হলো শিক্ষানীতি-নির্ধারণ, রাজ্যশিক্ষা-আইনের ভিত্তিতে উপ-আইন রচনা, স্কুলবাড়ী ও আসবাবের ব্যবস্থা, ছাত্রকল্যাণ, আঞ্চলিক পাঠ্যক্রম তৈরী, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষাপ্রসার, আঞ্চলিক শিক্ষাপরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, শিক্ষক-বেতনের ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক শিক্ষাকর সংগ্রহ। অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিখণ্ডিত অথবা খর্বিত নয় অর্থাৎ, অঞ্চলের মধ্যে সকল স্তর ও সকল রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেই শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কোন কোন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবাজেট

তৈরীর ব্যাপারেও স্বয়ম্ভর। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সামগ্রিক পৌরপ্রশাসনের কাছে দায়ী। শিক্ষার জন্য বিভিন্ন খাতে করধার্যের ব্যবস্থা আছে। অঞ্চলভেদে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার মাত্র ১ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করেন, রাজ্যসরকার বহন করেন অঞ্চল ভেদে ১৭ থেকে ৩০ শতাংশ, আর অঞ্চলকর্তৃপক্ষ বহন করেন ৬৫ থেকে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত। এইজন্যই আমেরিকায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রশাসন অত্যন্ত শক্তিশালী।

ফেডারেল রাষ্ট্র বলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রশাসন রয়েছে তিন স্তরে। রাজ্যকর্তৃপক্ষই সাংবিধানিকভাবে দায়ী, কিন্তু কেন্দ্র ও অঞ্চল কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিন স্তরের সহযোগিতায় বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতিতে প্রশাসন পরিচালিত। শিক্ষাবোর্ড নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ অভিমত জ্ঞাপন করেন। সেই অনুসারে নীতি নির্ধারণ করেন বোর্ডের সভ্য শিক্ষাবিদ্গণ এবং নীতি রূপায়িত করেন বিশেষজ্ঞ ও আমলাগণ। এক্ষেত্রেও ত্রয়ী সংযোগ ঘটে।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য অত্যাবশ্যক। প্রথমেই লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত আমেরিকার শিক্ষায় ইউরোপের প্রভাব ছিল বেশী। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আমেরিকার নিজস্ব জাতীয় চরিত্র, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং বাস্তব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আমেরিকার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। ঐ সব প্রভাবই শিক্ষা-সংগঠন, প্রশাসন, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণপদ্ধতি স্থির করেছে। গতিশীলতা (মোবিলিটি) মার্কিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তাই মার্কিন জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত উদ্যম এই গতিশীলতাকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে প্রাগম্যাটিজম্ এনেছে কর্মচাঞ্চল্য এবং নিয়ত পরিবর্তনের আকাংক্ষা। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার অধিকার লাভ করেছে। তাই সমগ্র আমেরিকায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা। **আমেরিকাকে সেজন্যই বলা হয় "শিক্ষার গবেষণাগার।"**

কিন্তু এক-কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রশাসন না থাকলেও এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য নেই। যৌথস্মৃতি, যৌথমূল্যবোধ এবং আকাংক্ষা এক সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি রচনা করে রেখেছে। তা সমগ্র আমেরিকাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ৪টি মৌল উপাদান আজ সর্বজন-

স্বীকৃত। এগুলি হলো প্রয়োজনবাদ (essentialism), শিশুকেন্দ্রিকতা, প্রগতিবাদ এবং সমাজ-কেন্দ্রিকতা। সমগ্র আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা আজ দুইটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা—শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিক ও নাগরিকতার উন্নয়ন এবং শিক্ষায় সমসুযোগ। এই মৌল উপাদানগুলিই ঐক্যের সূত্র।

পাবলিক স্কুল ও কম্প্রিহেনসিভ স্কুল

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের স্কুল সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা 'পাবলিক স্কুল' এবং 'কম্প্রিহেনসিভ' স্কুলের কথা বলেছি। কিন্তু এদের সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

পাবলিক স্কুল :—'পাবলিক' কথাটি দিয়ে যে অর্থে আমরা 'জনসাধারণকে' বোঝাতে চাই, বিলেতের পাবলিক স্কুলগুলি সেই অর্থে আদৌ পাবলিক, অর্থাৎ জনসাধারণের নয়, বরং জনসাধারণের আওতার বাইরে ধনীদের বিশেষ ধরনের স্কুল। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে নানা কারণে ওদের নামের সাথে 'পাবলিক' শব্দটি জুড়ে গিয়েছে।

নানাভাবে এই স্কুলগুলির সৃষ্টি হয়েছে। (ক) কয়েকশ বছর আগেই কোন কোন ব্যক্তির দানপত্রের ভিত্তিতে দরিদ্রদের জন্য কয়েকটি গ্রামার স্কুল সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলের সুবিধের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে এগুলির স্থানীয় চরিত্র ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধনীরাই এগুলি দখল করে নে᠎ এবং স্কুলগুলির স্থানীয় চরিত্রও আর থাকে না। হ্যারো (Harrow) এবং শ্রুস্‌ব্যারির (Shrewsbury) মত শহর ও গ্রামের বিশেষ চরিত্র হারিয়ে এগুলি বিভিন্ন জায়গার ধনী সন্তানদের স্কুলে রূপান্তরিত হয়। (খ) কোন কোন ক্ষে ধর্মসংস্কার যুগের আগে থেকে প্রচলিত ক্যাথলিক কিম্বা আশ্রমিক স্কুলেরও রূপান্ত ঘটে। (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সিঁড়ি হিসেবে রাজকীয় সহায়তায়ও কোন কো স্কুল সৃষ্টি হয়। কেম্ব্রিজ-এর কিংস্ (King's) কলেজের স্কুল বিভাগ হিসেবে ১৪৪০ সনে স্থাপিত 'ইটন' (Eton) এবং অক্সফোর্ডের 'নিউ কলেজের' স্কুলবিভাগ হিসেবে ১৩৮২ সনে স্থাপিত 'উইনচেস্টার' এর কথা এই সূত্রে বিশেষভাবে বলা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শুধু এ দুটিই ছিল আবাসিক পাবলিক স্কুল। (ঘ) তাছাড় রাগবি'র (Rugby) মত কয়েকটি উঁচুমানের 'ফ্রি' গ্রামার স্কুলও কালক্রমে ধনীদে বিখ্যাত আবাসিক স্কুলে পরিণত হয়।

এইসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে প্রাধান্য ছিল প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের

বিশেষতঃ ব্যাকরণের। কোন কোন ক্ষেত্রে হিব্রুও গ্রহণ করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই আসেনি। পড়াশুনার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ পুরাতন ধর্মী 'ফর্মাল ট্রেনিং', অর্থাৎ ব্যাকরণের ব্যায়ামচর্চা। ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সুতরাং ভীতির সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং বেত্রদণ্ডের অমানুষিক ব্যবহার চলতো অহরহ। বোর্ডিং স্কুলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল নিম্নস্তরের। খেলাধুলো কিম্বা সহজ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই বয়স্ক ছাত্রদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ঘটতো; সৈন্য দিয়ে দমন করবার মত অবস্থাও হতো।

অপরদিকে এইসব স্কুলে পড়তো যে সব ধনীসন্তানরা, তাদের সম্পদের ব্যাধিও ছিল নানা ধরনের। পরস্পরের মধ্যে হল্লা-মারামারি, মত্ততা, জুয়াখেলা, কমবয়সীদের পীড়ন এবং অন্যান্য নৈতিক অপরাধ প্রবণতার অন্ত ছিল না। (প্রসঙ্গত বলা দরকার যে সে সময় এগুলি ছিল শুধু ছেলেদের স্কুল)। ইংলণ্ডের অনেক নামকরা সাহিত্যকৃতিতেও স্কুল জীবনে শাসন ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র অমর হয়ে রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই পাবলিক স্কুলগুলি সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠে। একদিকে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পমালিকরা এদের পুরাতন পাঠ্যক্রমকে সমালোচনা করেন; অন্যদিকে নূতন সমাজ ও শিক্ষা চেতনার ফলে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ জীবনও নিন্দিত হতে থাকে। সুখের বিষয় শ্রুস্ব্যারীর স্যামুয়েল বাটলার এবং রাগবি'র টমাস আর্নোল্ড'এর মত কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ভেতর থেকে সংস্কারে হাত দেন। বাটলার ব্যাকরণের কচকচি (Gerund Grinding) বাতিল করে পাঠ্যক্রমে ইতিহাস ভূগোলের স্থান করেন। উঁচু শ্রেণীর ছেলেদের স্কুল পরিচালনায় অংশীদার করে নেন। এর ফলে যে নূতন জোয়ার আসে তার প্রতিফলন হয় অক্সফোর্ড কেমব্রিজের পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলে।

রাগবিতে আর্নোল্ড পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন—অর্থাৎ সাধারণভাবে "লিবারেল" শিক্ষাকে। তাছাড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, আত্মপ্রকাশ, সক্রিয়তাকে মূল্য দেওয়া হয়। উঁচু শ্রেণীর ছেলেদের বিশেষ দায়িত্ব সৃষ্টির জন্য প্রিফেক্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। "6th Form Gentlemen"দের জন্য বোর্ডিংএ আলাদা থাকা ও পড়ার ব্যবস্থা, বিশেষ পরিদর্শন ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন সমালোচনার ফলে এ সময় সরকারও হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬১ সনে ক্লারেণ্ডন কমিশন নয়টি প্রধান পাবলিক স্কুলে অনুসন্ধান করেন। কমিশন রিপোর্ট দেন যে থাকা-খাওয়া ও দেখাশোনার উন্নতি হয়েছে, ছেলেদের স্বাস্থ্যও ভাল এবং

আগেকার ঔদ্ধত্যের বদলে নিয়মানুবর্তিতা এসেছে, স্কুল পরিবেশে নৈতিক মানও উন্নত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণতাকে সমালোচনা করে তাঁরা জার্মাণীর জিমনাসিয়ামের অনুকরণে সংস্কার করা, বিশেষতঃ ফরাসী কিম্বা জার্মাণ প্রভৃতি ভাষা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন।

এরপরে Lord Taunton-এর নেতৃত্বে 'স্কুল অনুসন্ধান কমিটি' নানাধরনের নয় শতাধিক স্কুল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে পাবলিক স্কুল সম্পর্কে বলেন যে প্রাচীন ভাষার গুরুত্ব না কমিয়েও আধুনিক ভাষা, গণিত, বিজ্ঞানের উপর বেশী জোর দিয়ে পাঠ্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং স্কুলের বেতন ও অন্যান্য চাহিদাও কমানো দরকার।

এই দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৬৮ সনে পাস হয় "পাবলিক স্কুল এ্যাক্ট" এবং ১৮৬৯ সনে "দান পোষিত স্কুল এ্যাক্ট" (Endowed School Act)। বাইরের এই প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ চেষ্টার ফলে পাবলিক স্কুলগুলি নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নূতন গৌরবের যুগে পাবলিক স্কুলগুলি ব্রীটিশ সাম্রাজ্য তো বটেই, অন্যান্য দেশ থেকেও ছাত্র আকর্ষণ করে। "জনসাধারণ" অর্থে এই স্কুলগুলি পাবলিক ছিল না। শুধু ইংলণ্ডের বদলে সারা পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত হয়ে এরা আর 'ইংলিশ'ও রইল না। সর্বোপরি প্রচলিত অর্থে শুধু লেখাপড়ার জন্য 'স্কুল' না হয়ে এগুলি হয়ে উঠল বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা আয়ত্ত করবার কেন্দ্র। তাই লঘুভঙ্গিতে বলা হয় যে বিলেতের পাবলিক স্কুল বিলেতীও নয়, পাবলিকও নয়, স্কুলও নয়।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পাবলিক স্কুলগুলি ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে রয়েছে। ইংরেজরা বলেন যে লেখাপড়ার মান ছাড়াও ছাত্র-স্বায়ত্তশাসন, খেলাধুলো, সহপাঠ্যক্রম, এবং স্কুলের আভ্যন্তরীণ জীবনের নানা বৈচিত্র্যের সাহায্যে এখানে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রতিযোগিতামূলক যৌথজীবন এবং শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের শিক্ষা দেওয়া হয়। (ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রবাদ যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের মাঠে।—কথাটির ভাবার্থ হলো, যে যে গুণের জন্য ঐ যুদ্ধে জেতা গিয়েছিল, সেগুলি অর্জিত হয়েছিল পাবলিক স্কুলের ছাত্রজীবনে)। বস্তুতঃ সম্প্রতিকাল পর্যন্তও ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীই হতেন পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। এই ঐতিহ্যের জন্যই গণতন্ত্রের যুগেও বিলেতে পাবলিক স্কুলের মর্যাদা কমেনি, বরং এর সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। বর্তমানে ভালমন্দ, ছোটবড় পাবলিক স্কুল রয়েছে কয়েকশ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে পাবলিক স্কুলগুলিকে নূতন ধরনের সমালোচনার

সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই যুগে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক মঞ্চে গুরুত্ব পেয়েছে। গণতন্ত্রের যুগে এই স্কুলের অত্যধিক বেতন ও অন্যান্য ব্যয়, বিশেষ সুবিধে সুযোগ এবং আভিজাত্যমূলক কৌলীন্যের উপর আক্রমণ চলে। পাবলিক স্কুলগুলিও কিঞ্চিৎ আপসের মনোভাব নিয়ে সাধারণ গ্রামার স্কুলের সাথে পরীক্ষাক্ষেত্রে একাসনে বসে। পরিশেষে ফ্লেমিং কমিটি সুপারিশ করেন যে মেধার ভিত্তিতে যেসব ছেলেমেয়ে পাবলিক স্কুল শিক্ষায় লাভবান হতে পারবে, পিতামাতার আয় নির্বিশেষে তাদের কাছে ঐ স্কুলের দরজা খোলা থাকবে।

এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এর শিক্ষা আইনে কতগুলি স্কুলকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পুষ্ট (Direct Grant) 'সহযোগী স্কুল' (Associated School) রূপে তালিকাভুক্ত করা হয়। এগুলিতে অভিভাবকদের আয়ের স্তর অনুসারে বেতন ও বোর্ডিং খরচে স্তর বিভাগ করা হয়। অন্যান্য বহু স্কুলে আসন সংখ্যার ২৫% এল্, ই, এ, গুলি রিজার্ভ করবার সুযোগ পায়। মেধার ভিত্তিতে বাছাই করা এইসব ছেলে-মেয়ের জন্য ব্যয় বহন করে এল, ই, এ, এবং প্রতিদানে স্কুলের পরিচালক সভায় ⅓ সভ্য মনোনীত করতে পারে। কিন্তু বাকি ৭৫% অংশ ছেলেমেয়ের সুযোগ সুবিধা হয় আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে। এজন্য পাবলিক স্কুলগুলি সম্বন্ধে এখনও সমালোচনার অন্ত নেই। এরা ভাল ছাত্র টেনে নেয় (creaming off), শিক্ষায় অসম সুযোগ সৃষ্টি করে এবং নয়া আভিজাত্য জন্ম দেয়। বস্তুতঃ ১৯৪৪'এর আইনের আওতায় এলেও এইগুলি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত নয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আভিজাত্যের প্রতীক। কিন্তু মজা এই যে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই স্কুলগুলির জন্য ইংরেজদের শ্রদ্ধা ও দরদেরও অন্ত নেই।

এই সূত্রে ভারতে পাবলিক স্কুল প্রচেষ্টার কথাও একটু বলা দরকার। আমাদের "দেশীয় নৃপতিরা" ছেলেদের পাঠাতেন বিলেতের পাবলিক স্কুলে। ক্রমে রাজা-মহারাজাদের জন্য 'প্রিন্সেস স্কুল' এ দেশেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই ধরনের স্কুলের প্রতি জনসাধারণের বিরূপতাই ছিল বেশী প্রকট। পাবলিক স্কুলের ছেলেরা ছিল দেশের লোকের কাছে একঘরে। কিন্তু মজার কথা এই যে স্বাধীনতার পরে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে চল্লিশটির বেশী দাঁড়িয়েছে। এগুলি আমাদের সমাজে নয়া-আভিজাত্যের পোশাক। মুদালিয়র কমিশনও এদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বলেছেন, অবশ্য সাধারণ সরকারী নিয়মকানুনের মধ্যে। মেধাবী ছাত্রদের জন্য এখন কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী

বৃত্তিও চালু হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য এবং দূরত্ব যোজন পরিমাণ।

বিলেতে যে যে গুণের জন্য পাবলিক স্কুলগুলি সমাদৃত, এখানেও সেই সেই অজুহাতে এদের সমর্থন করা হয়। কিন্তু আজও এদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় নি। আজও চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব গড়ার ফলশ্রুতি দেখা যায় নি। তার বদলে সমাজ জীবন ও সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন আভিজাত্যের উন্নাসিকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। ভারতের আর্থিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এদের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করাই কষ্টকর।

কম্প্রিহেনসিভ্ স্কুল :—বিলেতের বিশেষ পরিবেশে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল পাবলিক স্কুল, আমেরিকার বিশেষ পরিবেশে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে কম্প্রিহেনসিভ্ স্কুল।

আমেরিকায় যখন মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন হলো, শিক্ষায় সমসুযোগের কথা নীতিগতভাবে গৃহীত হলো এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হলো, তখন ব্যক্তিগত রুচি পছন্দের ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্কুলে নানা ধরনের পাঠ্য রাখতে হলো। বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কুল গড়বার বদলে সর্বার্থসাধক যে স্কুল গড়ে ওঠে, সেগুলিই আমেরিকার কম্প্রিহেনসিভ্ স্কুল।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ইংলণ্ডের মত ছাত্রদের তথাকথিত "মেধা ভিত্তিতে" শ্রেণী বিভাগ করা হয় না, কিম্বা আমাদের মত একই স্কুলে 'প্রবাহ' ব্যবস্থাও নেই। বিভিন্ন প্রবণতার ছাত্রছাত্রী একই স্কুলে পড়ে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান থেকে গণিত কারিগরি, বাণিজ্য এবং নানাধরনের ব্যবহারিক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকে। পাঠ্য বিষয়ের মূল্যভেদও করা হয় না, কারণ প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী জীবনযাত্রার জন্য যে কোন বিষয়ে যে কেউ দক্ষতা অর্জন করতে চায়, তা সবই সমমূল্যের মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের মধ্যেও পার্থক্য করা হয় না। বস্তুতঃ কম্প্রিহেনসিভ স্কুলগুলি প্রায় সবই সহ শিক্ষামূলক (co-educational)।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে সব ছেলেমেয়েকেই ভাষা, সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ গণিত, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়কে আবশ্যিক পাঠ্য রূপে নিতে হয়। আবশ্যিক পাঠ্যগুলিকে বলা হয় 'constants' অথবা 'solids'। এ ছাড়া প্রতিটি স্কুলে তালিকাভুক্ত বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বাছাই করতে হয় ঐচ্ছিক (ইলেকটিভ) বিষয় হিসেবে। ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকায় দু'শয়ের বেশী পাঠ্য রয়েছে (অবশ্য সব স্কুলেই সবগুলো পড়ানো হয় না)। বস্তুতঃ ঐচ্ছিক বিষয়

নির্বাচনে ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে, কারণ সে ক্ষেত্রে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরির মধ্যে শক্ত দেওয়াল নেই। সুতরাং কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের মৌলিক চরিত্র হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। শিক্ষায় গণতন্ত্রের এটি এক বিশেষ অভিব্যক্তি।

মার্কিন শিক্ষাবিদরা মাধ্যমিক শিক্ষার চার ধরনের চরিত্রের কথা বলেছেন। Terminal Education, General Education, Pre-professional Education, Life Adjustment Education— এই চার রকমের উদ্দেশ্য যুগপৎ পূরণ করবার জন্যই কম্প্রিহেনসিভ স্কুল। বহু ধরনের বিষয়কে সমমর্যাদা দিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে ঢুকবার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা—যুগপৎ এই দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করাই কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের কাজ।

সাধারণত গ্রেড ক্রেডিট ব্যবস্থাতেই এই স্কুল পরিচালিত হয়। স্কুলগুলিই সার্টি-ফিকেট দেওয়ার মালিক। এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থার ফলে অস্তিত্বের জন্য এগুলিকে সংগ্রামও করতে হয়। একই স্কুলের বাড়ীতে বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়ার ফলে 'সনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পাঠ্য অনুসরণকারী ছেলেমেয়ের মধ্যে সৌহার্দ জন্যে সহপাঠ্যমূলক কাজের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

'হনসিভ স্কুলের গুণগত আবেদন থাকুক কিম্বা না থাকুক, এর সংগঠনগত ।ন্য, বিশেষতঃ সমসুযোগ নীতির জন্য অন্যান্য বহু দেশ এই স্কুলের নকল ইংলণ্ডে এই ধরনের স্কুলের পক্ষে এখন প্রবল জনমত। অনেক 'একমুখী' মুখী কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের প্রভাব ভারতের উপরও কিছু পড়েছে। আমাদের 'কোর' এবং 'ইলেকটিভ' পাঠ্য সংগঠনে এই প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। তাছাড়া একই স্কুলের মধ্যে এখানে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বহুমুখী স্কুলগুলি পুরোপুরি কম্প্রিহেনসিভ হয়নি, কারণ এখানে প্রবাহ বিভাগ করা হয়েছিল। তা ছাড়া পাঠ্য বাছাইতেও পুরো স্বাধীনতা ছিল না; নির্দিষ্ট প্রবাহের মধ্যেই বাছাইকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে নূতন ১২ ক্লাস স্কুলও কম্প্রিহেনসিভ হয়নি কারণ এ ক্ষেত্রে সাধারণ স্কুলে মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ের সমাবেশ থাকবে এবং তার মধ্যে বাছাই করা চলবে; কিন্তু কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার জন্য থাকবে আলাদা পাঠ্যক্রম ও স্কুল ব্যবস্থা।

বস্তুতঃ গণতান্ত্রিকতাই কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের শ্রেষ্ঠ শক্তি। একটি স্কুলে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর ফলে শিক্ষার একটা সার্বিক রূপ ফুটে ওঠে! কিন্তু অন্যদিকে প্রশাসনের সমস্যা থাকে, বিরাটত্বের ঝুঁকি থাকে এবং বিশেষীকরণও পূর্ণাঙ্গ হয় না।

তুলনামূলক আলোচনা

দুইটি উন্নত দেশ—ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তুলনার মধ্য দিয়ে উন্নতিকামী ভারতের অনেক কিছু শিখবার আছে। আমরা কোথা থেকে কতটা নিয়েছি এবং আরও কতটুকু নেওয়া যায় সে বিষয়ের বিশ্লেষণও আমাদের উন্নতির পক্ষেই সহায়ক।

(১) **শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড মূলত ভাববাদী (Idealistic)** এবং **আমেরিকা প্রয়োজনবাদী (Pragmatist)**। ভাবাদর্শের পার্থক্য শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যেও পার্থক্য এনেছে। ইংলণ্ডে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং চরিত্র-গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, আমেরিকায় সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নাগরিকতা, সামাজিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য আজ আর কোন দেশেই কোন একটি ভাবাদর্শকে নিষ্কলুষভাবে গ্রহণ করা হয় না। তাই উভয় দেশেই তাত্ত্বিক সমন্বয়ের ঝোঁক আছে। অর্থাৎ **Eclecticism আজ উভয় দেশকেই প্রভাবিত করছে।** ভারতেও আমরা ইংলণ্ডের ভাববাদ এবং আমেরিকার প্রয়োজনবাদের সমন্বয় করবার চেষ্টা করছি। আমরা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের শিক্ষা এবং নাগরিকতা ও উৎপাদন দক্ষতার সমন্বয় করার কথা বলছি। সুতরাং ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমরা উভয় দেশ দ্বারাই প্রভাবিত। তদুপরি অধ্যাত্মবাদী ঐতিহ্য এবং সম্প্রতিকালের সমাজবাদী চেতনাকেও শিক্ষাদর্শে স্থান দিচ্ছি। অবশ্য বিভিন্ন উপাদানের সার্থক সামঞ্জস্য যে আজও হয়নি, একথা বলতেই হবে।

(২) **ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রাষ্ট্রের কাঠামো আলাদা।** সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লিয়ামেন্টই ইংলণ্ডে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করে। সুতরাং জাতীয় ভিত্তিতে একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে সম্ভব। তাছাড়া ইংলণ্ড নিজেকে "কল্যাণরাষ্ট্র" ঘোষণা করায় তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সেখানে বেশী। আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান। আমেরিকা ফেডারেল রাষ্ট্র। **ক্ষমতা সেখানে বহুলাংশে বিকেন্দ্রীকৃত।** সর্বোপরি আমেরিকা নিজেকে 'মুক্তগণতন্ত্র'রূপে দাবি করে। **ব্যক্তিগত উদ্যমের ক্ষেত্র সেই পরিমাণেই অবারিত।**

ভারতবর্ষ এ ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। ভারতে ইংলণ্ডের মত এককেন্দ্রিক শাসন নয়, আবার এখানকার ফেডারেল ব্যবস্থাও আমেরিকার মত ঢিলেঢালা নয়। ভারত কল্যাণরাষ্ট্র তথা সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছে, কিন্তু মিশ্রঅর্থনীতি গ্রহণ করেছে। **শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই সমাজবাদ এবং মুক্তগণতন্ত্রের সামঞ্জস্য চেষ্টা করছে।** কিন্তু এ চেষ্টার ফলপ্রসূতা সম্পর্কে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে।

(৩) উভয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। কিন্তু উভয় দেশেই সরকারী অবৈতনিক স্কুল এবং বেসরকারী বৈতনিক স্কুলের মধ্যে বাছাই করার অধিকার পিতামাতার আছে। সুতরাং **আর্থিক সঙ্গতি নির্বিশেষে প্রকৃত অর্থে কমনস্কুল কোন দেশেই হয়নি।** উভয় দেশেই গ্রামাঞ্চল কিংবা দরিদ্র অঞ্চলে neighbourhood school-প্রথা প্রচলিত হলেও শহর অথবা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অঞ্চলে এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ইংলণ্ডে বংশগত আভিজাত্যের প্রভাব এখনও আছে, আমেরিকায় আছে আর্থিক আভিজাত্যের প্রভাব। প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘেও পার্থক্য রয়েছে। ইংলণ্ডের ৪ বছরের স্থলে আমেরিকায় নিম্নতম ৬ বছর সময়কেই প্রাথমিক শিক্ষাকাল ধরা হয়। **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোন দেশেই বাধ্যতামূলক নয়,** কিন্তু উভয় দেশেই রাষ্ট্রীয় উৎসাহ রয়েছে। তবে ইংলণ্ডে শিশুশ্রেণীর পাঠ (ইনফ্যাণ্ট ক্লাস) অপেক্ষাকৃত সংগঠিত। ইংলণ্ডে প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্র-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আমেরিকায় তেমন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের সময়ও কোন বাছাইয়ের ব্যবস্থা নেই। সব শিশুই মাধ্যমিক স্কুলে সরাসরি ঢোকে।

ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—স্বাস্থ্য, প্রাণ, চরিত্র। আমেরিকার উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক নাগরিকতা, মৌলিক দক্ষতা এবং সামাজিকতা। পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে খুব মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। উভয় দেশেই ক্রীড়াপদ্ধতি, অনুবন্ধ এবং প্রগতিশীল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমেরিকা নিঃসন্দেহে অগ্রগামী। ইংলণ্ডে ধর্মীয় শিক্ষাকে সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ।

উভয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। ইংলণ্ডের মূল সমস্যা শিক্ষাকে জীবনকেন্দ্রিক করা এবং কমনস্কুল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

আমেরিকায় মূল সমস্যা শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং লব্ধশিক্ষার স্থায়ীকরণ। ভারত সব দিক দিয়েই উভয় দেশের বহু পিছনে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাও সর্বজনীন এবং অবৈতনিক হয় নি। কমনস্কুল এখানে সুদূরপরাহত। পাঠ্যক্রম এখনও জীবনকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত। এইসব দিকেই আমরা ওদের থেকে কিছু নিতে পারি।

(৪) **মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার দৈর্ঘ্যেও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পার্থক্য রয়েছে।** ইংলণ্ডে এখন ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আর আমেরিকায় সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ সাধারণভাবে ১৮ বছর পর্যন্তই শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলণ্ডে রয়েছে প্রধানত তিনধরনের স্কুল। শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য এবং পাঠ্যক্রমে এদের পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে। আমেরিকায় বিশেষীকরণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও মূলত কম্প্রিহেনসিভ স্কুলই আমেরিকার নিজস্ব। এখানে কোনও প্রভেদমূলক পাঠ্যক্রম নেই। বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারেও ছাত্রের স্বাধীনতা অনেক বেশী। আমেরিকায় একটি স্কুলেই সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে তেমন নয়। তবে ইংলণ্ডে Continuation-শিক্ষা অনেক বেশী সংগঠিত। আমেরিকায় কম্প্রিহেনসিভ স্কুল এবং বিশেষীকরনের পূর্ণ-দৈর্ঘের মাধ্যমিক স্কুলগুলি বহুলাংশে এই প্রয়োজন মেটায়। দুই দেশে পরীক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা বহু সমস্যা-জর্জরিত। প্রথমতঃ, ১১ বছর বয়সে বাছাইয়ের নীতিটি অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিপন্ন! দ্বিতীয়তঃ, তিন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অসাম্য আজ বহুক্ষেত্রে নিন্দিত। কম্প্রিহেনসিভ কিংবা দ্বি-মুখী স্কুলের আন্দোলন আজ ক্রমবর্ধমান। "পাবলিক" স্কুলগুলি অসাম্যের আর একটি সাক্ষ্য। তদুপরি মাধ্যমিক শিক্ষায় Vocationalisation ইংলণ্ডে আশানুরূপ হয়নি। কমনস্কুল আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন থেকে ইংলণ্ড এখনও অনেক দূরে। আমেরিকারও তেমনি রয়েছে বহু সমস্যা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, মৌলিক তত্ত্বে স্থায়ী জ্ঞানের সমস্যা (stable theoretical knowledge of fundamentals), শিক্ষামানের সমস্যা প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে বহুমুখী বিদ্যালয় ছিল মার্কিন 'কম্প্রিহেনসিভ'

স্কুলের অনুকরণে, কিন্তু 'প্রবাহ'-ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডের ত্রি-ধারার অনুকরণে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রমের নূতন পরিকল্পনা, মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিগতকরণের সুপারিশ প্রভৃতিতে মার্কিন প্রভাব লক্ষণীয়। প্রস্তাবিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাও আপস প্রচেষ্টার নামান্তর। (কিন্তু এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের জি. সি, ই. পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে হয়।)

(৫) **বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য আমেরিকায় অনেক বেশী।** নানা ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রয়েছে। এবিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। তার ফলে ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষার সর্বনিম্ন মানের যেমন গ্যারাণ্টি রয়েছে, আমেরিকায় তেমন নেই। আমেরিকায় এমন নীচুমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে যা আদৌ সম্ভ্রম জাগায় না। অবশ্য এর পাশাপাশি অতি উঁচুমানের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। উচ্চশিক্ষাস্তরে বিশেষীকরণের সুযোগ দুই দেশেই বহুবিস্তৃত হলেও তুলনামূলকভাবে আমেরিকায় অনেক বেশী। বাস্তব উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমেরিকায় অনেক ঘনিষ্ঠ। দুইটি দেশেই যুগপৎ উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের সমস্যাও আছে। আমেরিকার সমস্যা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে "President's Commission on Higher Eduction"-এর রিপোর্টে, আর ইংলণ্ডের কথা Robbin's Committee রিপোর্টে। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমেরিকা অনেক অগ্রগামী; ইংলণ্ড থেকেও সেখানে "brain drain" হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা উভয়ের তুলনাতেই হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের এখানে সমস্যা রয়েছে যুগপৎ প্রসার, মানোন্নয়ন এবং বিশেষীকরণের। ভারতবর্ষে এখনও উচ্চশিক্ষা তুলনামূলকভাবে বহুমুখী হয় নি। বিশেষীকরণের সুযোগ এখনও সীমায়িত। উচ্চশিক্ষা এখনও তত্ত্বপ্রধান। উৎপাদনী-কর্মকাণ্ড এবং গণশিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ এখনও ক্ষীণ। তবে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমরা উভয় দেশের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি। উচ্চশিক্ষার আদর্শ, ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ইউ. জি. সি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই ঋণ বিশেষ পরিষ্কার। আমেরিকার জুনিয়র কলেজ এবং সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন) আন্দোলন এখানে নাড়া দিয়েছে কোঠারি কমিশনের 'Selective Approach'-পরিকল্পনায় সর্বশেষ চিন্তাধারা বিধৃত

(৬) **শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায়** ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশেই সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিতে পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকায় যুগপৎ সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত

শিক্ষণের দিকে ঝোঁক বেশী। তবে উভয় দেশেই সম্প্রতিকালে স্কুল পাঠ্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। **আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগুরু অংশই ইংলণ্ডের অনুকরণ।** কিন্তু রিজিওন্যাল ট্রেনিং কলেজগুলি আমেরিকার ধরনে। শিক্ষণস্তরে বিষয়বস্তুর পাণ্ডিত্যের উপরও সম্প্রতি-কালে আমাদের দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৭) **শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে** প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় মন্তেসরি ও কে জি. পদ্ধতি উভয় দেশেই প্রচলিত। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি উভয় দেশেই নীতিগতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সংগঠিত। জন ডিউই-র প্রদর্শিত পথে যে সব প্রগতিমূলক পদ্ধতি চালু হয়েছে, তার প্রতিটি নিয়েই গবেষণা এবং প্রয়োগ আমেরিকায় অনেক ব্যাপক। মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষায় স্বাধীনতা আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত বেশী স্বীকৃত। তাই Testing, Guidance এবং Counselling-ব্যবস্থা উভয় দেশেই প্রচলিত থাকলেও আমেরিকায় এসবের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। বিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দুই দেশেই প্রচলিত। সমপাঠ্যমূলক কাজও দুই দেশেই গুরুত্ব পেয়েছে। ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থাও পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়।

আলোচিত প্রতিটি বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছনে। এখানে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা অব্যবস্থিত। যে সব বেসরকারী ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার সাজ সরঞ্জাম মন্তেসরি কিংবা কে. জি. পদ্ধতির প্রয়োজনীয় মানের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। প্রাথমিক স্তরে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত ধরনের। বুনিয়াদি স্কুলে কিঞ্চিৎ উন্নতির চেষ্টা হলেও মৌলিক পরিবর্তন আজও হয় নি। **ছাত্র ও শিক্ষকের স্বাধীনতা ভারতবর্ষে এখনও অনাগত।** Testing-ব্যবস্থা এখনও গবেষণাগারের মধ্যেই আবদ্ধ। Guidance এবং Counselling অত্যন্ত দুর্বল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্র ও অভিভাবক এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক আজও নগণ্য বলে guidance-এর ব্যবস্থা মোটেই ফলপ্রসূ নয়। স্কুলে ছাত্রস্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে আজও আমাদের দেশে ভয়ের চোখেই দেখা হয়। সর্বোপরি অবসরবিনোদনের শিক্ষা কিংবা সমপাঠমূলক কাজও আমাদের দেশে অতিশয় দুর্বল। আলোচিত প্রতিটি বিষয়ই তত্ত্বগতভাবে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কাজে রূপ দিতে পারিনি। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে উভয় দেশ থেকেই আমরা অনেক কিছু নিতে পারি।

(৮) শিক্ষাব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও আমেরিকা— উভয় দেশেই ব্যক্তিগত উদ্যম স্বীকৃত। তাই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা

হয়েছে। ধর্মীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উভয় দেশেই স্বীকৃত। বেসরকারী উদ্যম আমেরিকায় অনেক ব্যাপক। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলা হলেও সংবিধানেই ব্যক্তিগত উদ্যমের স্বীকৃতি রয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের দেশে মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর স্তরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সংখ্যাগুরু এবং এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাও আছে। সুতরাং **বেসরকারী উদ্যমের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব দিয়েছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা।**

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে **মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিশু-অভীক্ষা** উভয় দেশকেই প্রভাবিত করেছে। তবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এ সবের গুরুত্ব আমেরিকাতেই অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচ্ছন্ন। ঠিক তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরি আন্দোলনও উভয় দেশকে প্রভাবিত করেছে। তবে এ ক্ষেত্রেও আমেরিকার উদ্যম বেশী সংগঠিত। জন ডিউই-র প্রদর্শিত পথে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের প্রভাবও আমেরিকাতেই বেশী লক্ষণীয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রভাবও আজ উভয় দেশেই লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকায় President's Commission on Higher Education পরিষ্কারভাবে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথা উচ্চ শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন।

মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, শিশুঅভীক্ষা এবং সমাজতত্ত্বের প্রভাব আমরাও ধারণ করতে সুরু করেছি। কিন্তু আজও এইসব শক্তি আমাদের সমগ্র চিন্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির আদর্শ আমরাও গ্রহণ করেছি।

(১) সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রভাব। এই সূত্রে আধুনিক শিক্ষায় **গণতন্ত্রের বিচিত্রমুখী প্রভাব** সম্পর্কেই প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

শিক্ষায় গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক চেতনা শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতিই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। ব্যক্তির মূল্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত। সুতরাং **প্রতিটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সৃষ্টিই গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।** কিন্তু নিছক আত্মকেন্দ্রিক বিকাশের কথা গণতন্ত্র স্বীকার করে না। সমাজবদ্ধ জীবনে সামগ্রিক উন্নতির মধ্যেই ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব। সুতরাং **"ব্যক্তির জন্য সমাজ এবং সমাজের জন্য ব্যক্তি"**—এই চেতনাই প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রূপায়িত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টি স্বার্থের সমন্বয়েই এই ভাবাদর্শ প্রতিফলিত। প্রতিটি শিশুর সমস্ত অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার

পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা এবং সামাজিক কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণের জন্য উৎপাদনী দক্ষতাই গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের মূল কথা।

প্রত্যেকের নিশ্চিত পূর্ণাঙ্গ বিকাশের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায় রাষ্ট্রের সঙ্গতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রকল্প। গণতন্ত্রে সব শিশুর সমমূল্য স্বীকার করা হয় বলে অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিম্নতম থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরে যাওয়ার সিঁড়ি সকলের কাছে খোলা থাকে। সিঁড়ি কেবল একটিই হবে, তাও নয়। বিভিন্ন প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছবাব সুযোগ থাকবে। (অর্থাৎ Educational ladder থাকবে, কিন্তু single ladder না হয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রে multiple ladder হওয়াই বাঞ্ছনীয়)।

সকল শিশুর সমমূল্য স্বীকৃত হয় বলেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কমনস্কুল-ব্যবস্থা। "কমনস্কুলের" অর্থ এই নয় যে একই ধরনের বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম সকলকে অনুসরণ করতে হবে। কমনস্কুল বলতে বোঝায় ধর্ম, বর্ণ কিংবা আর্থিক সংগতির ভিত্তিতে পার্থক্যের বদলে একই মানের এবং একই সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সকলের শিক্ষার সুযোগ। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমমর্যাদাসম্পন্ন টেকনিক্যাল, কৃষি, বাণিজ্য কিংবা সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, কিংবা একই স্কুলে সকলের জন্য ব্যবস্থা করা চলতে পারে, কিন্তু তথাকথিত সামাজিক আভিজাত্য, আর্থিক কৌলীন্য কিংবা মেধা, প্রবণতা বা "যোগ্যতার" ভিত্তিতে **বিভিন্ন মানের বিভিন্ন বিদ্যালয় সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী।**

গণতন্ত্রে প্রতিটি শিশুর সমমূল্য স্বীকৃত, অথচ প্রতিটি শিশুরই স্বকীয়তাও স্বীকৃত। **তাই গণতান্ত্রিক চেতনার অন্যতম অবদান হলো বহুমুখী পাঠক্রম।** আবার গণতন্ত্র কেবল প্রতিটি শিশুর স্বকীয়তার কথাই বলে না ; সামাজিক সংহতির কথাও বলে। তাই পাঠ্যক্রমে Core-periphery-ব্যবস্থাও গণতন্ত্রসম্মত। শিশুর স্বকীয়তা প্রতিফলিত হয় ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে, এমনকি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ঐচ্ছিকতার স্বীকৃতিতে। শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং নানা ধরনের সমপাঠমূলক কর্মধারায়। বিদ্যালয়কে সমাজের একটি উন্নত ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গহণ করা, বিদ্যালয়ে নাগরিকতার শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের ছাত্র স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গণতন্ত্রেরই প্রভাব বহন করে।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু ছাত্রই নয়, শিক্ষকও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। অবশ্য যে সব পদ্ধতিতে শিশুর

আত্মপ্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যম থাকে, সেই সব পদ্ধতিই প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্য। গণতন্ত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের যৌথ দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। সমাজ জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় সৃষ্টির চেষ্টা হয়। সমাজচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজসেবার আদর্শ গৃহীত হয়। বিদ্যালয়টি হয়ে ওঠে সমাজকেন্দ্র।

গণতান্ত্রিকতার প্রভাব শিক্ষাপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এমন মনে করা সঙ্গত নয় যে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনই একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রশাসন। গণতান্ত্রিক দেশে এককেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রশাসনের নজির সাম্প্রতিক কালেও রয়েছে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রশাসনের সঙ্গে গণজীবনের সান্নিধ্য ঘটে, শিক্ষাব্যবস্থা জনজীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়, গণউদ্যোগ স্বীকৃত হয়, শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণসার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় এবং নিম্নতম স্তর পর্যন্ত গণনিয়ন্ত্রণের পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই প্রশাসন ব্যবস্থাকেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রশাসন বলা চলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব অবশ্য শিক্ষায় সমসুযোগের স্বীকৃতি Equality of Educational O portunity)। সমসুযোগের অর্থ সকলের জন্য একই ধরনের (identical) শিক্ষা নয়। সমসুযোগের অর্থ প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে পূর্ণবিকাশের সুযোগ। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষাসুযোগের অসাম্য আঞ্চলিক অসাম্য , ধর্ম, বর্ণ, জাতি, কিংবা স্ত্রী-পুরুষ ভিত্তিতে অসাম্য প্রভৃতিই গণতন্ত্রবিরোধী। জন্ম অথবা অর্থকৌলীন্যের ভিত্তিতে শিক্ষার ক্ষেত্রেও "haves" এবং ' have nots"-এর বৈষম্য, কিংবা নীচু থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে লম্বমানভাবে দ্বি-খণ্ডিত করাই গণতন্ত্রবিরোধী। সুতরাং প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আকাংক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতম শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বহুমুখী পথই গণতন্ত্রসম্মত। দৈহিক কিংবা মানসিক বিকলাঙ্গদেরও গণতান্ত্রিক সমাজ পরিত্যাগ করে না, বরং তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই বিকলাঙ্গদেরও উপযোগী শিক্ষালাভের এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃত হওয়ার অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা মেনে চলে না—অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্করাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণকর ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব গণতান্ত্রিক সমাজ গ্রহণ করে।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছাড়া সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়** এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই সমসুযোগ সম্ভব ; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শিক্ষা পরিচালিত হলেই মাত্র সকলের সমানাধিকার সম্ভব। এই অর্থে শিক্ষার সমসুযোগ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্গতির মধ্যে প্রত্যেকের সম্ভাবনা ও চাহিদ

অনুযায়ী সর্বোত্তম শিক্ষালাভের সুযোগ। এ শিক্ষা বহুমুখী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একই স্তরের জন্য সব অভিজ্ঞান পত্রেরই সমমূল্য। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে প্রথমত অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত কমনস্কুল প্রথায়; তৃতীয়ত নানাবিধ ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং চতুর্থত বৈতনিক শিক্ষার স্তরে ব্যাপকভাবে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে। রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য।

শিক্ষায় গণতন্ত্র এবং সমসুযোগ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাফল্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উভয় দেশই এই আদর্শ গ্রহণ করেছে, কিন্তু উভয়ের সাফল্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য এবং সর্বোপরি কোন দেশই আকাংক্ষিত সাফল্যে পৌঁছতে পারে নি। ইংলণ্ডের চেয়ে আমেরিকা অগ্রগামী। অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার নীতি উভয় দেশেই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৈষম্য যে আছে, একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। শিক্ষায় "সম সিঁড়ি"-নীতি ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকায় বেশী প্রতীয়মান। তদুপরি ইংলণ্ডে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রয়াস সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটিকে লম্বভাবে দ্বি-খণ্ডিত করে রেখেছে। ইংলণ্ডের তিন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও আমেরিকার কম্প্রিহেনসিভ্ স্কুলের তুলনায় অগণতান্ত্রিক, ইংলণ্ডের পাঠ্যক্রম-পরিকল্পনা শ্রেণীবৈষম্যেরই নামান্তর। ছাত্রদের স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রেও আমেরিকা অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে উভয় দেশই গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন দেশেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হয় নি। ব্যাপক ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যম স্বীকার করে উভয় রাষ্ট্রই অসাম্যের পথ খুলে রেখেছে। এমনকি সরকারী উদ্যমের মধ্যেও অসাম্য রয়েছে। আমেরিকায় নিগ্রোদের সমানাধিকার অস্বীকার করে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা হয়েছে। **প্রকৃত কমনস্কুল এবং শিক্ষায় সমসুযোগ কোন দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি।** আমেরিকার President's Commission-ই স্বীকার করেছেন যে আঞ্চলিক, ধর্মীয়, বর্ণগত, পেশাগত, অর্থনৈতিক এবং স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আজও রয়েছে। তাঁরাই বলেছেন—"Democracy's task is yet unfinished." প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই তাঁদের সুপারিশ।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও ওদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। আমরা এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বজনীন করতে পারিনি। শিক্ষায় বহুমুখীনতার

তত্ত্ব' গ্রহণ করলেও ছাত্র বাছাইয়ের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নয়। আমাদের ছাত্র ও শিক্ষক এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন না। শিক্ষাপদ্ধতি এখনও কর্তৃত্ব-মূলক। পরীক্ষাব্যবস্থা এখনও চিরাচরিত। আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়। বস্তুত আমাদের দেশেও শিক্ষাব্যবস্থা লম্বমানভাবে দ্বি-খণ্ডিত। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উন্মুক্ত সিঁড়ি আমাদের নেই। তাই অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা আমাদের দেশে আজও পাহাড় প্রমাণ এবং বিকলাঙ্গরা নানাভাবে অবহেলিত। তেমনি অবহেলিত রয়েছে ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের প্রকৃত সাঙ্গীকরণ আজও হয়নি। স্কুল হয়ে ওঠেনি সমাজকেন্দ্র। শিক্ষাপ্রশাসন কিছুটা বিকেন্দ্রীকৃত হলেও প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক আজও নয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়ার নীতি গৃহীত হলেও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত নয়। বেসরকারী উদ্যমের অবারিত ক্ষেত্র থাকায় অসাম্যের মূল উৎস অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়।

কিন্তু ভরসার কথা এই যে তত্ত্বগতভাবে আমরা ইংলণ্ড ও আমেরিকা এমনকি অন্যান্য দেশেরও প্রগতিমূলক ভাবধারাকে গ্রহণ করেছি। এই হিসেবে আমাদের উপর বিদেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। আমরা আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র গ্রহণ করেছি, কমনস্কুল গ্রহণ করেছি, কম্প্রিহেনসিভ স্কুল এবং বহুমুখী পথের নীতি গ্রহণ করেছি, মেধার কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছি এবং শিক্ষায় সমসুযোগ এবং সমাজবাদী আদর্শও গ্রহণ করেছি। বস্তুত, প্রায় সব দিকেই আমরা অগ্রগামী দেশগুলিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক ভারতের শি[illegible]ায় বিদেশী প্রভাব অসামান্য। বিদেশের সমকক্ষ আমরা হতে পারবো কি না, এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে ভবিষ্যৎকালে।

প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত (সাধারণ মানের)

1. "The Education Act of 1944 constitutes the most important single progressive step ever taken in English Educational History." Discuss.

(**পাঠ সংকেত**) (১) ধাপে ধাপে সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি—(ক) পার্লিয়ামেন্টের অনুদান ব্যবস্থা, (খ) পার্লিয়ামেন্টের শিক্ষা কমিটি, (গ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৮৭০), (ঘ) ১৯০২-এর আইন, (ঙ) ১৯১৭-এর ফিসা[illegible] আইন ; (২) নানা ধরনের কমিটি ও কমিশন রিপোর্ট,—বিচ্ছিন্নভাবে আপস-মূলক নানা প্রচেষ্টা, (৩) ১৯৪৪ সনের আইন—সকল স্তরের, সকল ধরনের শিক্ষা

সকল রমক স্কুল (maintained-voluntary), কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন গ্রথিত করে একটি সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সার্বিক আইন)।

2. Make an analysis of the system of education as established in England by the Act of 1944. Is it truly a national system of education ?

পাঠ সংকেত—'বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক আলোচনার সারাংশ)।

3. What are the different types of secondary school in England, (a) from the point of view of length, organisation, curricular content, and (b) from the point of view of ownership and administration ?

পাঠ সংকেত—'বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক অংশ থেকে (ক) সংগঠন, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির ভিত্তিতে মডার্ণ স্কুল, টেকনিক্যাল হাই স্কুল, বাইলেটারাল স্কুল, কম্প্রিহেনসিভ স্কুল, বিশেষ স্কুল, প্রোগ্রেসিভ স্কুল ইত্যাদি ; (খ) মালিকানা ও প্রশাসনের দিকে—এল. ই. এ পরিচালিত স্কুল, ভলাণ্টারী স্কুল, প্রাইভেট, প্রেপ, ডাইরেক্ট গ্র্যাণ্ট, এইডেড, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, পাবলিক প্রভৃতি।

4. Discuss the nature and role of the Public School in England.

(পাবলিক স্কুল শীর্ষক অংশটি)।

5. What is the machine of local administration of education in England ? Discuss in this connection the distinctive roles of central and local administration. (সংকেত—"শিক্ষা প্রশাসন" শীর্ষক অংশের সারাংশ)।

6. Make an analysis of the present system of education in the U.S.A. and comment upon the points of strength and weakness.

(সংকেত—"বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা" শীর্ষক অংশ)।

7. Analyse the nature and characteristics of the Comprehensive School of America. (সংকেত—কম্প্রিহেনসিভ স্কুল সম্বন্ধে লিখিত অংশটি)।

8. How is education locally controlled in America ? or "Education is a State subject in the U.S.A But there is a three tier system of educational administration." Discuss

(প্রথম বিষয়টি আলোচনায় রাজ্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জিলা, টাউন, কাউন্টি, সিটি স্তরে প্রশাসনের সম্পূর্ণ রূপটি উপস্থাপিত করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনার পরিধি আরও ব্যাপক। "শিক্ষা প্রশাসন" শীর্ষে আলোচিত বিষয়ের সারকথা—অর্থাৎ ফেডারেল, রাজ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং তিনস্তরের মধ্যে আন্তঃ-সম্পর্ক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে মন্তব্য সংযোজন করতে হবে।

9 Write notes on: (a) Junior High School, (b) Junior College (c) General Education Movement, (d) Examination system—in the U. S. A and comment upon their respective influence on India. ("কয়েকটি বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক অংশে প্রতিটি বিষয় আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার সারাংশই উপস্থিত করা দরকার।)

10 What is democracy in education? How has it been provided in U. K., U. S.A. & India?

("শিক্ষায় গণতন্ত্র" শীর্ষক অংশের সারসংক্ষেপ প্রয়োজন।

11. Discuss the concept of equality of educational opportunity and Common School with reference to achievements in U. K, U S A., and India. (উপরিউক্ত শিরোনামাতেই "গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব অবশ্য শিক্ষায় সমসুযোগের স্বীকৃতি" দিয়ে সূচিত অনুচ্ছেদ থেকে অবশিষ্ট অংশের সারসংক্ষেপ)।

12. How has education in India been influenced by that in the U K and the U.S.A.? ("তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক অংশ থেকে নীচের বিষয়গুলির উল্লেখ করে আলোচনা উপস্থিত করতে হবে।—(১) দার্শনিক প্রভাব, ভাববাদ এবং প্রকৃতিবাদ ও প্রাগম্যাটিজম'এর সংমিশ্রণ; (২) প্রশাসনগত প্রভাব, ফেডারেল ব্যবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীকতার ঝোঁক; (৩) কমন স্কুল, নেবারহুড স্কুল—আদর্শগত ভাবে স্বীকৃত, সব ক্ষেত্রে প্রাকপ্রাথমিক স্তরে স্বেচ্ছা প্রচেষ্টা; (৪) মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা পরিকল্পনায় গৃহীত, (৫) বহুমুখী স্কুল, পাবলিক স্কুল, ইংলণ্ডের ত্রিধারার বদলে সপ্তধারা; (৬) পরীক্ষা ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের কিঞ্চিৎ প্রভাব; (৭) উচ্চ শিক্ষার আদর্শ; (৮) ছাত্র "বাছাই" নীতি; (৯) আমেরিকার "সাধারণ শিক্ষা" আন্দোলন এবং জুনিয়র কলেজের চেতনা; (১০) শিক্ষক শিক্ষণে ইংলণ্ডের প্রভাব; (১১) আমেরিকা থেকে নানাধরনের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি; (১২) আমেরিকা থেকে Testing, guidance, counselling, মানসিক অভীক্ষা; (১৩) মনোবিশ্লেষণের প্রভাব; (১৪) গণতন্ত্র এবং সমানাধিকার (১৫) উৎপাদনমুখী শিক্ষার চেতনা।

অগ্রবর্তী মানের

1. **Trace the development of modern education in England till the passing of the Education Act of 1944** ইংলণ্ডে শিক্ষা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" অংশ থেকে (১) ১৮৩২ পার্লামেণ্টে অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত, (২) ১৮৩৯ পার্লিয়ামেণ্টের শিক্ষা কমিটি, (৩) ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষা কোড, (৪) ১৮৭০ সনের প্রাথমিক শিক্ষা আইন (৫) ব্রাইস্ কমিশনের সুপারিশ এবং ১৯০২ সনের আইন, ফ্রী প্রেস্ পরীক্ষা, (৬) ১৯১৭ সনের ফিসার আইন (৭) হ্যাডো কমিটি, স্পেন্স কমিটি, নরউড কমিটি, ম্যাকনেয়ার কমিটি এবং ফ্লেমিং কমিটির সুপারিশের সূত্রে ১৯৪৪ সনের আইন—এই পর্যায় কয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে।

2. **How is Technical and Contiruation education provided in England ? Compare the provisions with those in the U.S A.**
(ইংলণ্ডে 'কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা' শীর্ষক অংশ ১৬ পৃষ্ঠা এবং আমেরিকার একই শীর্ষক অংশ ৩৩ পৃষ্ঠা)।

3. **Make a comparative study of (a) Primary Education, (b) Adult Education, (c) Teacher Education in England, America & India** (সূত্র=প্রাথমিক শিক্ষা—ইংলণ্ডের ১৫ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩১ পৃঃ ; বয়স্ক শিক্ষা—ইংলণ্ডের ১৭ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৫ পৃঃ ; শিক্ষক শিক্ষণ ইংলণ্ডের ১৫ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আলোচনা। ঐ সাথে বইয়ের প্রথম অংশ থেকে আহরণ করে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য সংযোজন দরকার)।

4. **Make a comparative analysis of the role of private enterprise in England, America and India** (সূত্র=ইংলণ্ডের "ভলাণ্টারী" স্কুল ব্যবস্থা ১৩ পৃঃ, ও পাবলিক স্কুলের স্থান এবং উচ্চ শিক্ষা ১৭ পৃঃ, আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষায় ৩২ পৃঃ এবং উচ্চ শিক্ষায় ৩৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা রয়েছে। এই সাথে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে Grant-in-aid ব্যবস্থার উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সংযোজন করতে হবে)।

5 **Discuss some of the social, economic, political and philosophical factors which influenced the development of education in the U.S.A.** ("শিক্ষা বিবর্তনের পটভূমি" শীর্ষক অংশের সারাংশ উপস্থিত করতে হবে)।

√6 **Trace the growth of the system of education in America.** ("শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন" অংশের সারাংশ)।

7. **How did the aims of secondary education evolve in the U. S. A. ?** ("মাধ্যমিক শিক্ষা" শীর্ষক অংশের প্রথমার্দ্ধ)।

তৃতীয় অধ্যায়

সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯১৭ সনের বিপ্লবকে রাশিয়ার জীবনে একটি যুগবিভাজিকা রূপেই ধরা দরকার, কারণ প্রাক-বিপ্লব যুগের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিক্ষা সংস্কৃতির তুলনায় বিপ্লবোত্তর যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসেছে গুণগত এবং পরিমাণগত পার্থক্য। বস্তুতঃ প্রাক-বিপ্লব অবস্থার সাথে তুলনা করেই বিপ্লবোত্তর অগ্রগতি বোঝা সম্ভব।

প্রাক-বিপ্লব অবস্থা

মধ্যযুগীয় সমাজ ও জীবন বিধির পরিবেশে, স্বৈরশাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর সূচনা কালেও রাশিয়ায় শিক্ষার বিস্তার ছিল নগণ্য। সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল ছিল মাত্র ১ লক্ষটি। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ছিল ১৬০০ মাত্র। মাধ্যমিক স্কুল ছিল ২৫০০। এবং বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিগত স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮০০। প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ছিল না। শিক্ষার যতটুকু সুযোগ ছিল, তাও ছিল শ্রেণী বৈষম্যে পূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ সংহতি ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার নামমাত্র ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের স্থায়ী সাক্ষরতাও হত না। মোট ১২½ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ শিশুর জন্য। শহর অঞ্চলে প্রতি দশ হাজারটি শিশুর মাত্র ৬১ জন ছিল প্রাথমিক স্কুলে। গ্রামাঞ্চলে ছিল মাত্র ৩টি। আর উচ্চ শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২.৯০ লক্ষ মাত্র।

জার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সিস্কভ বলেছিলেন, "To teach the mass of people or even the majority of them, how to read, will bring more harm than good." সরকারী নীতিই যেখানে এমনটি ছিল, সেখানে ব্যাপক শিক্ষার আশাই করা যায় না! তা ছাড়া মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিবেশে ধর্মসংস্কার প্রভাব ছিল খুবই প্রকট। স্কুলের শিক্ষায় অঙ্কের চেয়ে ধর্মশিক্ষায় সময় দেওয়া হত অনেক বেশী। গণ-বিপ্লবের ভয়ে সদা-শঙ্কিত রাষ্ট্রের পরিদর্শক মণ্ডলী স্কুল পরিদর্শকের চেয়েও স্কুল কলেজের ব্যাপারে গুপ্তচরের দায়িত্বই পালন করতেন বেশী। শিক্ষা প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীকৃত, কিন্তু অবিন্যস্ত এবং অদক্ষ।

এই অবস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে রাশিয়ায় জনসংখ্যার ৩/৪ অংশই ছিল নিরক্ষর। তা ছাড়া বহু ভাষাভাষি, বহু জাতি উপজাতির সাম্রাজ্যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ জাতিগুলির মধ্যে কোন শিক্ষার সুযোগই ছিল না বলা চলে। ১৮৮৭ সনের আদমসুমারীতেও দেখা গিয়েছিল যে সাক্ষরতার হার ছিল তাজিকিস্থানে ০·৫; কিরঘিজিস্থানে ০·৬; তুর্কমেনিস্থানে ০·৭; উজবেকিস্থানে ১·২ এবং কাজাকিস্তানে ২ শতাংশ মাত্র।

বিপ্লবের পরে প্রথম পর্ব

১৯১৭ সনের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া যাত্রা সুরু করল শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার দিকে। এই কাজে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল খুব স্বাভাবিকভাবেই। একটা নূতন সমাজ গড়ার অর্থ সমাজ কাঠামো কিম্বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক তৈরী করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়া ভাবমানসেরও আমূল পরিবর্তন দরকার। শোষিতকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখেই শোষকরা শোষণের যন্ত্র তৈরী করেছিল। সেই অশিক্ষিত জনতা দিয়ে একটি গতিশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়! লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবোত্তর রুশ রাষ্ট্র তাই জনশিক্ষাকে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়বার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবেই গ্রহণ করেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার জন্য সর্বজনীন শিক্ষা, চিরবঞ্চিত বয়স্কদের শিক্ষা, সার্বিক সাক্ষরতা এবং স্ত্রীপুরুষ, জাতি উপজাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সমসুযোগের আদর্শ নিয়েই কাজ সুরু করা হয়েছে।

তা ছাড়া মধ্যযুগীয় সামন্ত-শাসিত অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রার জন্য দরকার ছিল বৈজ্ঞানিক কৃষি এবং দ্রুত শিল্পায়ন। এই অর্থনৈতিক বিপ্লবে শিক্ষার ভূমিকাকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে দেখা হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার দিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরগাছার স্থান নেই। প্রতিটি নাগরিকই হবেন একজন দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদক। নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী বিরাট কর্মযজ্ঞে রাষ্ট্র-নির্ধারিত স্থানে প্রত্যেকেই উৎপাদনী শ্রমে নিযুক্ত থাকবে। সুতরাং নিছক পুঁথিগত বাবুয়ানা শিক্ষার বদলে উৎপাদনমুখী শিক্ষাকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হল। অবশ্য তাই বলে মানবিক কৃষ্টি সংস্কৃতিরও পরাজয় ঘটল না। সাহিত্য, শিল্প, কলা এবং নান্দনিক শিক্ষাকেও সম মর্যাদা দেওয়ার নীতি নেওয়া হল।

শিক্ষার আশু উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হল—(১) রক্ষণশীল ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে শিক্ষায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা। (২) চিরাচরিত ব্যক্তিতান্ত্রিক জীবন

যাত্রার বদলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যৌথ জীবনের জন্য তৈরী করে তোলা। (৩) উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজ জীবনে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি রূপে শ্রমের মর্যাদা শেখানো। (৭) সকলের কাছে যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার সমান সুযোগ উপস্থিত করা। (৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি উপজাতিগুলির সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। (৬) শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাব ভাবধারায় শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।

বিপ্লবের পরেই ঘোষণা করা হল যে নূতন রাশিয়ায় শিক্ষানীতি হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা; সকলের জন্য যথাসম্ভব শিক্ষাব সমসুযোগ; নূতন মানুষ গড়বার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ; শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯১৯ সনে জারি করা হল নিরক্ষরতা দূরীকরণেব ডিক্রী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হল। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিধি চালু করা হল। ৪ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সর্বজনীন ভাবে প্রবর্তন করা হল। ১৯২০ সনে যুবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে লেনিন বললেন, "পড়, পড়, আরও পড়।"

প্রথম তিন-চারটি বছর নূতন রুশ রাষ্ট্রকে অনেক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রাম হয়েছে তীব্র। স্বল্প সংখ্যক অবসরভোগীব শিক্ষা ও সংস্কৃতির বদলে ব্যাপকতম শ্রমজীবী জনতার সংস্কৃতি নিশ্চিত করবার এই সংগ্রামী অধ্যায়টি পরিচিতি হয়েছে "প্রোলেটকাল্ট" রূপে।

বিদেশী আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সংকট কাটিয়ে ১৯২১-২২ সনে নয়া রুশ রাষ্ট্র গ্রহণ করল "নয়া অর্থনৈতিক নীতি" (N E P.)। রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এল স্থিরতা। বিপ্লবোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থাটি তখন দাঁড়াল এই রকম—

—তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য ক্রেস ও নার্সারী,

—তিন থেকে আট বছর বয়সের শিশুদের জন্য কে. জি. কিম্বা অন্য ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;

—আট থেকে বারো বছর বয়সের জন্য 'কমনস্কুল' (লেবার স্কুল নামে অভিহিত)। এটিই হলো প্রথম স্তরের স্কুল (School of the First Grade);

—বারো থেকে পনের বছর বয়সের জন্য দ্বিতীয় স্তরের স্কুল (School of the Second Grade)। এই স্তরের স্কুলগুলি প্রাথমিক স্কুলের সাথেও থাকতে পারে, আলাদাও হতে পারে।

—পরবর্তী দুই বছরের জন্য (ক) পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা, কিম্বা (খ) বৃত্তি শিক্ষা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে শিক্ষার সংহতি

উপরোক্ত ব্যবস্থাটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সাথেই নূতন ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হল। আর্থিক পরিকল্পনা সফল করবার জন্য দরকার ছিল বৃহদায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন যৌথ খামার। সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন হল। কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ মানুষ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শিক্ষার প্রতি তাই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল।

১৯২৭ সন থেকে গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা হল ৭ বছর (প্রাথমিক সহ) পড়ার ব্যবস্থায় যুবা কৃষকের স্কুল (School for the Peasant Youth)। ৭ বছরের শিক্ষা শেষে বিশেষ দক্ষতার জন্য রইল টেকনিকাম (Technicum)। এখানে ব্যবস্থা হল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, থিয়েটার, সমাজ সেবা, নার্সিং, শিক্ষকতা, চারুশিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের কাজে বিশেষীকৃত দক্ষতা অর্জনের জন্য ৩।৪ বছরের পড়া। এই স্তরের শেষে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয় কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারও রইল।

শহরাঞ্চলে এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল "স্টাখানোভাইট আন্দোলন"। কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চতর কারিগরি জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ বাড়ানো এবং গবেষণার উৎসাহ সৃষ্টি করাই হল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্য কিম্বা রাত্রিকালীন শিক্ষা, অবসরকালের শিক্ষা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য নানা পথ খুলে দেওয়া হয়। পরিষ্কার করে বলা হয় যে বস্তুজগতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, সাম্প্রতিক জীবনের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপাদনী শ্রমের সাহায্যে যৌথ জীবনের জন্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নাগরিক গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। ("To aid the all round development of a healthy, strong, actively brave, independently thinking and acting men acquainted with the many sides of contemporary culture, a creator and warrior in the interest of the proletariat, and consequently in the final analysis, in the interest of the whole of humanity.") আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল "to bring up all round, well informed, physically healthy and strong, fitted with collectivist habits and joy of living—fighters for socialism."

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলা হল যে একই শিক্ষা-ধারার মধ্যে থাকবে বহু ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। তবে কেন্দ্র বিন্দুটি হবে 'কাজ'—দৈহিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকও।

সাম্প্রতিক পরিবর্তন

সম্প্রতিকালের মধ্যে ক্রুশ্চেভের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল ১৯৫৮ সনে। কিন্তু নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১৯৬৪ সনে আবার একদফা সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সংস্কারের ফলশ্রুতিই হল সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

১। সোভিয়েত রাশিয়ায় মায়েরা ব্যাপকভাবে কৃষি, কলকারখানা ও অফিসে কাজ করেন। তাই সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিয়োগ কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রীয় নীতি, নির্দেশ এবং পরিদর্শন এখানে সুবিন্যস্ত। কলকারখানার সাথে ক্রেস ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সংগঠিত।

২। শিশুরা একটু সক্ষম হয়ে উঠলেই তাদের জন্য রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেনে। অবশ্য রাশিয়াতে দুই ধরনের স্কুলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখা হয়নি। স্বাস্থ্য, আচার-আচরণ, সুস্থ মনোভাব গঠন, সমাজপ্রীতি এবং মানবপ্রীতি সঞ্চারই এই শিক্ষার লক্ষ্য। সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে লেখা-পড়া-গণিতের অনুশীলনও আরম্ভ হয়। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যতা মূলক নয়। তবে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়োগ-কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বলেই অবৈতনিকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তা ছাড়া এই স্তরের শিক্ষা ব্যয়ের $\frac{3}{4}$ অংশই রাষ্ট্র থেকে বহন করা হয়।

৩। এর পর ৭ বছর বয়স থেকে সুরু হয় নিয়ম-মাফিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং চলে তিন বছর কাল। সাধারণভাবে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সময়কে ৪ বছর থেকে কমিয়ে রাশিযাতে ৩ বছর করা হয়েছে। সেখানকার শিক্ষাবিদদের অভিমত হল যে দ্রুত প্রসারমান জ্ঞান জগতের সাথে পরিচয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সময় কাল বাড়ানো দরকার। তা ছাড়া বাবা মায়ের শিক্ষার ফলে প্রাথমিক স্কুলে আসবার আগেই বর্তমানের ছেলেমেয়েরা পড়া, লেখা এবং গণিতের প্রস্তুতি করে নেয়, জানেও অনেক কিছু। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বর্ণ পরিচয়ের প্রাথমিক প্রয়াসের জন্য আর সময় ব্যয় করা দরকার হয় না।

৪। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত চলে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর। অর্থাৎ চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী। সাধারণত প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তর একের পর এক যুক্ত থাকে। তাই প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর (১৫ বছর পর্যন্ত) শিক্ষাকেই বলা হয় **অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা।**

গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণের পড়া সুরু হয় চতুর্থ শ্রেণী থেকেই। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের গণিতেই থাকে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্‌কুলাস্‌, থিওরি অফ প্রোবেবিলিটি এবং কম্পিউটার প্রাকটিস্‌।

৫। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে আরও দু'বছর যোগ করে হয় **পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা।** অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হল সম্পূর্ণ স্কুল শিক্ষা।

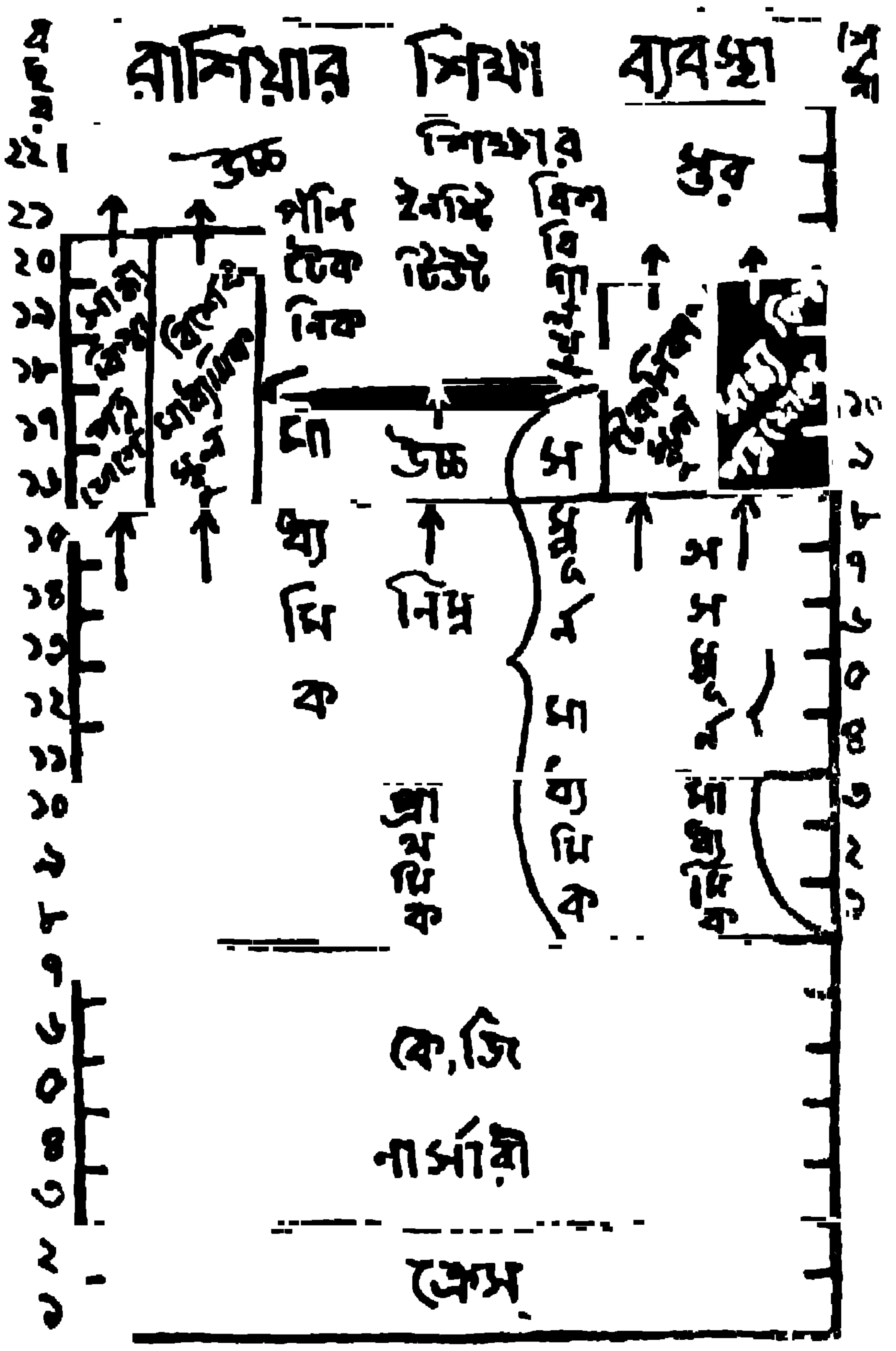

আট বছরের স্কুল শিক্ষা (অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা) ১৯৬২ সনেই সর্বজনীন এবং আবশ্যিক হয়েছে। চলতি পরিকল্পনার মধ্যেই দশ বছরের শিক্ষা আবশ্যিক এবং সর্বজনীন হবে। ৮৫% ছাত্র-ছাত্রী ভালভাবেই ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা শেষ করে। এই হারকে আরও বাড়াবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় এই সাফল্য খুবই প্রশংসনীয়। বর্তমানে ১ম থেকে তৃতীয়

শ্রেণীর প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২ কোটি; ৪র্থ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী আছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৯ম-১০ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ৯০ লক্ষ। শিক্ষক আছেন ২৭ লক্ষ।

পূর্ণাঙ্গ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠ্য বিষয়ের তালিকাটি বেশ বড়। অভিন্ন ধরনের এই শিক্ষায় সবগুলি বিষয়ই সকলকে পড়তে হয়। তা ছাড়া প্রবণতা অনুসারে বিশেষ পড়ার জন্য ঐচ্ছিক বিষয়ও অনেক। "সম্পূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে" বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পড়ানো হয় তার তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ :—

বিষয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০—শ্রেণী
মাতৃভাষা	১২	১০	১০	৬	৬	৩	৩	২	২	—
সাহিত্য				২	২	২	২	৩	৪	৫
গণিত	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৫	৫
ইতিহাস				২	২	২	২	৩	৪	৫
সমাজবিজ্ঞান										২
জীবতত্ত্ব		২	২	২						
ভূগোল					২	৩	২	২	২	—
জীববিজ্ঞান					২	২	২	২	২	২
পদার্থবিদ্যা						২	২	৩	৪	৫
জ্যোতির্বিজ্ঞান										১
নকশা রচনা						১	১	১		
বিদেশী ভাষা					৪	৩	৩	২	২	২
রসায়ন শাস্ত্র							২	২	৩	৩
চারুকলা	১	১	১	১	১	১				
সঙ্গীত	১	১	১	১	১	১	১			
শরীর চর্চা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
শ্রমশিক্ষা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
ঐচ্ছিক বিষয়							২	৪	৬	৬

৬। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে বিভিন্ন পথ খোলা রয়েছে, যেমন—

(ক) অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে রয়েছে টেকনিক্যাল স্কুলে ৩।৪

বছরের কোর্স। দশশ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে যারা টেকনিক্যাল স্কুলে যাবে তাদের জন্য পড়ার সময়টি কম। বর্তমানে ৫০০০ হাজারের বেশী টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে গ্রাম ও নগরে।

(খ) অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে রয়েছে বিশেষীকৃত (Specialised) মাধ্যমিক স্কুল। এই সব স্কুলে দশ ক্লাশের পরেও ভর্তি হওয়া যায়।

এই সব স্কুলে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ণ, দেশীয় ভাষা, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ ভাবে এই সব স্কুলে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উপর সমগুরুত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিশেষীকরণের ক্ষেত্রটি যাই হোক, প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা অব্যাহতই থাকে। ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়া হয় সমাজ প্রয়োজনীয় শ্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে। মধ্য শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ (middle cadre) তৈরী করাই এই সব স্কুলের লক্ষ্য। ভর্তি হতে হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে সব ধরনের পাঠ্য মিলিয়ে ৫০০ বিষয়ে শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ই বাস্তব কর্ম জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিষয়গুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—

"এ" গ্রুপ—শিল্প, নির্মাণ, যানবাহন, যোগাযোগ, কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

"বি" গ্রুপ—শিক্ষা, চিকিৎসা, কলা, সঙ্গীত, নাট্য প্রভৃতি পেশার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

যে গ্রুপের অন্তর্গত বিষয়ই বাছাই করা হোক না কেন, তাত্ত্বিক পাঠের সাথে বৃত্তিমূলক পাঠ মিশ্রিত থাকবেই। অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ স্কুলের পরে বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে হয় ৩।৪ বছর, দশ শ্রেণীর পরে ২।৩ বছর (সাধারণতঃ আড়াই বছর)। সান্ধ্য স্কুল কিম্বা পত্র যোগে যারা এই পড়া করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সময় লাগে আরও এক বছর বেশী। বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে পূর্ণাঙ্গ পড়া শেষ হয় পরীক্ষা কিম্বা গবেষণা নিবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার পায়। বর্তমানে দিবা, সান্ধ্য এবং ডাকযোগে শিক্ষার বিশেষীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৮৬০টি। সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই স্কুলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে আর একটি পথ হল পলিটেকনিক অথবা সেবার স্কুল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করাই এই সব প্রতিষ্ঠানের

কাজ। ট্রাক্টর মেকানিজম্, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, সময় বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ধরনের পাঠ্য এখানে রয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন পাঠ্য বিষয় অনবরতঃ যোগও করা হয়।

উচ্চ শিক্ষা :—

যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা সতের বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ঢুকতে পারে। এই স্তরটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর স্তর। নানা ক্ষেত্রেই নানা ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে বলে ছাত্র আসে নানা পথে, যেমন সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল, বিশেষ মাধ্যমিক, সান্ধ্য, কারিগরি ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে নানা ধরনের, যেমন—পলিটেকনিক, বিশেষ ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার সময় ২+২+১ ভাগে বিভক্ত। পাঠ্যক্রমে রয়েছে দুটি ভাগ—সকলের জন্য সাধারণ পাঠ্য এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ পাঠ্য। সাধারণতঃ তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বছর থেকে আলাদা আলাদা পাঠ সুরু হয়। প্রতিটি বিষয়েই অবশ্য তত্ত্বের সাথে থাকে ব্যবহারিক কাজ।

১৯১৪ সনে রাশিয়ায় ছিল ১০৫টি কলেজ। আজ রয়েছে ৭৪৫টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয় সহ)। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যায় ১৮৭ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (ইতালীতে ৫০ জন; পশ্চিম জার্মাণীতে ৪৯ জন)। দিবা বিভাগে ছাত্র সংখ্যা হল ২৪ লক্ষ, সান্ধ্য বিভাগে ৬½ লক্ষ; ডাক যোগে ছাত্র আছে ১৬ লক্ষ; মোট ৪৬½ লক্ষ।

ডাক যোগে এবং সান্ধ্য ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থাও অবৈতনিক। বিশেষ আলোচনা চক্রে যোগ দেবার জন্য কর্মরত ছাত্রছাত্রী বছরে ২০ থেকে ৪০ দিন সবেতন ছুটি পায়। গবেষণা নিবন্ধ রচনার জন্য ছুটি পায় ৪.৫ মাস। সান্ধ্য এবং ডাক্-ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৪০ জনই মাধ্যমিক কিম্বা বিশেষ মাধ্যমিক স্কুলের স্নাতক। প্রচুর ষ্টাইপেণ্ড ব্যবস্থার ফলে আনুষঙ্গিক ব্যয়ও লাগেনা। ভাল ফল করতে পারলে বোনাসের ব্যবস্থাও আছে।

উচ্চ শিক্ষার স্তরে কমপক্ষে ৪০০ বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়াশুনো হয়। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ১০০টি বিষয়ে ডাকযোগে পাঠ দিয়ে থাকে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্প ও কৃষি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ হয় কলেজে। ৩৫০টি কলেজ লেবরেটরি, ৪০০টি বিশেষ ধরনের কলেজ লেবরেটরি এবং ৪৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চলে।

বৃত্তি শিক্ষা :

কর্মরত অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও সোভিয়েত রাশিয়ায় খুবই সংগঠিত এ জন্যও রয়েছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেমন—

(ক) শিক্ষানবিসি কিম্বা ফ্যাক্টরী স্কুল। এই শ্রেণীর ৫০০০ স্কুলে ১০০০টি বিভিন্ন বৃত্তির বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখানে বৃত্তি শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হয়, অবশ্য বৃত্তি বিষয়ে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষাতেই ব্যয় হয় ৬০—৭০% সময়।

(খ) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি স্কুল। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ঢোকা যায়। এর সংখ্যা এখন ১৩০০।

(গ) সান্ধ্য কিম্বা পত্রযোগে পড়ার ব্যবস্থা। এখানে পাঠ্যক্রম দিবাস্কুলেরই মত। তবে শিক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সান্ধ্য বিদ্যালয়ে কিম্বা পত্রযোগে পড়ার সুযোগ পায়।

বয়স্ক শিক্ষা

সোভিয়েত রাশিয়ায় বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও বিবিধ! সচেতন প্রচেষ্টার ফলে এই ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে চমকপ্রদ। আগে যেখানে অঞ্চল ও গোষ্ঠীভেদে নিরক্ষর ছিল ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশ, এখন সেখানে ৮-৫০ বছরের লোকের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই সাক্ষর। কিন্তু সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কেবল লেখা ও পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে যে অষ্টম শ্রেণীর পর্যায়ে জ্ঞানবিদ্যার সুযোগ সকলেরই থাকবে। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য নিয়মিত স্কুল, সান্ধ্য স্কুল, অবসর বিনোদন কেন্দ্র, মিউজিয়াম, সংবাদপত্র প্রভৃতি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

(১) সাধারণ স্কুলগুলির সমান্তরালভাবে রয়েছে বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যস্কুল। (২) বয়স্কশিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় রয়েছে পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা। পাঠ্যক্রম, বই ইত্যাদি ঐ বিভাগ থেকেই স্থির করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে সবরকম সাহায্য পায়। স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের সাথেও এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। পুরো খরচ মেটানো হয় শিক্ষা বাজেট থেকে। (৩) বয়স্কদের মাধ্যমিক স্কুল আছে অনেক। লাইব্রেরী ও আসবাব দিয়ে এইসব স্কুল পুরো সাজানো। রাত্রিকালীন লাইব্রেরী আছে। এখানকার ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা উচ্চতর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছুদের জন্য

বিশেষ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তদের কাছে এই স্কুলটি বিশেষ পরিচিত। (৪) শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য আছে সান্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণ দিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান্তরাল ভাবেই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত। পাঁচ বছরের পাঠ্য। সন্ধ্যাবেলা ক্লাস করবার জন্য ছাত্রছাত্রীকে কর্মস্থল থেকে প্রয়োজনীয় ছুটি দেওয়া হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষা মন্ত্রকই এই স্কুল পরিচালনা করে থাকেন। (৫) শিল্প এবং কৃষি এ্যাকাডেমি। এগুলি পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম সহ পুরো সময়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বিশেষজ্ঞ তৈরি করার সাথে সাথে মানবিক বিদ্যাও পাঠ্যক্রমে আছে। স্টাখানোভাইট আন্দোলনের সময় থেকে এই সব প্রতিষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। (৬) এ্যাকাডেমি ছাড়া উপরে আলোচিত সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেরই রয়েছে পত্রযোগে শিক্ষার বিভাগ। এই ক্ষেত্রেও বিশেষ শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষাকে মেশানো হয়। বৃত্তি কিম্বা পেশাগত সংগঠনও পাঠ্যক্রম চালু করেন। বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের সময় "সংস্কৃতির সৈনিক" (Soldiers of Culture) এবং "জনতার শিক্ষা বাহিনী" (People's educational army) প্রভৃতি সংগঠন গণশিক্ষার আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। (৭) গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের নাম হয়েছিল "The Reading Hut"। এইসব কেন্দ্রে ছিল ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা, সম্মেলন এবং স্বেচ্ছা শ্রমদানের ব্যবস্থা। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমবেত গ্রামীণ মানুষের কাছে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে নূতন তথ্য সরবরাহ করেছেন। (৮) জেলা কেন্দ্রের "সংস্কৃতি-গৃহ" (Houses of Culture) গুলিতে ব্যবস্থা আছে হস্টেল, মিউজিয়াম এবং গ্রন্থাগারের। (৯) ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পরিচালনা করা হয় "সংস্কৃতি প্রাসাদ" (Palaces of Culture)। ছেলেমেয়েদের নিয়েই যেন বাবা মা আসতে পারেন, এই ব্যবস্থার জন্য এখানে শিশু বিভাগও আছে। শিক্ষা ও প্রমোদ ব্যবস্থাকে এখানে মেশানো হয়। (১০) এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আছে (ক) "রবিবারের বিশ্ব-বিদ্যালয়" (Sunday University)। এইগুলো বিশেষজ্ঞদের মিলন কেন্দ্র। এখানে উচ্চমার্গে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়। (খ) বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত "লেকচার ব্যুরো"। (গ) সংস্কৃতি ও বিশ্রামের বাগান ("Parks of Culture and Rest") (ঘ) স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী। এরা পাঠক সম্মেলনও সংগঠন করেন। (ঙ) নানা কেন্দ্রে সংগ্রহশালা। এখানে রয়েছে গাইড সার্ভিস এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা। (চ) অসংখ্য সিনেমা, থিয়েটার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তো আছেই। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করাই ছিল বড় কথা। বর্তমানে সেই সমস্যার সমাধান

হওয়ায় মূল নজর দেওয়া হচ্ছে বয়স্কদের অবসর বিনোদন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদনী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি।

শিক্ষক শিক্ষণ

নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে কয়েক বছর পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষণের দিকে তেমন নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ ১৯২৪ সন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে বহু শিক্ষক দরকার হয়েছে। নূতন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের দরকারও বেড়েছে তেমনি দ্রুত হারে। সাময়িকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুদিন 'সিফ্‌ট' ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। "অসম্পূর্ণ শিক্ষণের" সাহায্যেও কর্মক্ষেত্রে শিক্ষক সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অবস্থাটি আয়ত্তে আসবার পরে ১৯৩৬ সনে ডিক্রী জারি করা হয় যে শিক্ষণহীন শিক্ষকদের ১৯৩৮ সনের মধ্যে শিক্ষণ নিতেই হবে।

প্রাক-স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করেন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। অঙ্গরাজ্যের শিক্ষামন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষার মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োজিত হন উচ্চতর মাধ্যমিক এবং বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা।

শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল—(ক) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীকে তৈরী করবার দক্ষতা সৃষ্টি করা; (খ) যে বিষয়ে পড়াবেন, সেই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টি করা; (গ) শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক জীবন ও শ্রমের সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করা; (ঘ) যথেষ্ট জ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, শিক্ষা পদ্ধতিতে দক্ষ এবং যৌথ জীবন ও সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাকর্মী গঠন।

শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রথম যুগে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং ছিল টিচার্স ইনষ্টিটিউটে। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে এখানে তিন বছর পড়তে হত। পাঠ্যক্রমে ছিল সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য সাধারণ শিক্ষা এবং পেশাগত শিক্ষণ। নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে পড়াবার জন্য দরকার ছিল দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষণ কোর্সে ভর্তি। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হত। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ানোর অনুশীলন করতে হত। কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণও হয় শিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে (Pedagogical Institute)। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার জন্য যে নিম্নতম যোগ্যতা দরকার, এখানেও তেমন যোগ্যতাই দরকার।

দশ বছরের স্কুল শিক্ষার শেষে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে স্থান নিতে হয়। যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দক্ষ হতে চান, সেই বিষয়ে তাঁর ভাল ফলাফলকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষণকাল সাধারণত তিন বছর।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণকাল পাঁচ বছর। যে বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক হতে শিক্ষার্থী ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তুতে তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা আবশ্যিক। পাঠ্য পুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি চাই। প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক কাজ এবং লেবরেটরির কাজও করতে পারা চাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা, চতুর্থ বছরে আট সপ্তাহকাল এবং পঞ্চম বছর ১২ সপ্তাহকাল প্রাকটিস্ টিচিং করতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—উভয় স্তরেই পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে—স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষা প্রাকটিস্, উৎপাদনী কাজ, পরীক্ষা পদ্ধতি, সমপাঠ্য এবং নান্দনিক কাজ। শিক্ষণ সম্পর্কিত বই প্রকাশ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের এ্যাকাডেমি অথবা শিক্ষাকর্মীদের সমবায় (Co-operative of Educational Workers' Unions)।

শিক্ষণকালের শেষে হয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। নূতন কোন ডিগ্রী দেওয়া হয় না। সার্টিফিকেট দেওয়া হয় "মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক" ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ একটি উৎপাদনী কাজে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়। সুতরাং তাঁদের উপাধি হয় একই সাথে দুটি যেমন 'মাধ্যমিক শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ার;' অথবা "মাধ্যমিক শিক্ষক ও কৃষিবিদ," কিম্বা "মাধ্যমিক শিক্ষক ও গোপালন বিশেষজ্ঞ।"

গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান হারে স্কুল তৈরী হওয়ায় গ্রামীণ শিক্ষকের সমস্যাও সৃষ্টি হয়। তাই গ্রামীণ শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রতিষ্ঠান "Institute for the perfectibility of skills." শিক্ষণ কলেজের পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং গ্রামীণ শিক্ষকের মধ্যে ৬ মাসের জন্য পারস্পরিক স্থান বদলের পরিকল্পনাও করেছে মস্কোর লেনিন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা ডাকযোগে কিম্বা সান্ধ্য ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের পুরো পাঠ নিচ্ছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষকের স্থান সমাজ জীবনে যথেষ্ট সম্মানিত। ওখানে বিশ্বাস করা হয় যে শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা হয় না, শিক্ষা ছাড়া জীবনযাত্রায় উন্নতি হয় না। বস্তুতঃ লেনিনই বলেছিলেন, "We must raise our teacher to a height such as he had not attained and will never attain in a bourgeois society." রাশিয়ায় শিক্ষকরা পেশাগত জীবনে অনেক ধরনের সুবিধা

পেয়ে থাকেন। সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজ এবং অতিরিক্ত কাজের (overtime) জন্য অতিরিক্ত বেতন, ছাত্রছাত্রীর বাড়ীর কাজ (home work) শুদ্ধ করা, লেবরেটরির কাজ দেখানো, দূরাঞ্চলে শিক্ষকতা করার জন্য অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষয়িত্রীদের ৫৫ বছর এবং শিক্ষকদের ৬০ বছরে পেনসন্ আছে। গ্রামের শিক্ষকরা বিনা ভাড়ায় বাড়ী, জ্বালানী এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকেন। বেতনের অঙ্ক ছাড়াও প্রকৃত আয় অনেক বেশী কারণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষা, বিধবা মায়ের বিশেষ ভাতা, শিক্ষকের পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি নানা সূত্রে নানা সুযোগ রয়েছে। আশ্চর্য নয় যে সোভিয়েত শিক্ষকরা সমাজতন্ত্র গড়বার কর্মযজ্ঞে নিবিষ্ট মনে এবং হৃষ্ট চিত্তে অংশ নিচ্ছেন।

পরীক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করবার জন্য রাশিয়ায় পরীক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কড়াকড়ি আছে। অবশ্য ব্যবস্থাটির মধ্যে অনেক অভিনবত্বও আছে।

প্রাক প্রাথমিক স্তরে কোন পরীক্ষাই নেই। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সারা বছর ধরে টার্মিনাল রেকর্ড রাখা হয় এবং সম্বৎসরের অগ্রগতির ভিত্তিতেই ক্লাস প্রমোশন হয়, কোন বাৎসরিক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা পরীক্ষা নেই। তবে তৃতীয় শ্রেণীর পরে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের পরীক্ষা রয়েছে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল (১) শিশুটি নির্ভুলভাবে কতটা জেনেছে, তা নিরূপণ করা (অর্থাৎ জ্ঞানের সঠিকতা), (২) বুদ্ধিমত্তার সাথে পাঠ্য বিষয় বুঝবার ক্ষমতা পরিমাপ করা; (৩) যতটুকু শিখেছে, ততটুকুকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা যাচাই করা।

পরীক্ষার ব্যাপারে অবশ্য ছেলেমেয়েদের বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় না অথবা কোন সাজেশ্‌সন (suggestion) যোগাড় করতে হয় না। সবটা পাঠ্য পড়া হলেও পরীক্ষার কয়দিন আগে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে কার্ড পাঠিয়ে দেন; ঐ কার্ডে লেখা থাকে—কোন কোন বিষয়ে (topic) প্রশ্ন দেওয়া হবে (প্রশ্নগুলি নয়) পরীক্ষার্থীকে তখন হাতড়ে মরতে হয় না। সারা বছরে সবটা পড়া হলেও যে তিনটি 'টপিক' কার্ডে উঠেছে, সেই তিনটিতেই তার পরীক্ষাপ্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্ব নিয়োগ করতে পারে। এর ফলে মানসিক উৎকণ্ঠা কমে, স্নায়বিক ব্যাধি হয় না। অবশ্য লিখিত পরীক্ষা ছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়েই আছে মৌখিক পরীক্ষা।

চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত টার্মিনাল ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। পাঠ্য বিষয়ের উপর নম্বর দেওয়া ছাড়াও আচার আচরণ প্রভৃতিও পরীক্ষার অন্তর্গত হয়।

অষ্টম শ্রেণীর শেষ টার্মিনাল পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ও কার্ডে প্রশ্নের "টপিক" (অথবা Theme) জানিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই নবম শ্রেণী কিম্বা টেকনিক্যাল স্কুল কিম্বা বিশেষীকৃত স্কুলে ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়। এমনকি একই মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যেও নবম শ্রেণীতে নেওয়ার সময় অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষার ফলাফল বিচার করা হয়।

দশম শ্রেণীর সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটি খুবই মূল্যবান, কারণ ঐ পরীক্ষার ফলাফলই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল—(১) জ্ঞানের সঠিকতা নিরূপণ, (২) শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং বিকাশ নিরূপণ, (৩) সক্রিয় এবং আত্মনির্ভর বিচার শক্তির পরিমাপ, (৪) অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষমতা যাচাই করা ইত্যাদি।

এই পরীক্ষারও দশদিন আগে স্কুলে স্কুলে Topic Card পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্নগুলি অবশ্য স্কুল থেকে স্কুলে ভিন্নতর হয়। বিদেশী ভাষা, রুশ ভাষা, ইতিহাস, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নেওয়া হয় লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীকে অভিধান এবং মানচিত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষা হয় সব কয়টি পাঠ্য বিষয়েই। ভূগোলের ক্ষেত্রে গ্লোব ব্যবহারের ক্ষমতাও যাচাই করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী তৈরী করেন বিষয়ের শিক্ষক। পরীক্ষা হয় একটি বোর্ডের সামনে। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক, অন্য দুজন শিক্ষক, আঞ্চলিক শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি। অষ্টম শ্রেণীর শেষে এবং দশম শ্রেণীর শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন প্রধান শিক্ষক, বিষয়-শিক্ষক, অন্য দু'জন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।

রুশ পরীক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষকদের সামনা সামনি উপস্থিত হতে পরীক্ষার্থীর ভয় ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই পরীক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ স্কুলে একটা উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। আনন্দমুখর ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষকরা তাঁদের কাজ করে নেন। পাঁচটি স্তরে বিভাগ করে নম্বর দেওয়া হয় (1—5 Numerical Scale)। ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণী/বিষয় শিক্ষকের অভিমতকে খুবই মূল্য দেওয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মানসিক পরিমাপ ব্যবস্থা (Mental Measurement) সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। তবে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় ও কাজে গ্রেড অনুসারেই উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার জন্য ভর্তি পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার কড়াকড়ি হওয়ার ফলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ফাঁক-ফাঁকি থাকেনা। রাশিয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাটি তাই যথেষ্ট উচ্চমানের।

সমপাঠ্য কাজ

সর্বজনীন শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদা রাশিয়ায় পূরণ হয়েছে। সাংস্কৃতিক মান· আরও উন্নত করবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনবরত চেষ্টা চলছে। অবসরকালীন শিক্ষার জন্য রয়েছে সাহিত্য, কলা, সিনেমা ও সঙ্গীত ক্লাব; নানা ধরনের খেলাধুলোর সংগঠন এবং 'হবি' ক্লাব। সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে তিনলক্ষ খেলার মাঠ ও ষ্টেডিয়াম, পাঁচ হাজার স্বাস্থ্যাবাস এবং যুব হোষ্টেল; পাইওনিয়ার প্যালেস আছে ৩৬৯৫টি। ছেলেমেয়েদের সমপাঠ্য কাজ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান যেমন—৩৪৫১টি যুব শিক্ষানবিসি ক্লাব, ৩০৬টি প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্লাব, ১৬১টি ভ্রমণ ও হাইকিং ক্লাব, ২২১৭টি স্পোর্টস সংগঠন, ১২৩টি থিয়েটার ক্লাব, ১৭৫টি শিশু উদ্যান এবং ৩২টি শিশু রেলপথ।

কমসোমল (Komsomal)

স্কুল কলেজে সহপাঠ্যমূলক কাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে কমসোমল (যুব-কম্যুনিষ্ট লীগ)। বিপ্লবের পরে নবনির্মাণের সূচনাতেই এই সংগঠন গড়া হয়। শিক্ষামূলক কাজে অংশ গ্রহণ, নূতন ভাবাদর্শ নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গড়ে তোলা এবং নির্মাণ কাজে স্বেচ্ছামূলকভাবে কিন্তু সংগঠিতভাবে অংশ নেওয়াই হয়েছে এই সংগঠনের আদর্শ। ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হয় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র "কমসোমলস্কায়া প্রাভদা"। ১৫ থেকে ২৩ বছরের কিশোর-যুবারা এই সংগঠনের সদস্য হয়। নিম্নতর স্কুলের পর্যায়ে আছে "ইয়ং পাইওনিয়ার্স"। প্রতি স্কুলে কলেজে এইসব সংগঠনের শাখা আছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে জাতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠানও হয়। বর্তমানে কমসোমলের সদস্য সংখ্যা ২৩ লক্ষের বেশী। ইয়ং পাইওনিয়ার্সের সদস্য সংখ্যাও প্রায় ঐ সমান। কমসোমলদের মধ্য থেকে পাইও-নিয়ারদের পরিচালক নির্বাচন হয়।

পারিবারিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়াই কমসোমলের অন্যতম দায়িত্ব। তা ছাড়া স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে এরা অংশ নেয়, যেমন—জঙ্গল কাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, স্কুল বাড়ী সাজানো, মেরামত করা, বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইনকে কার্যকর করা, শ্রেণী কক্ষে নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করা, ভ্রমণ সংগঠন করা ইত্যাদি। প্রথমদিকে অতি উৎসাহের ফলে অনেক

সময় শিক্ষকদের কাজেও কমসোমলের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সনে স্থির করা হয় যে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং পঠন-পাঠনে হাত দেওয়া হবে না। এখন স্কুল-সময়ের বাইরে সাংস্কৃতিক কাজ, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং আগে উল্লেখিত কাজগুলির উপরই নজর দেওয়া হয়। একথা অনস্বীকার্য যে রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি "যৌবনই জাতির আশা" বহুলাংশে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রশাসন

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ট্রেড ইউনিয়ন এবং যৌথ খামার প্রভৃতি শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করে, তা ছাড়া বাকি সব আর্থিক দায়িত্বই রাষ্ট্রের। বস্তুতঃ প্রাকবিপ্লব যুগের তুলনায় বর্তমান কালে শিক্ষার বাজেট বেড়েছে ৬৫ গুণ।

শিক্ষার সাধারণ নীতি স্থির করে সুপ্রীম সোভিয়েট। ১৯৭৩ সনে সুপ্রীম সোভিয়েটে শিক্ষা সংক্রান্ত মূল নীতির যে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, তা থেকেই শিক্ষা প্রশাসনের মূল কথা বোঝা যায়। ঐ নীতিগুলি হল :—

(ক) সোভিয়েত রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সমসুযোগ থাকবে।

(খ) সব শিশু এবং কিশোরদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

(ঘ) শিক্ষার ভাষা মাধ্যম স্থির করবার স্বাধীনতা শিক্ষার্থী কিম্বা তার বাবা মায়ের থাকবে। মাতৃভাষা কিম্বা যে কোন রুশীয় ভাষাই গ্রহণ করা চলবে।

(ঙ) সকল স্তরের শিক্ষাই হবে অবৈতনিক।

(চ) ছাত্রদের জন্য প্রচুর ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা চলবে।

(ছ) কমন স্কুলের (Common School) ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি হবে সুসংহত।

(জ) সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান, কারিগরি কিম্বা সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সাথে শিক্ষা হবে সম্পৃক্ত।

(ঝ) সহ শিক্ষাই চালু থাকবে।

(ট) শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মনে সাম্যবাদী আদর্শই গড়ে তোলা হবে।

এই নীতিগুলি কাজে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা প্রশাসকদের।

রুশ সংবিধান হল ফেডারেল চরিত্রের। কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ফেডারেল কর্তৃপক্ষ,

অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষেব যৌথ দায়িত্বেই শিক্ষা প্রশাসন চলে। ফেডারেল সংবিধান হলেও ফেডারেল সরকারের বেশ দায়িত্ব এবং অধিকার আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তারতম্য দূর করা এবং সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য স্থাপনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের। অথচ কেন্দ্রীয় দায়িত্বের অজুহাতে স্থানীয় অধিকার অবহেলিত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সন পর্যন্ত কেন্দ্রে ছিল "উচ্চশিক্ষার কমিটি" (Committee of Higher Education)। ১৯৪৬ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই মন্ত্রককে সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিশ্চিত দায়িত্ব হল—(ক) বিশ্ববিদ্যালয়, (খ) বিশেষ ইনষ্টিটিউট (Single Faculty Institutes), (গ) কারিগরি শিক্ষা, (ঘ) জাতীয় সংগ্রহশালা, থিয়েটার, কলা ও বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির কাজ পবিচালনা করা। শিক্ষা মন্ত্রক ছাড়াও কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক থেকেও বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে আছে কয়েকটি বিভাগীয় সেল—যেমন (ক) কারিগরি ও চারুকলা শিক্ষার দায়িত্বে আর্টস ও ক্রাফ্‌ট্‌স্ কমিটি, (খ) শারীর শিক্ষার শিক্ষণের উপর নজর রাখবার জন্য "Committee of Physical Culture"। কোন কোন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার উপর খবরদারির জন্য আছে বিশেষ কমিটি।

বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিভাগেই রয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কেন্দ্রের প্রতিটি বিভাগেই আছে সেই বিভাগীয় উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা। শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থার উপর কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় না। প্রতিটি বিভাগই নিজস্ব পরিদর্শক নিয়োগ করেন। শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীর নিয়মানুবর্তিতাই মূলতঃ পরিদর্শকের দৃষ্টিতে থাকে। তা ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনেরও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগ আছে। শিক্ষার প্রয়োজনকে উৎপাদনী প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা করা ছাড়া পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিতে পারাই বড় কথা।

রাজ্যস্তরের শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে প্রথমেই বলা দরকার যে অঙ্গরাজ্যগুলি বহুলাংশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ভোগ করে। প্রতিটি রাজ্যে আছে "শিক্ষা কমিশার"। তাঁকে সাহায্য করা হয় একটি বোর্ড থেকে। শিক্ষা কমিশারই শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সংগ্রহশালা, থিয়েটার, সংগীত ও কলা প্রতিষ্ঠানের উপরও রয়েছে কমিশারের নিয়ন্ত্রণ। রাজ্য শিক্ষা কমিশারের কতগুলি উপসমিতি

আছে নানাধরনের কাজ দেখাশোনার জন্য, যেমন—প্রশাসন ও সংগঠন, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সংখ্যালঘু জাতি উপজাতির শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলা প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকা, সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি।

অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রকের অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিক্ষক শিক্ষণ, পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস নির্ধারণ, বাড়ীঘর ও আসবাব ইত্যাদির উপর রয়েছে নিয়ন্ত্রণ। এইসব বিভাগের প্রতিটিতেই আছেন একজন পরিচালক (Director)। রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা মন্ত্রক। শিক্ষা মন্ত্রকই পাঠ্যবই প্রকাশ করে। ক্রেস এবং নার্সারী স্কুলগুলি অবশ্য বেশীর ভাগই কারখানা ও যৌথ খামারের অনুদানের সাহায্যে পরিচালিত হয়।

শিক্ষা কমিশার সাধারণভাবে প্রশাসনের নীতিগুলি প্রস্তাব করে দেয় বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা অবশ্য এখানেও অবারিত নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা ছাড়া কোন প্রশাসনিক বিধি কার্যকর হতে পারে না।

রাজ্যস্তর থেকে নীচের দিকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ **"অবলাষ্ট"** (প্রদেশের সমতুল্য)। এই স্তরের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল সাধারণ শিক্ষা এবং স্কুল বহির্ভূত শিক্ষা-সহায়ক "সার্ভিসের" প্রতি বিশেষ নজর রাখা। অবলাষ্টের আরও এক ধাপ নীচে হল **রায়ন** (কাউন্টির সমতুল্য)। প্রতিটি রায়নেই আছে শিক্ষা বিভাগ। প্রতিটি শহরে রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের নগর কর্তৃপক্ষ। নগরের প্রশাসনও বরো (Borough) স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকৃত। গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিতে আছে গ্রামীণ জেলা কর্তৃপক্ষ।

অবলাষ্ট থেকে বরো পর্যন্ত প্রতিটি সোভিয়েতই নিজেদের সদস্যদের মধ্য থেকে কমিশার নির্বাচন করেন এবং একজন শিক্ষা আধিকারিক নিয়োগ করেন। কমিশারের দায়িত্ব হল স্কুলগৃহ ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া, চাকুরি কালে শিক্ষক-শিক্ষণ। শিক্ষকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এরা নন। প্রধান শিক্ষকের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষই শিক্ষক নিয়োগ করেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকের দায়িত্ব এবং অধিকার যথেষ্ট বড় প্রতিটি স্কুলের সুযোগ সুবিধে এবং উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আছে স্কুল কাউন্সিল এবং অভিভাবক কাউন্সিল। এরা অবশ্য আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হাত দিতে পারেন না।

ইংলণ্ড আমেরিকার অনেক গ্রন্থকার এক নিঃশ্বাসেই রায় দিয়ে ফেলেন যে রাশিয়ায় শিক্ষা প্রশাসন অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকৃত, এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন আদে

নেই। উপরের আলোচনা থেকে কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় যে শিক্ষা প্রশাসন উপর থেকে নীচে পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো। তবে সার্বিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদের। সমগ্রভাবেই রুশ প্রশাসন ব্যবস্থাটি লেনিনীয় "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ (Democratic Centralism) পদ্ধতিতে পরিচালিত। তা ছাড়া উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সরকারী প্রশাসনের পিছনে কাজ করছে সুগঠিত এবং নিয়মানুবর্তী পার্টি। তাই শিক্ষা প্রশাসনের কাজ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সুগ্রথিত। আপাতঃদৃষ্টিতে একেই মনে হতে পারে কেন্দ্রীকৃত।

কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য

"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" বলে কার্ল মার্কস যে ধ্বনি তুলেছিলেন সেই আদর্শ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সোভিয়েত রাশিয়া নীতি হিসেবে নিয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই মার্কসীয় নীতি। সেই অনুসারে সদ্যস্বাধীন অনুন্নত দেশগুলিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় সাহায্য করাও সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি। এই নীতিরই ফলশ্রুতি হল মস্কোর লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়। এমন একটি ব্যক্তির স্মৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যিনি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই প্রাণ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির পোশাকী নাম "আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়" (International Friendship University)। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলি থেকে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে বিনা ব্যয়ে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে।

পাঠ্যবইয়ের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারেও রাশিয়া অনেকটা এগিয়েছে। রাশিয়া থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পাঠ্যবইগুলি আমাদের দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাঠ্য বইয়ের ব্যাপারে রাশিয়ায় রয়েছে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞ দিয়ে বই লিখিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বই চালু করা হয়। শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও মন্তব্য অনুসারে আবার পুনর্বিবেচনা করা হয়। চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পরে বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশনা ও সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। বিভিন্ন ভাষাতেই বই ছাপানো হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে সারা রাশিয়ায় পাঠ্য বই অভিন্ন। শ্রেণী কক্ষে প্রয়োজন মত পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্ত আলোকপাত করার অধিকার শিক্ষকের আছে।

বহু জাতি উপজাতি এবং মানবগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতি

সমস্যার সমাধান করা হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে। প্রতিটি জাতির সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত। প্রতি জাতির নিজস্ব ভাষাই স্থানীয়ভাবে শিক্ষার বাহন। (বলা দরকার যে প্রাক বিপ্লব যুগে অনেক ভাষারই লিপি ছিলনা। বিপ্লবের পরে সেখানে লিপি সংযুক্ত হয়েছে। লিখিত ও পঠ্য আকারে ভাষাগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে)। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করবার সুযোগ হয়েছে বলেই অন্য ভাষা শিখবার বেলায় অনীহা নেই। রুশ অঙ্গরাজ্য ছাড়া রাশিয়ার সর্বত্রই রুশ ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আবশ্যিক রূপে অনুশীলন করা হয়। যে কোন একটি বিদেশী ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাছাই করা চলে। নিজস্ব ভাষা, সারা রুশিয়ার জন্য রুশ ভাষা এবং বিদেশী ভাষার সমন্বয়ে ভাষা সমস্যার সমাধান করা হয়েছে বলেই রাশিয়ার শিক্ষায় ভাষাদ্বন্দ্ব নেই। ধর্মের সাথেও শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রতিষ্ঠান কিম্বা ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সব প্রতিষ্ঠান এবং সমস্ত ব্যবস্থাটিই রাষ্ট্রপরিচালিত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষার ভূমিকা স্বীকৃতির ব্যাপারে কোন গোপনতা নেই। এ জন্যই নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা নেই। তা ছাড়া সহশিক্ষাই সাধারণ নীতি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ফলেই জাতি কিম্বা বর্ণগত সমস্যা নেই। সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিশেষ ফলশ্রুতি হল **পলিটেকনাইজেশন তত্ত্ব ও পদ্ধতি।**

(পলিটেকনাইজেসন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, **প্রথম অংশের শেষ অধ্যায়ে "কর্মশিক্ষা" প্রসঙ্গে**. সেই আলোচনাটির পুনরুক্তি আর করা হল না।)

তুলনামূলক সমীক্ষা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিবেশে এক একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে দুটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি তুলনার প্রশ্নই অবান্তর। তা ছাড়া সামাজিক ভাবাদর্শ, আর্থিক বিধি এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সুতরাং একটি ধনবাদী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একটি সমাজতন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আক্ষরিক তুলনা খুবই কষ্টসাধ্য। দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পার্থক্য থাকে, যদি তাদের ঐতিহ্য এবং প্রয়োজন ভিন্নতর হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা চলে রাশিয়া এবং পূর্ব জার্মাণীর কথা। জার্মাণ গণতান্ত্রিক

প্রজাতন্ত্রও একটি সমাজবাদী দেশ। কিন্তু উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই জার্মাণীতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষা জগতের অনেক নূতন ধ্যানধারণাও জার্মাণীতেই তৈরী হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জার্মাণীর উত্তরাধিকার তাই বলিষ্ঠ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মাণী বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও সেই উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়েছে পূব জার্মাণীও। অথচ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। তাই পুরানো ব্যবস্থার সাথে যথাযোগ্য সমন্বয় করেই বর্তমানের পুর্ব জার্মাণ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে, যদিও রাশিয়ার সাথে ভাবাদর্শগত সাদৃশ্য রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

তবু বর্তমান বিশ্বে অনেক সমস্যাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিন্ন। বিজ্ঞানের অবদান এখন সারা পৃথিবীর যৌথ সম্পদ। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার পন্থা ও প্রণালীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করা অবশ্যই সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা এখন আন্তর্জাতিক সমতার বিষয়। একই যন্ত্র ধনবাদী ও সমাজবাদী দেশে প্রবর্তিত হয়। একই ধরনের কারিগরি দক্ষতা দরকার হয়। পার্থক্য হয় যন্ত্রের মালিকানা এবং উৎপাদনের ফল ভোগ করবার বেলায়। সুতরাং কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্টই তুলনার যোগ্য।

সর্বোপরি বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এমন কতগুলি আদর্শ দানা বেঁধেছে, যাকে অস্বীকার করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় (১) শিক্ষায় সমানাধিকার; (২) কমন স্কুল, (৩) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা, (৪) শিক্ষার গণতান্ত্রিক প্রশাসন, (৫) উৎপাদনী শিক্ষা, (৬) শিক্ষার সাথে জাতীয় অর্থনীতি এবং জাতীয় উন্নয়ণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, (৭) শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমতা, (৮) বয়স্কদের শিক্ষার সঠিক ব্যবস্থা, (৯) বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ, (১০) শিক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব ইত্যাদি।

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে কমন স্কুল ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাশিয়া অনেকখানি সফল হয়েছে। রাশিয়ায় নারী শিক্ষাও অনেক ব্যাপক। শিক্ষার সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার যোগাযোগও হয়েছে অনেক ফলপ্রসূভাবে। জাতীয় অর্থনীতির সাথে শিক্ষার সংযোগও সেখানে অনেক প্রত্যক্ষ। সর্বোপরি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা সমস্যারও সার্থক সমাধান সম্ভব হয়েছে।

এইসব ক্ষেত্রের প্রতিটিতেই ভারতের আছে অনেক সমস্যা। সুতরাং ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ও সমাধানের পন্থা থেকে

ভারতের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। অপরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোও বুদ্ধিমত্তার কাজ।

Exercises

1. Write a note on the structure of the education system in the U. S. S. R.

2. Why could the U. S. S. R. shorten the period for Primary education ? In this connection make a critical appraisal of the curriculum for Complete Secondary Education.

3. Enumerate the types of secondary school in the U.S S.R. and analyse their distinctive features.

4. What are the educational avenues after the secondary stage in Soviet Russia ?

5. Discuss the importance of the Specialised Secondary School in the context of the Russian economic system.

6. Make an appraisal of Adult Education in the U. S S. R.

7. Give an account of the system of Teacher-Education in Soviet Russia. What is the significance of the double designation given to trained teachers ?

8. Write a note on the system of Examination in the U. S. S. R. Which features of this system appeal to you most ?

9 Write a short essay on educational administration in the U. S. S. R.

10. Write notes on :—(a) Incomplete Secondary Education ; (b) Komsomol ; (c) Lumumba University ; (d) Text Book preparation in the U. S. S. R. ; (e) Language policy in Russian education.

তৃতীয় অংশ

শিক্ষাগুরুদের কথা

শিক্ষাতত্ত্বের বিবর্তন

সুষম জীবন বোধের সন্ধান দেওয়াই দার্শনিকের কাজ। আদিকাল থেকে সব দার্শনিকই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের স্বরূপ এবং মানব সমাজের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের স্থান নির্ণয় করে সুষম জীবন সন্ধান করেছেন। এই বিমূর্ত দর্শনের জীবন বোধ শিক্ষার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনচেতনাই শিক্ষাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই অর্থে জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। তাই শিক্ষার আদর্শকে বলা হয় জীবনাদর্শের ফলিত রূপ। এ জন্যই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল যুগের খ্যাতনামা দার্শনিকরা শিক্ষা-দার্শনিক রূপেও খ্যাত হয়েছেন।

জীবনচেতনা কিন্তু পরিবেশাশ্রয়ী, সুতরাং যুগধর্মাশ্রয়ী। যুগপরিবেশ, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, সমাজ পরিবেশ প্রভৃতি নানা উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যুগমানস। আবার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তনশীল বলেই যুগমানসও পরিবর্তনশীল। দার্শনিকও পরিবর্তনশীল যুগমানসের ঊর্ধ্বে থাকতে পারেন না। যুগমানসের সার্থক ধারকই সে যুগের সার্থক দার্শনিক। আবার দার্শনিক বলেই তার অন্তর্দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে প্রসারিত। তাই সার্থক দার্শনিক একদিকে যুগমানসের ধারক হবেন, অপরদিকে ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন।

শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যুগপ্রয়োজন এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনবার জন্যই দেশে দেশে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন শিক্ষা দার্শনিক। সমাজের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা। পরিবর্তনশীল জীবনে সমাজ পরিবর্তনশীল। সুতরাং শিক্ষা চেতনাও পরিবর্তনশীল। চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় কোন শিক্ষাদর্শের কথা ভাবাই যায় না। দেশকালের প্রয়োজনে শিক্ষাচেতনাও তাই পরিবর্তিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর শিক্ষা ইতিহাসেই এই সত্য বিধৃত।

প্রাচীন ভারতে মুক্তি ও মোক্ষলাভের চেতনা এবং অপরদিকে চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজ চেতনার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা। প্রাচীন গ্রীসেও পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্যের চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল শিক্ষাচেতনা। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনের ফলেই সামাজিক

তথা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে। অপরদিকে এথেন্সে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যখন সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, তখন ব্যষ্টি ও সমষ্টির নূতন সামঞ্জস্যের সূত্রানুসন্ধান করলেন সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টোটল।

সক্রেটিস ঘোষণা করলেন সত্য সর্বজনীন, মূল্যবোধও সর্বজনীন। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি নৈতিকতায় ও পুণ্যে। জ্ঞানসাধনার দ্বারাই এই পুণ্যমার্গে পৌছা সম্ভব। প্লেটো এই দার্শনিক চেতনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনিও ব্যষ্টি ও সমষ্টি দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধান করলেন। সত্য লাভের জন্য বুদ্ধি ও অনুভূতির শিক্ষা এবং রিপু দমনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। নৈতিক জীবনেই শিক্ষার প্রকৃত ফলশ্রুতি। তবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নৈতিক ও পরম শিক্ষার যোগ্য পাত্র হিসেবে সমাজের অভিজাত অংশকেই প্লেটো উচ্চাসনে বসিয়েছেন। এ্যারিষ্টোটল এই চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়েছেন। শিক্ষাকে অভিজাত সমাজের মধ্যে সংকীর্ণ না রেখে তিনি সাধারণ সমাজের মধ্যে এনেছেন। নাগরিকতার সুস্থ শিক্ষা এবং দেহ মন ও বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন চর্চার পথ নির্দেশ করেছেন। তা ছাড়া সুস্থ নাগরিকতার শিক্ষা কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা নয় তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সংকর্ম ও আচরণের সংমিশ্রণ চেয়েছেন।

প্রাচীন গ্রীসীয় যুগের পরে এলো রোমীয় যুগ। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী রোমকগণ বাস্তব দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সন্তান-সন্তুতি, পিতা মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে রোমকগণের শিক্ষা গড়ে উঠলো। কিন্তু কালক্রমে রোমীয় নাগরিক জীবনেও সৃষ্টি হলো দুষ্টক্ষত। পতন হলো রোম সাম্রাজ্যের। এলো সর্বাত্মক অরাজকতা। তত্ত্বজ্ঞানহীন বিজয়ী "বর্বরদের দুর্ধর্ষতা ও 'নীতিজ্ঞানহীনতা' পারিস্থিতিকে করে তুললো অসহনীয়।" এই অবস্থায় ইউরোপীয় সভ্যতার ত্রাণকর্তা হলো খ্রীষ্টধর্ম। নীতিভ্রষ্ট ইউরোপীয় সমাজে খ্রীষ্টীয় শিক্ষাতত্ত্বে স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হলো নৈতিক জীবনের উপর। অন্তর্জীবনের পবিত্রতাই এই নৈতিক শিক্ষার মূল কথা। একদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে তাত্ত্বিক শিক্ষা (Scholasticism), এবং অপরদিকে আশ্রম জীবনে নৈতিক অনুশাসন ও অনুশীলনের শিক্ষাই (Monasticism) সমগ্র মধ্যযুগীয় শিক্ষার মর্মবস্তু।

মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করলেও নিয়মানুবর্তিতার কাছে ব্যক্তিসত্তা, অনুভূতি ও আবেগের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু কালের অমোঘ গতিপথে নূতন জীবনযাত্রার দাবিই রূপ নিল নবজাগরণ আন্দোলনে। শিক্ষাক্ষেত্রে

নবজাগৃতি আন্দোলনের ফলিত রূপটিই মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা (Humanistic Education)। ইউরোপীয় সভ্যতা মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিকতায় পদার্পণ করলো।

কিন্তু দু'শ' বছরের মধ্যেই মানবিক শিক্ষাও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেললো। সংকীর্ণ অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন সাহিত্যের বহিরঙ্গ-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিক অনুশীলনই হয়ে দাঁড়ালো মানবিক শিক্ষার বিকৃত রূপ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এ শিক্ষার কোন সম্পর্কই রইল না। এ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে শিক্ষা চেতনায় এলো বাস্তবতাবাদ। শিক্ষাকে সমাজমুখী করার দাবি উঠলো। জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাকে সকলের কাছে সহজলভ্য করার দাবি করলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু কোমেনিয়াস। কিন্তু মানবিক শিক্ষার নিয়মানুবর্তী ধারা তখনও শেষ হয়নি। মানবিক শিক্ষার নবমূল্যায়ণ করলেন ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লক্। তিনি বললেন সুস্থ দেহে সুস্থ মনসম্পন্ন, সুষম এবং ব্যাপক প্রজ্ঞাসম্পন্ন সদ্‌গুণাবিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার পদ্ধতি হলো নিয়মানুবর্তিতা ও সুঅভ্যাসের অনুশীলন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র চিন্তা জগতে এলো রূপান্তর। নবজাগরণের যুগ থেকেই জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তির ধারা ক্রমেই প্রবল হয়ে আসছিল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের সাধনায় যখন প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলো, তখন মানব সমাজকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে না কেন? তাই অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তির কষ্টি পাথরে সব কিছু যাচাই করার প্রবণতা দেখা গেল। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি এবং যুক্তির কাছে যা কিছু সত্য বলে প্রতীয়মান, তাকেই প্রকৃত সত্য রূপে গ্রহণ করা হলো। ফলে জিজ্ঞাসাহীন বিশ্বাসের অবসান ঘটলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক জ্ঞানসাধনার পথ প্রশস্ত হলো। এ যুগই ইউরোপের "প্রজ্ঞার যুগ"। স্বাধীন চিন্তার বিকাশই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। প্রজ্ঞা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল অতীন্দ্রিয় শক্তির ভয়, সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক স্বৈর শাসন ও পীড়ন থেকে মানবমুক্তি এবং নৈতিক ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু সূচনাকালে প্রজ্ঞা আন্দোলন এক মহান পদক্ষেপ হলেও অল্পকালের মধ্যেই এর প্রাণশক্তি গেল নিঃশেষিত হয়ে। প্রজ্ঞা আন্দোলন ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঘটলো নয়া আভিজাত্যের এই সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ—যার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করলেন রুশো, দাঁতো, রোবসপিয়েরের প্রভৃতি। সুতরাং রুশোর উত্থান আনুষ্ঠানিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে।

গণজাগরণের উদ্দেশ্য হলো নূতন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাকেই উচ্চাসন দিয়েছিল। রুশো সে ক্ষেত্রে শিশুর মুক্তি, শিশুনির্ভর শিক্ষা, শিশুর সামাজিক ভূমিকা ও প্রকৃতি-অবলম্বী শিক্ষার কথা বললেন।

প্রজ্ঞা আন্দোলন ছিল মূলতঃ যুক্তিবাদী। ভোলতেয়ার ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। গণবিদ্রোহ ছিল মূলতঃ হৃদয়বাদী, রুশো ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। যুক্তির পীড়ন ও বাহ্যাডম্বরের বিরুদ্ধে প্রকৃতিদত্ত আবেগ ও অনুভূতিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর আস্থা, সাধারণ মানুষের জীবনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, মানুষের জয়গান, নয়া সমাজের স্বপ্ন এবং মানুষের অন্তরেই প্রাকৃতিক ধর্মের প্রকৃত মন্দিরের কথা তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করে গেছেন। আধুনিক যুগের অন্যতম পথনির্দেশক রুশো ছিলেন আধুনিক শিক্ষা চেতনারও জনক। রুশোর শিক্ষাতত্ত্বই আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য।

জাঁ জ্যাকস্ রুশো (Jean Jacgues Rousseau) (১৭১২—১৭৭৮)

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—(১৭১২ সনে রুশোর জন্ম হয় জেনেভায়। বাল্যজীবন থেকেই রুশো আত্মসচেতন, একগুঁয়ে এবং আবেগপূর্ণ রোমাঞ্চক কাহিনীতে আকর্ষণ ছিল। পিতৃ দাদুর গ্রন্থাগার থেকে পড়া প্লুটার্কের "Parallel Lives" তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কড়া নিয়ম ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি গ্রামের স্কুল ছাড়েন, বাড়ী ছাড়েন, এবং ভবঘুরে জীবন যাপন করেন। এই জীবনেই তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠতম এবং নিকৃষ্টতম দিকের সাক্ষাৎ পরিচয় পান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রকৃত শিক্ষার ভূমিকা পালন করে।

১৭৫০ সন থেকে রুশোর অভিজ্ঞতাপুষ্ট সৃজনমূলক চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ বৎসরেই Academy of Dijon কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। রচনার বিষয় ছিল "Has the Restoration of Sciences and Arts contributed to purify or to corrupt morals ?" এই রচনায় রুশো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'মহান আদিমতার' (noble savage) জয়গান গাইলেন। ১৭৫৫ সনে প্রকাশিত হলো তাঁর "Discourse on the orgin of Inequality". বস্তুতঃ এই দুইটি রচনাতেই তাঁর সমস্ত চিন্তাসৌধের ভিত্তিমূল গ্রথিত।

তিন-চার বছরের মধ্যেই রুশো প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করলেন ধর্মযাজকদের শত্রুতা। ১৭৬১ সনে প্রকাশিত হলো 'The Nouvell-

New) Heloise" উপন্যাস। ১৭৬২ সনে প্রকাশিত হলো "The Contract Social" এবং 'Emile'। শেষোক্ত গ্রন্থেই রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব বিধৃত।

বিপ্লবী মতবাদের জন্য ফ্রান্স থেকে পালিয়ে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল জেনেভা এবং সেখান থেকে Motiers-এ। কিন্তু জার্মান যাজক সমাজের কোপদৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। তিনি পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে। সেখানে তিনি হিউম এবং বার্ক-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। জীবনসায়াহ্নে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। স্বদেশে তিনি ফিরে আসেন এবং ১৭৭৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

রুশো ছিলেন গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্দীপিত, ভাবাবেগপূর্ণ মিশ্র চরিত্রের ব্যক্তি। তাঁর ছিল প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং সহানুভূতি, কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের ছিল বড়ই অভাব। তাছাড়া স্বভাবে ছিল মানসিক অসমানুবর্তিতার। জেনেভার সরল ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণের সঙ্গে প্যারিসের কৃত্রিম জীবনযাত্রার বৈষম্যই তাঁর চিন্তার 'State of Nature" সম্পর্কিত ধারণার ভিত্তি রচনা করেছে।

কিন্তু তাঁর কাছে যুক্তির চেয়ে আবেগ বড়। বিচারের চেয়ে সহজাত প্রবণতা বড়। এই আবেগপ্রবণতা নিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে মানবিক সুখ ও উন্নতি প্রতিটি ব্যক্তিরই প্রকৃতিদত্ত অধিকার। সুতরাং শিক্ষাও জন্মগত অধিকার। তাই তিনি যুক্তিবাদের নিপীড়ন, মনীষার আভিজাত্য, প্রচলিত ধর্মাচরণ এবং সামাজিক আচার-আচরণ-বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ফরাসী বিপ্লবের মত রুশোর জীবনও ছিল পরস্পর বিরোধিতার সামঞ্জস্য। রুশো নেতৃত্ব করেছেন যুক্তির বিরুদ্ধে আবেগের বিদ্রোহে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহে, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিকতার এবং নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে গ্রামীণ জীবনের বিদ্রোহে।

রুশোর যুগ: রুশোর যুগ ছিল ফরাসী দেশের প্রাক্‌বিপ্লব যুগ। ইউরোপের মধ্যে কেবল ইংলণ্ডে তখন ধনতন্ত্র দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মূল ভূখণ্ডে মধ্যযুগের ক্রমক্ষয় অথচ ধনতন্ত্রের মন্থর অগ্রগতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক শূন্যতা। এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-এবং নৈতিক জীবনের পাহাড় প্রমাণ ক্লেদ। ফ্রান্সের জীবনে এই ক্লেদ প্রকাশিত হচ্ছিল বিকটতম এবং তীব্রতম ভাবে।

সেখানে ভূমিদাসব্যবস্থা নামে বেনামে তখনও প্রচলিত। মধ্যযুগীয় সমাজের তিন স্তম্ভ—রাজা, ধর্মযাজক ও সামন্তপ্রভুর শোষণ ও পীড়ন তখনও অপ্রতিহত। বিলাসসম্ভোগী সামন্ত প্রভুদের দৌলতে নগরগুলি হয়ে উঠেছিল বিলাস কেন্দ্র। সমাজ ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত (Three Estates)। ধর্মযাজক ও সামন্ত অভিজাতবর্গ

ছিলেন বিশেষ সুবিধাভোগী। প্রশাসন, বিচার এবং সামরিক বাহিনীর সমস্ত উচ্চপদের অধিকার নিধারিত হতো বংশগত আভিজাত্য দিয়ে।

অপরদিকে শিল্প-বাণিজ্যও অগ্রসর হওয়ায় নয়া ধনী-গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে নগর জীবনে। অথচ এই অর্থকুলীন সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কৌলিন্য অর্জন করতে পারেনি। রাজতান্ত্রিক শাসন ছিল স্বৈরাচারী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়ে এই মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায় চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তির কল্পনা করেছেন। কিন্তু কেতাদুরস্ত ভদ্রতা ও ফ্যাসানের গণ্ডীতে এঁদের নাগরিক জীবনও ছিল নিতান্তই কৃত্রিম। আর সর্বনিম্নস্তরের শ্রমজীবী মানুষ সভ্যতার জোয়াল কাঁধে বয়ে নেমে গিয়েছিল বর্বর অমানবিকতার স্তরে। পুতিগন্ধময় নাগরিক জীবনে সহজ সরল মুক্তির আনন্দ ছিল না। অসাম্যই ছিল এই সমাজের মৌলিক পরিচয়।

এই পরিবেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা সহজেই বোঝা যায়। তদানীন্তন শিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়ে Tayne বলেছেন যে কেশচর্চা সমাধা করে, খাপে ভর্তি তলোয়ার এবং বগলে শিরস্ত্রাণ নিয়ে, কোট গায়ে, কারুকার্য খচিত পোশাকে ছেলেরা পড়তে যেতো। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ কথাই খাটে। তাদের শিক্ষা ছিল মূলতঃ পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং অভিজাত সমাজে চলবার কত আদব-কায়দা ও সহবত শিক্ষা। বস্তুতঃ তদানীন্তন শিক্ষা ছিল "ভদ্রলোক" এবং "ভদ্রমহিলা" তৈরীর জন্ম শূন্যগর্ভ কৃত্রিমতার অনুশীলন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন চেষ্টাই ছিল না। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল আরও ন্যক্কারজনক। দরিদ্ররা ছিল শিক্ষায় বঞ্চিত।

অথচ এ যুগ ছিল জ্ঞানচর্চার যুগ। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যেব ক্ষেত্রে এ যুগ সৃজন প্রতিভার গৌরব সৃষ্টি করেছে। এমন কি ফরাসী রাজদরবারই ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এ্যাকাডেমি আন্দোলন এ যুগেই দানা বাঁধে। বস্তুতঃ প্রকৃতিবাদ, যুক্তিবাদ এবং মানবতাকে অবলম্বন করে প্রজ্ঞাসাধনা দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রজ্ঞাসাধনা জনজীবনকে আলোকিত করতে পারেনি। তাই সব কিছুই উচ্চশ্রেণীর কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে। সহজেই স্বীকার্য যে এই যুগ ছিল 'সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম যুগ'।

এই অবস্থার বিরুদ্ধেই রুশোর বিদ্রোহ। নিপীড়িত সামাজিক জীবনের কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যুর বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক রচনায় তিনি বললেন: "আদিম বন্য মানুষই ছিল প্রকৃত মহৎ, কারণ সে ছিল সরল, সৎ এবং পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত। বিজ্ঞান এনে দিয়েছে অনাবশ্যক জটিলতা এবং অভাববোধ। সভ্যতা মানুষকে করেছে লোভী,

আত্মকেন্দ্রিক, কুটিল এবং মিথ্যাচারী। অসাম্যই সমাজের ভিত্তি। শিল্প ও সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে মিথ্যাচারের বাহন রূপে।" 'Discourse on the origin of inequality among men' রচনায় তিনি আরও পরিষ্কারভাবে বললেন যে সামাজিক ব্যবস্থাই কৃত্রিম এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এনেছে মানুষ ও মানুষে বৈষম্য। 'ব্যক্তিগত মালিকানাই' সকল অনর্থের মূল এবং কৃত্রিম সমাজের স্রষ্টা। ব্যক্তিগত মালিকানার বেড়া ভেঙ্গে দিতে পারলে মানব সমাজকে কত অপরাধ, যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড এবং দুঃখবেদনা থেকেই না রক্ষা করা যেতো! রুশো তাই মানুষকে সাবধান করে দিলেন সভ্যতার জালিয়াতির বিরুদ্ধে।

রুশোর এই সমাজদ্রোহিতা কিন্তু সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, কুটিল ও কৃত্রিম সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁর এই চিন্তা রূপ পেয়েছে "স্যোশাল কণ্ট্রাক্ট" গ্রন্থে। এই গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বললেন: 'Man is born free, and everywhere he is in chains. One man thinks himself the master of others, but remains more of a slave than they are." সমাজবন্ধনের মধ্যে এই দাসত্বের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রকৃত বিদ্রোহ। তিনি বলেছেন "প্রকৃত সভ্য" মানুষই আভিজাত্যহীন, কৃত্রিমতাহীন, অভাবহীন, সরল স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তুলবে। রুশোর সংগ্রাম তথাকথিত সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে, প্রকৃত সভ্যতা এবং প্রকৃত সমাজের জন্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রুশোর অভিযান মূলতঃ সামাজিক অনুশাসনপিষ্ট, শূন্যগর্ভ, কৃত্রিম শিক্ষার বিরুদ্ধে। পাঁচ অংশে রচিত "এমিল" গ্রন্থে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আসে, তা সবই ভাল, কিন্তু মানুষের হাতে সব কিছুই নিকৃষ্টতায় পর্যবসিত হয়। সকল অনর্থের মূল হলো কৃত্রিম সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ কৃত্রিমতা এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ। মানুষের আদিম প্রকৃতি নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এই প্রকৃতি কলঙ্কিত হয়। সুতরাং সর্বপ্রধান দায়িত্ব বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে মানুষের আদিম শুভ প্রকৃতির অনুসন্ধান এবং পরিপোষণ। রুশোর এই চেতনাই "প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন" রূপে খ্যাত হয়েছে।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের কয়েকটি দিক

১. **প্রকৃতির অধিরাজ্য তত্ত্ব** (Doctrine of the State of Nature): রুশোর আগেই Hobbes এবং Locke প্রাক-সমাজ যুগে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে

নিজ নিজ তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। রুশো তাঁর তত্ত্বে বললেন যে প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুই শুভ এবং সব মানুষেরই ছিল পূর্ণ মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র। কলুষ, ক্লেদ ও অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে সমাজ গঠন ও তথাকথিত সভ্যতার উৎস থেকে। সুতরাং আবার সহজ সরল অকৃত্রিম জীবন প্রতিষ্ঠাই মুক্তির পথ। (এই মতবাদের মধ্য দিয়ে নবজাগৃতি ও তদুত্তরকালের অনেক বৈশিষ্ট্যকেই রুশো সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এমনকি প্রজ্ঞাযুগের যুক্তিবাদকেও তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন। প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে এই বিষোদগার অবশ্যই বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ।)

প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা :—কৃত্রিম সমাজ হল মুক্তি তথা শিক্ষার অন্তরায়। শিশুকে নিয়ে যেতে হবে পিতামাতা, বিদ্যালয় কিংবা সমাজ থেকে দূরে। সেখানে আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে নৈসর্গিক প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রে কলুষতার বাইরে শিশু আপন প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা লাভ করবে।

রুশো তাঁর আলোচনায় "প্রকৃতি" শব্দটিকে তিনটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বাহ্যিক নৈসর্গিক প্রকৃতি, অন্তর প্রকৃতি এবং জাগতিক জৈব প্রকৃতি। এই ত্রিবিধ প্রকৃতিই মানুষের শিক্ষক। ত্রিবিধ শিক্ষার সমন্বয়ই উত্তম শিক্ষা এবং এই সমন্বিত শিক্ষাই ব্যাপকার্থে "প্রকৃতি-অনুসারী শিক্ষা"।

ত্রিবিধ প্রকৃতির মধ্যে "জাগতিক বস্তুর" উপর মানুষের অনেকটা নিয়ন্ত্রণ আছে। মানুষ তার "অন্তর প্রকৃতিকেও" বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করতে পারে। কিন্তু চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস প্রভৃতিতে গড়া "নৈসর্গিক প্রকৃতির" উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং বস্তু-প্রকৃতি ও অন্তর-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা প্রকৃতি অনুগামী নয়, সে শিক্ষা কৃত্রিম এবং ব্যর্থ। সমাজের চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক, সামাজিক কিম্বা পেশাগত প্রয়োজনে শিশুকে প্রস্তুত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বরং স্বাস্থ্যসম্মত, স্বাভাবিক এবং পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। প্রশস্ত মানব জীবনের প্রস্তুতিই শিক্ষা। 'জীবন শিল্প' আয়ত্ত করাই শিক্ষা। রুশো পরিষ্কার বলেছেন, "To live is the trade I wish to teach him." (রুশোর এই মতবাদকে আরও প্রসারিত করে উত্তরকালে জন ডিউই বলেছেন—"জীবন যাপনের প্রস্তুতি নয়, জীবন ধারাই শিক্ষা।")

যে তিনটি অর্থে রুশো 'প্রকৃতি' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, তা আরও একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ** তিনি প্রকৃতি বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের অন্তর

প্রকৃতি যা তার ব্যক্তি সত্তা তথা ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। শিক্ষার ক্ষেত্রে 'অন্তর প্রকৃতির' অর্থ শিশুর জন্মগত কিংবা সহজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্র অথবা প্রকৃতি গঠিত হয় সহজাত প্রবণতা, অনুভূতি ও আবেগ, বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। এই সমস্ত উপাদানই শিশুর বিশিষ্ট আচরণ ও অভ্যাস নির্ণয় করে। সুতরাং শিশুর প্রকৃতি ও অভ্যাস সমার্থক। এই ব্যাপকার্থে "অভ্যাস" অর্জনই প্রকৃত শিক্ষা।

রুশোর বিচারে "অভ্যাস" কথাটি কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক। অপরিবর্তিত সহজাত প্রবণতা ও সম্ভাবনাই "প্রকৃতি"। এই অর্থে শিক্ষা "অভ্যাসকে" অনুসরণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে অপরের অনুকরণ, নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়া। নিয়মানুবর্তিতার পথে অর্জিত আচরণ বিধির অর্থে "অভ্যাস" প্রকৃতির বিপরীত, সুতরাং এ ধরনের অভ্যাস শিক্ষার বিপরীত। তাই রুশো বলেছেন: "The only habit……is to contract no habit…… " অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষা বলতে প্রথমেই বুঝায় সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা তথা অন্তর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা।

এখন সহজেই অনুমেয় যে রুশোর ব্যবহৃত অর্থে "প্রাকৃতিক মানুষ" আদৌ বন্য মানুষ নয়, আপন অন্তর-প্রকৃতির নিয়মবিধিতে সুপরিচালিত মানুষ। সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা এগোবে না। শিক্ষা শুধু অন্তর প্রকৃতিকে অবলম্বন করবে। এ শিক্ষাই প্রকৃত সামাজিক শিক্ষা, কারণ অন্তর প্রকৃতিতে মানুষ অবিমিশ্রভাবে সামাজিক।

সুতরাং জীবনের প্রথম স্তরের শিক্ষায় প্রধান কাজ হবে শিশুকে জানা, তার স্বভাব, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করা এবং তদনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি স্থির করা। রুশো নিজেই বলেছেন: "The method of education and the aims of education will both depend on knowing the child's nature well" (এই মনোভাবকে স্মরণ করেই Adams মন্তব্য করেছেন: "This is the paedocentric attitude." শিশুপ্রকৃতি অনুসন্ধানের প্রতি রুশোর দেওয়া এই গুরুত্ব অনুসরণ করেই পেস্তালোৎসি বলেছেন "I wish to psychologise education.")

'প্রকৃতি' বলতে **দ্বিতীয় অর্থে** রুশো বুঝিয়েছেন কৃত্রিমতার বদলে স্বাভাবিক সরলতা। রুশোর মতে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ও নাগরিকতা—সব কিছুই অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষা বলতে বুঝায় সামাজিক কৃত্রিমতা বিরোধী শিক্ষা। সমাজদেহের মধ্যে পাপের স্পর্শ থেকে শিশুকে দূরে রেখে সহজ ও সরল হওয়ার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। তথাকথিত সভ্যতার অর্থ দাসত্ব ও কৃত্রিমতা। সভ্য সমাজের

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৃত্রিমতার বর্মে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে। রুশোরই কথায় : "Civilised man is born in servitude, lives in servitude, dies in servitude ; he is wrapped in the labour room, and again packed in a coffin after death : as long as he lives in human form, he is bound down by the laws and customs." সুতরাং বেছে নিতে হবে কৃত্রিম সমাজের "সভ্য নাগরিক" এবং "প্রকৃত মানুষের" মধ্যে যে কোন একটিকে। সভ্য মানুষ কেবল অর্ধমানুষ মাত্র। সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োজনে যে শিক্ষা, দাসত্বই তার নামান্তর। এ শিক্ষা অন্তর প্রকৃতি এবং প্রকৃত সুখের অন্তরায়।

অন্তর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষায় আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক বক্তব্য থেকেই "শিক্ষায় স্বাধীনতার" চেতনা ক্রমে দানা বেঁধেছে। রবীন্দ্রনাথও কৃত্রিম নাগরিক জীবন থেকে দূরে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও উদার পরিবেশে শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু অন্তর প্রকৃতি অনুযায়ী আত্মমঙ্গলের সঙ্গে সমাজপ্রীতি তথা সামাজিক মঙ্গলের যথার্থ সামঞ্জস্য রুশো করতে পারেন নি। রুশোর এই "সমাজবিরোধী" চেতনা আধুনিক সমাজচেতনার বিরোধী। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সার্থক সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কল্পনাই আধুনিক সমাজদর্শনের মূলমন্ত্র।

'প্রকৃতি' শব্দটি **তৃতীয় অর্থে** বুঝায় নৈসর্গিক প্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতি। রুশোর মতে বিশ্বপ্রকৃতিই শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবিমিশ্র ঐক্যের অনুভূতিতেই আসে মনের প্রসারতা ও মানসিক বৃদ্ধি। কুশিক্ষার ছোঁয়া থেকে বাঁচতে হলে উদার অপঙ্কিল প্রকৃতির সংস্রব প্রয়োজন। আধুনিক নগরজীবন হলো হৃদয়ের শ্মশানভূমি। এই শ্বাসরোধকারী শ্মশানের বাইরেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব।

প্রকৃতি তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত : 'প্রকৃতি তত্ত্ব' থেকে অবধারিত ভাবে রুশো কয়েকটি উপসিদ্ধান্ত এবং অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই সূত্রে প্রথমেই উল্লেখ **"নেতিবাচক শিক্ষা"** তত্ত্ব। শিক্ষার পুরাতন অর্থে মানুষের পাপপঙ্কিল আদি প্রকৃতির পাপ শোধন করে মনুষ্যকল্পিত 'পুণ্য' অনুসারে পুনর্গঠনকেই শিক্ষা বলে মনে করা হয়েছিল। সেই শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল প্রতিনিয়ত নির্দেশ, তাড়না, শাসন ও নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে অপরিপক্ক বয়সেই আচার-আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপক্ব করে তোলা। কিন্তু রুশোর মতে মানুষের আদিম এবং সহজাত প্রকৃতি অমলিন এবং শুভ। সুতরাং প্রথম শিক্ষা হবে নেতিবাচক। অর্থাৎ 'মানুষের দেওয়া' শিক্ষার পঙ্কিলতা থেকে শিশুকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা না দেওয়া। ইতিবাচক শিক্ষা হলো বাইরে থেকে শিশুর উপর জ্ঞান, দক্ষতা এবং কর্তব্যের বোঝা

চাপিয়ে অপরিণত বয়সেই প্রাপ্ত বয়স্কর ধ্যান-ধারণা অনুসারে শিশু-মনকে ঢালাই করার চেষ্টা। নেতিবাচক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়ার আগে শিশুর মন ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। অপরিণত শিশুর উপর পাপ-পুণ্যের কিংবা সত্য-মিথ্যার তত্ত্ব বর্ষণ নিরর্থক। রুশোরই কথায় : "It consist not in teaching the principles of virtue or truth, but in guarding the heart against vice, and the mind from errors. I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and instruct the child in duties that belong to a man. I call a negative education one that tends to perfect the instruments of knowledge before giving the knowledge directly and that endeavours to prepare the way for reason by the proper exercise of the senses." নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ "শিক্ষাহীনতা" নয়, বরং একটি ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষা। জ্ঞান আহরণের জন্য দেহযন্ত্রের প্রস্তুতি এবং ইন্দ্রিয়-শক্তির মার্জনাই নেতিবাচক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। শিশু যখন সৎ ও শুভকে ভালবাসতে পারবে, সেই উপযুক্ত সময়ে পদক্ষেপের প্রস্তুতিই নেতিবাচক শিক্ষা। সুতরাং শিশুর প্রকৃত শিক্ষা নেতিবাচক এবং এই শিক্ষার **তিনটি উদ্দেশ্য**। (১) শিশুর সহজাত ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, (২) প্রচলিত সামাজিক বিধি ও মতবাদের দ্বারা আবিষ্ট ও প্রভাবিত না করে শিশুর নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ, এবং (৩) কর্মফলের ভিত্তিতে স্থায়ী নৈতিক শিক্ষা।

শেষোক্ত বক্তব্যটির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কারণ এই বক্তব্যই **"প্রাকৃতিক কর্মফলের ভিত্তিতে শাসন"** (Punishment by natural consequence) রূপে পরিচিত। রুশোর মতে—তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে নীতিশিক্ষা সম্ভব নয়, বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সম্ভব। অন্যায়ের অবধারিত শাস্তি আছে, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি আছে, অন্তর প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার শাস্তি আছে, শাস্তি ভোগ করেই এ কথা শিশু শিখবে। আগুনে হাত দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গলে যে শাস্তি পেতে হয়, হাত পুড়িয়েই তা সে জানবে এবং এমন অপরাধ আর করবে না। এইভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথেই ন্যায় ও নীতিবোধ জাগবে। এর জন্য প্রতিনিয়ত বয়স্কদের শাসন ও হস্তক্ষেপ ক্ষতিকর ও অবান্তর।

সুতরাং **শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে 'নেতিবাচক শিক্ষার' মূল কথা** প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুর অবাধ স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত বায়ু ও আলোকের স্পর্শ। সরল সহজ

খাদ্য বস্ত্রে স্বাধীন দেহ চর্চায় শিশুর শরীর গড়ে উঠবে। **বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে** এর অর্থ মানসিক পরিপক্কতার আগে তত্ত্বজ্ঞান না দেওয়া—রুশোর মতে বাল্যকাল হলো "যুক্তির নিদ্রাকাল" (Childhood is the sleep of reason)। যুক্তি শক্তি জাগবার পরেই যুক্তিবাদী শিক্ষা সম্ভব। **নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে** নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নীতিবোধ অর্জন। সংক্ষিপ্তাকারে রুশোর মতামত উদ্ধৃত করা চলে—"Education is spontaneous, natural development of the child's nature, through complete living in close contact with the phenomenal nature unadulterated by human hands."

বয়সের স্তরানুযায়ী শিক্ষা : রুশো বিশ্বাস করেছেন যে প্রাকৃতিক সবকিছুর মত মানুষের মনও বিবর্তনের ধারায় উন্মোচিত হয়। সুতরাং বয়সের স্তরের সঙ্গে শিক্ষার স্তরভেদ এবং সামঞ্জস্য প্রয়োজন। মন যেমন ক্রমিক ধারায় উন্মেষিত হয়, শিশুর শিক্ষাও হবে তেমন। রুশো নিজেই বলেছেন, "The kind of education the child will best be able to assimilate has a due time, and the time is when the child will feel the need." সুতরাং সকলের জন্য এবং সকল বয়সের জন্য একই ধরনের শিক্ষার প্রচলিত রীতি তিনি বাতিল করেছেন। শিক্ষাজীবনকে মূলতঃ চারটি স্তরে ভাগ করে বয়সের স্তরভেদে সুনির্দিষ্ট শারীরিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার কথা রুশো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

শিক্ষার **প্রথম স্তর** জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (Infancy)। এ সময় বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তারাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সবদিকে সাহায্যকারিণী হিসেবেও মায়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। 'New Heloise' গ্রন্থে এই দিকটি তুলে ধরে রুশো পারিবারিক পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এই স্তরে পুঁথির বোঝায় শিশুর স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করা চলবেনা। Heloise গ্রন্থে মা জুলি বলেছেন : 'My work is not to educate my children, but to prepare them for future." তাছাড়া এই স্তরে শিক্ষা হবে মূলতঃ শারীর শিক্ষা। অনাড়ম্বর বেশভূষা, অলংকরণহীনতা, পরিমিত স্নেহ-ভালবাসা পুঁজি করে শহর থেকে দূরে উদার প্রকৃতির মাঝে মুক্ত বিচরণ এবং খেলাধুলো ও আনন্দের মধ্যে শিশু বড় হয়ে উঠবে। তার প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়ে কিম্বা শাস্তির বোঝা চাপিয়ে স্বাভাবিক বিকাশ রোধ করা শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর। বরং দুঃখ-বেদনা-কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে, অনুসন্ধিৎসায় চালিত হয়ে প্রকৃতির পাঠশালায় সে শিক্ষা লাভ করুক। নগ্নপদে, অন্ধকারে কিংবা খরতাপে চলাফেরার

্য দিয়ে শিশুর দেহ সুগঠিত হোক। বিশেষ বিপদ ছাড়া চিকিৎসকেরও দরকার ই।

এই স্তরে বড়দের প্রভাবে শিশুর নির্দিষ্ট আচরণ এবং অভ্যাস গঠনেরও তিনি বোধিতা করেছেন। তাছাড়া শিশুকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে দেওয়া বকার। বিশ্বপ্রকৃতি যুগপৎ সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। সবকিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে াস্তব জীবন-সংগ্রামে শিশুর জয়লাভ সুনিশ্চিত। মূল্যবান কৃত্রিম সরঞ্জামের বদলে াব খেলার সমগ্রীও হবে গাছের ডালপালা, ফুলফল, কাঠের বল প্রভৃতি সাধারণ জনিস। রুশো ঘোষণা করেছেন যে দৈহিক দুর্বলতাই মানসিক দুষ্টতার উৎস। শিশুর সহজাত ক্ষমতা, বুদ্ধি ও প্রবণতাকে সযত্নে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য। দেহ সুগঠিত ও কষ্টসহিষ্ণু করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

এই স্তরে পিতামাতার মত শিক্ষকের ভূমিকা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক কেবল লক্ষ্য রাখবেন, শিশুর ক্রমবিকাশ অনুসরণ করবেন এবং গুরুতর বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন, কিন্তু তার কাজে বাধা দিয়ে নিজের অভিমত অনুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে চাইবেন না। শিশুর সঙ্গে তিনি সহানুভূতিসূচক আলাপ করবেন, কিন্তু "শিক্ষাদান" থেকে বিরত থাকবেন। নিজের চেষ্টায় শিশু যা অর্জন করবে, আবিষ্কার করবে, আয়ত্ত করবে, তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। এই নব মূল্যায়নকেই আরও পরিচ্ছন্ন করে মাদাম মন্তেসরি শিক্ষিকাকে বলেছেন "Directress"।

দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ বাল্যস্তর—৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত (Childhood)। এই স্তরেও প্রাকৃতিক নেতিবাচক শিক্ষা চলবে, কারণ তখনও শিশুর যুক্তিক্ষমতা পরিপক্ক হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা তখনও অর্থহীন। শিশুকে "শিশুই" থাকতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে রুশো বলেছেন: "Nature desires that children should be children before they are men." সুতরাং দেহগঠন, মুক্ত বিচরণ এবং প্রকৃতি-নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগানোই প্রধান কাজ। মনের জমি সাময়িকভাবে অনাবাদী থাকলেও ভবিষ্যতের আবাদে সোনা ফলবে। রুশোই বলেছেন, "Exercise the body, the organs, the senses and powers, but keep the soil lying fallow as long as you can." "শিক্ষাকে" ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন নেই, বিলম্বিত সূচনার জন্য ভয়েরও কোন কারণ নেই। সময় সংক্ষেপ করার বদলে কালক্ষেপ করাই লাভজনক ("It is not to gain time, but to lose it")। কারণ এই কালক্ষেপণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার প্রস্তুতি চলে, মনের জমিতে জলসেচ হয়। বাল্যের শিক্ষায় প্রয়োজন অনাবিল

মুক্তি। রুশোর মতে—"Greatest benefit is not power, it is freedom. That man is really free who aspires after what he can do, and does what he really aspires after." এই কথাটিই রুশোর দার্শনিক চেতনার সার কথা।

স্বাধীনতা কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। প্রকৃতির রাজ্য নিয়মে বাঁধা। বিশ্বপ্রকৃতিই শিশুকে শৃঙ্খলা শেখাবে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু নিয়ম ভাঙ্গার শাস্তি পাবে। বাহ্যিক শাসনে নয়, কর্মফলেই হবে প্রকৃত শাস্তি। সুতরাং শিক্ষার এই স্তরে "প্রকৃতির শাসন" তত্ত্ব পুরোপুরি কাজ করবে। পুঁথিগত শিক্ষার সময় এখন নয়। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচার ও যুক্তির শক্তি অর্জন করেই জ্ঞানচর্চার স্তরে পৌঁছা সম্ভব।

বাল্যের শিক্ষা মূলতঃ নেতিবাচক হলেও ইতিবাচক শিক্ষার প্রাথমিক সূচনাও হবে। পরিবেশ নিরীক্ষণ করার মধ্য দিয়ে রঙ আকার, দৈর্ঘ, দূরত্ব, ওজন, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের জ্ঞান আসবে। ধৈর্য নিয়ে শিশুর জিজ্ঞাসার উত্তর যোগানোই শিক্ষকের দায়িত্ব, কারণ শিশু স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু। অনুসন্ধিৎসা পূরণ হলে শিশু আবিষ্কারের আনন্দ পাবে। মাটি, জল, বালু, গাছপালা দিয়ে ঘরবাড়ী, নদী, দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করা এবং ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে খেলাচ্ছলেও শিশুর নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি বাড়বে। দৌড, ঝাপ, সাঁতার এবং রৌদ্র বৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্পর্শে দেহ হবে সুঠাম। পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামও প্রয়োজন। কিন্তু আলস্য, বিলাসিতা এবং সুখপরায়ণতা যেন কোন ক্রমেই শিশুকে গ্রাস না করে। দেহের কর্মক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয় শিক্ষার এই সার্থক স্তরের পরেই আসবে বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা।

তৃতীয় স্তরের শিক্ষা হবে ১২ থেকে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত (Boyhood)। প্রকৃতির নিয়মে এই স্তরই জ্ঞানার্জনের স্তর। এতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয় ও দেহের শিক্ষার ফলে পড়াশুনা, জ্ঞানার্জন ও পরিশ্রমের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বয়সের ধর্মে মানসিক ক্ষমতা বেড়েছে। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির শক্তি বেড়েছে। অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসাও বেড়েছে। সুতরাং এই স্তরই জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের সময়।

শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে জ্ঞানের প্রয়োগমূল্যই মূল বিচার্য হওয়া উচিত। শিশুর বুদ্ধির অগম্য জ্ঞান কিম্বা অলংকাররূপী অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের চেষ্টা নিরর্থক। প্রয়োজনের বিচারে প্রথমেই আসে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার প্রেরণাতেই শিশু নিরীক্ষণ করবে, জিজ্ঞাসা করবে, প্রশ্নের সমাধান করবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিক্ষা। শিক্ষক হবেন ক্রমবিকাশের

.হায়ক। মুখস্থবিদ্যার বদলে বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পদ্ধতির কথাই রুশো বলেছেন : If ever you substitute in his mind authority for reason, he will no longer reason." আকাশের নক্ষত্ররাজির সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিশুর পরিবেশে গ্রামনগর, নদীপাহাড়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে ভূগোল পড়ার কথাও তিনি বলেছেন।

এই স্তরে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা রুশো স্বীকার করেছেন। তবে বইয়ের সংখ্যা হবে কম। বইয়ের বিদ্যা নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক বলেই রুশোর আপত্তি। তিনি বলেছেন : "I hate books; they merely teach us to talk of what we do not know." একমাত্র "রবিনসন ক্রুশোর" কথাই 'অবশ্য পাঠ্য' বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ এই বইয়ের মূল কথা আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের প্রকৃতি-বিজয়। প্রাক-কৈশোর স্তরে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে হস্তশিল্প শিক্ষার উপরও রুশো গুরুত্ব দিয়েছেন। বৃত্তি শিক্ষার ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও জীবিকা অর্জন সম্ভব। এই শিক্ষায় শ্রমের মর্যাদাবোধ জন্মে। উৎপাদনী শ্রমের সাহায্যে সহযোগিতামূলক সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব। তাছাড়া বৃত্তিগত শিক্ষা নম্রতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সৎসাহস সৃষ্টি করে। এইসব গুণে গুণান্বিত শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে কখনোই দিকভ্রান্ত হয় না।

শিক্ষার চতুর্থ স্তর ১৫ থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি (Adolescence)। এই স্তর সমগ্র জীবনের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। এখনই আবেগ ও অনুভূতি, সামাজিক চেতনা এবং নীতিবোধ তীব্রভাবে জেগে ওঠে। শৈশব ও বাল্যের পরিচয় ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু এখন সমাজের পরিবেশে নিজেকে নূতন করে জানবার পালা। রুশো তাই এই সময়টিকেই 'নবজন্ম' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নূতন যৌবন নিয়ে আসে আবেগ, সঙ্গীপ্রিয়তা, ভালবাসার স্পৃহা। এতদিন পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা হয়েছে নিজের জন্য, নিজের প্রচেষ্টায়, উদ্দেশ্য ছিল আত্মবিকাশ ও আত্মোন্নতি। কিন্তু এখন তার সমাজপ্রীতির সময়। এতদিন পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির শিক্ষা হয়েছে। এবার অন্তরের শিক্ষা ও হৃদয় গঠনের পালা। এই স্তরের লক্ষ্য নীতি ও ধর্মশিক্ষা। সুতরাং জীবনের প্রকৃত শিক্ষা এখান থেকেই শুরু। অন্য মানুষের সাথে সহানুভূতি ও আবেগের বন্ধনে বাঁধা পড়েই এই শিক্ষা সম্ভব। সামাজিক সম্পর্কের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; কারণ সামাজিক সম্পর্কই সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় (The study proper of man is that of his relations.)।

আবেগ অবদমনের (sublimation) এই শিক্ষা বক্তৃতা দিয়ে সম্ভব নয়। মানুষের

দুঃখ ও মহত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলেই মানুষকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা যায়, বোঝা যায় মানুষ মৌলিক বিচারে সৎ, কেবল সমাজের কৃত্রিমতাই তাকে করে অসৎ। মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শন তাই এ সময়ের অবশ্য পাঠ্য। ইতিহাস পড়ে সামাজিক মনোভাব সৃষ্টি হবে, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ে মানুষের উপর শ্রদ্ধা জাগবে, দর্শন পড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ব্যষ্টি মানুষের সম্পর্ক জানা যাবে। তখন আসবে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচেতনা। প্রকৃত ধর্ম কোন আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের মহত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আদর্শে একনিষ্ঠতা এবং বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভূতিই ধর্মযোগ। এই ধর্মচেতনাই রুশো "Savoyard Vicar's Profession of Faith" রূপে উপস্থিত করেছেন (The Creed of a Savoyard Priest)। ফ্রোয়েব্‌ল্‌ এই ধর্মচেতনাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন।

প্রকৃত নীতিবোধ কেবল জ্ঞানে হয় না, প্রয়োজন কর্মের। শিক্ষার্থী নিজে পাপ-মুক্ত জীবন যাপন করতে শিখবে। অন্তরের প্রশান্তিই (peace and happiness) হবে এ শিক্ষার ফলশ্রুতি। একদিকে দেহচর্চা আনবে যৌবনোচিত শরীর, অপর-দিকে সৌন্দর্যপ্রীতি আনবে হৃদয়ের শান্তি। এ সময় যৌনচেতনা ও যৌনকামনা সৃষ্টি হয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। এ চেতনার নিষ্পেষণ বিপজ্জনক, আবার অবাধ মুক্তিও বিপজ্জনক। সুতরাং যৌন প্রবণতার অবদমনের জন্য চাই যৌন শিক্ষা। প্রথম শিক্ষা হবে দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে। তারপরে শিক্ষা হবে বিবাহ ও যৌন সম্পর্কের পবিত্রতা সম্পর্কে। এ চেতনাই দৃঢ়মূল হওয়া চাই যে বৈবাহিক সম্পর্ক একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন।

রুশোর মতে শিক্ষা হবে এই চারটি স্তরের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য 'প্রকৃতি', সুতরাং শিক্ষা হবে আবেগ কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য 'প্রয়োজন', শিক্ষা হবে ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক। তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য 'উপযোগিতা', শিক্ষা হবে বুদ্ধি কেন্দ্রিক। চতুর্থ স্তরের বৈশিষ্ট্য 'নৈতিকতা'। শিক্ষা হবে নীতি, সৌন্দর্যপ্রীতি এবং সমাজ কেন্দ্রিক। সব শেষে **শিক্ষা সমাপ্ত হবে** ব্যাপক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। ভ্রমণের ফলে আসবে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের প্রসারতা। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকই হবে আদর্শ নাগরিক। সৃষ্টি করবে নূতন সুখী সমাজ।

'এমিল' গ্রন্থের পঞ্চম অংশে এমিলের ভাবী পত্নী সোফির (Sophy) শিক্ষা বর্ণনা প্রসঙ্গেই রুশো স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন। দুঃখের বিষয় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো তদানীন্তন যুগচেতনার ক্ষুদ্রতাকে ত্যাগ করতে পারেন নি। স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি আস্থা স্থাপন করেন নি। বরং বলেছেন: **"A woman of culture is the**

league of her husband, her children, her family, her servants—everybody." গৃহিনী জীবনই মেয়েদের পক্ষে প্রকৃতি নির্ধারিত জীবন। বুদ্ধিবৃত্তির চেয়েও তাঁদের প্রয়োজন্ন সুগৃহিণী ও সুসঙ্গিনী হওয়া। বাড়ীতে মায়ের কাছে শিক্ষাই শ্রেয়। অবশ্য মেয়েদের সম্পূর্ণ গৃহ-বন্দিনী হওয়ার কথাও তিনি বলেননি। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁরা অপরের সংস্পর্শে আসবেন, ভদ্রতা নম্রতা শিখবেন। বিবাহোত্তর জীবনে অবশ্য গৃহের অন্তরালেই স্ত্রীর প্রকৃত স্থান।

রুশোর প্রকৃতিবাদের স্বরূপ: তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে রুশো জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ থেকে সহজেই ধারণা হয় যে দার্শনিক চেতনাতেও রুশো মূলতঃ প্রকৃতিবাদী। "নীতিবোধের উপর শিল্পবিজ্ঞানের প্রভাব" সম্পর্কিত প্রবন্ধে 'সভ্যতার' প্রতি কটাক্ষ করে রুশো 'noble savage" আদর্শকে তুলে ধরেছেন। 'অসাম্য' সম্পর্কিত রচনায় তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সামাজিক আভিজাত্যকে অভিসম্পাত করে বলেছেন যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। " Political Economy" এবং 'সোশ্যাল কণ্ট্রাক্ট" তত্ত্বে তিনি স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিন্দা করে প্রাকৃতিক অধিকারের' দাবি জানিয়েছেন। Nouvelle Heloise গ্রন্থে তিনি তৎকালীন নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধকে বর্জন করেছেন। 'Confessions' রচনায় প্রচলিত পাবিবারিক জীবনেব অসারতা প্রমাণ করেছেন। 'এমিল' গ্রন্থে রুশো অমানুষ সৃষ্টিকারী প্রকৃতিবিরোধী শিক্ষাকে বর্জন করেছেন। সর্বোপরি বিষাক্ত নাগরিক জীবনকে তিনি মানবতার কবরস্থান বলে মনে করেছেন। অভ্যাসের বিরুদ্ধে, ইতিবাচক শিক্ষার বিরুদ্ধে, কৃত্রিম শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি অভিমত জানিয়েছেন। সহজ স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে দৈহিক অনুশীলন, যথাসময়ে বুদ্ধির জমিতে বীজ বপন এবং শিক্ষাকে শিশু কেন্দ্রিক কববার কথা বলেও রুশো প্রকৃতিবাদী রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। বস্তুতঃ পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সভ্যতার সকল ঐতিহ্যকেই তিনি নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছেন। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে রুশোর প্রকৃতিবাদের অর্থ পঙ্কিল সমাজের স্পর্শ থেকে দূরে যাওয়া।

কিন্তু রুশোর প্রকৃতি-চেতনাও মূলতঃ ভাববাদী। মানুষের স্বাভাবিক এবং অন্তর্নিহিত বিচার বিবেক ও যুক্তির বাণীই প্রকৃতির বাণী। স্বাভাবিক বিবেকের বাণী সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয়, অমোঘ সত্য। এইখানেই মানুষ ও পশুর পার্থক্য। রুশো মানুষ চেয়েছেন, সভ্যতার যাঁতাকলে পেষা "নাগরিক" চাননি। রুশোর প্রকৃতিবাদের সারার্থ তৎকালীন সমাজের নিন্দা। মানুষের কাছে তিনি নূতন আশার বাণী শুনিয়ে-

ছেন, আপন ভাগ্য গড়বার বিশ্বাস এনেছেন। বিবেকের মধ্যে ধর্মের নূতন ভিত্তি খুঁজেছেন। জীবনে শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভাববাদী রুশো :—বস্তুতঃ রুশোকে প্রকৃতিবাদী বলা হলেও, এবং এ্যাডামস্ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠতম প্রকৃতিবাদী শিক্ষাগুরু' বলা সত্ত্বেও দার্শনিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি ভাববাদী। রুশোর "প্রকৃতি" মানুষের বিবেক ও যুক্তির পরিপন্থী নয়, "সভ্য সমাজের" বিধিবিধান ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতার পরিপন্থী। বিশ্বচরাচরে এক নৈতিক সত্তাকে তিনি অনুভব করেছেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এমিলের শিক্ষাও শেষ হয়েছে নীতি শিক্ষা দিয়ে। রুশোই বলেছেন : "We have reached the moral order at last."

এমিল গ্রন্থেই রুশো বলেছেন যে এক অদৃশ্য ও অগম্য শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করছেন, পৃথিবীকে গতিশীল করছেন, সবকিছু ভাঙাগড়া করছেন। আমরা এই পরম শক্তির কর্মকে অনুভব করি ; কিন্তু বিশ্বকর্মাকে দেখি না (We see his work, the workman is hidden.)। এই শিল্পীর শিল্পকর্ম কেবল চন্দ্র সূর্যে প্রতিভাত নয়, গাছ, মাটি, পশুপক্ষীতেও প্রকাশিত। সুতরাং রুশো আদৌ জড়বাদী নন। বস্তু ও গতি সম্পর্কে রুশোর বক্তব্যই তাঁকে ভাববাদী বলে প্রমাণ করে। Savoyard Priest-এ এই দিকটি খুবই পরিচ্ছন্ন। পরমের ইচ্ছাই একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি যার প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গতি ও প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চক্রের পিছনে একটি চেতনশীল পরম সত্তার কল্পনা ভাববাদেরই বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে প্রাচীন 'স্টয়েক' (Stoic) দার্শনিকদের সঙ্গে রুশোর অভিমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্টয়েকরা প্রকৃতিবাদী ছিলেন না। নৈতিক বিধিকে তাঁরা বিবেকের বিধি তথা ভগবানের বিধিরূপে মনে করেছেন। রুশোও বিবেকের বাণীকে প্রকৃতির বিধিরূপে স্বীকার করেছেন। প্রকৃতিই পুণ্যের আধার এবং ভগবানের সৃষ্টিতে সবকিছুই ভাল—এই কথার স্বীকৃতি ভাববাদেরই লক্ষণ।

যে কোন দর্শনের স্বরূপ বোঝা যায় নীতিশাস্ত্র থেকে। আত্মসুখই (Hedonism) প্রকৃতিবাদের নীতিশাস্ত্র (ethics)। রুশো কিন্তু আত্মসুখ ও "পরম শান্তির" মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেছেন। Julie-র কথায় : "We have sought pleasure, and happiness had fled from us." এমিল গ্রন্থে বলেছেন : "The nearer we are to pleasure, further we are from happiness." বস্তুতঃ নৈতিক শিক্ষাকেই রুশো শেষ স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক দর্শনে রুশো 'বিমূর্ত সাধারণ ইচ্ছা'র কথা বলে স্বীকার করেছেন যে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে মৌলিক কোন দ্ব

নেই। সমাজেই ব্যষ্টির ক্রমবিকাশ। সমষ্টির পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশই মূল কথা। মনোবিশ্লেষণের সাহায্যেও রুশোকে ভাববাদী বলে চেনা যায়। শারীরিক বিকলাঙ্গতার জন্যই তিনি অন্তর্মুখী। John Adams-এর মতে পরিবেশের প্রতিক্রিয়াই তাঁকে ভাববাদী করেছে (His theory is the outcome of his reaction to surroundings)। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার এবং প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়ার ডাক সমাজ সম্পর্কে তাঁর অন্তর্মুখী চেতনারই (introvert) ফল। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রকৃতিবাদী হলেও মৌলিক বিচারে রুশো ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক।

<u>সমালোচনা</u>: রুশোর শিক্ষাচেতনায় শক্তি ও দুর্বলতা দুইই আছে। তিনি এমিলকে বিচ্ছিন্ন ও একক একটি শিশুরূপে সব থেকে আলাদা করে তার একার জন্যই একজন সর্বগুণান্বিত শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। শিক্ষায় সকলের অধিকারের কথা বলেও প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক শিক্ষকের কল্পনা অভিজাতসুলভ মনেরই পরিচয়। প্রাকৃতিক মানুষ সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্যও ত্রুটিপূর্ণ। প্রাকৃতিক মানুষ নিজ প্রকৃতির নিয়মেই পরিচালিত ও শাসিত। কিন্তু অদমিত আবেগ ও আদিম ক্ষুধার মানুষ কখনও মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে না। আদিম প্রকৃতির শাসন ও সংস্কারই শিক্ষা, এ-কথাটি রুশো যথাযথভাবে বিচার করেননি। (অবশ্য উত্তরকালের শিক্ষানায়করা রুশোর ভুল সংশোধন করেছেন।)

প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে রুশো মানুষের সভ্যতা, সামাজিক জীবন কিম্বা শিক্ষায় সমাজের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ রুশো কেবল দুষ্টক্ষতগ্রস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজের কথাই বিবেচনা করে সমাজজীবন বর্জন করতে চেয়েছেন। সভ্য মানুষকে তিনি 'অর্ধমানুষ' মনে করেছেন। পরোক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৌন্দর্য সাধনার ঐতিহ্য এবং সভ্যতার অবদানকেই তিনি অস্বীকার করেছেন। তাই তিনি সমাজ ও সভ্যতার ছোঁয়া থেকে দূরে শিশুর শিক্ষা কল্পনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর স্ববিরোধিতা প্রকট। এমিল বড় হয়েছে প্রকৃতির কোলে। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি, ইচ্ছা ও কর্মসাধনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার শিক্ষক —যিনি সভ্য সমাজেরই একজন।

পুঁথিপুস্তক সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়। বইয়ের সাহায্যে অতীত এবং ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় হয়। রুশোর বক্তব্যে এই ঐতিহাসিক চেতনার বেশ অভাব। বস্তুতঃ অতীতকে অস্বীকার করে নূতন ভবিষ্যৎ গড়া নিতান্তই অসম্ভব। রুশো আত্মমঙ্গলের কথা বলেছেন, আবার অন্যত্র সার্বিক মঙ্গলের কথা বলেছেন। কিন্তু আত্মপ্রীতি ও সর্বজনীন ভালবাসার সার্থক সামঞ্জস্য করতে পারেননি।

এই স্ববিরোধিতা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ প্রকট। এমিলের শিক্ষায় তিনি উদার, সোফির শিক্ষায় তিনি সংকীর্ণ। অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কিন্তু সোফিকে সেই সমাজের অনুকরণে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সামাজিক ক্লেদ এমিলকে স্পর্শ করতে পারে, সোফিকে পারে না। সোফির স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি যুগচেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে অক্ষম হয়েছেন।

বৃহত্তর এইসব ত্রুটির দিক ছাড়া ক্ষুদ্রতর ত্রুটির দিকও কম নয়। রুশো বয়সের স্তরানুসারে শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্তরকে যে ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রূপে তিনি কল্পনা করেছেন তা মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাতত্ত্বে মৌলিক সত্য আছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাও আছে। নমনীয় শৈশব ও বাল্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি এবং চরিত্রের কাঠামো গঠিত হয়। সেই সময়ে সমাজ বহির্ভূত জীবনযাত্রা ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াও অসম্ভব নয়। মনের জমি দীর্ঘকাল অকর্ষিত ও অসিঞ্চিত রাখার বদলে ক্রমপর্যায়ে যথাযোগ্য জলসেচেই সুফল সম্ভব। অভ্যাসের বিরুদ্ধে রুশো জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সুসমঞ্জস জীবনের পক্ষে সুঅভ্যাসের মূল্য অনস্বীকার্য। ঠিক তেমনি 'প্রাকৃতিক ফলাফলের শাসন' তত্ত্বের প্রয়োগও সীমাবদ্ধ। কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান শিশুর নেই, সুতরাং ফলাফল থেকে কারণ বুঝে নিয়ে সচেতন শিক্ষা গ্রহণ করতে শিশু পারে না। প্রকৃতির শাসন যে অপরাধের অনুপাতেই হবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। লঘু অপরাধে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে শিশুকে রক্ষা করাই প্রয়োজন। তা ছাড়া মানুষ সব কিছুই ঠেকে শেখে না, অপরের অভিজ্ঞতাও মানুষের শিক্ষার অন্যতম উৎস। ভয়ভীতির বদলে নীতিবোধের মূল্যই বেশী। রুশো কিন্তু ইতিবাচক নীতিবোধের বদলে শাস্তির মাধ্যমে নেতিবাচক অনুশাসনেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে রুশোর চেতনাও এই সূত্রে আলোচ্য। রবিনসন ক্রুশোর কাহিনীতে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শহর থেকে দূরে আত্মপ্রচেষ্টামূলক শিক্ষাতেই জোর দিয়েছেন। একদিকে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন মোহময় রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে ভাববাদীরূপে। অপরদিকে রবিনসন ক্রুশোতে জড় প্রকৃতিকে মানুষের শত্রু বলে কল্পনা করে বিজয় অভিযান বর্ণনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য চেতনার এ একটি বিশেষত্ব। এবং প্রাচ্য চেতনার সঙ্গে এখানে গভীর পার্থক্য। প্রাচ্য চেতনায় প্রকৃতি নিবিড় শান্তির নীড়। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্পর্কটি আধ্যাত্মিক। তাই তিনি তপোবনের

জয়গান গেয়েছেন। অবশ্য তিনি পাশ্চাত্ত্যের প্রকৃতি-বিজয়কেও অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি বিজ্ঞানসাধনা ও প্রয়োগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনই চেয়েছিলেন।

রুশো একাধারে আদর্শবাদী ও নৈরাশ্যবাদী। তিনি মানুষের উপর চরম আস্থা জানিয়েছেন। আবার মানুষেরই সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রবলভাবে ঘৃণা করেছেন। শিশুকে তিনি দিয়েছেন পরম স্নেহ, আবার সেই শিশুর প্রতি নির্দয়ও হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা চেতনা অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক। কিন্তু নবসৃষ্টির জন্য পুরাতন জগদ্দল ধ্বংসের উন্মাদনার প্রয়োজন ছিল। Graves-এর কথায়: "Such a new ideal was necessary then. Often a reformer has to be destroyer in order to draw attention to his opinions." রুশোকে সার্বিক ভাবেই গ্রহণ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যথাযোগ্য সমালোচনা করে তাঁর ইতিবাচক বক্তব্যই আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান। বস্তুতঃ উত্তরকালের শিক্ষাগুরুদের হাতে সুসংস্কৃত হয়ে ইতিবাচক বক্তব্যই সমগ্র শিক্ষাজগৎকে প্রভাবিত করেছে।

বুদ্ধির কচকচি এবং পাণ্ডিত্যের বোঝার বদলে তিনি ইন্দ্রিয়শক্তির মার্জনা, অনুভূতি, আত্মবিকাশ, আবেগের অবদমন, স্বরানুযায়ী শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলে গেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা বর্জনের কথা বলার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির কোলে জীবনচঞ্চল আনন্দের মধ্যেই যে শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষা সম্ভব, একথা বলার প্রয়োজন ছিল। শিশুপ্রকৃতির স্বীকৃতি, শিশুর মুক্তি, তথা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাচেতনার প্রয়োজন ছিল। মানব প্রগতির স্বার্থে রুশো এই প্রয়োজনই পুরণ করেছেন। ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রে তিনি মানব মনের প্রসারতা, এবং ব্যাপক মানবতাবাদ দাবি করেছেন। তিনি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন, মানব ধর্মের কথা বলেছেন। যান্ত্রিক নগরজীবন এবং সভ্যতার অভিশাপের বিরুদ্ধে স্বভাব-সুন্দর মানুষকে তিনি উচ্চাসন দিয়েছেন।

তাঁর শিক্ষাতত্ত্বও এই চেতনারই ফলশ্রুতি। শিশুমুক্তি ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যে সোচ্চার ঘোষণা তিনি করেছিলেন তা থেকেই আধুনিক শিক্ষা চেতনার ফুলফল সুশোভিত রূপ। Morle বলেছেন: "Emile is a seed book of future history. The old system was mechanical. He gave a new idea and system." বস্তুতঃ রুশোকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা আদৌ অতিরঞ্জন নয়, কারণ তিনিই পুরাতন থেকে নূতনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নূতন যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রুশোর প্রভাব ঃ অভিজাতপ্রধান সমসাময়িক ফ্রান্সে রুশোর তত্ত্ব তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বিপ্লবকালীন ফ্রান্সের শিক্ষা আন্দোলনে ব্যাপকভাবে রুশোর প্রভাব পড়েছিল। সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং বিশেষতঃ প্রাশিয়ায় রুশোর তত্ত্ব সমাদৃত হয়েছিল, এবং শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তবায়িতও হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যায় রুশোর শতাব্দী। শত ত্রুটির মধ্যেও সত্যদ্রষ্টার মত ভবিষ্যতের যে দিকদর্শন তিনি উপস্থিত করেছিলেন তাই স্থির করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর গতিপথ। রুশোর দেওয়া প্রকৃতির ত্রিমুখী ব্যাখ্যা নিয়েই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, বিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষা, সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিবাদের মধ্য দিয়েই তিনি নূতন ধরনের সামাজিক শিক্ষার পথ করেছেন। বৃত্তি শিক্ষার প্রস্তাব করে কৃত্রিম অভিজাতসুলভ শিক্ষাব বদলে সামাজিক উপযোগিতার কথা বলেছেন। আবেগ ও নীতিবোধের নূতন মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছেন। রুশোর তত্ত্বের পরিশোধন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনানুগ পরিবর্তনের মাধ্যমেই উত্তর সাধকদের শিক্ষা-চেতনা এগিয়েছে।

শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে রুশোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে **পেস্তালোৎসি** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকেই মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শিশুর স্বাভাবিক এবং অব্যাহত ক্রমবিকাশের স্বার্থে শিশুকে জানবার কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। বস্তুতঃ শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার সংকল্প নিয়ে তিনিই প্রথম বলেছিলেন : "**I wish to psychologise education**". তিনিও ছিলেন শিশুপ্রকৃতির পবিত্রতার প্রতি আস্থাবান। তিনিও শিশুর স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রুশোকে অনুসরণ করেই তিনিও শারীরশিক্ষা এবং ইন্দ্রিয়শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুব ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করে ক্রমবিকাশের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। তিনিও প্রতিটি নূতন জ্ঞানের জন্য যথোপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছেন। শিশুপ্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগের দাবিতে তিনিও সরল থেকে জটিলে যাওয়ার এবং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। সর্বোপরি পেস্তালোৎসিও কর্মদক্ষতার প্রয়োজনে হাতের কাজেব শিক্ষাগত মূল্য প্রচার করেছেন।

রুশোরই মত **ফ্রোয়েবলও** মনে করেছেন যে পৃথিবীর সব কিছুই অতীন্দ্রিয় নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রকৃতিরই বিধান। অন্তঃপ্রকৃতির উন্মোচনই শিক্ষা। সুতরাং এমন শিক্ষা চাই যেন শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও কর্মের সুষম বিকাশ ও পূর্ণতা ঘটে। শিক্ষকের হাতে জ্ঞানের কুই নিন পিল সেবন করাই শিক্ষা নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের

পূর্ণ বিকাশই শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌল সত্য হলো আত্মবিকাশ, স্বাধীন বিকাশ, স্বতঃস্ফূর্ত কাজ এবং ক্রীড়াসুলভ আনন্দ।

দার্শনিক চেতনায় পার্থক্য থাকলেও **হার্বার্ট** শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করবার চেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট নীতিশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনকেই প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও অন্তর্লীন স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার স্তর ও পদ্ধতিকে মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন।

স্পেন্সারের শিক্ষাতত্ত্বে দুইটি মূল স্তম্ভ—বিজ্ঞানতত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশতত্ত্ব। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি রুশোর কাছে ঋণী। শারীর শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর জ্ঞান আহরণ, প্রকৃতির অনুশাসনের কথা তিনিও বলেছেন। পূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। রুশোর পদানুসরণ করে শিশুপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতির কথাও স্পেন্সার বলে গেছেন। বস্তুতঃ পুরাতন ও নূতন শিক্ষার তারতম্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্পেন্সার বলেছেন যে শিশুর ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে, সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে অর্ডার-মাফিক মনোগঠনের প্রচেষ্টাই পুরাতন শিক্ষাব বৈশিষ্ট্য। আর শিশু প্রকৃতির ভিত্তিতে নিজস্ব অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও আত্মোন্নতিমূলক উৎপাদনী শিক্ষাই নূতনের বৈশিষ্ট্য। এই নূতনের ভিত্তি কিন্তু রুশোই স্থাপন করেছিলেন।

মেরিয়া মন্তেসরি বলেছেন শিশুব প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ ও আগ্রহের ভিত্তিতে ব্যক্তিশিশুকে অবলম্বন করে আত্মশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর প্রকৃতি, শিশুর মুক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তির মার্জনার উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষিকাকে Directress আখ্যা দিয়েছেন। এইসব কিছুই যেন রুশোর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

রুশোর মৃত্যুর দেড় শতাধিক বৎসর পরেও **জন ডিউই** বলেছেন প্রকৃতির বিধানানুসারে শিক্ষার কথা। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার চেতনাকে পরিবর্ধন করে তিনি ঘোষণা করেছেন "জীবনই শিক্ষা" তথা "শিক্ষাই জীবন"। ডিউই স্তরানুযায়ী শিক্ষার কথা বলেছেন। একদিকে ব্যক্তি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ এবং অপরদিকে সামাজীকরণের উপর গুরুত্ব ডিউই-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। আত্মবিকাশের জন্য চাই স্বাধীনতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার ভিত্তিতে বাস্তব সমস্যার সমাধান। কর্মপ্রবণতা ছাড়া এই আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। ডিউইও বলেছেন আগ্রহ ও প্রবণতা অনুশীলন করে শিশুই আত্ম আবিষ্কার করবে এবং সমাজে যোগ্য স্থান নেবে। এমিলের চূড়ান্ত পর্বের

শিক্ষায় রুশো চেয়েছিলেন সামাজিক-নৈতিক শিক্ষা। ডিউইও সামাজীকরণ এবং সামাজিক জীবনে নীতি শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজের বাইরে নয়, সমাজের মধ্যেই ব্যবহারিক পদ্ধতিতে এই শিক্ষা সম্ভব।

দূরাগত পদধ্বনির মত ভারতের শিক্ষা চেতনায়ও রুশোর চেতনা প্রসারিত হয়েছে। **রবীন্দ্রনাথও** বলেছেন প্রকৃতির কোলে শিশুমুক্তির কথা, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার কথা, শারীরিক সুস্থতা ও স্বাবলম্বনের কথা। পীড়নমূলক, শিক্ষানামীয় নৃশংসতার বদলে অকৃত্রিম মানবতাপূর্ণ হৃদয়ানুভূতির কথাই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় মূর্ত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ঐক্যতান এবং পরমানুভূতির কথাও তিনি বলেছেন। **গান্ধীজীর** শিক্ষাচেতনায়ও কর্মবাদ এবং স্বাবলম্বীতার কথাই ঘোষিত হয়েছে। বস্তুতঃ সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিশ্বের শিক্ষা চেতনা রুশোর চেতনাকে ত্যাগ করে অগ্রসর হতে পারেনি।

স্থায়ী অবদানের মূল্যায়ন: শিক্ষা চেতনায় রুশোর স্থায়ী অবদানের (Contribution) মূল্যায়নকালে প্রথমেই উল্লেখ্য যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যত বিকৃতাকারেই হোক না কেন তিনি নূতন দৃষ্টিপট উন্মোচন করেছেন। তাঁর দেওয়া প্রকৃতির ত্রিমুখী ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে উত্তরকালে শিক্ষা চেতনায় তিন ধরনের বিকাশ ঘটেছে। শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার যে কথ তিনি বলেছিলেন, তাকে অবলম্বন করেই মনোবিজ্ঞান প্রবণতার (Psychologica tendency) ধারা এগিয়েছে। পেস্তালোৎসি, ফ্রয়েবল, হার্বার্ট প্রভৃতি এই ধারার পরিপোষণ করেছেন। নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে কথ রুশো বলেছিলেন তা থেকেই একদিকে প্রকৃতিপ্রবণতা এবং অপরদিকে বিজ্ঞানপ্রবণতার ধারা (Scientific tendency) অগ্রসর হয়েছে। এই দুই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন যথাক্রমে ফ্রোয়েবল-রবীন্দ্রনাথ এবং স্পেন্সার-ডিউই প্রমুখ শিক্ষাগুরুবৃন্দ "প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা" চেতনা থেকেই প্রকৃতিবাদের অগ্রগতি (Naturalistic tendency)। অপরদিকে মানুষের অন্তর প্রকৃতির পবিত্রতা এবং অন্তর ও বাহিরের যে সামঞ্জস্যের কথা রুশো বলেছেন, তা থেকেই ভাববাদী ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে (Idealistic tendency)। উৎপাদনী শ্রমের ভিত্তিতে সামাজিক মানুষের C গুণগান রুশো করেছেন, তার মধ্যেই শিক্ষায় সমাজ প্রবণতার উৎস (Sociologica tendency)। কৃত্রিমতা ও আনুষ্ঠানিকতাকে পরিহার করে পরিশুদ্ধ আবেগ ও নীতিবোধের ভিত্তিতে সামাজিক গুণাবলীর যে কথা বলেছেন, তাই ভিত্তি স্থাপন করেছে সামাজিক শিক্ষার (Social education)। এদিককে যে উদ্দেশ্যে একটি মৌলিক

হস্তশিল্পের শিক্ষা রুশো দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবণতার উৎস (Vocational tendency)। আভিজাত্যকে বর্জন করে রুশো যেভাবে ব্যক্তিশিশুর মূল্য স্বীকার করেছিলেন, সেই সূত্রেই সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষায় গণতান্ত্রিক ধারা (Democratic tendency)। শিশুর মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রুশোর কথা সমগ্র শিক্ষা চেতনাতে ছেয়ে আছে। ঐ চেতনাই মুক্ত-শৃঙ্খলা (Free discipline) তত্ত্বের উৎস। সর্বোপরি রুশো যেভাবে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছিলেন, তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে শিশু কেন্দ্রিকতা (Child centricism)। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে রুশোই আধুনিক শিক্ষা চেতনার বিভিন্নমুখী ধারার উৎস এবং আধুনিক শিক্ষার জনক।

রুশোর প্রভাব কেবল তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবহারেও প্রসারিত। মনোবিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টি তত্ত্ব (Faculty psychology) আজ পরিত্যক্ত। শিশুকে আজ শিশু-রূপেই দেখা হয়। শিক্ষাকে আজ স্বাভাবিক আগ্রহ অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনবিকাশ বলে মনে করা হয়। শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং কৈশোর জীবনের গুরুত্বও আজ স্বীকৃত। শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়ানুশীলন তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার অগ্রগতির কথাও আজ সর্বজনগ্রাহ্য। বস্তুতঃ বর্তমানের শিক্ষা চেতনায় দেহ-মন-বুদ্ধি ও আত্মার সুষম বিকাশ, প্রকৃতি পাঠ, শিশুর অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তা, অনুভূত প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা, ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও বিষয়ের গুরুভার লাঘব করা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যের শিক্ষা, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যরূপে সমাজ-চেতনা এবং সর্বোপরি শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতার কথা—সব কিছুতেই রুশোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। রুশো-নির্দেশিত মৌল নীতির (First Principles) ভিত্তিতেই আধুনিক শিক্ষা অগ্রসর হয়েছে, একথা বলা খুবই যুক্তিসম্মত।

জন হেনরিখ পেস্তালোৎসি (J. H. Pestalozzi), ১৭৪৬—১৮২৭

সংক্ষিপ্ত জীবনী: জুরিখ শহরে জন্ম ১৭৪৬ সনে; পিতৃহীন পরিবারে মায়ের স্নেহস্পর্শে অতিবাহিত শৈশব ও বাল্য। দাদু ছিলেন ধর্মযাজক। যাজকত্বের শিক্ষাই ছিল পেস্তালোৎসির জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বদলে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের আদর্শই গ্রহণ করেন। নিজেই বলেছিলেন: "I will turn school master." পরিণামে শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতায়ও সাফল্য আসেনি। অবশ্য নানা অভিজ্ঞতা থেকে

তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এবং সেই ভিত্তিতে যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাফল্যের পরিচয়।

সর্বপ্রথম স্কুল পরিচালনার চেষ্টা করেন Newhof নামক জনপদে। ১৭৭৯ সনে স্কুলটি উঠে যায়। কয়েকটি অনাথ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন। তাদের শিক্ষার সূত্রেই ১৭৭৯ সনে দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রথম শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পেস্তালোৎসির উদ্যোগে। এখানে তিনি যুগপৎ জ্ঞানচর্চা এবং বৃত্তিশিক্ষার নিরীক্ষা চালনা করেন। আর্থিক অনটনের জন্য এখানেও ব্যর্থ, এবং ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু মনের সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি রচনা করেন "The Evening hours of a Hermit"। এই গ্রন্থে তিনি শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে ১৮০টি নীতি সন্নিবেশ করেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই শিক্ষা-সংক্রান্ত তাঁর প্রথম রচনা 'Journal of a Father" প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক শিশু অভীক্ষার (child study) সূচনা হয় এই গ্রন্থেই। ১৭৯১ সনে প্রকাশিত "Leonard and Gertrude: a Book for the People" পুস্তকে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে একটি গ্রামীণ গোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন চিত্রিত করেছেন। লিওনার্ডের বাড়ীতে স্কুল এবং সেখানে গার্টুডের মাতৃস্নেহের স্পর্শেই এসেছে সাফল্য। স্কুলে পারিবারিক স্নেহনীড় রচনার তাৎপর্যই এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে ১৭৯৮ সনে কিছু যুদ্ধ-অনাথ শিশুর জন্য Stanz শহরে অনাথাশ্রমের দায়িত্ব নেন। কিন্তু পরের বছরই স্কুলবাড়িটি ফরাসী কর্তৃপক্ষ হুকুমদখল করেন। আশাহত হলেও পেস্তালোৎসি ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন Burgdoff নামক স্থানে। কিন্তু এই স্কুল বাড়িটিও বেদখল হয়। অবশ্য বার্গডফ-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন "How Gertrude Teaches her Children"। এই পুস্তকে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন। ১৮০৫ থেকে ১৮২৭ সনে মৃত্যু কাল পর্যন্ত তিনি Yverdun-কে করেছিলেন কর্মক্ষেত্র।

উল্লেখিত বইগুলি ছাড়াও পেস্তালোৎসি অনেক নিবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ছিল "Mother's Book"। সংগঠন ক্ষমতা এবং বাস্তবতা বোধের অভাবে তিনি ধারাবাহিকভাবে কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের সাক্ষ্য রেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিদ্যালয়ে প্রখ্যাত দর্শকের অভাব হয়নি। নিউহফ-এ এসেছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক Fichte, বার্গডফ-এ এসেছিলেন হার্বার্ট, এবং Yverdun-এ এসেছিলেন ফ্রোয়েবল। কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তত্ত্বের ক্ষেত্রে পেস্তালোৎসির জলসিঞ্চনের ফলে যে সোনার ফসল ফলেছে, তাই তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব।)

পেস্তালোৎসির শিক্ষাতত্ত্ব

রুশোর জীবন-মধ্যাহ্নে পেস্তালোৎসির বাল্যকাল। ইউরোপের চিন্তাশীল মনে রুশো রেখাপাত করেছিলেন। বস্তুতঃ রুশোর ধ্বংসাত্মক তত্ত্বই গঠনাত্মক চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। পেস্তালোৎসি, তাঁর বন্ধু Basedow এবং তাঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই চিন্তা ও কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। পেস্তালোৎসির চিন্তার উৎস ছিল সোশ্যাল কনট্রাক্ট এবং এমিল। কিন্তু রুশোর ভাবাবেগপ্রধান, স্ববিরোধী, নেতিবাচক বক্তব্য থেকেই শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ইতিবাচক সূত্র উদ্ধার করেন। খাপছাড়াভাবে বলা রুশোর বক্তব্য থেকেই তিনি নির্দিষ্ট এবং মূর্ত শিক্ষানীতি উপস্থিত করেছেন।

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য : পেস্তালোৎসি ভাববাদী এবং আদর্শবাদী। দরিদ্র জনজীবনের উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি বলেছেন : সব মানুষই মৌল বিচারে অভিন্ন, সুতরাং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই উন্নয়নের সমান সম্ভাবনা, অভাব কেবল সুযোগের। উপযুক্ত সুযোগ তথা শিক্ষার সাহায্যে সব মানুষের উন্নতি সাধন করে সমাজ সংস্কার এবং সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং মানবিক পরিপূর্ণতা এবং সামাজিক উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জীবন বিকাশের সার্বিক সহায়তাই শিক্ষার আদর্শ। তিনি বলেছিলেন : "Life is the trade I would teach him." এই পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্ভব কেবল দেহ ও মনের সার্থক সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশের পথে। সুতরাং "The aim of all instruction is the development of human nature by the harmonious cultivation of powers, faculties and promotion of manliness."

বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান আহরণই প্রকৃত শিক্ষা নয়। জ্ঞান যখন বাস্তব ক্ষমতায় ও দক্ষতায় পরিণত হয়, এবং প্রয়োগের ফলশ্রুতি ঘটে, তখনই হয় জ্ঞানের সম্পূর্ণতা। জ্ঞানকে ক্ষমতায় পরিণত করার দৃষ্টিকোণ থেকেই পেস্তালোৎসি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারা নিরূপণ করেছেন। শিশুকে জ্ঞানের তাড়নায় জর্জরিত না করে, যথাসময়ে উপযুক্ত ফসলের জন্য অপেক্ষা করে ক্রমবিকাশোন্মুখ শিশুমনকে সাহায্য করাই প্রকৃত শিক্ষা। তাই তিনি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত "শিক্ষাশিল্প" উদ্ভাবন, অর্থাৎ শিক্ষণের প্রকৃতি নির্ণয়কেই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সমস্যারূপে জ্ঞান করেছেন।

শিক্ষার নূতন তাৎপর্য : রুশোর প্রদর্শিত পথে পেস্তালোৎসির তত্ত্বে "শিক্ষা" কথাটির নূতন অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণিত হয়েছে। শিশুর সহজাত শক্তির সংরক্ষণ, উপযুক্ত পরিচর্যা এবং ক্রমবিকাশকেই তিনি শিক্ষা বলে মনে করতেন। তাই তিনি শিশুর শিক্ষা ও বিকাশকে চারাগাছের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। যথার্থ

শিক্ষাকে তিনি বলেছেন : "A tree planted near fertilizing waters. The tree is an uninterrupted chain of organic parts, the plans of which had existed in its seed and root. In the new born child are hidden the faculties which are to unfold during life. Education does not put new powers or faculties or breath and life, it only guards against untoward influence. The moral, intellectual and practical powers must be nurtured within himself."

আত্মবিকাশের এই ধারার জন্য ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রকৃতির কোলে অবাধ স্বাধীনতার দরকার। এই মন্তব্যটি কশোর অভিমতের সঙ্গে তুলনীয়। আত্ম-বিকাশের জন্য শিশুর আত্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষক যথাযোগ্য সাহায্য দেবেন মাত্র। কিন্তু নৈসর্গিক ও বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উন্মোচনের সঙ্গে সমতালে এবং সুসমঞ্জসরূপে হওয়া দরকাব। তদুপরি শিশুকে দেওয়া জ্ঞান তার বিকাশের সঙ্গে ক্রমিক পর্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া শিশুর শিক্ষা কখনও বক্তৃতা-সর্বস্ব নয়। যুক্তিতে নয়, বিশ্বাসের কাজ করার মধ্য দিয়েই আস্থা ও বিশ্বাস আসবে। ভালবাসার মধ্য দিয়েই ভালবাসা শিখবে। চিন্তা করার মধ্য দিয়েই চিন্তা শিখবে এবং অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করবে জ্ঞান। সুতরাং শিক্ষা হলো "The natural, purposive, harmonious development of all the powers and faculties of tho human being." পেস্তালোৎসি প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয ক্ষমতা, দক্ষতা এবং হৃদয়াবেগ দেখেছেন। এই তত্ত্বের সবচেয়ে নূতন দিক হলো বাস্তব শ্রেণীকক্ষে এর প্রয়োগ। শিশুর কর্মসাধনার জন্য পরিবেশ রচনাই শিক্ষকের কাজ। মানবিক ক্রমবিকাশের ধারাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে জোর দিয়ে বলাব জন্য 'মনোবিজ্ঞান সম্মত' শিক্ষার স্রষ্টারূপে যোগ্য সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি : পেস্তালোৎসি দ্ব্যর্থহীনভাবে সে যুগের পীডন-মূলক শিক্ষার নিন্দা করেছেন। স্কুলকে তিনি দেখেছেন বাড়ীর দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে যেখানে পারিবারিক পরিবেশের আদর্শ ও মনোভাব এবং স্নেহমধুর সম্পর্ক প্রতিফলিত হবে। পরিবারেরই মত স্কুলেরও লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং জাগতিব উন্নতি। মনের ধারাবাহিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন করলে প্রতিটি স্তরেই আসবে সামঞ্জস্য।

ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ করে জটিল বিষয়ের সরলীকরণ

এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টাকেই পেস্তালোৎসি যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতির মূল কথা "Object method"। এই সূত্রেই তিনি 'Anschauung" কথাটির অবতারণা করেছেন। এই কথাটির অর্থ বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, বস্তু ও পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু পেস্তালোৎসি অন্ধ প্রকৃতির উপর নিরঙ্কুশ আস্থা স্থাপন না করে পর্যবেক্ষণ শক্তির ট্রেনিং এবং উৎকর্ষতার কথাই বলেছেন। সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবেই শিশুর মনোবিকাশ ঘটবে। অভিজ্ঞতা অর্জনও বড় কথা নয়, অভিজ্ঞতার আত্মকরণ এবং ভাষায় প্রকাশ করাও সম মূল্যবান। Impression এবং Expression-এর সমন্বয়েই জ্ঞানের যথার্থতা। শিক্ষক হবেন শিশুর এই আত্মপ্রয়াসের সহায়ক। সুতরাং শিশুর অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার বদলে পেস্তালোৎসির তত্ত্বে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকাও স্বীকৃত।

পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য: প্রাথমিক পাঠক্রমে পেস্তালোৎসি অঙ্কের উপর, বিশেষতঃ মানসাঙ্কের উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ এর সাহায্যে গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে সহজ বোধশক্তি জন্মে এবং প্রত্যয়ের সাথে জ্ঞান আহরণের সম্ভাবনা থাকে। গণিত শিক্ষার উপকরণ রূপে তিনি খেলা, বিভিন্ন বস্তু এবং সক্রিয়তাকে সদ্ব্যবহারের কথা বলেছেন। পাথরকুঁচি, মটরদানা প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদানই যথেষ্ট। জ্যামিতিক ধারণা হবে নানা আকার এবং আয়তনের ছবি কিম্বা জিনিসের সাহায্যে। অঙ্কনকে পেস্তালোৎসি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। সরল রেখা, কোণ, বক্ররেখা প্রভৃতি সোজা জিনিস থেকেই জটিলের দিকে যেতে হবে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে পড়ার পুরানো পদ্ধতির বদলে তিনি শব্দাংশকে (syllable) অবলম্বন করে উচ্চারণ ও ধ্বনিমূলক (Phonetic) পদ্ধতির কথা বলেছেন। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বস্তুর রঙ ও আকার, বস্তুর নাম ও ক্রিয়া অবলম্বন করে 'প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে' ভাষা শিক্ষাই প্রত্যয়মূলক শিক্ষা। পরিচিত বস্তুকে ভাষা শিক্ষার উপকরণ এবং শব্দ সম্ভার সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে। অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাঠের রঙিন অক্ষরও ভাল। মোট কথা, ভাষা শিক্ষাও সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হবে।

স্কুলের প্রাঙ্গণ কিম্বা গ্রামীণ পরিবেশই হবে ভূগোল শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্র। পরিবেশ পরিচিতিই প্রকৃতি পাঠ ও কৃষিশিক্ষার ভিত্তি রচনা করবে। আধুনিক কালের 'বস্তুঅবলম্বী প্রকৃতিপাঠ আন্দোলন' পেস্তালোৎসির পদ্ধতিরই পরিণত সংস্করণ। সংগীত ও শারীর শিক্ষার সাহায্যে এবং বাস্তব ধরনের পারস্পারিক সহ-যোগিতার পথে তিনি অনুভূতি এবং নীতিশিক্ষার কথা বলেছেন।

Yverdun-এর কর্মজীবনে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন

সংখ্যাবোধ সৃষ্টির জন্য পূর্ণসংখ্যার নামতা, ভগ্নাংশের নামতা, এবং ভাষা শিক্ষাকে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক করবার কথা বলেছেন। ভাষা, শিল্পকলা, হস্তাক্ষর, সংখ্যা, আয়তন ও পরিমিতি বোধ সৃষ্টির জন্য বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবনও তাঁর কৃতিত্ব।

বিভিন্ন বইতে ছড়ানো শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে তাঁর মন্ত্রশিষ্য Morf সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো—(১) জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিভা কিম্বা বিশেষ পারদর্শিতা সৃষ্টিই শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। সহজাত বুদ্ধির ক্ষমতাকে উন্মোচিত, বিকশিত এবং প্রসারিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। (২) শিক্ষাদানের কাজ চলবে এই মূল লক্ষ্যকে অবলম্বন করে। শিক্ষা দেওয়ার কাজকে মহত্তর আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিকাশের সহায়করূপে মাত্র মনে করতে হবে। (৩) শিক্ষকের খেয়াল খুশী মত শিশুর কাছে অপরীক্ষিত এবং অনুশাসন বাণীর মত কোন জ্ঞান উপস্থিত করা হবে না। (৪) শিশুর ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তাকে স্বীকার করতে হবে। তার মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার কাজ এগোবে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হবে স্নেহ ও প্রীতির। ভালবাসাই হবে শৃঙ্খলার গ্যারান্টি। (৫) শিশুর অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষার কেন্দ্র। নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির অনুশীলনই হবে শিক্ষার ভিত্তি। এমনকি ভাষা শিক্ষাও হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে। (৬) শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে সরল থেকে জটিলে। শিক্ষার স্তরভেদও হওয়া চাই মনোবিজ্ঞান সম্মত। (৭) একটি পাঠ শেষ হলে সেই জ্ঞান আত্মস্থ করার জন্য শিশুকে উপযুক্ত অবসর দিতে হবে। (৮) জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সংযোগ এবং শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব দক্ষতার প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রয়োজন। (১০) অর্জিত জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে।

Newhof-এই তিনি বলেছিলেন: "We lack most in what we need most"। তাই তিনি হাতের কাজ ও গৃহের কাজ, উৎপাদনী শ্রম, ইন্দ্রিয়ানুশীলন এবং সাধারণ মৌলিক জ্ঞানের সমন্বয়ে পাঠ্য তালিকা তৈরী করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির দাবি করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "We have speaking schools, writing schools, Catechism schools, and we want men's schools."

বইয়ের ব্যবহার অস্বীকার না করলেও বইয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারের বিপদ সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন। ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করেই শিক্ষা হয় না। অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-শক্তির সুবিবেচিত স্বেচ্ছাপ্রয়োগ এবং কাজ করার পথেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব। শিশুর প্রয়োজন প্রকৃতির ক্রোড়ে মুক্তি, আত্মবিকাশ, নিরীক্ষণ এবং ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে

দিয়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা। এক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। সুতরাং মায়েদেরও শিক্ষা এবং সন্তান পালনের শিক্ষণ প্রয়োজন।

গৃহ ও বিদ্যালয় : শিশুর প্রতি অসীম ভালবাসা এবং শিক্ষা-গবেষণার স্পৃহাই ছিল পেস্তালোৎসির মূল পুঁজি। অনুভূতিকেই তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন। তাঁর মতে সুগঠিত এবং স্নেহসিক্তিত গৃহই শিশু শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান। বিদ্যালয় মানসিক কসরতের স্থান নয়, সদুদ্দেশ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমপ্রয়োগের স্থান। তাই গৃহের পরিবেশই স্কুলে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের পথে স্কুল জীবনে নতুন প্রাণ ও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন বলেই তিনি "Father Pestalozzi" রূপে আখ্যাত হয়েছিলেন।

রুশো চেয়েছিলেন নেতিবাচক পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে এমিলকে গড়ে তুলতে। পেস্তালোৎসির হাতে এমিলের শিক্ষা হয়েছে বাস্তব সমাজ পরিবেশের মধ্যে। এমিল ছিল ধনীর সন্তান। পেস্তালোৎসির শিশুরা দরিদ্রের সন্তান। রুশো যা একক এমিলের জন্য চেয়েছিলেন, পেস্তালোৎসি তাই চেয়েছিলেন আত্মনির্ভর শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জন্য। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

রুশো ও পেস্তালোৎসি —রুশো এবং পেস্তালোৎসির শিক্ষা চেতনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার খুব স্বাভাবিক কারণেই বৈসাদৃশ্যও আছে। এঁরা উভয়েই মনে করেছেন যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার স্বাভাবিক এবং সর্বাঙ্গীণ উন্মোচনই শিক্ষা। শিক্ষা কখনো শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিশুর প্রকৃতিতেই রয়েছে শিক্ষার সম্ভাবনা। কিন্তু পেস্তালোৎসি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন যে অনিয়ন্ত্রিত আচরণই শিক্ষা নয়, প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রণই শিক্ষা।

নৈসর্গিক প্রকৃতির মূল্য উভয়েই স্বীকার করেছেন। সামাজিক জীবনকে রুশো নিন্দা করেছেন। পেস্তালোৎসি কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গলকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ধরেছেন এবং সমাজ জীবনের মধ্যেই শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। বর্তমানের শিক্ষাবিদরা এক্ষেত্রে পেস্তালোৎসিকেই সমর্থন করেন। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিকাশকেই আধুনিককালে শিক্ষার আদর্শ বলে মনে করা হয়।

প্রকৃতিবাদ এবং শিশু-কেন্দ্রিকতার জনক বলেই রুশো স্বীকৃত। এই তত্ত্বকে গ্রহণ করে পেস্তালোৎসিও মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারার জনকরূপে খ্যাত। তিনি শিশুর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। উভয়েই প্রকৃতির পবিত্রতা, ব্যক্তির মূল্য, স্বাভাবিক ও বাধাহীন বিকাশ এবং শারীর শিক্ষার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। উভয়েই বলেছেন যে শিক্ষার প্রথম কথাই হলো 'শিশুকে জানা'। কিন্তু রুশো বলেছেন নিতান্তই

আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে নেতিবাচক শিক্ষার কথা এবং শাস্তির ভিত্তিতে শৃঙ্খলার কথা। পেস্তালোৎসি নেতিবাচক শিক্ষা এবং শাস্তিমূলক শৃঙ্খলাতত্ত্ব বর্জন করে শিশুর উপর স্নেহশীল নিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন। তিনি শিক্ষকের ভূমিকা এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত বইয়ের মূল্যও স্বীকার করেছেন। রুশোর Negative Education-এর স্তরটিকে পেস্তালোৎসি ইতিবাচক শিক্ষার স্তর রূপে দেখেছেন।

উভয়েই আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে এ সব বিষয়ে পেস্তালোৎসির বক্তব্য বেশী বাস্তব। বস্তুপাঠকে তিনি পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করে 'object lesson' উদ্ভাবন করেছেন। রুশো শিক্ষার স্তরবিভাগ করেছিলেন। পেস্তালোৎসিও প্রত্যেক শিক্ষার জন্য নিজস্ব সময়ের কথা বলেছেন। ভাষা ও শিল্প শিক্ষায় সরল থেকে জটিলে যাওয়ার পদ্ধতিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। 'উপকরণেব সাহায্যে শিক্ষা' সম্বন্ধে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তিনি শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, শিক্ষাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন। সর্বোপরি রুশোব শিক্ষা একজনেব জন্য পরিকল্পিত। পেস্তালোৎসি সেই তত্ত্বকে সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। রুশোর বক্তব্য আদর্শবাদী ভাবাবেগপূর্ণ। পেস্তালোৎসি আদর্শবাদী ও ধর্মপ্রাণ হলেও তাঁর বক্তব্য অনেক বাস্তব। রুশো মূলতঃ পুরাতন চেতনাকে ধ্বংসই করেছেন। পেস্তালোৎসি সেক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাচীন বন্ধন থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই অবদান অধিকতর মূল্যবান।

দুর্বলতার সমালোচনা: পেস্তালোৎসির ত্রুটি এবং ব্যর্থতা অবশ্যই ছিল। অনেক সময় ভাবাবেগের বাড়াবাড়িতে তার বুদ্ধিবৃত্তি যেন নিষ্প্রভ হয়েছে। তিনি শিক্ষার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝেও প্রয়োগেব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। Von Raumer বলেছেন যে সামান্য একটি গ্রাম্য পাঠশালা পবিচালনাব বাস্তব দক্ষতাও তাঁর ছিল না। তাঁর বাস্তব অনুশীলনও ছিল অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুতঃ পেস্তালোৎসির না ছিল সংগঠন ক্ষমতা, না ছিল নির্ভুলতা, পূর্বাপর সঙ্গতি, কিম্বা একটি কাজে অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকবার ক্ষমতা। তাঁর রচনায় রয়েছে অনেক ভুল এবং স্ববিরোধিতা। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরতাকে তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্তু নিজেই স্মৃতিনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। রবার্ট আওয়েন এই ত্রুটির দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গভীর কোন দার্শনিক চেতনা দিয়েও তিনি পরিচালিত হননি। তাঁর ভাবশিষ্যদের অনেক নতুন কথা তাঁরই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে।

কিন্তু নিজের ত্রুটি ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি গবেষণা করেছেন, মতামত বদল করেছেন, কিন্তু কখনোই পূর্ণসত্য আবিষ্কারের দাবি

করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর ধ্যানধারণাগুলি ছিল পরীক্ষার স্তরে অঙ্কুরের মত। কিন্তু এই অঙ্কুরেই নিহিত ছিল আধুনিক শিক্ষাচেতনার বহুতর দিক।

অবদানের মূল্যায়ন: শিক্ষাচেতনায় নূতন কথা বলে, শিক্ষার এক মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার করে, শিক্ষার নূতন তাৎপর্য, নূতন নীতি, নূতন পদ্ধতি নিরূপণ করে শ্রেণী কক্ষে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন পেস্তালোৎসি। রুশোর বক্তব্যকে তিনি ইতিবাচক রূপ দিয়েছেন। তিনি এই ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে শিক্ষার সমস্যাগুলিকে বিচার করতে হবে ক্রমবর্ধমান শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে। শিক্ষণকলা এবং শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষণপদ্ধতি বাস্তব অভীক্ষা নিরীক্ষারই ফলশ্রুতি। তাঁর রচিত "A Journal of a Father" শিশু অভীক্ষার প্রথম নিদর্শন। তিনিই প্রথম শিল্পশিক্ষালয় পরিচালনা করেন যেখানে শিশুরা ক্ষেতে-খামারে, তাঁতে-চরকায় কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও করতো। তিনি প্রমাণ করেছেন যে বুদ্ধি ও হাতের কাজ যুগপৎ চালানো সম্ভব। "Evening Hours of a Hermit" গ্রন্থে সন্নিবেশিত ১৮০টি নীতিই ভবিষ্যৎ বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। এখানেই তিনি বলেছেন: Education which brings true wisdom and peace of mind must be simple and within everybody's reach." তিনি বলেছেন "Nature develops all the forces of humanity by exercising them." দ্ব্যর্থহীন-ভাবে তিনি বলেছেন: "The exercise of man's faculties and talents must follow the course laid down by nature."

পেস্তালোৎসির বক্তব্য কল্পনাশ্রয়ী "দিব্যসত্য" ছিলনা বলেই ভবিষ্যতের নিশানা হসেবে কাজ করেছে। তাঁর তত্ত্বের মৌল নীতি ছিল—(ক) শিশুর নিত্যপ্রয়োজন পূরণ করে সৃজন প্রয়াসের সাহায্যে তার হৃদয় উন্মোচন করা চাই। (খ) তার হৃদয়ে ভালবাসা, দয়া ও করুণা সঞ্চারিত ও বিকশিত করা চাই। (গ) জ্ঞানজগতের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। (ঘ এই সব কিছুর জন্য চাই শিক্ষার কাজে নতুন চেতনা, নতুন আদর্শ এবং নতুন পদ্ধতি।

পেস্তালোৎসির কৃতিত্ব এই যে তিনি সমাজ উন্নয়নকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করে নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। জ্ঞানের বোঝায় ভারাক্রান্ত না করে শিশুরই দৈহিক, মানসিক ও ভাবপ্রকৃতি অনুসরণ করার কথা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই নূতন ধ্যানধারণা তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাবনে তিনি অগ্রদূত। আধুনিক পাঠ্যপুস্তক এবং

আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিও তাঁর কাছে ঋণী। বস্তুত. তাঁকেই শিক্ষক-শিক্ষণের পথিকৃৎ বলা চলে।

পেস্তালোৎসি মনে করেছেন যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধ্যাত্ব থেকে পরিত্রানের পথ হলো অন্তঃসারশূন্য পাণ্ডিত্যের বদলে প্রত্যয়মূলক জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগ। বাস্তব পন্থায় দরিদ্রতম এবং স্বল্পক্ষমতা সম্পন্ন শিশুর জন্যও তিনি এই ধরনের শিক্ষা চেয়েছিলেন। সুতরাং আধুনিক গণশিক্ষার উদ্গাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গৃহের শিক্ষা, মায়ের শিক্ষা, ভালবাসার শিক্ষা, এবং গুরু-শিষ্যের মধুরতম সম্পর্কের কথা বলেও তিনি নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। উত্তর সাধকরা তাঁর ধ্যান-ধারণা পরিপুষ্ট করেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে হার্বার্ট পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করেছেন এবং শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান প্রয়োগকে বাস্তবায়িত করেছেন। ফ্রোয়েবলীয় আন্দোলনও শিশুর আগ্রহ, অভিজ্ঞতা, কর্মচাঞ্চল্যকে ভিত্তি করে, আনন্দময় বিদ্যালয় পরিবেশে বুদ্ধি, হৃদয় ও কর্মের শিক্ষার কথাই প্রচার করেছে। ফ্রোয়েবল নিজেই ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর পেস্তা-লোজীয় শিক্ষায়তনের শিক্ষক ছিলেন।

পেস্তালোজীয় আন্দোলনের মধ্যেই পেস্তালোৎসি অমর হয়েছেন। তাঁর মন্ত্র শিষ্য এবং উত্তরসাধকরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁর মৌলনীতির পরিবর্ধন এবং প্রয়োগ করেছেন। ইউরোপের শিক্ষাজগতে পেস্তালোজীয় বিদ্যায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ অবদানকেই বলা হয় "Pestalozzian Movement"। বার্গডফ্ হয়েছিল বহু-দর্শকের তীর্থভূমি। সুইস্ সরকার এখানে নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পেস্তালোজীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রিদ, নেপলস্, সেন্ট পিটার্সবার্গ'-এ। রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, এবং ইতালীর প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী রাজারা (Benevolent Despot) ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগ করেন। ১৮৩০ সনের পরে বিভিন্ন দেশে পেস্তালোৎসির ছাত্র কিংবা সহকারীদের অধ্যক্ষতায় নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাশিয়াও পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পেস্তালোজীয় শিক্ষাকেই জাতীয় নবজাগরণের উপায় বলে Fichte প্রচার করেন। বাছাই করা প্রুশিয় যুবকদের পেস্তালোজীয় স্কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয়।

১৮৩০ সনের বিপ্লবের পরে ফরাসী দেশেও গণশিক্ষার সূচনা হয় এবং Victor Cousin'এর নেতৃত্বে পেস্তালোজীয় ভাবধারা স্বীকৃতি পায়। ইংলণ্ডে মোনিটোরিয়াল ব্যবস্থা এবং ইনফ্যান্ট স্কুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে সংশোধিত পেস্তালোজীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সেখানে রবার্ট আওয়েনের প্রচেষ্টা এবং মেয়ো আন্দোলন পেস্তালোৎসির

কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আত্‌লান্তিক পাড়ি দিয়ে এই ভাবধারা আমেরিকাতেও পৌঁছে এবং হোরেস ম্যানকে উদ্দীপিত করে। বস্তুতঃ আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার জনক রূপে পেস্তালোৎসির স্থান নির্দেশ করা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়।

সর্বোপরি অনাথ, দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ মূকবধির এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের শিক্ষার প্রতি অধুনিক সমাজের যে দরদ, তারও কৃতিত্ব বহুলাংশে পেস্তালোৎসির প্রাপ্য। তাঁর পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই কৃষি উপনিবেশ, তরুণ অপরাধীদের উপনিবেশ কিংবা রিফর্মেটরী স্কুল গড়ে ওঠে। 'Object lesson' পদ্ধতি পঙ্গুদের শিক্ষার যে সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে, তার জন্য সমগ্র সমাজই তাঁর কাছে ঋণী।

বিস্ময়ের কথা নয় যে নিউহফে এই মানবপ্রেমিক ও সমাজদরদীর স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে: "Man, Christian, Citizen, everything for others, nothing for self. Blessings on his name."

জন ফ্রেড্‌রিক হার্বার্ট (John Frederick Herbart) : ১৭৭৬-১৮৪১

সংক্ষিপ্ত জীবনী : (জার্মানীর সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ১৭৭৬ সনে। দাদু ছিলেন ওল্ডেনবার্গ জিমনাসিয়ামের রেক্টর এবং বাবা ছিলেন আইনজীবী। মাও ছিলেন সুশিক্ষিতা। তিনি হার্বার্টকে গ্রীক ও গণিতের প্রারম্ভিক পাঠ দিয়েছেন।

জেনা বিদ্যালয়ে পড়বার সময় Fichte এবং Schelling প্রমুখ দার্শনিকদের সংস্পর্শে আসেন। স্নাতকোত্তর জীবনে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার তিনটি শিশুর গৃহ-শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন। শিক্ষকতায় এই তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের বাবার কাছে রিপোর্ট করার জন্য তিনি যে রচনা আরম্ভ করেন, তাই তাঁর চিন্তাসূত্রকে সুসংবদ্ধ করে। তিনি বোঝেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ব্যক্তিশিশুর ক্ষমতা, রুচি, প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা অবলম্বন করেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব। ১৭৯৯ সনে তিনি বার্গডফে *পেস্তালোৎসির স্কুল পরিদর্শন* করেন এবং তাঁর ধ্যান-ধারণাকে উন্নত এবং সুসংবদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

হার্বার্ট ১৮০২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষা-দর্শনকেই তাঁর বিশেষ সাধনার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে Pedagogical Seminar প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে হার্বার্টের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) Observations of a Pedagogical Essay. (২) Outlines of Educational Doctrines (৩) The Science of Education এবং (৪) Minor Pedagogical Works. কোনিগসবার্গে ২৫ বৎসর

কাজ করার পরে তিনি নিজের শহর গটিনযেন-এ ফিরে আসেন। জীবনের শেষ আট বৎসর তিনি গ্রাম্যজীবন যাপন করেন।)

পূর্বসূরীদের প্রভাব: সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিবেশে ব্যক্তির নবমূল্যায়নের জন্য যে দার্শনিক চেষ্টা চলছিল, জন লক-এর দর্শন ছিল এই প্রচেষ্টার প্রথম স্তর। তিনি শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষ গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। রুশো বললেন প্রকৃতি অনুযায়ী সত্তাবিকাশের কথা। তারপর ভাববাদী আন্দোলন দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে জার্মানীকে কেন্দ্র করে। কাণ্ট-এর দর্শনে লক এবং রুশোর মিশ্রণ ঘটলো। তিনি একদিকে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে অন্তর্লীন স্বাধীনতার (inner freedom) কথা বললেন। এই সূত্র ধরেই অগ্রসর হলেন হার্বার্ট। তিনি অন্তরের স্বাধীনতা এবং পবিবেশের প্রভাবের মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা নির্বাচনে সচেষ্ট হয়েছেন।

সাধারণ দার্শনিকতা ছাড়া শিক্ষাতাত্ত্বিক হিসাবেও হার্বার্ট পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী। লক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে আমল দিয়েছেন। রুশো শিশুনির্ভর শিক্ষার কথা বলেছেন। পেস্তালোৎসি মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে গেছেন। হার্বার্ট শিক্ষাতত্ত্বের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে আদর্শে পৌছতে চেয়েছেন।

হার্বার্টের শিক্ষা চেতনা

হার্বার্ট মূলতঃ দার্শনিক। তাই তিনি "Aesthetic Presentation" রচনার সুরুতেই শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন: "The only aim of education, the whole aim of education can be expressed in a single word, that is morality"। অন্যত্র বলেছেন: "Virtue—this single word expresses the aim of education." আবার বলেছেন: "The ultimate objective of education is virtue."

এই 'Virtue' তথা "অন্তর্লীন ন্যায়নিষ্ঠা" কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কাণ্ট বলেছেন যে বিবেকবান মানুষেব পক্ষে Virtue হলো সম্পূর্ণ অবধারিত সম্পদ (Categorical Imperative)। এই নিষ্ঠার প্রভাবেই মানুষ সৎপথে চলে এবং সৎ কাজ করে। সৎকর্মের প্রেরণা সহজাত এবং স্বাভাবিক। "Virtue" সম্পর্কিত চেতনায় হার্বার্ট ও কাণ্ট প্রায় সমদর্শী। হার্বার্টও বলেছেন যে ন্যায় নিষ্ঠা হলো অন্তরের মৌলিক সম্পদ। কেবলমাত্র সততা এবং নিষ্ঠা দিয়ে চালিত মানুষই মুক্ত

এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্কে পার্থক্যও আছে। কাণ্ট-এর মতো হার্বার্ট হৃদয় তথা আত্মাকে সক্রিয় শক্তি বলে মনে করেননি। হার্বার্টের মতে— Virtue অন্তর্লীন সাধীনতা ও মুক্তির অনুভূতি হলেও এর বহিঃপ্রকাশ আছে। এর বহিঃপ্রয়োগ সুস্থ সবল অভিজ্ঞতাব উপর নির্ভবশীল। ন্যায়নিষ্ঠার প্রয়োগকে মানুষের মধ্যে স্থাযী অভ্যাসে পবিণত কবাই শিক্ষা। এখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব। ন্যায়নিষ্ঠতার কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে শিশুব সকল অভিজ্ঞতাব সংগঠন এবং আদর্শ অভিজ্ঞতাব পরিপোষণই শিক্ষাবিজ্ঞানেব মূল কথা। শিশুব মধ্যে এমন দিকদর্শন সৃষ্টি কবা দরকার যা তাকে স্বাভাবিকভাবেই সত্যেব প্রতি আকৃষ্ট কববে এবং কদর্যতা ও অসত্যকে ঘৃণা কবতে শেখাবে।

হার্বার্ট সৌন্দর্যপ্রীতিকে (aesthetics) ন্যায়নিষ্ঠাব চেয়েও বড করে দেখেছেন। এখানেই কাণ্ট-এব সঙ্গে তাঁব মৌলিক পার্থক্য। কাণ্ট বলেছেন : "ইচ্ছাশক্তি" একটি সহজাত ক্ষমতা। হার্বার্ট বলেছেন : চিন্তা, ভাবাদর্শ এবং কামনাই ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করে। ইচ্ছা হলো অভিজ্ঞতাবই ফলশ্রুতি। বস্তুতঃ 'ইচ্ছা' সংক্রান্ত মতবাদেব উপরই হার্বার্টের শিক্ষাচেতনা প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার সাহায্যে যাব ভাবজগত সুসংবদ্ধ নয়, তাব পক্ষে 'Virtue' থাকা সম্ভব নয। তিনি বলেছেন : "One whose ideas are not organised through education cannot be virtuous." মানসিক বোধ (Comprehension) থেকেই আবেগ, এবং আবেগ থেকেই ক্রিয়া (action)। সুতরাং হার্বার্টেব তত্ত্বে শিক্ষার প্রধান এবং মৌলিক কাজ হলো শিশুব অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিব সুসমঞ্জস ঐক্যসাধন। একেই তিনি "apperception" রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

হার্বার্টেব মতে পাঁচটি উপাদান নিয়ে virtue সংগঠিত –(১) অন্তর্লীন স্বাধীনতা (inner freedom) অর্থাৎ কামনা ও প্রত্যয়েব সামঞ্জস্য, (২) দক্ষতা (skill) অর্থাৎ সুসমঞ্জস আত্মপ্রকাশ, (৩) উদারতা (liberalism) অথবা সদিচ্ছা, (৪) ন্যায়বোধ (Justice) এবং (৫) স্বাভাবিক সততা। শিক্ষণ পদ্ধতিব বিশ্লেষণে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, বোধ, অনুভূতি এবং চিন্তাকে Virtue-র পথে শিক্ষক পবিচালিত করতে পাবেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—Virtue সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত থেকেই বোঝা যায় তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদী আদর্শই প্রচাব করেছেন। বস্তুতঃ "Morality" কথাটির মধ্যেই তাঁর শিক্ষাদর্শ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ন্যায় ও সত্য, শুভ ও সুন্দরের সাধনা। হার্বার্টের 'নীতিতত্ত্ব' পাঁচটি উপাদানে গঠিত—(১) Justice, (২) Equity,

(৩) Goodness, (৪) Kindness, (৫) Inner freedom অর্থাৎ Self mastery। এই কয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতাই চরিত্রের মূল ভিত্তি। সুতরাং হার্বার্টের শিক্ষাদর্শ হল "নৈতিক চরিত্র" গঠন।

চরিত্র গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি তিনটি কথা বলেছেন—(১) অনুশাসন অথবা নিয়ন্ত্রণ, (২) শিক্ষণ (instruction), এবং (৩) আত্মশৃঙ্খলা। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষকের ভূমিকা এবং শৃঙ্খলার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা সম্পর্কে লক-এর চিন্তা থেকে তাঁব চিন্তা পৃথক। তিনি শাসনের পথে 'সদাচরণ' এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে 'ভদ্র আচরণেব' মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে— নৈতিক চরিত্রের মূল উপাদান হলো স্বাধীনতা।

হার্বার্ট মনে করেন শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণ অনেকটা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। সৎ কাজের জন্য সদিচ্ছা জাগাতে শিশুকে সাহায্য কবাই শিক্ষকের দায়িত্ব। এইজন্য অনেকে বলেছেন যে হার্বার্ট শিশুর স্বকীয়তা স্বীকাব করেননি। এই ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। "Science of Education" গ্রন্থে তিনি স্বকীযতা ও ব্যক্তিত্বেব পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে—বহুমুখী জ্ঞান, এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বকীয়তা (individuality) রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিত্বে (Personality)। এই 'ব্যক্তিত্ব' গঠনকেই তিনি শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব : হার্বার্ট বলেছেন : শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষাকলা জানতে হলে প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিনতে হবে মনের রাজ্যকে। মনের পরিচয়, প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে হার্বার্টের নিজস্ব অভিমতই তাঁর মনস্তত্ত্ব। পরিণামে তাঁব অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তিনি তৎকালীন ধ্যানধারণাকে অনেক পরিবর্তন করেছিলেন। হার্বার্ট বলেছেন : মানবাত্মা একটি অবিভাজ্য সত্তা। তিনি বিশ্বাস করেননি যে কতকগুলি সহজাত চেতনা জন্মকালেই সৃষ্টি হয়। সহজাত প্রত্যয় কিম্বা ফ্যাকাল্টির কোন অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি। জন্মকালে মন থাকে সম্পূর্ণ শূন্য। স্নায়ুর সাহায্যেই প্রথম ধারণা ও অনুভূতি জন্মে। এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকেই তিনি "primary presentation" রূপে আখ্যা দিয়েছেন। মন তথা আত্মার বহুবিধ অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকৃত জ্ঞান, কামনা এবং ইচ্ছা সংগঠিত হয়।

সুতরাং মনের দুইটি বিশিষ্টতা—(১) অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং আত্মকরণ, (২) শিক্ষার মাধ্যমে মনোগঠন। মনের আত্মকরণ (assimilation) ক্রিয়াকেই তিনি

pperception আখ্যা দিয়েছেন। স্নায়ু এবং ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে নানা ধরনের ।ভিজ্ঞতা গ্রহণ এবং মানসিক আত্মকরণই শিক্ষা। সহজাতরূপে মনের কোন ভালমন্দ .বিচয় নেই। অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং আত্মকরণের উপরই মনের গঠন নির্ভরশীল। :তবাং মনকে গঠন করা (build up) সম্ভব।

মানসিক সম্পদের (apperception) দুইটি উৎস—(১) Experience—অর্থাৎ নসর্গিক প্রকৃতি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, এবং (২) Sympathy of intercourse, যথাৎ মানব সমাজেব সঙ্গে সংযোগ। এই দুইটি সূত্র থেকে পাওয়া অসংবদ্ধ যভিজ্ঞতাগুলিকে ঐক্যতানে সুসংবদ্ধ করা এবং শিশুব ন্যায়নিষ্ঠাকে স্বভাবগত করাই শক্ষকের কাজ। মানবিক অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করে মানবতার প্রতি ভালবাসা ষ্টি করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। সহজাত ক্ষমতাই মনেব বিকাশ ও প্রকাশ ঘটায় না, র্জিত অভিজ্ঞতার আত্মকরণ দরকাব। মানুষ জন্মাবধিই সৎ কিম্বা অসৎ হয় না, যভিজ্ঞতাই গুণাগুণ নির্দিষ্ট কবে। সুসম অভিজ্ঞতাই সততা এনে দেয়।

এহ আলোচনা থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত কবা যায—(১) মনেব প্রধান গুণ হলো গ্রহণ এবং আত্মীয়করণ, এবং (২) শিক্ষাই শিশুকে গঠন কবে। উপযুক্ত শিক্ষার াহায্যেই আগেকার অভিজ্ঞতাব সাথে নূতন অভিজ্ঞতার সংযোগ এবং সামঞ্জস্য াপিত হয়। তখনই অভিজ্ঞতা হযে ওঠে জীবন্ত। শিক্ষকই বহুলাংশে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করেন, নূতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন চিন্তাপরিমণ্ডলের সাথে সঙ্গতি-র্ণ করতে সাহায্য কবেন। সুতরাং হার্বার্টের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক শুধু নিষ্ক্রিয় র্শক নন। তাঁর মতে মনের কোন নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা নেই। বহির্বিশ্ব এবং অন্তর্লীন অনুভূতি থেকে মনের কাঁচা মাল সংগৃহীত হয়। সুতবাং ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞানের উৎস। (এক্ষেত্রে হার্বার্ট পেস্তালোৎসির অভিমত গ্রহণ কবেছেন। মন্তেসরির াতে এই তত্ত্বটি আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে।)

বিভিন্নসূত্রে মনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়। বহু ধরনের অভিজ্ঞতার তুলনা, সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপিত হয়। সাদৃশ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও সুগ্রথিত হয়। বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা পরস্পরকে প্রতিরোধ করে। পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রতিকূলতার জন্য কোন কোন অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। চেতনার প্রহরী ক্লান্ত হলেই এইসব অভিজ্ঞতা চেতন রাজ্যের সীমানায় হানা দেয়। (লক্ষণীয় যে হার্বার্টের এই তত্ত্ব উত্তরকালের ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরই পূর্বসূরী।)

যখন সমপ্রকৃতির একাধিক অভিজ্ঞতা চেতন মনে জাগে, তখন তারা পরস্পর সংবদ্ধ অবস্থায় সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে। পরস্পর সংবদ্ধতাই "Presentation Mass"। এই প্রাথমিক সংগ্রহই মনের পুঁজি। মনের দরজায় নূতন কোন অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হলে এই পুরাতন পুঁজির সঙ্গে বোঝাপড়া চলে। পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্যেব ভিত্তিতে নূতন অভিজ্ঞতার আত্মকরণকেই হার্বার্ট বলেছেন: "educational apperception"। তাঁর কথায় "When the materials of new experience are related to the accumulated old experience, only then happens apperception. The value of the new is determined by the touchstone of the old". সুতরাং apperceptionই হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাসৌধেব মূল ভিত্তি।

হার্বার্টীয় মনস্তত্ত্ব আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত হলেও শিক্ষাব ক্ষেত্রে জ্ঞান আত্মকবণের কথা আজও সববাদীসম্মত। পেস্তালোৎসি ইন্দ্রিয়ানুশীলনকেই শিক্ষাব প্রথম ধাপ রূপে গ্রহণ কবেছিলেন। হার্বার্ট নূতন সংযোজন করে তাঁর তত্ত্বকে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। (জন ডিউই এই তত্ত্বকেই "Principle of continuity" নামে উপস্থাপন কবেছেন। Gestalt মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে প্রতিটি নূতন অভিজ্ঞতাই পুবাতনেব ভিত্তিতে "প্যাটার্ন" গঠন করে।) হার্বার্ট একথাও যথার্থই বলেছিলেন যে প্রত্যেক শিশুর একই শিক্ষা গ্রহণ কিংবা একই ভাবে আত্মকরণের ক্ষমতা থাকে না। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো প্রত্যেকের মধ্যে পুবাতন অভিজ্ঞতার "চিন্তাপরিমণ্ডল" (Circle of Thought) গড়ে তোলা, যেন শিশু সেই ভিত্তিতে নূতন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে।

হার্বার্টের মতে আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা হলো একই মানসিক জীবনের বিভিন্ন দিক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই অনুভূতির রূপ ও গতি ঠিক হয়। সুতরাং অভিজ্ঞতা সংগঠনের সাহায্যে অনুভূতির জগৎও শিক্ষক সুসংবদ্ধ করতে পারেন। এভাবেই চরিত্র গঠন সম্ভব।

শিক্ষার স্বরূপ ও ভূমিকা:—শিক্ষাব স্বরূপ সম্বন্ধে হার্বার্ট তিনটি কথা বলেছেন। (১) শিক্ষার কাজ হলো মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা, (২) পুরাতন ও নূতন অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে গঠিত চিন্তামণ্ডলে (Circle of thought) আবেগের স্পর্শ দিয়ে Virtue-তে রূপান্তর (৩) উপযুক্ত শিক্ষা, শিক্ষণ ও নির্দেশনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন। হার্বার্টের তত্ত্বে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় দর্শক নন। এ বিষয়ে রুশোর সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য। হার্বার্ট বলেন, "Teacher forms the

pupil." অবশ্য জ্ঞানের বোঝা চাপানোই শিক্ষা নয়। মানসিক প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতার আত্মকরণ ক্ষমতা জাগলেই শিশু পাঠ গ্রহণে উন্মুখ হয়। তিনি বলেছেন : 'Instruction is not giving bits of information. In such superimposed knowledge, there is no guarantee which can save the pupil from vulgarity and malinfluence. The instuction must reach the ideas of his mind which guide and control his will and emotion. The extent the teacher will be able to control and idealise that mental idea, the extent will be the instruction helpful to the pupil.'

শিক্ষকের করণীয় : শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষকের কাজ। এই কাজকে হার্বার্ট আখ্যা দিয়েছেন 'ট্রেনিং'। এই উদ্দেশ্যে শিশুর ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তার সংগঠন দরকার। হার্বার্ট একেই বলেছেন "Instruction." আবার এই উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, শাসনও প্রয়োজন। একে হার্বার্ট বলেছেন 'Government'। আমরা বর্তমানে একে বলি নিয়মানুবর্তিতা (discipline)। এটা "উপায়" মাত্র (means), উদ্দেশ্য নয়। শিশুদের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা এবং স্কুলে সুব্যবস্থার জন্য, কাজে ব্যাপৃত রেখে শিক্ষার জন্য শাসনের প্রয়োজনীয়তা হার্বার্ট স্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে রুশোর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য। কিন্তু তাড়না ও অনুশাসনের বিপদ সম্পর্কেও তিনি সচেতন। বস্তুতঃ হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শিক্ষাদানের কাজটি স্ববিরোধিতাপূর্ণ। একদিকে শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশই লক্ষ্য, অপরদিকে শিশুর বুদ্ধি, যুক্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণই পদ্ধতি। হার্বার্টই বলেছেন, "If the ultimate goal of education is not freedom, it would mean oppression." শিক্ষকের এই অদ্ভুত দ্বৈত ভূমিকার কথা ফরাসী শিক্ষাবিদ ক্রটও উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকের কাজ হলো শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীন মানুষ গড়া।

শিক্ষার অন্তর্নিহিত পদ্ধতি : কিন্তু বাহ্যিক শৃঙ্খলাই বড় কথা নয়। প্রকৃত শৃঙ্খলার জন্য শিশুর মানসিক সমর্থন এবং জীবন্ত আগ্রহ দরকার। সরল বহুমুখী আগ্রহই শিক্ষকের হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে যে মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকেই তিনি বলেছেন 'interest'. তথ্যকে আত্মস্থ করার মধ্যেই interest-এর সৃষ্টি। বহুমুখী স্থায়ী আগ্রহই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

আগ্রহ দু'রকমের হতে পারে—(১) জ্ঞানের আগ্রহ এবং (২) সামাজিক জীবনের

আগ্রহ। জ্ঞানের আগ্রহকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(ক) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, (খ) চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে পাওয়া জ্ঞান, এবং (গ) সৌন্দর্যবোধ থেকে পাওয়া সুসামঞ্জস্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান। তেমনি সামাজিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহও হতে পারে তিন ধরনের—(ক) অন্যান্য লোকের সাহচর্য থেকে পাওয়া সহানুভূতি, (খ) সমগ্র সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট 'সামাজিক' আগ্রহ, (গ) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে ধর্মীয় জীবন। আগ্রহের উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তিতে হার্বার্ট পাঠ্যবিষয়গুলি দুই অংশে ভাগ করেছেন—

(১) ঐতিহাসিক—সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি এ শাখার অন্তর্গত।

(২) বৈজ্ঞানিক—গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা এই শাখার অন্তর্গত। শিক্ষক দেখবেন যেন শিশুর আগ্রহ একদেশদর্শী না হয়ে বিচিত্র দিকে প্রবাহিত হয়।

আদর্শ শিক্ষা :—শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে তার মানসিক স্তর এবং আগ্রহ অনুসারে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন শিশুর আগ্রহ বহুমুখী হয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত না হয়। (The opposite of manysidedness is not only unisidedness, but also scattering)। তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন বহুমুখী প্রয়াসের ফলে ব্যক্তিত্বের একীকতা বিনষ্ট না হয়। শিক্ষণের কাজ হলো অর্থহীন ও অসংবদ্ধ প্রয়াসের অপব্যয় থেকে শিশুকে রক্ষা করা। সেই শিক্ষাই সার্থক শিক্ষা যখন শিক্ষার্থী বিচিত্র জ্ঞান এবং আগ্রহকে আত্মস্থ করে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত করতে পেরেছে।

সম্পৃক্ততা তথা অনুবন্ধ তত্ত্ব : আগ্রহ, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে হার্বার্টের বক্তব্য থেকেই আধুনিক অনুবন্ধ তত্ত্বের (correlation) উদ্ভব। মনের ঐকিকতার উপর হার্বার্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সমধর্মী বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং সার্বিক জ্ঞানের সংহতি হলে প্রাণহীন মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয় না। যে বিষয় বা কাজের প্রতি শিশুর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ, তাকেই কেন্দ্র হিসাবে নিয়ে অন্যান্য বিষয়কে সংযোজন করা প্রয়োজন। তাঁর এই অভিমত থেকেই বিভিন্ন অনুবন্ধ প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। হার্বার্ট নিজেই "Concentration" পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন। হ্যারিস প্রমুখ উত্তরসাধকরা Co-ordination এবং অন্যান্য ভাবেও অনুবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন।

ইতিহাসকে অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে হার্বার্ট বলেছেন। রোমাঞ্চকর কিম্বা বীরত্ব কাহিনীর ভিত্তিতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য পড়ার

সংহতি স্থাপনের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ শিশুশিক্ষার স্তরে হোমারের মহাকাব্যকেই তিনি যথার্থ কেন্দ্র মনে করেছেন, কারণ মানবজাতির শৈশবস্তরে সংগ্রাম ও বীরত্বই প্রধান স্থান নিয়েছিল। হার্বার্টের এই ইঙ্গিতের সূত্রেই তাঁর ভাবশিষ্য Zeiller বললেন, মানব সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনকে অনুসরণ করেই শিশু শিক্ষার ক্রমিক পর্যায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। Stanley Hall-ও ক্রীড়াতত্ত্ব (Play) উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শিশুর খেলার রূপ ও প্রকৃতিকে মানব সভ্যতার আদিমযুগের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এই "Culture Epoch" তত্ত্ব যদিও বিজ্ঞান সমর্থিত নয়, তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি :—শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হার্বার্ট বলেছেন: "Pedagogy as a science is based on practical philosophy and on psychology. The former points out the aim of culture, the latter the way, the means and the obstacles." শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হার্বার্টের সমগ্র বক্তব্য 'Instruction' কথাটির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার instruction কথাটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আগ্রহতত্ত্বের উপর (doctrine of interest)। নিছক আগ্রহই আগ্রহের শেষ কথা নয়। উপযুক্ত মাত্রায়, উপযুক্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তাই আগ্রহের প্রকৃত পরিচয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবৈষম্য অবশ্যই স্বীকার্য। অনেক সমালোচক বলেছেন যে মনোজগৎ সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু হার্বার্ট বলেছেন, "It is a chief requisite of a good pedagogical plan that it be flexible enough to fit the various capacities."

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে হার্বার্টের বক্তব্য Apperception mass এবং apperception তত্ত্ব, তথা পুরাতন ও নূতন জ্ঞানের সমন্বয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। Apperception mass কথাটির অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর মনে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি। Apperception কথাটির সরল অর্থ সজ্ঞান শিক্ষা, অর্থাৎ পুরাতন জ্ঞানের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করে নূতন জ্ঞানের আত্মীয়করণ। শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বিচার করা এবং নূতন জ্ঞান আত্মীয়করণে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে association এবং apperception কথা দুটির পার্থক্য লক্ষণীয়। Association বহুলাংশে যান্ত্রিক সংযোগ, কিন্তু apperception মূলতঃ সচেতন সংযোগ। হার্বার্টীয় শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হলো সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন। শিশুর মানসিক আগ্রহের ভিত্তিতে তিনি পাঠের "অংশ" ভাগ করবেন, পূর্বজ্ঞান ও নূতন জ্ঞানের সমন্বয় করবেন এবং সামগ্রিক দৃষ্টি দেবেন। শিক্ষার্থীর দিক থেকেও

সচেতন প্রচেষ্টা থাকবে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নূতন বিষয়বস্তুর সচেতন সংযোগ স্থাপনের। এই ভাবেই গড়ে উঠবে সুসংহত চিন্তামণ্ডল। চিন্তাচক্রই নির্ধারণ করবে আগ্রহ. আগ্রহই নির্ধারণ করবে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রেরণা। এই "ইচ্ছাই" চরিত্রের ভিত্তি। হার্বার্ট বলেছেন: "Instruction will form the circle of thought, and education the character. The last is nothing without the first. Herein is contained the whole sum of my pedagogy." সুতরাং কথা হলো আগ্রহ জাগানো, বিষয়বস্তুকে গ্রহণীয় ভাবে উপস্থাপন করা, উপস্থাপিত বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং সমগ্র পাঠের সঙ্গে পূর্বজ্ঞানের সংহতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হার্বার্ট পাঠের স্তর বিভাগ করেছেন—যা Herbartian step কিম্বা method নামে খ্যাত।

পঞ্চ সোপান পদ্ধতি: শিশুর মানসিক জীবন ও আগ্রহের ধারাকে তিনি চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—(১) Observation. এই পর্যায়ে শিশু নিবিষ্ট আগ্রহে নিরীক্ষণ করবে। (পেস্তালোৎসিও এই observation এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।) (২) Expectation, (৩) Demand (৪) Action। মনের গতির এই চার পর্যায়ের ভিত্তিতে তিনি চারটি পাঠ-পর্যায় নির্দেশ করেছেন—(ক) Clearness, (খ) Association, (গ) System এবং (ঘ) Method.

Clearness বলতে বোঝায় পূর্বজ্ঞানের জাগরণ। হার্বার্টের অনুগামী Zeiller এই স্তরকে দুই অংশে ভাগ করেছেন—(১) Preparation এবং (২) Presentation। প্রস্তুতির পর্বে পূর্বজ্ঞান জাগ্রত হলে নূতন জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তখন নূতন জ্ঞান উপস্থাপিত হলে শিশু তার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করে আত্মস্থ করতে পারে। Association স্তরে অর্জিত জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। System স্তরে চিন্তা, যুক্তি ও ভাষার সাহায্যে জ্ঞানের বিমূর্তন (abstraction) এবং সাধারণীকরণ (Generalisation) সম্পাদিত হয়। Method-এর স্তরে হয় নূতন সমস্যা সমাধানের জন্য অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ। Zeiller এই স্তরকে Recapitulation কিম্বা Verification স্তরও বলেছেন। Application কথাটির অবতারণা করেছেন হার্বার্টের আর এক অনুগামী Rein। তিনি 'aim' অর্থাৎ পাঠের উদ্দেশ্য ঘোষণাকে একটি পৃথক স্তর হিসাবে সংযোজনের প্রস্তাব করেছেন। কোন কোন শিক্ষাবিদ প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য ঘোষণার প্রস্তাবকে সমালোচনা করে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু শিশুকে "আন্দাজ" করার জন্য ছেড়ে না দিয়ে প্রত্যক্ষ-ঘোষণাই বোধহয় শ্রেয়। কোন কোন শিক্ষাবিদ হার্বার্টের ছকটিকেই

সমালোচনা করে বলেছেন যে এভাবে শিশুকে ছকে বাঁধা যায় না। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে শিশুর মনোজগৎকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখাও চলে না। হার্বার্টই বলেছেন যে শিক্ষকের ভূমিকা বড়ই অদ্ভুত। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য নিয়ন্ত্রণই তাঁর কাজ।

শিষ্যদের সংশোধন এবং সংযোজন গ্রহণ করে বর্তমানে হার্বার্টীয়রা Preparation (প্রস্তুতি), Presentation (উপস্থাপন), Comparison or abstraction (তুলনা ও বিমূর্তন), generalisation (সাধারণীকরণ) এবং application (প্রয়োগ)—এই পাঁচটি স্তরেই পঞ্চসোপান পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেন। আবও সংক্ষিপ্তাকারে উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ—এই কয়টি স্তরেই বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বহু ধরনের পাঠকে (lesson) মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—অনুভূতিমূলক (appreciation), দক্ষতামূলক (Skill or Drill) এবং জ্ঞানমূলক (knowledge)। সামান্য হেরফেব করে এই তিন শ্রেণীর পাঠেই হার্বার্টীয় পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

অবদানের মূল্যায়ন: মনোবিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টি তত্ত্ব হার্বার্ট বর্জন করলেও association তত্ত্বকে বহুলাংশে গ্রহণ কবেছিলেন (যদিও তিনি association এবং apperception-এর মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় করেছিলেন)। অনুভূতির মূল্যকে তিনি চিন্তাশক্তির সহযোগী রূপে মাত্র স্বীকার কবেছেন। শিক্ষার স্তরভেদ সম্বন্ধে তাঁব বক্তব্য যদিও পেস্তালোৎসির বক্তব্য থেকে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত, তবুও তিনি যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে উঠতে পাবেননি। ফ্রোয়েবল এবং মন্তেসরির তুলনায় শিশুর দেহযন্ত্রের মূল্য তার তত্ত্বে কম স্থান পেয়েছে। তাঁরা শিশুর ক্রমবৃদ্ধি এবং সক্রিয়তাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, আর হার্বার্ট তুলনামূলকভাবে শিক্ষকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব মূলতঃ এই অর্থে শিশুকেন্দ্রিক যে শিশুর আগ্রহকে ভিত্তি করে শিক্ষার কাজ অগ্রসর হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শিশুর আগ্রহকে পবিচালনা কবার দায়িত্ব মূলতঃ শিক্ষকের। আধুনিক মনোবিজ্ঞান হার্বার্টীয় মনস্তত্ত্বকেও বাতিল করেছে।

তা সত্ত্বেও হার্বার্টের বিরাট অবদান অনস্বীকার্য। মনোবিকাশের ধারায় তিনি প্রত্যয় এবং অন্তর্দৃষ্টিব গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর আগ্রহতত্ত্ব মন্তেসরি ও ডিউইকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠনের পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছেন। নৈতিক শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন: "Moral education is not separable from education as a whole." তাঁর আগেও অনেকে চরিত্র গঠনের কথা বলেছিলেন। মানুষ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্য পেস্তালোৎসিও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হার্বার্ট আগ্রহকে চরিত্র গঠনের সঙ্গে

সংযুক্ত করেছেন। তাছাড়া শিক্ষনীয় বিষয় বাছাই এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতিও প্রস্তাব করেছেন।

হার্বার্ট শিশুকেন্দ্রিকতাকে শিশু মনস্তত্ত্ব, শিশুর প্রকৃতি এবং শিশুর ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। Tabula Resa থেকে মনের ক্রমিক সঞ্চয়, প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সংগ্রহে ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুশক্তির ভূমিকা, apperception mass, মানসিক প্রস্তুতির মূল্য এবং apperception পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শিক্ষা চেতনায় নতুন সংযোজন। বিষয় "উপস্থাপনের" মূল্য এবং উপস্থাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এবং Gestalt মনোবিজ্ঞানও তাঁর কাছে পরোক্ষে ঋণী। Correlation তত্ত্বেরও তিনি অন্যতম উদ্ভাবক এবং Culture Epoch তত্ত্বও তাঁর কাছে ঋণী। তিনি শিক্ষকের ভূমিকাকে নূতনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। পঞ্চসোপান পদ্ধতির জনক রূপে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। সাম্প্রতিককালে বহুতর ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র দেশে, বিশেষতঃ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির মূল্য আজও রয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে পেস্তালোৎসি ও হার্বার্ট পরস্পরবিমুখী। পেস্তালোৎসির তত্ত্বে গভীর যুক্তি ও দার্শনিক ভিত্তি ছিল না। হার্বার্টের প্রতিষ্ঠা ছিল যুক্তি ও গভীর দার্শনিকতায়। পেস্তালোৎসির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল ঝাপসা। আবেগপ্রবণ সংস্কারকের মত তিনি আশু ফলশ্রুতির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। হার্বার্টের ছিল প্রসারিত দৃষ্টি এবং যুক্তিশীলতা। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি পেস্তালোৎসির তত্ত্বকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। পেস্তালোৎসির মত তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল্য তো স্বীকার করেছেনই, আরও বলেছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে ভাবরাজ্য গঠনের কথা। ইন্দ্রিয়শক্তিকে মূল্য দিয়েও তিনি সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন নৈতিক আদর্শ। পেস্তালোৎসি নৈসর্গিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতাকেই বড় করেছিলেন। হার্বার্ট সেক্ষেত্রে যুক্ত করেছেন নৈতিক ও aesthetic অভিজ্ঞতার কথা। পেস্তালোৎসি চেয়েছিলেন শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে। হার্বার্ট শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি শিক্ষা প্রয়াসকে দার্শনিকতামণ্ডিত করেছেন।

হার্বার্টীয় মনস্তত্ত্ব যদিও আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ফ্যাকাল্টিতত্ত্বের ভুল প্রমাণ করে তিনি শিক্ষায় প্রয়োগযোগ্য বাস্তব মনস্তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন কিভাবে উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে জ্ঞানের আত্মকরণ এবং চরিত্র গঠন সম্ভব। তাঁর প্রয়াস পরবর্তীকালে ম্যাডাম মন্তেসরিকে প্রভাবিত করেছে। পেস্তালোৎসির খাপছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্যকে

সুসংহত করে তিনি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষণ-পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি আগ্রহের উপর তাঁর দেওয়া গুরুত্বই আধুনিক ক্রিয়াকেন্দ্রিক এবং শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির পথ তৈরী করেছে।

ফ্রেডরিক উইলিয়াম আগষ্ট ফ্রোয়েব্‌ল্‌ ; ১৭৮২—১৮৫২
(Frederick William August Froebel)

সংক্ষিপ্ত জীবনী—(দক্ষিণ জার্মানীর থুরিঙ্গিয়াতে ১৭৮২ সনে জন্ম। পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। মাত্র নয় মাস বয়সে মাতৃহারা শিশু স্বাভাবিকভাবেই অন্তরমুখী হয়ে উঠলেন। প্রকৃতিই ছিল তাঁর একমাত্র বন্ধু। প্রকৃতির সাহচর্যেই তিনি অন্তর-প্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির ঐক্যতান শুনতে পান। পরবর্তীকালে "Education of Man" গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন : প্রকৃতিব সঙ্গে পরিচয় ঘটে শৈশবেই সবচেয়ে ভাল, কারণ তখন বিশ্লেষণের বদলে অনুভূতি এবং প্রকৃতিব শাশ্বত শক্তির চেতনাই বড হয়ে ওঠে। তাই স্কুলের পডাশুনা তাঁকে খুশী কবতে পাবেনি।

১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ সন পর্যন্ত তিনি বনবিভাগে চাকরি কবেন। এ থেকেই তাঁর "প্রকৃতি-বিজ্ঞান' পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হন। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির ফলে কৃষি, জরিপ, হিসেবসংরক্ষণ প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট'এর পেস্তালোজীয় বিদ্যালয়েও শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিন বছরের শিক্ষকতা জীবনে নিজের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা অনুভব কবেন। পেস্তালোজীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব তিনি অনুভব কবেন, কিন্তু তাঁর তত্ত্বের সংহতি ও ঐক্যের অভাবও বোধ করেন। তাই পেস্তালোৎসির তত্ত্বকে পূর্ণতা দানের সংকল্প নেন। মানবমনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার চেতনা এখান থেকেই দানা বাঁধে এবং শিশুর জন্য মায়ের সহৃদয় পরিচালনাব মূল্য অনুধাবন কবেন। এখানে তিনি সৃজনী উদ্দেশ্যে কাগজ, পেষ্টবোর্ড, কাঠ প্রভৃতির ব্যবহার কবেন।)

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ফ্রয়েবল্‌ অনুধাবন কবলেন যে বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতি একই ধারাব দুই রূপ। তিনি ১৮১১ সনে আবাব গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু কবেন। সেখান থেকে আসেন বার্লিনে। এখানেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন বিকশিত হয়। Fichte দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। তাঁর অন্তবে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও মানসিক রাজ্য একই অন্তর্নিহিত সূত্রে বাঁধা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই বিশ্বচরাচরের পরমতম সত্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমাংশ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান-

দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির যুগ। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন পণ্ডিত নানা ভাষার মধ্যে ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করেন। রসায়ন শাস্ত্রে Black এবং Priestly সার্বিক ঐক্যের সন্ধান পান। দর্শনের ক্ষেত্রে Fichte, Schelling, Hegel বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক পরম সত্তার অন্বেষণ করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof Weiss-এর অধীনে ধাতুবিজ্ঞান অধ্যয়নকালে স্ফটিক গঠনের সূত্রাবলী অনুশীলনের সূত্রে ফ্রোয়েবল্ জৈব অজৈব জগতের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেনাদলে যোগ দিয়ে সৈনিক জীবনে তিনি অনুভব করেন ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং সহযোগিতার মূল্য। আরও বেশী লাভ হয় যে এই সময়েই তিনি Langethal এবং Midendorff-এর বন্ধুত্ব অর্জন করেন।

যুদ্ধের পরে স্টকহোম'এ অধ্যাপনার প্রস্তাব নাকচ করেন, তৎপরিবর্তে পাঁচটি শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপরোক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "The Universal German Institute of Education"। ক্ষুদ্র Keilhau গ্রামে নগণ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তাঁর গবেষণার যাত্রারম্ভ। শিশুর সহজাত শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশের পথ নির্দেশ করাই হলো গবেষণার লক্ষ্য।

Keilhauতে ভিন্ন প্রকৃতির আরও একটি পরীক্ষা তাঁরা প্রয়োগ করেন। ফ্রোয়েবল ও তাঁর বন্ধুরা বিয়ে করেন এবং পারিবারিক ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন এখানকার দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হলো ১৮২৬ সনে প্রকাশিত "The Education of Man"। ১৮৩০ সনে যান সুইজারল্যাণ্ডের লুসান শহরে। এখানে ধর্মযাজকদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সরকারী সহযোগিতা পান। শিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের তাঁর কাছে পাঠানো হয়। পরিশেষে Burgdoff-এ একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে শিশু শিক্ষার সূচনা হওয়া উচিত তিন বৎসর বয়সে। সুতরাং সুশিক্ষিতা মায়ের প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সচেতন হন। Keilhau-তে ফিরে Blankenburg নামক স্থানে তিনি ৩-৭ বৎসরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪০ সনে Kindergarten (K. G.) অর্থাৎ "শিশু উদ্যান" নামের উদ্ভাবন করেন। কিণ্ডারগার্টেনের জনক রূপেই তিনি আজও অবিস্মৃত।

ব্ল্যাঙ্কেনবার্গে তাঁর বিদ্যালয় হয়ে ওঠে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র। তাছাড়া নূতন শিক্ষানীতির প্রচারকরূপে তিনি মা ও শিক্ষকদের কাছে অনেক বক্তৃতাও দিতে থাকেন, পত্র-পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তদানীন্তন স্বৈরতন্ত্রী জর্মানীতে শিশুমুক্তির বাণীবাহক কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন সরকারী নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। প্রথ

কিণ্ডারগার্টেনটিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই আন্দোলন ক্রমে সারা বিশ্বের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষাতত্ত্ব রয়েছে প্রধানত:—(১) "The Education of Man", (২) "Education by Development", (৩) "The Pedagogies of the Kindergarten," এবং (৪) আত্মজীবনী (Autobiography) গ্রন্থে।

ফ্রোয়েবলীয় দর্শন:—তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে ফ্রোয়েবল চারটি উৎসের কাছে ঋণী—(১) কান্টের উত্তরকালে ভাববাদী দর্শন, (২) বিজ্ঞানের সমসাময়িক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয়, (৩) পূর্বতন শিক্ষাগুরুদেব তত্ত্ব এবং (৪) তাঁব নিজস্ব অনুভূতিপ্রবণ মন, যা দিয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশ নিরীক্ষণ করেছেন।

ফ্রোয়েবল ছিলেন Fichte-র ছাত্র। ব্রুনো, সেলিং, সিলার এবং বিশেষ করে হেগেলের তাত্ত্বিক প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। কান্টের দর্শনে বলা হয়েছিল যে এক সর্বব্যাপক আধ্যাত্মিক সত্তার শাশ্বত সর্বাত্মক নিয়মেব বাঁধনে নৈসর্গিক প্রকৃতি ও মানব মনের ঐক্য স্থাপন করে। ফ্রোয়েবল্ বিশ্বাস করেছেন যে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য বস্তু, সচেতন এবং সক্রিয় অদৃশ্য সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করি প্রকৃতির "শক্তি" রূপে, আবার অন্যভাবে অনুভব করি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রেরণাতে। তিনি বস্তুতে ও ঘটনায় প্রকাশিত, আবার মানসিক জগতেও বিরাজিত। পরম ঐকিক সত্তা বহুর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেন মাত্র। এই পূর্ণাঙ্গতাবোধই ফ্রোয়েবলীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষা চেতনা

বিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবনধারার অংশ রূপেই ফ্রোয়েবল শিক্ষাকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "The aim of education is to so unfold the life from within that the educand may feel him a part of the universal spiritual entity." সকল বস্তু ও কর্মের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পরনির্ভরতা অনুধাবন করেই ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর অন্তরকে এমনভাবে বিকশিত করা যেন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরসংযুক্ত শক্তির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অনুভব করে। এই ঐক্যতত্ত্ব থেকেই তাঁর শিক্ষানীতি উদ্ভাবিত। শিক্ষার পদ্ধতি হবে এমন যেন ইচ্ছা, অনুভূতি ও কাজের যুগপৎ পূর্ণাঙ্গ সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটে।

ঐক্যতত্ত্বের পরিপূরকরূপে তিনি আরও দুইটি তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন—(১) Law of continuity (নিরবচ্ছিন্নতা) এবং (২) Doctrine of evolutionary

growth (ক্রমবিকাশ)। ফ্রোয়েবল বিশ্বাস করেছেন যে সৃষ্টির রাজ্যেও পর্যায়ভেদ আছে। প্রতিটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি বলেছেন, "The different stages of human growth viz infancy, childhood, adolescence, youth or manhood or womanhood are not independent. The child is to be viewed in the chain of continuous growth. Complete and effective growth in a particular stage is dependent on the previous stage." সুতরাং প্রতিটি স্তরেরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ফ্রোয়েবল'এর শিক্ষাতত্ত্বে "নিরবচ্ছিন্নতা নীতি"র দুই রকম প্রয়োগ হয়েছে—(১) মানুষের শিক্ষায় বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং সকল ক্ষমতার সুসমঞ্জস উন্নতি প্রয়োজন। (২) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত ঐকিক সম্পর্কের অনুভূতিই প্রকৃত শিক্ষা। তদুপরি জ্ঞানের সঙ্গে জীবনাদর্শ এবং সামাজিক জীবনেরও ঐক্যের সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্ক অনুধাবন করাও প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।

ফ্রোয়েবল জৈব ও অজৈব প্রকৃতির বিবর্তন তত্ত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। সব কিছুর পিছনে তিনি বিশ্বাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। অসীম বিশ্বাত্মা স্বয়ম্ভু এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ক্ষেত্রে হেগেলের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর ঐক্য ছিল। এজন্য সমালোচকরা তাঁকে অদ্বৈতবাদী (Pantheist) আখ্যাও দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করে তিনি মানুষকে উর্বর জমিতে চারা গাছের সাথে তুলনা করেছেন বাহ্যিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে নয়, অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই চারাগাছের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। জৈব ও অজৈব উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্প্রকৃতিজাত বিবর্তনের মত মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিবর্তনও স্বীকার করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই বিবর্তন ঘটে সরল থেকে জটিলে। এই বিবর্তনের মধ্যে "বৈপরীত্যের মিলন ধর্মও" দেখা যায়। তিনি বলেছেন যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্তা একক বিবর্তনশীল জীবন সত্তারই নানা রূপ।

বিবর্তনের ধারায় মানুষই এসেছে সর্বশেষে। মানুষের মধ্যেই দেহ মনের সফল সামঞ্জস্য ঘটেছে; এসেছে আত্মসচেতনতা, ঘটেছে সৃষ্টির চরম বিকাশ। মানুষ কেবল কার্য-কারণ সম্পর্কের দাস নয়। সে স্বাধীন কর্মক্ষমতা, স্বাধীন বিবেক এবং স্বেচ্ছাধীন সৃজনী সত্তার অধিকারী। সুতরাং শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন

শিশুকে জানা। সহজাত প্রবণতার উপর অন্ধবিশ্বাস না রেখে আত্মপ্রয়াস এবং সৃষ্টি-শক্তির উপর বিশ্বাস রাখলে মানুষের আরও পূর্ণতা সম্ভব। এই সর্বাত্মক বিবর্তনের তত্ত্বই আধুনিক শিক্ষাচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুর স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে শিক্ষা চলবে। শিক্ষকের দেওয়া "কুইনিন শিক্ষা" ক্ষতিকর এবং অস্বাভাবিক অপচয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার ও সৃষ্টির আনন্দে ভরা স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াই হবে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। বস্তুতঃ রুশোর চেতনা ফ্রোয়েবল'এর তত্ত্বে নূতন মূল্য পেয়েছে। অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষার অর্থ নিয়ন্ত্রণবিহীন অরাজকতা নয়। বিক্ষিপ্ত কামনা কিম্বা প্রবণতার পরিপোষণ করে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি সম্ভব নয়। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশিত এবং সুগঠিত হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য :—উপরোক্ত আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে ফ্রোয়েবল-নির্ধারিত শিক্ষার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, "The aim of education is to so unfold the life from within that the educand may feel him a part of the universal spiritual entity." অন্যত্র তিনি বলেছেন, "The aim of education is to unfold and develop the human mind that h can feel his unity with the interrelated creative power of the universe." ফ্রোয়েবল আরও বলেছেন, "The aim of education is development of personality." বস্তুতঃ বিশ্বসত্তার অংশরূপে আত্মসত্তার অনুভব এবং পূর্ণতম স্বাভাবিক বিকাশের পথে আত্মসত্তার পূর্ণতাই ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষাব উদ্দেশ্য। প্রাণহীন অনুকরণে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাব পথেই সম্ভব। প্রতিটি মানুষই স্বকীয়তাসম্পন্ন। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে বৃহত্তব মানবতার রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান। সকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত সাফল্য।

অথচ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিসাধনা অসম্ভব। ব্যষ্টি ও সমষ্টি পবস্পর-বিরোধী নয়, বরং সমাজেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব। ফ্রোয়েবল বলেছেন, "Education is possible in co-operation with other men. Every social institution is a background for complete development of the individual; it supplies his urge and materials." সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রকৃতি ও পরিমাণই ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মানদণ্ড। সমাজের মধ্যে

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার পথেই চরিত্রের শক্তি সৃষ্টি হয়। সহযোগিতার এই মূল্যবোধই স্কুল সম্বন্ধে ফ্রোয়েবল'এর মতামত নির্দ্ধারণ করেছে।

পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, বিদ্যালয় :— ফ্রোয়েবল'এর শিক্ষাচেতনায় দুইটি চিন্তাধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—(১) তিনি বলেছেন সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করাই শিক্ষার কাজ। (২) তিনি বিশ্বাস করেছেন ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যবিধায়ক শক্তি চলমান, জীবন্ত এবং ক্রমবিকাশমান। সুতরাং শিশুর ক্রমবিকাশের ধারানুযায়ীই তার শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝা নয়; স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতিই শিক্ষা। ফ্রোয়েবল বলেছেন, "God does not mend from outside, does not manage infiltration. He unfolds everything according to the internal law of development." শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটবে স্বতঃস্ফূর্ত খেলার মধ্য দিয়ে। দুইটি তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, 'Self development' এবং 'Free development'। শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হবে মুক্তাঙ্গনে, বাগানে, স্কুলের আঙ্গিনায় কিম্বা স্কুল ঘরে সুচিন্তিত, সুপারকল্পিত কর্মোদ্যম। ফ্রোয়েবল'এর শিশুরা মাটি, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, তুলো প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদান দিয়ে নদীর বাঁধ, গমভাঙ্গা কল, দুর্গ কিম্বা প্রাসাদ তৈরী করেছে। বন থেকে এনেছে নানাজাতীয় প্রাণী, পাখী, পোকা ও ফুলফল। গণিতের সমস্যার সমাধান করেছে বাস্তব অনুশীলনের পন্থায়। সমবেত সংগীত, গল্প ও কাহিনী তাদের কল্পনায় নূতন জগৎ গড়েছে।

যখনই শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষায় কাজ করে তখনই সে পরীক্ষা করতে চায়; নিজের মনে বহু ছবি ও কল্পনার ভাঙ্গাগড়া করে। পরিবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। এটাই জীবনের বিধি, সুতরাং শিক্ষারও বিধি। সৃষ্টিধর্মই শিক্ষা প্রয়াসের মর্ম-কথা। তাই ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে হাতের কাজকে অসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরের কাছ থেকে কতটা গ্রহণ করলো—তাই বড় কথা নয়; শিশু কতটা সৃষ্টি করেছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই বড় কথা।

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে **প্রকৃতি পাঠ** একটি প্রধান স্থান পেয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি এবং অন্তর প্রকৃতি একসূত্রে গ্রথিত। বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনের সাহায্যে অন্তরপ্রকৃতির অনুধাবন সম্ভব। রহস্যময় প্রকৃতি ইঙ্গিতগর্ভ এবং আকর্ষণীয়। **বিজ্ঞান ও গণিত** অনুশীলনের পথেই এই রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব। প্রকৃতির রহস্যের মধ্যেই শিশু খুঁজে পাবে ধর্মের মর্মবাণী। তাই তিনি বলেছেন—"Spirit and religion are inseparable, similarly inseparable are mind and mathematics. God

is the greatest mathematician." সুতরাং "Mathematics is the greatest expression of the laws of life."

হাতের কাজের কথা আবারও বলা দরকার। K. G. পদ্ধতির 'gift'-গুলি যে ধ্যানধারণা সৃষ্টি করবে, তাই প্রকাশিত হবে হাতের কাজের মধ্যে। উভয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। Gift-গুলিকে শিশু বিভিন্ন ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে সাজায়, হাতের কাজে সে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে জিনিস সৃষ্টি করে। মাটি, বালি, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে জিনিস গড়ার মধ্য দিয়ে ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করে। কাগজ, মাদুর প্রভৃতির কাজে সৃষ্টি হয় তল (surface) সম্পর্কে ধারণা। এই কাজ শিশুর সৃজনী ক্ষমতাকে বাড়ায়; দৈহিক দক্ষতা বাড়ায়, সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে শিশু আত্মশক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে; সহযোগিতার মূল্য বোঝে। হাতের কাজ ছাড়াও বাগানের কাজ, পশু পালন, ছোট ছোট কুটির সংস্কার ও নির্মাণও কে, জি পদ্ধতির অংশ।

কে, জি, ব্যবস্থায় **অঙ্কনের** বিশেষ মূল্য স্বীকৃত। ফ্রোয়েবল বলেন, "What man can draw or do—he can understand." অঙ্কনের মাধ্যমে কেবল রেখা ও রংয়ের ধারণাই জন্মেনা, সুন্দর কল্পনার অভ্যাসও সৃষ্টি হয়। এই কারণে **নৃত্য ও ছন্দের** মূল্যও স্বীকৃত। ছন্দই ভাষা ও সংগীতের প্রাণ। ছন্দানুশীলনের ফলে সৃষ্টি হয় দৃঢ়তা, একতা, সামঞ্জস্য ও পরিমিতি বোধ এবং সৌন্দর্যপ্রীতি।

তেমনি মূল্য আছে **গল্প** বলার। এর ফলে শিশুর বুদ্ধি ও কল্পনার বিকাশ হয়। এক্ষেত্রে হিতকথার বিশেষ মূল্য আছে; আর মূল্য আছে "কাহিনীর",—কারণ এই সূত্রে অতীতকে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ইতিহাস পড়ার পটভূমি তৈরী হয়। ফ্রোয়েবলের মতে দেহের পক্ষে যেমন খেলা, মনের পক্ষে তেমনি গল্পের দরকার। বিশুদ্ধ স্নান যেমন দেহের শান্তি দেয়, গল্পকথা তেমনি মনকে সুখী করে, বুদ্ধির শক্তিকে নাড়া দেয়, কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগায়।

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতির মূল সুর '**খেলা**'। তিনি বলেছেন শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষা খেলার মাধ্যমেই সম্ভব। খেলাকে কিভাবে শিক্ষার বাহন করা যায়, তাও তিনি দেখিয়েছেন। শিক্ষা ও খেলা সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "Play is the greatest side of the child's expression." শৈশবই হলো অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ও আবেগের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক বহিঃপ্রকাশের সময়। এই বহিঃপ্রকাশই খেলা। খেলাই শৈশবের নিষ্কলুষ কাজ। খেলার মধ্যেই শিশু পায় আনন্দ, মুক্তি, সুখ, মনের শান্তি এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। যে শিশু পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় নিমগ্ন থাকতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে দৃঢ়

প্রত্যয়সম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের কিম্বা অপরের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ হয়। "The future man can be best found through the spontaneous play of the child. Childhood play is the young plant which will create the big tree of the future."

Gifts and Occupations:—ফ্রোয়েবলীর পদ্ধতিতে 'gift' এবং 'occupation' শব্দ দু'টি ভাস্বর হয়ে আছে।

রূপকের ব্যবহার ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুর জগৎই রূপকময়। লাঠিকে ঘোড়া কিম্বা এক টুকরো কাঠকে ট্রেন হিসেবে সে সহজেই কল্পনা করে নেয়। তাই ফ্রোয়েবল রূপকময় খেলার জিনিস (plaything) উদ্ভাবন করেছেন। শিশুর বয়সানুপাতে ছয়টি মৌলিক সত্যের রূপক হিসেবে তিনি ছয়টি 'gift' দিয়েছেন।

Gift-গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য Ball. কথাটির ভাবার্থ করা হয়েছে b-all—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতীক। মনস্তত্ত্বের বিচারে অবশ্য নানা রঙ ও আকারের বল নিয়ে খেলার মধ্য দিয়ে আকার, গঠন, রঙ, বস্তু, গতি, দিক এবং মাংসপেশীর সঞ্চালন শিক্ষা সম্ভব। শিশু কর্মচঞ্চলও হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় gift হলো ঘনবস্তু (cube) এবং সমবর্তুল (cylinder)। এগুলি বলের বিপরীত ধর্মী। বল গড়িয়ে চলে, এগুলি স্থিতিশীল; বলের নির্দিষ্ট তল (surface) নেই, ঘনবস্তুর ছয়টি তল। কিন্তু উভয়ই কঠিন ও নিরেট। বল এবং ঘনবস্তুর সমন্বয় করলেই পাওয়া যায় cylinder; সুতরাং বৈপরীত্যের মিলন তত্ত্ব এখানে বাস্তব সত্য। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য gift হলো একটি কাঠের ঘনক্ষেত্রকে বিভক্ত করে আটটি ক্ষুদ্র ঘনক্ষেত্র। এগুলি দিয়ে শিশু সিঁড়ি, শিকল, দরজা, সিংহাসন প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরী করতে পারে। অবশিষ্ট ৩টি gift-ও ঘনক্ষেত্রের বিভিন্ন রকম বিভাগ—যা থেকে শিশুর আকার, গঠন প্রভৃতি ধারণা জন্মে। এই ধারণা থেকেই জ্যামিতি কিম্বা ত্রিকোণমিতি পড়ার পটভূমি তৈরী হয়। ফ্রোয়েবল পরিশেষে আরও তিনটি gift যোগ করেছিলেন। এগুলির উদ্দেশ্যে ছিল তল (surface), রেখা (line) এবং বিন্দু (point) সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি।

ফ্রোয়েবল-এর সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাতটি মায়ের গান (mother song), এবং ৫০টি খেলার গান। গানের সঙ্গে থাকে ছবি, গানের সাথে চলে নাচ কিম্বা অন্য কোন ভাবে দেহ সঞ্চালন। গানগুলিও শিশুর বয়সানুপাতে ক্রমিকরূপে শ্রেণীবদ্ধ। মায়ের গানের বিষয়বস্তু মা'র ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা। শিশু এবং

গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচবে। খেলার গানগুলির সঙ্গে দেহ সঞ্চালন করবে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে খেলার গানগুলিকে চারটি অংশে ভাগ করা চলে—(ক) একেবারে শৈশবের (babihood) যোগ্য। (খ) একটু বড়দের জন্য। (গ) গ্রহ নক্ষত্ররাজি সম্বন্ধীয়। (এই গানে শিশুর কৌতূহল এবং বিশ্বচরাচরের ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়।) (ঘ) বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শিশুদের জন্য নীতিবোধের গান।

খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার কথা ফ্রোয়েবল বলেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন খেলার কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, "Without rational, conscious guidance childish activity degenerates into aimless play instead of preparing for those tasks of life for which it is destined... Human education needs a guide ... ...without law-abiding guidance there is no free development."

ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষানীতিতে শৈশব ও বাল্যের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। রুশো কৈশোর জীবনকেই শিক্ষার সময় রূপে মনে করেছিলেন। ফ্রোয়েবল্ কিন্তু বাল্যজীবনকেই শিক্ষা তথা তথ্য আহরণের সময় রূপে নির্দেশ করেছেন। এই সময়ের শিক্ষা সচেতন উদ্দেশ্যমূলক। শিল্পকর্মের প্রতি ঝোঁক এ সময়ে স্বাভাবিক। শৈশবে শিশু গৃহস্থালীর কাজ অনুকরণ করে, বাল্যে অনুকরণ করে পরিবেশ জীবনের কর্মসাধনা। সুতরাং এ সময়ের কাজগুলি প্রধানতঃ সমস্যামূলক, অনেকটা 'প্রোজেক্ট'-এর মত। সর্বোপরি বাল্যকালকেই তিনি instruction-এর স্তর বলে মনে করেছেন। এই মতাদর্শ অনুসারেই তিনি পাঠক্রম কল্পনা করেছেন। হার্বার্টের মত তিনিও মনে করেছেন যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই তাঁর পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে ধর্মচেতনা ও ধর্মীয় শিক্ষা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিত, ভাষা, অঙ্কন, শিল্পকর্ম ও সৌন্দর্যানুভূতি, হাতের কাজ প্রভৃতি।

শিক্ষণ নীতির মূলমন্ত্ররূপে তিনি বলেছেন যে শিশুর প্রকৃতি জানতে হবে, তাকেই কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্বীকার করতে হবে; শিক্ষার উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সেই অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে; শিক্ষা হবে ব্যবহারিক এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর; শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি স্থির হবে শিশুর বয়স এবং ক্রমবিকাশের স্তরানুসারে; শিশুর মধ্যে নীতিবোধ জাগাতে হবে; সর্বোপরি চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি গড়তে হবে। এই সব কিছু প্রয়াসকে একই প্রচেষ্টার বিচিত্র দিক রূপেই মনে করতে হবে। তিনি বলেছেন, "Law of unity is the fundamental law of education."

বিদ্যালয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ফ্রোয়েবল-এর ধারণাও তার মূল শিক্ষানীতি

থেকেই উদ্ভূত। শিশুর আত্মপ্রকাশে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ নিশ্চিত করাই কে, জি-র উদ্দেশ্য। এখানে মৌল লক্ষ্য থাকবে শিশুর আগ্রহ এবং কর্ম-প্রবণতা। অবশ্য সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে জ্ঞানের দিকেও সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জীবনে সত্য, নিষ্ঠা, উদ্যোগ এবং দায়িত্ববোধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হবে। বিশ্বচরাচরে ঐক্যনীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ও হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যের প্রতীক। প্রতিটি শিশুই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা অনুসরণ করবে। কিন্তু সম-আগ্রহের ভিত্তিতে সংগঠিত সব কাজ হবে সকলের সহযোগিতায় এবং পুরস্কার ভোগ করবে যৌথভাবে। বিদ্যালয় হবে ক্ষুদ্রতর পৃথিবীর তথা সমাজের সংস্করণ। এখানে জীবনযাপনের 'প্রস্তুতি' হবে না, হবে প্রকৃত জীবনযাপন। Instruction-কেই এখানে শিক্ষারূপে গণ্য করা হবে না। Instruction রূপান্তরিত হবে কাজ ও বাস্তব ফলশ্রুতিতে। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা সুগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শ রূপায়িত হবে।

শৃঙ্খলা ও শিক্ষকের দায়িত্বঃ—রুশোর মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে শিশু স্বাভাবিক ভাবেই সৎ, পবিত্র এবং ভাল। যদি শিশুপ্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়া হয়, সময়মত যত্ন ও শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে সহজাত শক্তির সার্থক বিকাশ ঘটে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা আবিষ্কার এবং প্রতিবন্ধক অপসারণ। শিশু চরিত্রের ভালমন্দের জন্য মা'ই বহুলাংশে দায়ী। সুতরাং সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিতা মা এবং শিক্ষিকা।

সহজেই অনুমেয় যে দৈহিক শাস্তি ফ্রোয়েবলীয় নীতির বিরোধী। স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই বলে একথাও সত্য নয় যে শিক্ষক শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক, এবং ঢেউ গণনাকারী। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিকাশই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সুতরাং মুক্তির প্রয়োজন আছে। অপরদিকে সুগঠিত চরিত্রই শিক্ষার লক্ষ্য। চরিত্র গঠনের জন্য সুপরিচালনার প্রয়োজন আছে। সুতরাং শিক্ষকের ভূমিকা নেতিবাচক নয়। তিনি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যথাসময়ে শিক্ষনীয় বিষয় তার কাছে উপস্থাপন করবেন, শিশুর আগ্রহকে ব্যবহার করবেন, সমাজবোধ ও আদর্শ জাগাবেন। শিশুর জ্ঞানক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচ করা এবং প্রকৃত মুক্তি ও আলোকের পথে পরিচালনা করাই শিক্ষকের দায়িত্ব।

ফ্রোয়েবল ও অন্যান্য শিক্ষাগুরুঃ—রুশো শিশুকেই শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে দাঁড় করিয়েছিলেন। ফ্রোয়েবল তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং তদুপরি বলেছেন যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশই শিক্ষা। অন্তর্লীন ক্ষমতার প্রয়োগেই শিশু শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু

রুশোর বাণী ছিল মূলতঃ ধ্বংসাত্মক, ফ্রোয়েবল মূলতঃ গঠনাত্মক। রুশোর কাছে সমাজ ছিল পাপের উৎস; পেস্তালোৎসি ও ফ্রোয়েবলের কাছে পরিবার ও সমাজই শিক্ষার স্বাভাবিক এবং অতি প্রয়োজনীয় পটভূমি। মা'ই শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা। শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য সমাজের সঙ্গে শিশুর ফলপ্রসূ সংযোগ সাধন। রুশোর কাছে শিক্ষক ছিলেন দর্শকতুল্য। কিন্তু পেস্তালোৎসির মত ফ্রোয়েবলও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তিনি কেবল শিশুকে রক্ষাই করবেন না, প্রত্যাশিত পথে তাকে পরিচালনাও করবেন। ডিউইর মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে শিক্ষা একটি সামাজিক কাজ এবং বিদ্যালয় হলো সামাজিক জীবনের কেন্দ্র।

পেস্তালোৎসিও ফ্রোয়েবলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। পেস্তালোৎসি শিক্ষাকে মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক করবার ইচ্ছে করে থাকলেও করতে পারেননি। ফ্রোয়েবল তাঁর ভুল সংশোধন করেছেন এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মন্তেসরির সাফল্য আরও উল্লেখযোগ্য। হার্বার্ট ও ফ্রোয়েবল— উভয়েই সর্বাত্মক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু হার্বার্টের মতামত বুদ্ধি বাহিত, ফ্রোয়েবলের অভিমত অনুভূতি-বাহিত। হার্বার্টের গুরুত্ব শিক্ষকের উপর। ফ্রোয়েবলের গুরুত্ব শিশু তার ক্রমবিকাশ, শিক্ষনীয় বিষয় এবং স্নেহশীল নির্দেশনার উপর। ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরির অভিমত অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয়েই শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, দৈহিক ও মানসিক ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নির্বাচন, হাতের কাজ ও খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া ফ্রোয়েবল তাঁর 'gift'—গুলিকে রহস্যাবৃত করে ধর্মভাবের সংগে সংযুক্ত করেছেন। মন্তেসরি কল্পনার তেমন মূল্য দেননি, কিন্তু ফ্রোয়েবল শিশুর কল্পনাকে যথার্থ মূল্য দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিক শিক্ষাবিদরা ফ্রোয়েবলকেই বেশী সমর্থন করেন।

(ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরির পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোচনা মন্তেসরির শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনার শেষে উপস্থাপিত হবে)।

অবদানের মূল্যায়ন :—ফ্রোয়েবল'এর সমালোচনা অনেকেই করেছেন। রক্ষণশীল ধার্মিকরা তাঁর ধর্ম-চেতনার বিরোধিতা করেছেন, কারণ তিনি জড়জগতে প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যাত্মবাদের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐকিকতা সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণ সাধারণের কাছে প্রায় অবোধগম্য। তিনি বহুলাংশে রহস্যবাদী ছিলেন। বিশেষ করে 'gifts' এবং গণিত শাস্ত্রকে রহস্যাবৃত করে তিনি এগুলিতে প্রায় ঐন্দ্রজালিক মহিমা আরোপ

করেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে '১' হলো ঈশ্বরের প্রতীক, '২' এর অর্থ পৃথিবী ও মানবাত্মা, '৩' এর অর্থ পৃথিবী ও মানব মনের সমন্বয় ইত্যাদি। এইসব প্রতীক কৌতূহল জাগাতে পারে, কিন্তু শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য নয়।

সমালোচকরা বলেছেন খেলা ও হাতের কাজের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যকে ছোট করে দেখেছেন। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার প্রেরণায় তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ছোট করে ফেলেছেন। শিক্ষা যে আয়াসসাধ্য এ কথাই তাঁর মনে হয়নি। তাঁর 'gift' গুলির মর্মার্থ রহস্যাবৃত। আবার ছবিগুলিও শিল্পসৌকর্যপূর্ণ কিম্বা আকর্ষনীয় নয়। তাঁর গান ও ছড়া হয় একেবারে ছেলেমানুষি নচেৎ ধর্মীয় কুইনিন। এর ভাষা ও ভাবও শিশুর বোধগম্য নয়। তা ছাড়া খেলা ও কল্পনাকেও তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন বলে কেউ কেউ বলেন। জন ডিউইও বলেছেন যে ফ্রোয়েবলের প্রতীকধর্মীতা বহু ক্ষেত্রে যুক্তি ধর্মীতাকেও পরাস্ত করেছে। তা ছাডা অন্ধ ভক্তদের হাতে 'Gift' ও 'Occupation' এর ব্যবহার বহুলাংশে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলেও ফ্রোয়েবল-তত্ত্বই সমালোচিত হয়েছে।

এইসব সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত কিম্বা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে আধুনিক শিক্ষাধারার সমস্ত ভাল দিকই কিণ্ডারগার্টেন প্রথার মধ্যে রয়েছে। এই সূত্রে আধুনিক শিক্ষাচেতনায় ফ্রোয়েবলের স্থায়ী অবদানও স্মরণীয়। ফ্রোয়েবল দুইটি মৌলিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছিলেন—(১) শিশুরা সৃষ্টিধর্মী, (২) শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজাত প্রবণতাকে অবলম্বন করেই শিক্ষণ প্রচেষ্টা পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিসত্তাকে প্রসারিত করে নিখিল বিশ্বসত্তার অনুভূতি, এবং পরমসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক গড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মহিমা প্রতিষ্ঠা। এর ফলে শিশুর ব্যক্তিজীবন এক দিকে প্রকৃতি এবং অপরদিকে মানব সমাজের অংশ হয়ে উঠবে।

ফ্রোয়েবল'এব চিন্তায় তিনটি মৌলিক ধারার প্রভাব ঘটেছিল—(১) শিশুর প্রতি অসীম ভালবাসা, (২) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক ঐক্য, (৩) আত্মানুভূতির প্রয়াস। এই মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু নূতন ভাবনার অবতারণা করেছেন, যেমন—(ক) Idea of evolution and evolutionary growth, (খ) Idea of continuity। তিনি বলেছেন—"The most important thing is to grow in continuous ascending series in accordance with eternal self grounded and self developing laws." (গ) Idea of development—Self development এবং Free development, (ঘ) Law of 'unity":

অংশরূপে Law of contraries, (৬) Importance of educative process. তিনি বলেছেন যে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির ধারায় ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ঈশ্বরের দেওয়া পুঁজি ব্যবহার করে শিশু নিজে যা তৈরী হবে তাই হবে তার প্রকৃত পরিচয়।

এই সব মৌলিক তত্ত্বকে অবলম্বন করে শিক্ষার **বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি যে সব নীতি প্রস্তাব করে গেছেন,** সেগুলির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—(১) শিশুশিক্ষার ভিত্তি হবে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও কর্মোদ্যম। শিক্ষার ধারা হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (২) শিশুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক আগ্রহের ভিত্তিতেই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। (৩) বিবর্তনের ধারা নিরবচ্ছিন্ন। প্রতিটি পর্যায়ের সাফল্য পরবর্তী পর্যায়ের সাফল্যকে নিশ্চিত করে। সুতরাং প্রতিটি পর্যায়ের সুশিক্ষাই সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের গ্যারান্টি। (৪) জ্ঞানেব কোন স্বকীয় (intrinsic) মূল্য নেই, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিব ঐক্য সাধনের সাফল্যেই জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য। (৫) অন্তরের শক্তিতে স্বচালিত আত্মপ্রকাশই সৃষ্টিশীলতার গুণে মণ্ডিত। (৬) আত্মবিকাশমূলক শিক্ষায় শৈশব ও বাল্যের মূল্য সীমাহীন। ক্রমবিকাশই হবে এই শিক্ষার প্রকৃত ধারা। (৭) সক্রিয়তাই হবে শিক্ষাধারাব পদ্ধতি। সক্রিয়তার মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি ঘটে, নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বজগৎ ও অন্তরজগতের সমন্বয় ঘটে। শৈশব ও বাল্যের ক্রীড়ামূলক সক্রিয়তাই শিক্ষার সর্বোত্তম পন্থা। (৮) হাতের কাজের মাধ্যমেই শিশুর দেহ, মন, বুদ্ধি ও নীতিবোধের সমন্বয় ঘটে। (৯) খেলা ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও সামাজিক নির্দেশনার সফল সমন্বয় সম্ভব। (১০) শিশুর সমাজীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতর সমাজজীবনে বাস্তব জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সমাজ শিক্ষা সম্ভব। (১১) সুস্থ মাতৃত্বের উপরেই মানব-কল্যাণ নির্ভরশীল। সুতরাং সুমাতৃত্বের শিক্ষা প্রয়োজন। মা ছাড়াও শিশুব শিক্ষাধারায় শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বমণ্ডিত।

ফ্রোয়েবল কেবল তত্ত্ববাগীশ ছিলেন না, তত্ত্বকে ব্যবহারে রূপান্তর করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাঁর তত্ত্ব এবং প্রয়োগপদ্ধতি দিয়ে তিনি উত্তরকালের শিক্ষাক্ষেত্রে জল-সেচন করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য উত্তরকালের শিক্ষাচেতনা ও শিক্ষণ প্রয়াসের ভিত্তি রূপে গৃহীত হয়েছে। শিশুর সহজাত ক্ষমতা তিনি স্বীকার করেছিলেন, শিশুকে জেনেছিলেন এবং ভালবেসেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস অপরকেও প্রবুদ্ধ করেছে। বিদ্যালয়কে তিনি দেখেছিলেন এমন একটি জায়গা রূপে যেখানে শিশু বাস্তব জীবন-

যাত্রার মধ্য দিয়ে সত্য, ন্যায়, উদ্যোগ, ও দায়িত্ববোধ শিখবে এবং স্বাধীন ব্যক্তি গঠন করবে। বিদ্যালয় সমাজে শিক্ষা ও জীবন যাত্রা হবে সমার্থক। ফ্রোয়েবলে এই চেতনা উত্তরকালে ডিউইর তত্ত্বে পূর্ণতা পেয়েছে।

স্ট্যানলি হল, জন ডিউই প্রমুখ উত্তরসাধক ফ্রোয়েবল'এর শিক্ষাতত্ত্ব দিয়ে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। আধুনিক শিশুশিক্ষা 'কিণ্ডারগার্টেন" পদ্ধতি থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। যদিও কে, জি'র মাধ্যমে ফ্রোয়েবল মূলতঃ প্রাকবিদ্যালয় শিশুদের কথাই বলেছেন, তবুও তাঁর অনেক নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য। কিণ্ডারগার্টেনের জনপ্রিয়তাই ফ্রোয়েবল'এর অমর অবদানের সাক্ষ্য।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯—১৯৪৮)

পাশ্চাত্য দুনিয়ার কয়েকজন ভাববাদী দার্শনিকের পাশাপাশি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাদী-অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকের কথা বলা বোধহয় শ্রেয়। সময়ের বিচারে তিনি মন্তেসরি, ডিউই কিম্বা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, কিন্তু স্পেন্সার থেকে অর্ধ-শতাব্দী পরে। হার্বার্ট বা ফ্রোয়েবল-এর অধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী তত্ত্ব আলোচনার সঙ্গেই আমরা গান্ধীজীর কথা আলোচনা করতে চাই।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:—(জন্ম গুজরাটের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সনে। পেশায় আইনজীবী ; দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলনেই প্রথম খ্যাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতেই কর্মক্ষেত্র। অহিংস সত্যাগ্রহই তাঁর সংগ্রামী অস্ত্র। এই অস্ত্র ছিল তাঁর দার্শনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। চম্পারণ সত্যাগ্রহ অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। খাদি এবং হরিজন আন্দোলনের নেতা। ১৯৩৭ সনে "হরিজন" পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব, যা বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব বলে খ্যাত।)

গান্ধীজীর দর্শন চেতনা:—গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল অহিংসার পদ্ধতিতে শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, অসমতাহীন সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে অসমতা আসে শোষণ থেকে শোষণ থেকেই জন্ম হয় হিংসার, প্রবঞ্চনার, নীতিহীনতা এবং ক্ষয়িষ্ণুতার। এদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে দরকার হৃদয়শুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, সত্য ও মানবতাকে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ বলে জানা যায়। গান্ধীজী তাই জেনেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শও এই সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল।

গান্ধীজীর মতে স্বরাজ অর্থ সর্বোদয়, অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র সর্বোদয় পরিকল্পনার অংশরূপেই তিনি কর্মকেন্দ্রিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনি

শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। তাঁর তত্ত্বে মূল আদর্শ হলো—শিশুব দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সত্তার যুগপৎ উন্নতি। মানুষের নিজের মধ্যেকার সংঘাত জয় করার পথেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরাই সৃষ্টি করতে পারেন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ। সুতরাং ভবিষ্যতের সুন্দর সমাজের জন্য দরকার অহিংসা, ত্যাগ, সহযোগিতা এবং আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত নাগরিক। বুনিয়াদী শিক্ষা এই রকম মানুষ তৈরীর শিক্ষা। এই শিক্ষা হবে জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, সামাজিক মূল্যসম্পন্ন উৎপাদনী কাজের মধ্য দিয়ে। হাতে কলমে প্রত্যেকের আবশ্যিক কাজের ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রমশক্তির ব্যবধান ঘুচবে, কায়িক শ্রমেব উপর শ্রদ্ধা জাগবে, শোষণের পথরোধ করবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক কাজেব থাকবে সৃজনী-মূল্য এবং সামাজিক উপযোগিতামূল্য। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ফলে সামাজিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। "উৎপাদনী কাজ" শিক্ষার ক্ষেত্রেও হবে উৎপাদনী।

গান্ধীজী কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গণশিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্মশক্তির প্রকাশ। সাক্ষরতাই সব নয়, শিক্ষার সূচনা মাত্র। জ্ঞানের শুকনো বোঝার মূল্য নেই, অভিজ্ঞতা এবং নিরীক্ষার মূল্য আছে। সুতরাং স্কুল হবে কাজ, গবেষণা ও আবিষ্কারের জায়গা। স্কুলের কাজের মধ্য দিয়েই আসবে সামাজিক দায়িত্ব এবং নাগরিকতা বোধ। শিক্ষা চলবে জাতির ভাবমানসের সাথে সঙ্গতি রেখে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। উদ্দেশ্য হবে হৃদয় শুদ্ধি, চরিত্র গঠন, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জন। এ শিক্ষা হবে আধ্যাত্মিক মুক্তিব শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা।

সুতরাং আদর্শের দিক থেকে বুনিয়াদী পরিকল্পনা ভাববাদী। এব আদর্শ অনেকটা অধ্যাত্মবাদী, দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতাবাদী, ব্যবস্থাপনা ব্যবহারবাদী (প্র্যাগমাটিক)—কারণ পাঠক্রমের মূল কথা হলো অভিজ্ঞতা ও কাজ, যৌথ জীবন ও সহযোগিতা। উৎপাদনী কাজের সংস্পর্শেই বিকশিত হবে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক জীবন এবং মানবিক আবেগ। সর্বোপরি পদ্ধতির দিক থেকে রয়েছে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা। আনন্দ ও কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্ব তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। এই অভিজ্ঞতা ট্রান্সভাল'এ "টলস্টয় ফার্ম" থেকে সবরমতি এবং ওয়ার্ধা আশ্রম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর তত্ত্বে অনেক ত্রুটি আছে। তবুও এই তত্ত্ব ভারতের শিক্ষাচেতনার এক নিজস্ব সাক্ষ্য। তা ছাড়া চিরাচরিত শিক্ষাপ্রণালীর বদলে এই পদ্ধতিতে আছে অভিনবত্ব।

উপরোক্ত মুখবন্ধের পটভূমিতে গান্ধীতত্ত্বের মূল নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

(১) সুসংবদ্ধ ও সঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়তা করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। গান্ধীজী বলেছেন, "I hold that true education of the intellect can only come through a proper exercise and training of the bodily organs. But unless the development of the mind and body goes hand in hand with a corresponding awakening of the soul, the former alone would prove to be a poor lop-sided affair. By spiritual training I mean education of the heart." মানুষ কেবল বুদ্ধির পিণ্ড নয়, জড়দেহী নয়, কেবল হৃদয় কিম্বা আত্মাও নয়। গান্ধীজী চেয়েছেন সুন্দর সুঠাম দেহ, স্থির অথচ প্রাণবন্ত বুদ্ধি—যে বুদ্ধি কেবল পুঁথির সীমানায়ই বাঁধা থাকবে না, জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত হবে।

(২) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো আত্মনির্ভরতা এবং কায়িক শ্রমের মর্যাদাবোধ। শ্রমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিশু কখনও জীবনযুদ্ধে অসহায় বোধ করবে না। ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী। তাদের কাছে পুঁথিগত তাত্ত্বিক জ্ঞানের মূল্যকে গান্ধীজী প্রশ্ন করেছেন, "It is a crime to make education merely literary and to unfit boys and girls for manual work in afterlife." সুতরাং শিক্ষা হবে **হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে**। গান্ধীজী বলেন, "I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training."

(৩) এ শিক্ষা হবে **আর্থিক বিচারে স্বয়ংনির্ভর**। মাদক বিক্রীর আয় কিংবা ভূমি রাজস্বের উপর শিক্ষা নির্ভরশীল হবে না। অন্য যে কোন বৃত্তিই শিক্ষা দেওয়া হোক, সুতোকাটা হবে বাধ্যতামূলক। চরকা ও তকলির তিনটি উদ্দেশ্য—(ক) শিক্ষাকে স্বয়ংনির্ভর করা; (খ) শিশুর দেহ ও মনের শিক্ষা দেওয়া এবং (গ) বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জনের প্রস্তুতি করা। তাছাড়া ছাত্ররাও হয়ে উঠবে আত্মনির্ভর এবং স্বাধীন। শিক্ষার জন্য পূর্ণ কিংবা আংশিক ব্যয়ের যোগান দেবে শিক্ষার্থীরা। কায়িক শ্রমের দুটি উদ্দেশ্য—(ক) এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে এবং (খ) শিশুরাও একটা বৃত্তি আয়ত্ত করবে।

(৪) **ধর্ম ও শিক্ষার কোন বিরোধ থাকবে না**। গান্ধীজী বলেন, "To me religion means Truth and Ahimsa or rather truth alone, because truth includes Ahimsa, Ahimsa being the necessary and

ndispensable means for its discovery." সকল ধর্মের সার কথা পড়ানো রকার, যেন এই অভ্যাস ও অনুভূতি জন্মে যে সকলের ধর্মবিশ্বাসের মৌল বস্তু অভিন্ন। আপন সংস্কৃতি রক্ষা করার অর্থ যেমন অপরের সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, র্মের ক্ষেত্রে তেমনি নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করার অর্থ অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়।

(৫) **শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন**; অর্থাৎ হৃদয়ের শিক্ষা। শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রায় গান্ধীজী তাই ব্রহ্মচারীর আদর্শকেই অনুসরণ করার কথা বলেছেন। অনুকরণপ্রিয়তার বদলে উদ্যোগ, গঠনমূলক স্বকীয় চিন্তা ও কাজ এবং নিয়মানুবর্তী জীবনের পথেই চরিত্র গঠন সম্ভব। "The highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility." সেবাধর্মই শিক্ষার উদ্দেশ্য। "What better book can there be than the book of humanity?……If we are to reach real peace in this world and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with children." বস্তুতঃ গ্রহণীয় ও বর্জনীয়র মধ্যে বাছাই করার শিক্ষা খুবই দরকার।

(৬) গান্ধীজীর মতে **স্বরাজ ছাড়া জাতীয় শিক্ষা কল্পনা করা যায় না।** ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে ঐ শিক্ষার ফলে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। "New education must be rooted in the culture and life of the people…The choice must be clearly and finally made between National and Foreign education." সুতরাং নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচলিত শিক্ষা, প্রচলিত পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ বাতিল করা দরকার। জীবনের বাস্তব পরিবেশের ভিত্তিতে, উৎপাদনী শিল্পের মাধ্যমে পেশী, মস্তিষ্ক ও আত্মার যুগপৎ শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, ভারতীয় বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে নূতন পাঠ্য বই রচনা করা দরকার। এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা এবং হিংসাশ্রয়ীতা বর্জন।

"Our system of education leads to the development of the mind, body and soul. The ordinary system cared only for the mind." নব শিক্ষা সম্বন্ধে এই চেতনা সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় গ্রামীণ-জীবনের চরম দুর্দশার অভিজ্ঞতা থেকে। প্রচলিত উচ্চশিক্ষার ব্যর্থতা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "Present education is slavish imitation. Higher education makes

us foreigners in our country. ·Primary education is of no use in after life…There is neither originality nor naturalness about it ….English knowing Indians have not hesitated to strike terror into the people." প্রচলিত কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাকেও গান্ধীজী ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করেছেন।

(৭) **জাতীয় শিক্ষার নবরূপায়ণ** সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্য :—

(ক) শিক্ষার ভিত্তি প্রোথিত থাকবে গ্রামীণ জীবনে। মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, মানসিক গণিত, সুতো কাটার বাস্তব শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত হবে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম। বৃত্তি শিক্ষাই হবে জ্ঞান সাধনার বাহন। শারীর শিক্ষা, সৃজনশীল বুদ্ধিচর্চা, এবং হৃদয়ের শিক্ষার সমন্বয়েই হবে মানুষ সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। "A proper and harmonious combination of all the three is required for the making of the whole man and constitutes the true economics of education." সমগ্র শিক্ষাপ্রয়াসটি হবে স্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মিতব্যয়ী অথচ আশু ফলদায়ক।

(খ) অবৈতনিক ভিত্তিতে শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্ণ করার পরেই বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন উঠতে পারে, নচেৎ বাধ্যতামূলক আইনও ব্যর্থ হতে বাধ্য: "I shall resist compulsory education till every effort at voluntary primary education has been honestly made and failed."

(গ) নূতন শিক্ষায় বয়স্কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেবল অক্ষরজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, নবসাক্ষরদের "নিরক্ষতায় প্রত্যাবর্তন" সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। সুতরাং গ্রামীণ ভূগোল, গ্রামীণ ইতিহাস, গ্রামীণ গণিতের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। নারী-শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার সত্ত্বেও ক্ষমতা ও দায়িত্বের পার্থক্য আছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রম ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় হরিজনদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকবে।

(ঘ) শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ প্রণোদিত। স্বনির্ভর নূতন শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে গ্রামীণ শিল্প। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে হতে হবে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মী।

(ঙ) উচ্চশিক্ষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। "I would revolutionise college education and relate it to national necessity."

(চ) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজীর বদলে বিশেষ স্থান দখল করে

ভারতের জাতীয় ভাষা। যে ভাষায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধর্মীয়, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা আছে এবং যে ভাষা শেখা সহজসাধ্য, তেমন ভাষাই হবে জাতীয় ভাষা। এই বিচারে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দীই হবে জাতীয় ভাষা। তারপরেই বাংলা ভাষার স্থান। প্রতিটি সংস্কৃতিবান ভারতীয়র পক্ষেই নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, হিন্দীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সমগ্র ভারতেই উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে ঐ সব ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে সারা বিশ্বের ভাষা হিসেবে ইংরেজীর বিশেষ মূল্য আছে। তাই গান্ধীজী বলেছেন, "I would therefore accord it a place as a second, optional language, not in the school, but in the university course,—that can only be for a select few, not for the millions"। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান সকল ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেবেন।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ

যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা করবো আরও পরে, তবুও গান্ধীজীর কথা আলোচনার সূত্রেই গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঁরা উভয়েই বলেছেন যে স্কুল, কলেজ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানই জ্ঞানক্ষেত্রের শেষ কথা নয়, সূচনামাত্র। শিক্ষা হলো জীবনধারার অংশ, জীবনব্যাপীই যার সাধনা। শিক্ষা কেবল জ্ঞানসঞ্চয় নয়, অন্তরীণ আত্মার কাছে এর আবেদন। আধ্যাত্মবিকাশই এর ফলশ্রুতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশ। এক্ষেত্রে উভয়েরই দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক। তবে গান্ধীজী যেখানে জোর দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মার অন্তরীণ শক্তির বহিঃপ্রকাশের উপর, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন বিশ্ব-অস্তিত্বের সঙ্গে সুসমঞ্জস জীবনের কথা। উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে সারল্য ও স্বাভাবিকতাকে বড় করে দেখেছেন। গান্ধীজী ছিলেন শিক্ষায় ব্যয়াধিক্যের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যেন প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিক্ষার মৃত্যু না ঘটে। শিক্ষার স্বাভাবিকতা যেন ছাত্রদের জীবনেও আনে সারল্য।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই মানবজীবন তথা শিক্ষা-জীবনের পরম কাম্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু পার্থিব জীবনকে কেউ অস্বীকার করেন নি। উৎপাদনমূলক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যেই গান্ধীজীর মতাদর্শ রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনপরিবেশের বিচ্ছেদই ইংরেজী

শিক্ষার সবচেয়ে ক্ষতিকর পরিণতি। এই বিচ্ছেদের অবসান করতে হবে। জাতী. শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হবে জীবন, মন ও সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়। শিক্ষার সঙ্গে সমাজসংস্কৃতির ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। প্রকৃ. সংস্কৃতির অর্থ মনের সুস্থ লালন। হৃদয়ের সংস্কৃতি মানুষ ও মানুষের, তথা শিক্ষক ও ছাত্রের হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রকৃত সংস্কৃতি নিখিল বিশ্বে. সম্পদ। তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলনের বাণী প্রচার করেছেন।

সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে উভয়েই শ্রদ্ধাসহকারে ভারতের প্রাচ সংস্কৃতির দিকে তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছেন অতীতের ফসল ৫. জাতি বিনষ্ট করে, বর্তমানে তার জন্য লেখা থাকে হাহাকার। নতুন শস্য বপন করবার জন্য বীজের প্রয়োজনেও ভিক্ষা নিতে হয় অপরের কাছে। অবশ্য ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ছিল মতান্তর। গান্ধীজী ধর্মীয় শিক্ষা এবং প্রার্থনাকে শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পড়ানো- মধ্য দিয়ে ধর্মচেতনা দেওয়া যায় না। সম্যক জীবনের সত্যানুভূতিই প্রকৃত ধর্মচেতনা। পরমের সঙ্গে সম্পর্কের চেতনাই প্রকৃত ধর্মবোধ। এই ধর্মবোধ আসতে পারে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সার্থক সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিক্ষায় মাতৃভাষার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য ইংরেজী ভাষাব মূল্যকে কেউই অস্বীকার করেন নি। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ইংরেজীকে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। উভয়েই শিক্ষাকে যুগপৎ জীবনেব বিকাশ এবং জীবনপ্রস্তুতি রূপে জ্ঞান করেছেন। উভয়েই সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের কথা বলেছেন। তবে গান্ধীজী যেখানে সামাজিক উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্বাচনেব কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আনন্দদায়ক সুকুমার শিল্পের কথা বলেছেন, কাবণ আনন্দময় সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব।

গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যের বাণীকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। অহিংসা ও প্রেমেব পথেই হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব। তাঁর পথ কর্মযোগের পথ। রবীন্দ্রনাথ আনন্দ ও পূর্ণতার বাণী প্রচার করেছেন। উভয়েই ছিলেন স্বাধীন চিন্তার উপাসক। দেশের মুক্তিই ছিল উভয়ের কাম্য। তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বও মুক্তিতত্ত্বেরই নামান্তর। তাই গান্ধীজী প্রচার করেছেন সর্বোদয়ের বাণী, আর রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন বিশ্বমৈত্রীর গান।

শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির বিবর্তনে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথও করেছেন বিশ্বভাণ্ডারে কিছু সংযোগ। স্বাধীনতার আগে আমরা উভয়ের শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে অনেক মাতামাতি

হয়েছি। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রকল্পকে জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পের ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার তত্ত্বকাণ্ডে গান্ধীজীর দার্শনিক আবেগের থেকে যে আমরা বিচ্যুত হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাণহীন কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। এর ব্যর্থতা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ হয় কি। বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে গুরুদেবের বাণী আজ কেঁদে ফিরছে।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে যতই ব্যর্থ হতে আমরা দিয়ে থাকি না কেন, আমাদের আবেগ জগতে এঁদের স্থান আছে, যেমন আছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চেতনার।

প্রাচীন ভারতে পরা ও অপরাবিদ্যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রটি। মানবতা, আত্মা, প্রকৃতি এবং সামাজিক কার্যকুশলতাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা চেতনার ভিত্তি। সেই চেতনাই বিবেকানন্দ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নূতনভাবে দেখা দিয়েছে। নবজাগরণ আন্দোলনের সময় থেকে একদিকে ঐতিহ্যবাদ এবং অন্যদিকে বর্তমানবাদের টানা পোড়েনের মধ্যে আমাদের শিক্ষা জগতেও এসেছে নানা ভাবসংঘাত। অতীত ভারতের গৌরবকে নূতনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - "Education is the manifestation of the perfection already in man." কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বর্গীয় জ্যোতি (Light Divine) অনেকের মধ্যেই থাকে আবৃত। সেই রশ্মিকে অনাবৃত করে জীবনকে উদ্ভাসিত করাই শিক্ষার কাজ। এইভাবে আলোকিত জীবন "প্রকৃত মনুষ্যত্বের জীবন"। "The end of all education, all training, should be man making." এই মানুষ গড়ার জন্য দরকার স্বাধ্যায় এবং একাগ্রতা। বিবেকানন্দ বলেছেন, "There is only one method by which to attain knowledge, that which is called concentration." তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার স্পর্শ আবার নূতন করে দিতে হবে—"The idea of the true Shraddha must be brought back once more to us." বিবেকানন্দের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক চেতনা তীব্রভাবে ছিল বলেই শিক্ষার সূত্রে তিনি বলেছেন, "Let the foundation be spirit; the middle, spirit; the culmination, spirit."

গান্ধীজীও বলেছেন যে আত্মশক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, সত্য ও মানবতাকে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ বলে জানা যায়। প্রকৃত শিক্ষা হলো মানুষের দৈহিক, মানসিক

ও অধ্যাত্ম শক্তিকে প্রকাশ করে "যথার্থ মনুষ্যত্ব" সৃষ্টি করা। (By spiritual training I mean education of the heart.)

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 'শান্তং, শিবং, অদ্বৈতং'এর কথা। তিনি বলেছেন ভগবানের প্রকাশ ঘটে মানব সমাজে, মানব আত্মায়। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য মানব জীবনের পরিপূর্ণতা। মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ সহজ নয়। মনুষ্যত্ব লাভই মানব জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং "মানুষ" করে তোলাই শিক্ষা। এ জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তি ও অবস্থার সঙ্গে আত্মচেষ্টার মিলন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বুদ্ধির শিক্ষার সাথে "হৃদয়ের শিক্ষার" প্রশ্নটিও বড় হয়েছে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের শিক্ষাগুরুরা "মনুষ্যত্বের মূল্যকে" শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় করে দেখেছেন। অথচ আধুনিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং বণিকি অর্থনীতির পেষণে মনুষ্যত্বেরই আজ অপমৃত্যু ঘটছে। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকৃত সংকট হলো "মনুষ্যত্বের সংকট"। মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তৃত বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও সহজ কথায় বলা চলে যে সুস্থ এবং সমাজসচেতন মানবিক মূল্যবোধই মনুষ্যত্বের পরিচয়। ভারতের শিক্ষাগুরুদের দিকদর্শনকে সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু প্রয়োগ করে কিভাবে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারবো—তাই আজ বড় কথা।

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) : ১৮২০—১৯০৩

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—(ইংলণ্ডের এক নন্-কনফর্মিস্ট পরিবারে হার্বার্ট স্পেন্সারের জন্ম ১৮২০ সনে। তাঁর বাবা উইলিয়াম জর্জ স্পেন্সার ছিলেন স্কুল শিক্ষক। নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাই ছেলেবেলায় হার্বার্ট স্পেন্সার বেশ স্বাধীন জীবন যাপন করেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অনেক কিছুর "কারণ" সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। বাল্যজীবনে তিনি শরীর চর্চার অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বলতে পেরেছিলেন, "Be a boy as long as you can." বস্তুতঃ শারীর-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত যেমন তত্ত্বগত, তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ।

স্পেন্সারের জীবনের প্রথম যুগটি ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসে সমাজসংঘাত ও ভাবসংঘাতের যুগ। দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলন, Corn Law আন্দোলন, Temperence আন্দোলন, চার্টিস্ট আন্দোলন, ধর্মসহিষ্ণুতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুরাতন ও নূতনের সংঘাত হচ্ছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জীবনের বহু

অসংলগ্নতা ধরা পড়েছিল। শিক্ষাজীবনের অসামঞ্জস্যই স্পেন্সারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তিনি নতুন যুগের শিক্ষাতত্ত্ব ঘোষণা করেন।

সমসাময়িক ইংলণ্ডের প্রাজ্ঞ সমাজে স্পেন্সারের বিশেষ আসন ছিল। নানা তত্ত্বালোচনায় এবং বিতর্ক বিতণ্ডায় তিনি অংশ নিয়েছেন। বহুবিধ রচনার মধ্যে তাঁর "Social Statics" গ্রন্থে তিনি নিজস্ব জীবন দর্শন আলোচনাস্থলে সকলের সমস্বাধীনতার নীতি সমর্থন করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'Liberty of each limited by the like liberty of all." "National Education" প্রবন্ধে সমসাময়িক ইংলণ্ডের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং পাঠপদ্ধতির নিন্দা করে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির দাবি করেছেন। ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর "Principles of Psychology"। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "Education : Intellectual, Moral and Physical" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনে। এই পুস্তকে সংকলিত চারটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। Intellectual Education সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ সনে, Moral Education সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ সনে, এবং বাকিটি ১৮৫৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বহু অসঙ্গতি সত্ত্বেও হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষানীতি ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরেজ শিক্ষাবিদগণের রচিত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে আজও বোধহয় জন লক'এর 'Thoughts' ছাড়া স্পেন্সারের 'Education'ই সর্বাধিক পঠিত পুস্তক। তাছাড়া স্পেন্সারের আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অনস্বীকার্য।

স্পেন্সারের যুগ :—ফরাসী বিপ্লবের পরে সমগ্র ইউরোপে যখন আত্মানুসন্ধান চলছিল, সেই ভাবতরঙ্গের মধ্যে স্পেন্সারের জন্ম। জার্মানীকে কেন্দ্র করে তখন চলেছে ভাববাদের জয়যাত্রা। ইংলণ্ডে চলেছে উপযোগিতাবাদের (Utilitarianism) অভিযান। পার্লামেণ্টারী সংস্কার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজরা তখন মুখর। ইংলণ্ডের চিন্তাকে রূপ দিচ্ছেন James Mill এবং Jeremy Bentham. সেখানে তখন উদারনৈতিকতার (Liberalism) নব রূপায়ণ ঘটছে। ইংলণ্ড তখন শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্যিক শক্তি। শিল্পবিপ্লব বহুদূর এগিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে "Survival of the fittest" নীতি অন্তরে গেঁথে গিয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা তদানীন্তন ইংলণ্ডের মর্মবাণী। প্রয়োগ বিজ্ঞানের সুফল ইংলণ্ডে এনেছে ঐশ্বর্য। জীবনের সব ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ড পেয়েছে আত্মবিশ্বাস। এই বিজ্ঞান-নির্ভর জীবন বাসনাকেই রূপ দিয়েছেন হার্বার্ট স্পেন্সার। জগৎকে ভিত্তি

বিজ্ঞানময় দেখেছেন। এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ পুরানো শিক্ষার বদলে তিনি নূতন শিক্ষা দাবি করেছেন। তাঁর দর্শনের ভিত্তি হয়েছিল দুটি—সংগ্রামশীল ব্যক্তি-সত্তা এবং বিজ্ঞাননির্ভর জীবন।

স্পেন্সারের শিক্ষাচেতনার পটভূমি:—শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চেতনা কোমেনিয়াসের যুগ থেকেই ধীরে অগ্রসর হয়ে আসছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান চেতনা অভূতপূর্ব গুরুত্ব অর্জন করে। এই অগ্রগতি ঘটে দুইটি ধারায়—(১) পাঠক্রমে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার আন্দোলন এবং (২) আরোহী (Inductive) পদ্ধতি অবলম্বনের আন্দোলন। প্রকৃতিপাঠ বস্তুপাঠের কথা অনেকেই বলে আস-ছিলেন। পেস্তালোৎসির শিষ্যরা বলছিলেন বস্তুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আন্দোলনের সমস্যা হলো পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন।

স্বভাবতই এই আন্দোলন পুরাতন ক্লাসিক্যাল শিক্ষা তথা নিয়মানুবর্তী শিক্ষার (disciplinary education) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপ। ইংলণ্ডে এই আন্দোলন দানা বাঁধে পাঠক্রম বদলের দাবিতে। দাবি করা হলো এমন জ্ঞানের যা শিশুকে বুদ্ধি ও সাফল্য নিয়ে বাস্তব জীবনের কর্তব্য করবার দক্ষতা দেবে। উদার শিক্ষার (Libera' Education) নূতন সংজ্ঞা দিয়ে বলা হলো যে, শিক্ষার মাধ্যমে যে জীবনের জন্য প্রস্তুতি চলবে, সে জীবনের সর্বোত্তম সংস্কৃতিই তৎকালীন উদার শিক্ষা। উনবিংশ শতাব্দীর "উদার শিক্ষায়" প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের স্থান অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ডে এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার।

স্পেন্সারের শিক্ষাতত্ত্ব:—স্পেন্সারের তত্ত্বে বিজ্ঞান প্রবণতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো "পাঠ্য বিষয়" নির্বাচনের সমস্যা। তাঁর মতে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের প্রস্তুতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। (Preparation for complete living . সকল পরিবেশে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে আচরণগত দক্ষতাই প্রধান কাম্য। এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচন প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ জীবন-প্রস্তুতির শিক্ষা বলতে বুঝায়—(১) সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের উন্নতির জন্য জ্ঞান আহরণ এবং (২ এই জ্ঞানকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন। "Education : what knowledg is of most worth" প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের তালিকা দিয়েছেন স্পেন্সার।

স্পেন্সার বলেছেন যে সভ্য সমাজে এতদিন শিশুর "প্রয়োজনীয়" জ্ঞানের বদলে সামাজিক ফ্যাশান অনুসারে শিক্ষার সাহায্যে মনের সজ্জা রচনা করা হয়েছে অতীতকাল থেকেই সামাজিক চাহিদার কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনকে আহুতি দেওয়া

হয়েছে। জ্ঞানের প্রকৃত মূল্যের চেয়েও সমাজগ্রাহ্যতার নিরিখেই শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচিত হয়েছে। এই ক্ষতিকর চিরাচরিত প্রথার অবসান প্রয়োজন।

স্পেন্সারের মতে প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু মূল্য আছে। পাঠক্রমে গ্রহণের জন্য বাছাইয়ের কালে আনুপাতিক গুরুত্বই মূল বিবেচ্য। কিন্তু মূল্যের মানদণ্ড কি? শিক্ষার্থীর উপকার, সুখ ও ভালত্বের মানদণ্ডেই 'বিষয়ের' মূল্য নিরূপিত হবে। পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের সহায়ক জ্ঞানই প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

উপযোগিতার বিচারে, আনুপাতিক গুরুত্ব অনুসারে স্পেন্সার জ্ঞানজগৎকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন—(১) প্রত্যক্ষভাবে আত্মরক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, আচরণ ও অভ্যাস। আপদ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা, শারীরবৃত্তের শিক্ষা, রোগ প্রতিরোধের শিক্ষা এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির শিক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর জ্ঞানই সবচেয়ে আগে দরকার।

(২) পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার সহায়ক জ্ঞান ও আচরণই দ্বিতীয় প্রয়োজন। পণ্যোৎপাদন, যোগান ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এজন্য প্রয়োজন গণিত, যন্ত্রবিদ্যা, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, সমাজবিদ্যা অর্থাৎ ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত শাস্ত্রাদি। সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে 'business of life'ই দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা।

(৩) আনুপাতিক বিচারে তৃতীয় প্রয়োজনীয় স্থান পেয়েছে সন্তান পালনের শিক্ষা। উপযুক্ত লালনের উপরই শিশুর জীবন ও মৃত্যু, নৈতিক উন্নতি কিম্বা আধোগতি নির্ভর করে। সুতরাং অন্ধভাবে ভাগ্য কিম্বা যুক্তিহীন রীতিতে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঠাকুরমা অথবা অশিক্ষিতা ধাত্রীর উপর সন্তান পালনের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিশু লালনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা চাই। এ ক্ষেত্রে শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, এবং জীবন যাত্রার মৌলিক বিধি শিক্ষার উপযোগিতা আছে।

(৪) আপেক্ষিক গুরুত্বে চতুর্থ স্থান পেয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান, অর্থাৎ নাগরিক দায়দায়িত্বের জ্ঞান। এই ক্ষেত্রে প্রচলিত বিষয়বস্তুকে স্পেন্সার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বয়স্কদের জন্য রচিত অসংগঠিত তথ্যাদি শিশুদের কাছে মূল্যহীন। (প্রচলিত ইতিহাসের ত্রুটি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "That which constitutes history, properly so called, is in great part omitted from works on the subject." তদানীন্তন ইতিহাস পাঠকে তিনি বলেছেন যুদ্ধ ও নরহত্যার কাহিনী—"History is a tissue of homicide and perfidy stitched together by dates." প্রয়োজনীয় জ্ঞান হলো প্রাকৃতিক

সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান—অর্থাৎ ধর্মীয় সংস্থা, শ্রেণী সম্পর্ক, সামাজিক বিধিবিধান, স্ত্রীপুরুষ তথা পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, শিল্পসংগঠন, ক্রয়-বিক্রয় ও মুদ্রা ব্যবস্থা, শিল্পকলা, স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত সাহিত্য ও কাব্যে প্রকাশিত সৌন্দর্যবোধ এবং প্রচলিত নীতিবোধ সম্পর্কিত জ্ঞান। চতুর্থ প্রয়োজনের জন্য তিনি দাবি করেছেন তুলনামূলক এবং বিবরণ ধর্মী সমাজতত্ত্ব।

(৫) সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্থান পেয়েছে রুচি, অনুভূতি ও সৌন্দর্যপ্রীতি যা জীবনের অবসরকালকে পূর্ণ করে, অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতির শিক্ষা। তিনি বলেছেন, যেহেতু এগুলি জীবনের অবসরকালের কর্ম, সেহেতু এগুলি অবসর-কালীন শিক্ষা। "As they occupy the leisure part of life, so should they occupy the leisure part of education." সাহিত্য এবং কলার মাধ্যমে বিশ্রামকালকে আনন্দে পূর্ণ করার কথা তিনি বলেছেন, "We yield to none in the value we attach to aesthetic culture and its pleasures." শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদন আরও সহজসাধ্য হলে অবসরের সুযোগ বাড়বে এবং সৌন্দর্যপ্রীতি স্বাভাবিকভাবেই মনের অধিকতর স্থান দখল করবে। কিন্তু সৌন্দর্য সাধনা একান্তই আবশ্যিক কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে এসবের যত মূল্যই থাক, জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় এ সবের মূল্য অবশ্যই অল্প, "However important it may be, it must yield precedence to those kinds of culture which bear directly upon daily duties." স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলাকে সভ্যতার প্রস্ফুটিত ফুল অবশ্যই বলা চলে, কিন্তু পুষ্পশোভার স্বার্থে গাছটিকে অবজ্ঞা করা চলে না। সৌন্দর্যসাধনা অবশ্যই শিক্ষার অঙ্গ, এবং শিক্ষার সূচনা থেকেই পাঠক্রমে এর স্থান থাকবে, কিন্তু "প্রয়োজনীয় জ্ঞানের" তুলনায় এর স্থান নীচে (subsidiary)।

বিজ্ঞান ও কলার তুলনামূলক বিচারের সময় স্পেন্সার অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি-পূর্ণ বক্তব্য বলেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান চর্চাতেই শিল্পী তৈরী হয়না একথা সত্য. কিন্তু সহজাত ক্ষমতাও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া বিকশিত হয় না। শিল্পেরও বিজ্ঞান আছে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ছাড়া শিল্পী তৈরী হয় না তাছাড়া বিজ্ঞানের মর্মবাণীই সামঞ্জস্যের বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দলয়ের বাণী, সুতরাং বিজ্ঞানই কাব্যময়, (Science is itself poetic)।

নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা (faculty) চর্চার মধ্য দিয়েই "ক্ষমতা" বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মানসিক শৃঙ্খলার (mental discipline) শিক্ষাই ক্ষমতা

বিকাশের শিক্ষা। এমন কি স্মৃতিশক্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। (Sciences afford far wider fields for the exercise of memory)। ভাষার তুলনায়ও বিজ্ঞান শিক্ষা মূল্যবান। বিজ্ঞান এনে দেয় আবেগের বদলে বিচার বিশ্লেষণ, সত্যানুসন্ধান, অভীক্ষানিরীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস। এই অভ্যাসের মূল্য অসীম। তাই আচরণ ও মনোভাবের "অভ্যাস" (habit) গঠনের জন্যও বিজ্ঞান পড়াকে স্পেন্সার অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নৈতিক শৃঙ্খলার জন্যও বিজ্ঞান চর্চা প্রয়োজন। বিজ্ঞান সাধনা এনে দেয় স্বকীয়তা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সত্যানুসন্ধিৎসা। এইগুলিই নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। প্রকৃত ধর্মসাধনা এবং বিজ্ঞান সাধনাও পরস্পর বিরোধী নয়, বরং বিজ্ঞানচর্চা ধর্মচর্চার সহায়ক ('Science disciplines for religious culture')। বিজ্ঞান ও ধর্ম যমজ বোন। পরস্পরের বিচ্ছেদ উভয়েরই অপমৃত্যু ডেকে আনে। প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধি এবং বিশ্বচরাচরের ঐকিক শক্তির অন্বেষণই বিজ্ঞানের কাজ। ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্যও এই। বিজ্ঞান সাধনার পথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে কার্যরত পরমশক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে। "Devotion to science is a tacit worship of the cause"। বিজ্ঞান চর্চা করে আমরা বুঝতে পারি যে মানবজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে একটি ব্রহ্মশক্তি—জীবনে, চিন্তায়, প্রকৃতিতে যিনি আত্মপ্রকাশিত।

বস্তুতঃ স্পেন্সারের সমগ্র চেতনাই বিজ্ঞানময়। তিনি তাই পরিশেষে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেছেন, "What knowledge is of most worth? The uniform reply is Science: for direct self preservation—Science; for indirect self preservation—science; for the discharge of parental function—Science; for citizenship—Science, for enjoyment of art—Science, for the purpose of intellectual, moral and religious discipline—Science.

While these haughty sisters sink into merited neglect, Science proclaimed as highest alike in worth and beauty will reign supreme."

বুদ্ধির শিক্ষা (Intellectual Education) :—শিক্ষাতত্ত্বের 'intellectual' অংশে স্পেন্সার শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যবস্থা সমকালীন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। পুরাতন ও নূতন শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য

নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিশুর ইচ্ছাকে দমন করাই ছিল পুরাতন কালের শিক্ষা। শিশুর মধ্যে নূতন ক্ষমতার সঞ্চার করে শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী শিশুকে গঠন করা যায়—এই ছিল ধারণা। নূতন চেতনায় একথা স্বীকৃত যে শিশুর বহু ইচ্ছাই পূরণ করা সম্ভব, এবং শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রবণতা ভীতিজনক কিম্বা অবোধ্য নয়। "স্বাধীন বাণিজ্যের" যুগে শিশুর স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিও স্বাভাবিক। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানও "চাহিদা-যোগানের" নিয়ম মেনে চলে। অতীতের মহামান্য পোপ থেকে শিক্ষক পর্যন্ত - সবাই ছিলেন "authority"। কিন্তু আজকের নূতনত্ব হলো "স্বাধীনতার নূতনত্ব'। আজকের মতবিরোধ মতৈক্যের পূর্বাভাস। মানুষের চেতনা তিনটি স্তর অতিক্রম করে চলে—অজ্ঞানতার ফলে মতৈক্য, জিজ্ঞাসার ফলে মতানৈক্য, এবং পরিশেষে সজ্ঞানতা থেকে মতৈক্য। দ্বিতীয়টির মাধ্যমেই তৃতীয়টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে স্পেন্সার এই নূতনত্বেরই অন্যতম উপাসক ছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মন—উভয়েরই যথার্থ বিকাশের জন্য সমমূল্য আরোপ করার কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে—"The first requisite to success in life is to be a good animal" এখানে দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত সময়ের আগে তত্ত্বমূলক শিক্ষার তিনি বিরোধী। তাই বলেছেন, "One secret in education is to know how wisely to lose time'. অন্যত্র তিনি বলেছেন, "Be a boy as long as you can."

মুখস্থবিদ্যার মত বিমূর্ত সংজ্ঞা ও সূত্রের ভিত্তিতে (teaching by rules) শিক্ষাকেও স্পেন্সার নিন্দা করেছেন। আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে আয়ত্ত জ্ঞানই কেবল স্থায়ী ও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। অনায়াসলব্ধ জ্ঞান কখনও স্থায়িত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। ("Easy come easy go, applies also to knowledge"). শিশুকে অভিজ্ঞতা ও তথ্যে সমৃদ্ধ করার আগে বিমূর্ত সূত্রাবলম্বী পাঠ নিতান্তই ক্ষতিকর। সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হলো বীক্ষণ ক্ষমতার অনুশীলন। বীক্ষণের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়-শক্তি মার্জিত হয়। কবি ও দার্শনিকদের মূল পুঁজি হলো বীক্ষণ (observation). মনের উপর সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ ছাপই মৌলিক প্রয়োজন। এই সূত্রেই স্পেন্সার মূর্তপাঠের দাবি করেছেন। মূর্তপাঠের যৌক্তিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে স্পেন্সার ব্যক্তির শিক্ষাধারা এবং মানবজাতির শিক্ষাধারার মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন। মানবজাতি যেমন বীক্ষণ এবং মূর্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিমূর্ত সূত্র এবং বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছে, শিশুর শিক্ষাধারাও হবে তেমনি মূর্ত থেকে বিমূর্ততার পানে।

শিশুর শিক্ষা হবে আনন্দময় এবং আগ্রহ উদ্দীপক। মন যখন পড়তে প্রস্তুত, তখন শিক্ষা পীড়নমূলক হয় না। তাই স্পেন্সার ছড়া, রূপকথা (Rhymes & Fairy Tales) এবং খেলার সমর্থন করেছেন। শিশুর বিচিত্রতাধর্মী মনের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শ্রান্তির আভাস মাত্রই পড়া শেষ করা চাই। বিদ্যালয়ের নির্ঘণ্টে যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন রয়েছে গান, প্রমোদ ও ভ্রমণের। বিদ্যালয়ে 'তপস্বী' (ascetic) জীবনের যুগ শেষ হয়েছে। শিশুদের আনন্দ ও সুখের মানদণ্ডেই বিদ্যালয়ের সাফল্য বিচার করতে হবে।

স্পেন্সারের শিক্ষানীতির মূল সূত্রগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এইভাবে উপস্থিত করা চলে —(ক) প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রাথমিক সূচনা হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মাধ্যমে, (খ) প্রথম পাঠ হবে মৌখিক ও বীক্ষণমূলক, গ) মূর্ত ও তথ্যাবলম্বী পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানের সাধারণীকরণ ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করা প্রয়োজন, (ঘ) প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যমের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি হবে আকর্ষণীয়, এবং (ঙ) আত্মশিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা। পেস্তালোৎসির প্রদর্শিত পথে স্পেন্সার বলেছেন যে শিশুর শিক্ষাক্রম ও পদ্ধতি হবে মনোবিবর্তনের অনুষঙ্গী। বয়স্কদের প্রয়োজনীয় সাহায্যও হওয়া উচিত সুবিবেচিত।

পেস্তালোৎসির মূল নীতিকে স্পেন্সার স্বীকার করেছেন। কিন্তু পেস্তালোৎসীয় পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত করে স্পেন্সার নিম্নানুরূপভাবে উপস্থিত করেছেন :—

(১) শিক্ষার গতি হবে সরল থেকে জটিলে, ঐক্য থেকে বৈচিত্র্যে। শিশু বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমন্বয় করতে শিখবে। "Object Lesson" এর বিষয়বস্তুকে আরও প্রসারিত করার কথা বলে স্পেন্সার অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স পর্যন্ত বস্তুপাঠের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা এবং প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান করা সম্পর্কে যে সহজাত প্রবণতা শিশুদের থাকে, তাকেই উৎসাহিত করে জীবনবিধি শিক্ষার দিকে শিশুদের তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

(২) মনের স্বাভাবিক গতি "নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টের দিকে। সুতরাং নির্দিষ্ট বস্তু কিম্বা বিষয় থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনির্দিষ্টতার দিকে যাত্রা করা দরকার। পাঠ শুরু হবে মূর্ত জ্ঞানে। ক্রমে অগ্রগতি হবে বিমূর্তের দিকে। শিক্ষার অগ্রগতি হবে "পরীক্ষামূলক জ্ঞান থেকে যুক্তিমূলক" জ্ঞানের দিকে।

(৩) মানবজাতির শিক্ষা-ধারার পূর্বানুবৃত্তি ঘটবে ব্যক্তি শিশুর শিক্ষাধারায়। "The education of the child must accord both in mode and arr—

angement with the education of mankind considered historically. In other words, the genesis of knowledge in the individual, must follow the same course as the genesis of knowledge in the race." অথবা "As each child's mind stands in the same relationship to phenomena, they can be accessible to it only through the same route. Hence, in deciding for the right method of education, an enquiry into the method of civilisation will help to guide us. (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই বক্তব্যই Culture Epoch তত্ত্বের মূলকথা।)

(৪) শিশুর শিক্ষা হবে আত্মপ্রকাশের আনন্দময় ধারা। আত্মশিক্ষাই হবে মূল কথা। "They should be told as little as possible, and induced to discover as much as possible." শিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে মনের উপর পরিচ্ছন্ন ও স্থায়ী ছাপ রাখা। অর্জিত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা এবং সংহতি দরকার। জ্ঞানকে ক্ষমতায় রূপান্তর করা প্রয়োজন।

(৫) পাঠক্রম তৈরী করতে হবে এমনভাবে যেন ক্রমিক পর্যায়ে শিশুর উন্নতি হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তব হবে মানসিক শক্তিগুলির বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিজ চেষ্টায় পাওয়া নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে সাহস, ধৈর্য, আগ্রহ ও অধ্যবসায়। বিদ্যালয় জীবন শেষ হলেও শিক্ষা প্রচেষ্টার অবসান হবে না।

পরিশেষে মন্তব্য করা প্রয়োজন যে আত্মজীবনীতে স্পেন্সার বলেছেন, "Under biological aspect, education may be considered as a process of perfecting the structure of the organism and making it fit for the business of life." তিনি আরও বলেছেন যে প্রতিটি পাঠ, অভিজ্ঞতা এবং বীক্ষণের ফলে কোন না কোন স্নায়ুকেন্দ্রে "molecular" পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং শিশুকে সর্বদাই সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষা :—নৈতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে স্পেন্সার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে 'ভদ্রলোক' তৈরীর জন্য বহু বৎসর যায়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব—পরিবার লালনের শিক্ষাই দেওয়া হয় না। সুতরাং "শিশু লালন পদ্ধতি" শিক্ষা ছাড়া কোন পাঠক্রমই পূর্ণাঙ্গ নয়। "The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education."

স্পেন্সার শিশুকে জন্মাবধি ভাল কিম্বা মন্দ বলে মনে করেন নি। আবার শিশুকে ইচ্ছেমত তৈরী করা যায় বলেও তিনি মনে করেন নি। অবশ্য প্রকৃতিদত্ত অসম্পূর্ণতা শিক্ষার সাহায্যে কিছুটা কমানো যায় বলে তিনি মনে করেছেন। শাসকরা ক্রটিহীন এবং শাসিতরাই দুষ্ট—এই প্রচলিত ধারণা তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে নৈতিক শিক্ষার ক্রটির উৎস পিতা ও সন্তান—উভয়েই। সুতরাং শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সংস্কারও দরকার।

যে আচরণের ফলাফল উপকারী, সেই আচরণই ভাল এবং যে আচরণের ফলাফল বেদনাদায়ক, সেই আচরণই মন্দ। শিশু পড়ে গেলে, জলন্ত বস্তু হাতে ধরলে, ফুটন্ত জল গায়ে ঢাললে যে বেদনা পায়, তা সে সহজে ভোলে না। এই বেদনার স্মৃতিই ভবিষ্যতে ঐ ধরনের কাজ থেকে তাকে বিরত করে। অর্থাৎ কর্মফলের ভিত্তিতে তার নৈতিক আচরণ গঠিত হয়। প্রকৃতির অনুশাসন হয় প্রত্যক্ষ, বেদনাদায়ক এবং অপরাধের আনুপাতিক হারে। এই শাসন থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। পূর্ণবয়স্কতা পর্যন্ত এই শাসন মনে থাকে। "The burnt child dreads the fire" কথাটিই এ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। "Dearly bought experience" অথবা "bitter experience" থেকেই মানুষ শিক্ষা লাভ করে। "Self guidance"ই হয় তখন নৈতিক শিক্ষার রূপ। সুতরাং "ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকৃতির শাসনই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থেকে শিশুকে নিবৃত্ত করাও বিধেয়। তা ছাড়া সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে শিশুর অপরাধ প্রবণতাও হ্রাস পায়। "Savageness begets savageness and gentleness begets gentleness".

সুতরাং নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সারের নীতি হলো :—(ক) শিশুকে দেবতুল্য মনে করার প্রয়োজন নেই, বরং শৈশবে অনেক বর্বরতার নিদর্শন দেখা যায়। দুষ্ট "জ্ঞান" সম্বন্ধে শিশু অজ্ঞ হলেও দুষ্ট "প্রবণতা" থেকে সে মুক্ত নয়।

(খ শিশুদের কাছে উচ্চ নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য স্থাপনও অর্থহীন এবং নৈতিক আচরণের জন্য অনবরত উদ্দীপনা সৃষ্টিও নিরর্থক। স্বাভাবিক কর্মফলের ভিত্তিতেই শিশু শেখে। কিন্তু আবেগবর্জিত নির্লিপ্ততাও অন্যায়। পিতামাতার খুশী-অখুশীও শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তবে সন্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মাত্রাবোধ থাকা দরকার।

(গ, কেবল আদেশ করাই ভাল নয়। কিন্তু আদেশ করলে দৃঢ়তার সঙ্গেই করা উচিত। আত্মশৃঙ্খলাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন মানুষ তৈরী করে। সুতরাং শিশুর মধ্যে স্বকীয়তা বোধ দেখলেই চিন্তার কিছু নেই।

(ঘ) মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষাদানের কাজটি জটিল। এই কাজের ভাল-মন্দর বিচার হবে ফলাফলের দ্বারা।

সুতরাং দেখা যায় যে স্পেন্সার স্বাভাবিক ফলাফলের শাসনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, কারণ, এই শাসন অবধারিত, আনুপাতিক, কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী এবং ন্যায়-সঙ্গত। কিন্তু এই মতবাদ চ্যালেঞ্জ করা চলে, কারণ সবক্ষেত্রেই অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি আসে না, প্রকৃতির শাসন সর্বদা আনুপাতিকও নয়। কার্যকারণ সম্পর্কিত জ্ঞানের বদলে ভাগ্যের উপরই নির্ভরতা বাড়ে। তা ছাড়া প্রকৃতির শাসন নিষ্কলুষ ন্যায়ের শাসন নয়। নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। স্পেন্সার অবশ্য দৈনন্দিন শাসন বিধিও রচনা করেছেন। বস্তুতঃ শৈশবে কিঞ্চিৎ স্বৈরশাসন দরকার বলে তিনি মনে করেন।

দৈহিক শিক্ষা :—ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য দেহ ও মনের যুগপৎ শিক্ষাই দরকার। শরীর গঠনের জন্য অতিভোজন ও স্বল্পভোজন উভয়ই খারাপ। খাদ্যের ব্যাপারে সন্ন্যাসীপণাও ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ-সমৃদ্ধ আমিষ অথবা নিরামিষ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন। খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্যও প্রয়োজন।

শীত ও গ্রীষ্মের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও গুণের পোশাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মুক্ত বায়ু, খেলা ও আনন্দ। স্পেন্সার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে ছেলেদের ক্ষেত্রে শরীর চর্চা স্বীকার করেও অনেকে মেয়েদের শরীর চর্চার বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত দুর্বলতাকে কৃত্রিম নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আরও বাড়িয়ে তোলা অন্যায়। সুতরাং "For girls, as well as boys, the sportive activities to which the instincts impel, are essential to bodily welfare. Whoever forbids them, forbids the divinely appointed means to Physical development."

স্পেন্সার অতিরিক্ত মানসিক শ্রমেরও বিরোধিতা করেছেন। বেশী পড়াশোনাও অনেক সময় ক্ষতিকর। "Over education during youth is equally bad with over education during childhood"। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম দেহগঠনকে বাধা দেয়, স্নায়ু ও পেশীর দুর্বলতার ফলে মস্তিষ্কেরই ক্ষতি করে। 'Growth' এবং 'Development' কথা দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। একটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্বের ফলে আর একটির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অতিশিক্ষা স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ। তাই মুখস্থ পদ্ধতিতে অতি-আয়োজনকে নিন্দা করে তিনি বলেছেন, "Do not damage the boiler while finishing the

engine." দেহ ও মনের ভারসাম্য সম্বন্ধে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি বলেছেন, 'Nature is a strict accountant, and if you demand of her in one direction more than she is prepared to lay out, she balances the account by making a deduction elsewhere."

অবদানের মূল্যায়ন :—হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষাতত্ত্ব বহুভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁর রচনায় আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিও রয়েছে। 'Education' সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটির সাথে বিবর্তন তত্ত্বের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। জ্ঞানক্ষেত্রের আনুপাতিক মূল্য সম্বন্ধে স্পেন্সারের বক্তব্যে সত্য ও অসঙ্গতির মিশ্রণ ঘটেছে। স্পেন্সার উপযোগিতার উপরই মাত্র গুরুত্ব দিয়েছেন; কিন্তু একপেশে দৃষ্টির বদলে মানবাত্মার বিচিত্র প্রকাশের দিকেই আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। পুস্তককে তিনি নগণ্য জ্ঞান করেছেন, অথচ বাস্তব সত্য এই যে পুস্তক হলো জ্ঞান-ভাণ্ডারের অন্যতম প্রবেশ পথ। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রীক ও রোম্যানদের স্থানকে অবজ্ঞা করে তিনি নিজের অবস্থাকেই দুর্বল করেছেন। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বর্তমানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত, কিন্তু প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য আজও মুছে যায়নি।

স্পেন্সার জ্ঞানের যে আনুপাতিক মূল্য স্থির করেছেন, তাও যথার্থ নয়। প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শারীর বৃত্তের যথোচিত মূল্য স্বীকৃত হয়নি। তা ছাড়া শারীরবৃত্তের জ্ঞানই যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করবে এমন নয়। পরোক্ষ আত্মরক্ষামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেন্সার মূলতঃ উৎপাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা বলেছেন, কিন্তু ক্রেতার (consumer) পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা বলেন নি। তেমনি সন্তান পালনের শিক্ষা এবং সমাজ সংযোগের শিক্ষার ক্ষেত্রে 'mothercraft' কিম্বা শিশু মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখিত হয়নি।

অবসর বিনোদনের শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সারের অভিমত সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। Tyndall বলেছেন, "The circle of human nature is not complete without the arc of the emotions." প্রস্ফুটিত লিলি, গ্রামীণ গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, অস্তগামী সূর্য, গোলাপের লাল, নক্ষত্রখচিত আকাশ—এ সব কিছুই সৌন্দর্যানুভূতিকে উজ্জীবিত করে বিজ্ঞানের কাজকে পরিপূর্ণতা দেয়। সমসাময়িক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলও সাংস্কৃতিক শিক্ষার মূল্য স্বীকার করেছেন। স্পেন্সার কিন্তু নিজেই দাবি করেছেন যে সৌন্দর্য শিক্ষার দাবিতে তিনি কারও থেকে পিছিয়ে নেই। তাই বলেছেন, "If men are to be mere cits, mere porers over the ledgers, with no ideas beyond their trades—then indeed it is

needless to learn anything that does not directly help to replenish the till and fill the larder." তবুও বিজ্ঞানের উপর অতিগুরুত্বকে একমাত্র এই বলেই সমর্থন করা যায় যে 'সাংস্কৃতিক শিক্ষায়' নিমগ্ন সমাজকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি অতি-সোচ্চার দাবি তুলেছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা অবশ্য আছে। সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী জৈব বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে Recapitulation তত্ত্বে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ হয়েছে Culture Epoch তত্ত্বরূপে। স্পেন্সার culture epoch তত্ত্বকে গ্রহণ করে বলেছেন, "The education of the child must accord both in mode and arrangement with the education of mankind considered historically." কিন্তু এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানের মানদণ্ডেই পরিত্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ধারা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "conformity to the methods of nature." কিন্তু সমস্ত রকমের শিক্ষাই তো যুগপৎ প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম। তৃতীয়তঃ 'Punishment by natural cause' তত্ত্বও গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থতঃ বিজ্ঞান পাঠকেই তিনি মানসিক ডিসিপ্লিন, formal training, অভ্যাস গঠনের উপায় রূপে নির্দেশ করেছেন। (এ সবগুলিই ঐতিহ্যবাদী বিজ্ঞানবিরোধী চেতনার প্রতিধ্বনি।) সর্বোপরি তিনি কাব্য, সাহিত্য, কলা, নীতিবোধ, এমন কি ধর্মবোধকেও বিজ্ঞানময় দেখেছেন। পরিবেশ বীক্ষণ এবং বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই জীবনের সব সদগুণ আয়ত্ত করা যায়, এমন কথা নয়। বস্তুতঃ স্পেন্সারকে একদেশদর্শিতার বিষয়ে সমালোচনা করা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে তিনি আগুনের ছোঁয়া দিয়ে অনেকদিনের জমাট বরফ ভাঙতে সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পর্কে রাসেলও বলেছেন, "A classical education is almost entirely critical: the boy learns to avoid mistakes. Hence originality is replaced by respect for authority. Correct science is continually changing. Hence, the attitude produced by science education is likely to be more constructive than that produced by the study of the dead languages."

উপযোগিতাবাদী রূপে স্পেন্সার সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর তালিকায় বহু প্রাচীন জ্ঞানক্ষেত্র নিম্নস্থান অধিকার করেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে মনরো বলেছেন, যে জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আচরণ ও জীবনকে উন্নত করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল করে,

তাই উপযোগী। স্পেন্সার সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চাননি, বরং সংস্কৃতির নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজের ক্ষুদ্র এবং অবসরভোগী অংশের মধ্যে আবদ্ধ অপ্রয়োজনীয় aesthetic culture-এর বদলে বৃহত্তর অংশের মধ্যে "প্রয়োজনীয় কালচার" প্রসারের কথাই বলেছেন।

শিক্ষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে যে শিক্ষাকে জীবনের সাঙ্গিক রূপে মনে করার বদলে তিনি মনে করেছেন জীবনের প্রস্তুতি রূপে। এই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় "জ্ঞানের" উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বপক্ষে একথাও বলা চলে যে মানসিক শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে শিক্ষণ "পদ্ধতির" উপর যে গুরুত্ব প্রচলিত ছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'বিষয়ের' উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন ছাড়াও স্পেন্সারের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল জ্ঞান "প্রয়োগের" ক্ষমতা সম্পর্কে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য আদৌ সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া তিনি বিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দিলেও সমাজবিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দেননি। শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও স্পেন্সারের নিজস্ব অবদান সামান্য। তিনি মূলতঃ পেস্তালোৎসীয় পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যদিও সেগুলিকে সংগঠিত রূপ দিয়েছেন।

এ ছাড়া স্পেন্সারের আরও কয়েকটি ইতিবাচক অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, শরীর চর্চা ও খেলার মূল্য, উপযুক্ত পরিধেয় ও খাদ্যের প্রয়োজন, সন্তান পালনের শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে উত্তরকালের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। এই প্রভাবই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন, স্কুল টিফিন আন্দোলনে সাড়া জাগায়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তৎকালীন যুগের তুলনায় অনেক প্রগতিশীল। পেস্তালোৎসীয় পদ্ধতিকে তিনি সুসংবদ্ধ করেছেন। এমন কি একটি চমৎকার পোশাক ও শরীর চর্চার তালিকা এবং খাদ্য তালিকাও তিনি দিয়ে গেছেন। 'Problem solving'কেই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি রূপে প্রচার করে তিনি ডিউইর পূর্বসূরীর ভূমিকা পালন করেছেন।

স্পেন্সারের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকৃত হয়। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে Real Gymnasium, Oberreal Schule আন্দোলনও স্পেন্সারের পরোক্ষ প্রভাব বহন করে। প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যন্ত এই প্রভাব পড়ে। পাঠ্যপুস্তকেও নূতন মনোভাব প্রতিফলিত হয়। আতলান্টিকের অপর পাড়েও এই আন্দোলন সাড়া জাগায়। তিনি তৎকালীন যুগমানসকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। অলংকরণ ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তিনি শিক্ষার উন্নতি করেছেন।

ম্যাডাম মেরিয়া মন্তেসরি (Mm. Maria Montessori) :—১৮৭০—১৯৫২

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—ইতালীতে আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন মেরিয়া মন্তেসরি। তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিদ ; চিকিৎসকের দৃষ্টিতে প্রথমেই তিনি শিক্ষা সমস্যার প্রতি তাকিয়েছেন। একটি সরকারী মানসিক চিকিৎসার ক্লিনিকে তিনি জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই কাজে তাঁর সহায়ক হয় ১৮৪৬ সনে প্রকাশিত E. Seguin রচিত "Idiocy : its treatment by the Physiological Method"। ইন্দ্রিয় ও পেশীশক্তি অনুশীলনের সাহায্যে জড়বুদ্ধি শিশুর শিক্ষার সম্ভাবনার কথা সেগুইন বলেছিলেন। মন্তেসরি সেই অভিমতকে বাস্তব রূপ দেন। রোমের "Orthophrenic School"এর পরিচালিকা রূপে তাঁর কর্মক্ষেত্রও প্রসারিত হয়।

তিনি শিক্ষা দর্শন, ফলিত মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও জীববিদ্যা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পড়েন। উদ্ভাবিত পদ্ধতি তিনি পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি স্কুলে প্রয়োগও করেন। লোরেন ব্রিজম্যান (Lorain Bridgeman) কিম্বা হেলেন কেলারের (Hellen Keller) অভূতপূর্ব সাফল্যও তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। ক্রমে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মে যে জড়বুদ্ধি শিশুর ক্ষেত্রে যদি তাঁর পদ্ধতি সফল হয়ে থাকে, তবে স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে সফল হবে না কেন !

তাঁর সুযোগও এলো। দরিদ্র বস্তি অঞ্চলে বাসগৃহ উন্নত করবার জন্য গঠিত "The Roman Association for Good Building" লক্ষ্য করেন যে নবনির্মিত বাসগৃহ সুরক্ষার জন্য পিতামাতা উদ্যোগী হলেও তাঁদের অনুপস্থিতির সময় অশিক্ষিত শিশুরা বাড়ীর ক্ষতি করে। এই শিশুদের শিক্ষার জন্য বস্তি অঞ্চলেই গঠিত হয় "শিশু নিকেতন'। ১৯০৭ সনে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিশু নিকেতন অথবা বালমন্দির—'Cassa de Bambini'র প্রথম পরিচালিকা রূপে মন্তেসরি স্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে নূতন পর্যায়ে গবেষণা শুরু করেন। সারা বিশ্বে প্রসারিত মন্তেসরি আন্দোলন এবং মন্তেসরি পদ্ধতি এই প্রারম্ভিক সূচনারই ফলশ্রুতি।

অন্যান্য বহুবিধ সাময়িক রচনা ছাড়াও তাঁর মৌলিক অভিমতও লিপিবদ্ধ রয়েছে "The Secret of Childhood", "The Montessori Method", "The Advanced Montessori Method" প্রভৃতি গ্রন্থে। মন্তেসরির উত্তরকালেও তাঁর শিষ্যরা এই মহীয়সী মহিলার কর্মোদ্যম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আজও নিখিল বিশ্ব মন্তেসরি এসোসিয়েশনের শাখা রূপে প্রতি দেশেই রয়েছে মন্তেসরি সংঘ। মন্তেসরি

শিক্ষা শিবির আজও পরিচালিত হয়। মন্তেসরি পদ্ধতি আজ শিশু শিক্ষা, বিশেষতঃ নার্সারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রভাবে বিকলাঙ্গ এবং জড়বুদ্ধিদের সম্পর্কেও সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মে। এই পরিবেশেই মন্তেসরি তাঁর আদর্শ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের জন্য সক্রিয় সাহায্যই শিক্ষা। ("By education must be understood the active help given to the normal expression of the life of the child). এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য—(১) আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক দক্ষতা সৃষ্টি, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অনুশীলন, (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পেশীর অনুশীলন, (৪) লেখা, পড়া ও গণিতের দক্ষতা, (৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, হাতের কাজ, বাগানের কাজ এবং প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, (৬) নৈতিক শিক্ষা, এবং (৭) ধর্মীয় শিক্ষা।

অল্প কয়েকটি মূল নীতির উপর মন্তেসরির শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেখেছিলেন বিকলাঙ্গদের শিক্ষায় সরল পেশী সঞ্চালন থেকে ক্রমে জটিল পেশী সঞ্চালনের চেষ্টা সফল হয়েছিল। অন্ধদের শিক্ষায় দর্শনেন্দ্রিয়র অক্ষমতা পরিপূরণ হয়েছিল স্পর্শেন্দ্রিয়র অনুশীলনে। স্পর্শেন্দ্রিয়র প্রতি গুরুত্বের ফলে মন্তেসরি পদ্ধতিকেই কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেছেন "Touch Method." মন্তেসরি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ এবং পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে দৈহিক সক্রিয়তাই শিক্ষার মূল। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি নির্ভর। শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি ও গতি নির্ধারিত হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে। কিছুই শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

মন্তেসরির শিক্ষানীতি (Principles) :—মন্তেসরির বিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচনার বয়স ৩ বৎসর এবং শিক্ষাকাল ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তিন বৎসরেই আরম্ভ করা হয়েছে এই জন্য যে এই সময়েই শিশুর কতকগুলি স্বাভাবিক অভাব বোধ জাগে। উপযুক্ত ক্ষণে স্বপ্রচেষ্টায় এই অভাব পূরণই শিক্ষা। নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় সময় নির্ঘণ্টকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই শিক্ষা নয়। প্রতিটি শিশুই স্বকীয়তাসম্পন্ন "ব্যক্তিশিশু"। সুতরাং শিক্ষিকার দায়িত্ব যুগপৎ সহজ ও কষ্টসাধ্য।

সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই। তাঁকে হতে হবে সজাগ, সচেতন ও স্নেহপ্রবণ। শিশুর প্রকৃতিকে সুগঠিত মূর্তরূপ দেওয়াই হবে তাঁর দায়িত্ব।

মন্তেসরি নীতিতে প্রধান কথাই হলো শিশুর স্বাধীনতা। তাদের "সূঁচিবিদ্ধ প্রজাপতি" মনে করা অবৈজ্ঞানিক। তাদের আনন্দ ও খেলায় বাধা পড়লে স্বাভাবিক বিকাশই রুদ্ধ হয়। মন্তেসরি মন্তব্য করেছেন যে সাধারণতঃ আমরা শিশুদের শ্রদ্ধা করি না, আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করি। সুতরাং আমাদের আদর্শ আচরণই প্রথম দরকার, কারণ শিশুরা আমাদের অনুসরণ করে। তাছাড়া শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের উপর। শিশুর উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলে আগ্রহ সৃষ্টি করা আদৌ কষ্টকর নয়। মন্তেসরিই বলেছেন, "To keep alive that enthusiasm is the secret of real guidance and it will not prove a difficult task, provided that the attitude toward the child's acts be that of respect, calm and waiting, and provided that he be left free in his movement and his experience." বস্তুতঃ চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝায় পীড়নমূলক প্রাণহীন পুরাতন শিক্ষাকে সকল আধুনিক শিক্ষাগুরুই নিন্দা করেছেন। রুশো থেকে ডিউই—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই মূল ধ্বনি....স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কেবল দেহের স্বাধীনতা নয়, তবে দৈহিক স্বাধীনতা মানসিক মুক্তি এবং স্বনির্বাচিত কাজের সহায়ক।

আবার স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজেই অনেক কাজ করে চলে। তারা সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আগ্রহশীল, নিয়ন্ত্রিত, ভদ্র এবং সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনুশীলনের ফলে চলাফেরা হয়ে ওঠে ছন্দোময়, এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সহযোগিতার পথে তারা বন্ধুবাৎসল্য এবং সদভ্যাস আয়ত্ত করে। মন্তেসরি শিক্ষা নেতিবাচক নয়। এই পদ্ধতিতে রয়েছে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আবেগ ও ক্ষমতার ইতিবাচক নির্দেশনা। শিক্ষিকা তখনই মাত্র হস্তক্ষেপ করেন, যখন একজনের কাজ আর একজনের ক্ষতি করে। শিক্ষার অন্যান্য মূল নীতি সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন যে :—

শিশুর পরিবেশই হবে শিক্ষার ভারকেন্দ্র। স্কুলের পরিবেশকে শিশু নিজের জগৎ বলে অনুভব করবে। শিক্ষার উপকরণও হবে শিশুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বনির্ভরতা শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর মনোবিকাশের নিম্নতর স্তর থেকেই শিক্ষার সূচনা প্রয়োজন। এ সময় বুদ্ধির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের নিকট আবেদনই বেশী প্রয়োজন।

একটি ইন্দ্রিয়শক্তির স্বল্পতা অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তির প্রখরতা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে। শিশুকে পীড়ন করা অন্যায়, পুরস্কৃত করারও প্রয়োজন নেই। তার নিজস্ব সাফল্য ও আত্মোন্নতিই তার সত্যিকারের এবং একমাত্র আনন্দ। এই আনন্দই তার পুরস্কার। শিক্ষণধারা হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরানুযায়ী। পরিবেশও হবে সেই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবেশের মধ্যেই শিশু আত্মশিক্ষার উপায় খুঁজে পাবে। ("Environment should contain the means of auto-education")

মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষার উপকরণের মধ্যেই আছে ভুল সংশোধনের নির্দেশ। ব্যর্থতা থেকে শিশু নিজেই ভুল শোধরাতে শিখবে; এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রুশো ও স্পেন্সার কেবল নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে "ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার" কথা বলেছিলেন (moral training by consequence)। মন্তেসরি একে প্রসারিত করেছেন বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও। অভিজ্ঞতা দিয়ে ভুল সংশোধনের শিক্ষাই আত্মশিক্ষার (auto-education) মূল।

দেহযন্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় সেগুইনের পদ্ধতিকে বলা হয়েছে Physiological Method। পেস্তালোৎসি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেও যান্ত্রিকতায় শেষ করেছিলেন। মন্তেসরির পদ্ধতিকে বলা হয়েছে Psychological Method। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল কথা—(ক) পাঠ্যক্রম কিম্বা শিক্ষকের বদলে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি এবং আগ্রহই হবে মূল কথা। (খ) শিশুর প্রয়োজন বোধ অনুসারে শিক্ষা দিলে সাফল্য আসবেই। ঠিক উপযুক্ত ক্ষণটি একবার হারালে সেই সময়টির যোগ্য শিক্ষার সুযোগ আর আসে না। (গ) শিশু কোন ভুল করলে বুঝতে হবে নির্ভুল শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক এবং দৈহিক অবস্থা তখনও আসেনি। সুতরাং নির্ভুল কাজের জন্য সময় গুণতে হবে। (ঘ) স্কুলের সময় নির্ঘণ্ট অনুসারে শিশুর শিক্ষা চলবে না। তার আগ্রহ ও নিবিষ্টতার মাপকাঠিতে নির্ঘণ্ট তৈরী হবে। সুতরাং প্রতি শিশুর সময় নির্ঘণ্ট আলাদা।

শিক্ষণ পদ্ধতি :—"মন্তেসরি স্কুলের" শিক্ষা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম স্তর হলো বাস্তব জীবনযাত্রা বিধির অভ্যাস গড়া। স্বাবলম্বীতা শিক্ষাই এই স্তরের লক্ষ্য। হাতমুখ ধোয়া, দাঁত নখ পরিষ্কার রাখা, পোশাক পরা ও খোলা, বিনম্রভাবে চলাফেরা করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য অভ্যাস গঠন করা হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা, লাইন বেঁধে হাঁটা, ব্যালেন্সের অনুশীলন প্রভৃতি পন্থায় তিনি নানাধরনের শরীর চর্চাও দেহযন্ত্রের সুস্থতার জন্য বলেছেন।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলো ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য নানাধরনের অনুশীলন।

স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আত্মশিক্ষার উন্নতি। শিশুকে নির্ভুল কাজে নিবিষ্টচিত্তে নিমগ্ন করাই লক্ষ্য। তাছাড়া তুলনামূলক বিচারের পদ্ধতিতে শিশু জিনিস ও কাজের গুণাগুণ বুঝতে পারে—তাও অন্যতম লক্ষ্য। রুশোরই মত মন্তেসরিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আলাদা আলাদা পরিমার্জনার কথা বলেছেন। এজন্য বস্তুর আকার, গঠন, ওজনের তারতম্য, উত্তাপের তারতম্য, রংয়ের তারতম্য বুঝবার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপকরণ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। তৃতীয় স্তরের শিক্ষায় থাকবে শিক্ষামূলক অনুশীলন (didactic exercises)। এ ক্ষেত্রে মন্তেসরি সেগুঈনকে অনুসরণ করেছেন। সেগুঈন পদ্ধতির মূল কথা—(ক) ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বস্তুর নামের সংযোগ স্থাপন, (খ) নাম থেকে বস্তু চিহ্নিত করা এবং (গ) স্মৃতি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর নাম উল্লেখ করা। এই তিন ধরনের অনুশীলন চলবে বর্ণ, স্পর্শ, ওজন, উত্তাপ প্রভৃতি সকল অনুভূতির ক্ষেত্রেই।

ম্যাডাম মন্তেসরি এই তিন পর্বের আগে একটি প্রস্তুতি পর্বে ইন্দ্রিয়গুলির বাস্তব অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। বর্ণানুভূতির উপকরণ হিসাবে তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন রংয়ের ৬৪টি রঙ্গিন পশমের কার্ড; শিশুরা রংয়ের তারতম্য ও আনুপাতিক গভীরতা অনুসারে সাজাবে। অথবা অনেকগুলি জিনিসের স্তূপ থেকে কাঠের কিউব, ইট প্রভৃতি বেছে রাখবে। মুদ্রা, শস্য, নানাধরনের গম কিম্বা ধানও ব্যবহার করা চলে। বস্তুর গঠন ও আকার সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট জিনিস সাজাতে বলা হয়, অথবা রেখাচিত্রের উপর কাঠের টুকরো বসাতে বলা হয়, বিভিন্ন জ্যামিতিক টুকরোকে পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়

মন্তেসরি পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত অনেক উপকরণের মধ্যে কয়েকটির নামোল্লেখ করা চলে—যেমন:—তিন প্রস্থ অন্তর্নিবিষ্ট ঘনবস্তু (solid insets); ক্রমিক পর্যায়ের (graded) আকৃতি বিশিষ্ট তিন প্রস্থ কাঠের টুকরো; গোলাপি রংয়ের ঘনবস্তু (cube), বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রঙিন দণ্ড (rod), বাদামী রংয়ের ত্রিশির ফলক (Prism); বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের কাঠের টুকরো; মসৃণ অথবা অমসৃণ তলবিশিষ্ট চতুষ্কোণ কাঠ; বিভিন্ন ওজনের কাঠের খণ্ড; রঙ্গিন কাপড়ের টুকরো; ৬৪টি রংয়ের পশমের বাক্স; বিভিন্ন তলবিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্তু বোঝাই ড্রয়ার-আলমারী, জ্যামিতিক আকারের রঙ্গিন কাগজ লাগানো তিনখানা কার্ড; বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনকারী কয়েকটি গোলাকার বাক্স, বিভিন্ন শব্দ উত্থাপক দুই লাইন ঘণ্টা প্রভৃতি। মন্তেসরি দাবি করেছেন যে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়শক্তি জাগালে ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জিত হয়। উপরোক্ত অনুশীলনের পটভূমিতে হবে

'didactic exercises.' লেখা, পড়া ও গণিতের অনুশীলনই এ ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য।

মন্তেসরি পদ্ধতিতে **লেখার শিক্ষা** হয় পড়ার শিক্ষার আগে। শিশু কি ভঙ্গিতে লেখে, তাই শিক্ষিকার বিবেচ্য, কি লেখে তা নয়। লেখার প্রস্তুতি পর্বে চলে আঙুল চালনার শিক্ষা। ক্রমে শিশু কলম ব্যবহারের দক্ষতা, লেখা অনুকরণ এবং শেষে ধ্বনিবোধ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ লেখা আয়ত্ত করে। প্রথমে শিরীষ কাগজের অক্ষরের উপর আঙুল চালিয়ে স্পর্শের সাহায্যে আকারের ধারণা হয়। একেই বলা হয় 'learning from tactual & motor experience' অথবা "grapho motor imagery." তারপর আসে কলমের ব্যবহার। লেখা শিক্ষার তিনটি স্তর—(১) কলম ব্যবহারের দক্ষতা, (২) শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে অক্ষর লিখবার দক্ষতা, (৩) ধ্বনি অনুসারে লিখবার দক্ষতা। এই তিনটি স্তর পেরিয়ে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখবার প্রেরণা পায়। এই ক্ষণটিতেই শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেখা শিক্ষার উপকরণ হিসাবে তিনি নিয়েছেন শিরীষ কাগজের অক্ষর, কাঠের অক্ষর, কার্ডের উপর লেখা সাধারণ অক্ষর প্রভৃতি। চার বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন থেকে প্রথম শব্দ লেখা পর্যন্ত সময় লাগে এক থেকে দেড় মাস ; পাঁচ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রায় এক মাস, এবং পুরোপুরি লেখা শিখতে তিনমাস।

পড়ার শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন, "Reading is not a mere barking at Print. What I understand by reading is the interpretation of an idea from the written signs...Until the child reads a transmission of ideas from the written words, he does not read." পড়া শিক্ষার প্রস্তুতি পর্বে শিরীষ কাগজের অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করানো হয়। কার্ডে অর্থপূর্ণ লেখার সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থপূর্ণ উচ্চারণ আয়ত্ত করবার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা আসে। মন্তেসরির মতে লেখা শেখা শুরুর ১৫ দিন পরেই পড়া শেখা শুরু হতে পারে। তিনি নীরব পড়াকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ সরব পড়ার সময় চোখ ও গলার যুগপৎ জটিল ব্যবহার শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে। নূতন পদ্ধতির সাফল্য ঘোষণা করেই মন্তেসরি বলেছেন—"Truly we have buried the tedious and stupid ABC Primer side by side with the useless copy books."

গণনা কিম্বা নামতা মুখস্থ করার বদলে **অঙ্ক শিখবারও** নূতন পদ্ধতি দিয়েছেন মন্তেসরি। এক মিটার থেকে এক ডেসিমিটার পর্যন্ত দশটি রঙিন দণ্ডের (rod)

সাহায্যে খেলাচ্ছলে দৈর্ঘের তারতম্য শেখা যায়। দৈর্ঘ অনুসারে রড সাজানো, গণনা করা, বিভিন্ন নামের রড চিনতে পারা, পরিশেষে ১, ২, ৩ গুণতে ও বলতে শেখার মধ্য দিয়ে সংখ্যার ধারণা সৃষ্টি হয়। অঙ্ক শিক্ষার উপকরণরূপে ব্যবহার করা হয়—বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের লোহার পাত, শিরীষ কাগজের সংখ্যা, সংখ্যা লিখিত কার্ড, অঙ্কিত রেখা প্রভৃতি।

শিক্ষার উপকরণই ভুল সংশোধনের উপায় বলে দেয়। অর্থাৎ auto-education এর ক্ষেত্রে didactic apparatus ব্যবহারের ফলে বুদ্ধির শিক্ষাও 'learning by consequence' নীতি অনুসরণ করে। আবিষ্কারের গৌরবে শিশু দ্রুত অগ্রসর হয়। এই শিক্ষায় কল্পনা বিলাসিতার স্থান নেই, কারণ উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব জড়বস্তু। আর এই পদ্ধতি অনায়াসসাধ্যও বটে।

মন্তেসরি পদ্ধতিতে আলাদাভাবে **নীতি শিক্ষার** স্থান নেই। তাঁর মতে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকশিত হলেই নীতিবোধ জন্মে। নীতি ও ধর্মবোধ জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, চাপিয়ে দেওয়াও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বাস্থ্যকর ও সংগঠিত ব্যবস্থার অভাবে নীতি-হীনতার জন্ম হয়। শিক্ষার লক্ষ্যই শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের পূরণ। সুতরাং এক্ষেত্রে রাগ, ভয়, লোভের স্থান নেই। শিশুর চাহিদা পূর্ণ হয় বলেই সে বিদ্রোহ করে না। নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনের চাঞ্চল্যই দুষ্টুমি রূপে প্রকাশ পায়, শিশু প্রকৃতিগত ভাবে মন্দ কিংবা দুষ্ট নয়। মন্তেসরির মতে—"Freedom without organisation of work would be useless. Ths child, left free without means of work would go to waste, just as a new born baby, if 'left free', without nourishment, would die of starvation. 'The organisation of work', therefore, is the cornerstone of this new structure of goodness; but even that organisation would be in vain without the liberty to make use of it, and without freedom for the expansion of all those energies which spring from the satisfaction of the child's highest activities."

মন্তেসরি বিদ্যালয়ে তাই প্রয়োজন প্রচুর জমি ও উপকরণ এবং আসবাবের সুব্যবস্থা; সঙ্গীতের ব্যবস্থা, ফুলের টব এবং অন্যান্য আসবাবে সজ্জিত ক্লাশঘর; শিশুদের উপযোগী খাবার ঘর; তোয়ালে, সাবান ও জলের কলে সাজানো পোশাকঘর; ওজন ও দৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র; প্রশস্ত বাগান এবং উপযুক্ত ডাক্তারী

ব্যবস্থা। এই স্কুলে জোরজুলুম নেই, মুখস্থ বিদ্যা নেই, ভুলের জন্য শাসন নেই; অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করে। নীরবতা পালন করা, উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করাও মন্তেসরি বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কাজ।

শিক্ষিকার ভূমিকা :—কোমেনিয়াস বলেছিলেন, "Education is gardening. As swimming is natural to fish, flying to the bird, running to the beasts, so education is to human children." মন্তেসরি পদ্ধতিতে এই কথাটির ভাবার্থ প্রতিভাত হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও গতি শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছুই চাপানো হয় না, সবকিছুরই উপযুক্ত সময় আছে। এই উপযুক্ত সময়ের জন্যই শিক্ষিকা অপেক্ষা করেন। শিশুর আত্ম-বিকাশের পথে সক্রিয় সাহায্যই শিক্ষা। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষণটির সদ্ব্যবহার করাই শিক্ষিকার কাজ। তাই মন্তেসরি পদ্ধতিকে Rusk বলেছেন "psychology centred education."

এই দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষিকার পক্ষে প্রয়োজন—শিশু মনস্তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ফলিত মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান। তাঁর কাজই হলো শিশুকে লক্ষ্য করা, তার মনের কর্মধারাকে পরিচালনা করা। তাই শিক্ষিকার নাম হয়েছে Directress। শিক্ষিকার ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন, "Instead of facility of speech, she has to acquire the power of silence; instead of teaching she has to observe, instead of the proud dignity of one who claims to be infallible, she assumes the vesture of humility."

মন্তেসরি ও অন্যান্য শিক্ষাগুরু :—নূতন শিক্ষার ভিত্তি রয়েছে রুশোর এমিল গ্রন্থে। মন্তেসরিও এই উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন। রুশোর তত্ত্বের মূল কথা ছিল প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, পীড়নহীন স্বাধীন শিক্ষা, শিশুর আগ্রহ ও উদ্যমের ভিত্তিতে শিক্ষা। রুশো মানুষের স্বাভাবিক ভালত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই শিশুর মুক্তি চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রুশোর সঙ্গে মন্তেসরির সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নেই। রুশো সমাজের বাইরে শিক্ষার কথা বলেছিলেন। মন্তেসরি বলেছেন বিদ্যালয়ের যৌথজীবন ও সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা। স্কুলের ভালবাসা, বন্ধুত্ব, আনন্দ ও সহযোগিতাই শিক্ষার প্রধান হাতিয়ার। পেস্তালোৎসি চেয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। বাস্তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মন্তেসরির পদ্ধতি অনেক বৈজ্ঞানিক

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ফলিত মনস্তত্বকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। পূর্বসূরীদের ভুল থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন।

মন্তেসরির সঙ্গে ফ্রোয়েবলের তুলনা খুবই আগ্রহ উদ্দীপক। ফ্রোয়েবল শিক্ষার প্রশ্নকে দেখেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে, মন্তেসরি দেখেছেন চিকিৎসাবিদ ও সমাজ-সেবীর দৃষ্টিতে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক ঐক্য সম্বন্ধে ফ্রোয়েবলের ছিল পরিচ্ছন্ন দর্শন। তিনি সবকিছুর পিছনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দেখেছেন। মন্তেসরি ছিলেন বাস্তববাদী। পার্থিব দৃষ্টিতেই তিনি শিক্ষার সমস্যাকে দেখেছেন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তা করাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তাঁরা উভয়েই শিশুর আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরকে স্বীকার করেছেন। উভয়েই হাতের কাজ ও খেলাকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণের ক্ষেত্রে দু'জনের অনেক পার্থক্য। মন্তেসরির উপকরণ সংখ্যায় বেশী, বিচিত্র এবং অপেক্ষাকৃত সুন্দর। ফ্রোয়েবল ধর্ম ও রহস্যের আবরণ দিয়ে gift-গুলিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবে কল্পনার যে গুরুত্ব ফ্রোয়েবল দিয়েছেন, মন্তেসরি তেমন দেননি। ফ্রোয়েবল নৈসর্গিক প্রকৃতিকে উচ্চতম আসন দিয়েছিলেন। মন্তেসরির পদ্ধতিতে তেমন নেই। মন্তেসরি পদ্ধতিতে formal training এবং recapitulation তত্ত্বের প্রভাবও লক্ষণীয়। তবুও এঁরা পরস্পরের পরিপূরক। শিশু শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে প্রায়শঃই উভয় পন্থার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়।

অবদানের মূল্যায়ন :—মন্তেসরি পদ্ধতিকে সমালোচনা করা হয়েছে প্রধানতঃ দুইটি কারণে—(১) ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি এই পদ্ধতিতে স্বল্প গুরুত্ব পেয়েছে। (২) কল্পনা শক্তির পরিমার্জনাও স্বল্পমূল্য পেয়েছে এবং তার বদলে ইন্দ্রিয়শক্তির পরিমার্জনাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

কল্পনা সম্পর্কিত বিতর্কটি আলোচনার যোগ্য। বাস্তব বিচারে কল্পনাশ্রয়ী শিক্ষা কখনও বস্তুনির্ভর শিক্ষার সমতুল্য নয়। তা ছাড়া পরীর গল্পের সাহায্যে কল্পনা-বিলাসিতাও যুক্তিযুক্ত নয়। অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়িতার বিপদ আছে। নিয়ন্ত্রিত এবং গঠনমূলক কল্পনাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান। ইন্দ্রিয়শক্তির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম কারণ এই যে মন্তেসরি Recapitulation তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "The child follows the natural way of development of the human race....In short, such education makes the evolution of the individual harmonise with that of

humanity." এই ত্রুটির দিকটি অবশ্যই স্বীকার্য। অবশ্য এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী কালে তিনি recapitulation তত্ত্বকে "a materialistic idea now discredited" বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ভাষার উপর স্বল্পগুরুত্বের অভিযোগও এই বলে নরম করে নেওয়া চলে যে ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের স্তরে ভাষাজ্ঞানের বদলে ভাষাশিক্ষার দক্ষতা অর্জনই বড় কথা। এই পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার প্রণালী অবশ্যই সফল হয়েছে, কিন্তু একথা সত্য যে অনুভূতি এবং সামাজিক জীবনের দিক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয়ে জন ডিউই অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন।

সবকিছু সমালোচনা সত্ত্বেও শারীরিক অনুশীলন, ইন্দ্রিয় শিক্ষা, আগ্রহভিত্তিক শিক্ষা, আত্মশিক্ষা, উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক মুহূর্তের সদ্ব্যবহার, লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষার পদ্ধতি, জীবনের তৃতীয় বছরের গুরুত্ব, শিক্ষিকার ভূমিকা ও গুণাগুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে মেরিয়া মন্তেসরির বক্তব্য অতিশয় মূল্যবান। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নাচ ও মাটির কাজকে পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা নিয়ে গবেষণা চলেছে। মন্তেসরির শিষ্যরা দাবি করেন যে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, রুচি, প্রয়োজন ও আদর্শের সঙ্গে এই পদ্ধতির সামঞ্জস্য করা সম্ভব। মন্তেসরির সবচেয়ে বর অবদান শিক্ষণের বিশেষ উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যক্তিকরণ (individualisation of instruction)। তাই জন এ্যাডামস্ বলেছেন যে মন্তেসরি শ্রেণী-পাঠ ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছেন। আধুনিক যুগের একটি প্রধানতম শিক্ষা গবেষণা (experiment) রূপে এই পদ্ধতির মূল্য স্বীকৃত।

জন ডিউই (John Dewey): (১৮৫৯—১৯৫২)

সংক্ষিপ্ত জীবনী: আমেরিকার প্রতিনিধি স্থানীয় দার্শনিক, গবেষক এবং শিক্ষাগুরু জন ডিউইর জন্ম ১৮৫৯ সনে। দার্শনিক মতবাদে তিনি ছিলেন স্থিতিশীলতার ঘোর বিরোধী। তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনচেতনাও বহু পরিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়েছে। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ মরিস'এর প্রভাবে তিনি প্রথমে ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বাসী। কালক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তাঁকে আকর্ষণ করে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সামঞ্জস্যের পথে জীবন সংগ্রাম এবং জীবনকে ক্রমাগত পরীক্ষার ধারা রূপে তিনি গ্রহণ করেন। এই স্তরে তাঁর দার্শনিক চেতনাকে বলা হয়েছে 'Experimental Idealism'. কিন্তু হেগেলীয় 'বৈপরীত্যের মিলন' (synthesis of opposites) তত্ত্বও তিনি বিশ্বাস করেন এবং দ্বৈত অস্তিত্বকে

অস্বীকার করেন। পরিশেষে তিনি William James'এর 'প্রয়োগবাদ'কে (Pragmatism) সংশোধিত রূপে গ্রহণ করেন।

ডিউই নিজেই বলেছেন, "The forces that have influenced me, have come from persons and from situations more than from books". সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Laboratory School'এ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর অভিমত গঠন করেন। এই ল্যাবরেটরীর খ্যাতির সঙ্গে ডিউইর প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে। বহুবিধ রচনার মধ্যে ডিউইর নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: (১) Freedom and Culture, (২) Democracy and Education, (৩) Human Nature and Conduct, (৪) How we think, (৫) The Quest for Certainty. (৬) Sources of a Science of Education, (৭) How much Freedom in the New School, (৮) The School of Tomorrow, (৯) School and Society প্রভৃতি।

দার্শনিক উত্তরাধিকার:—জার্মানীর ভাববাদ এবং ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবাদের কথা আগে বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এলো কার্ল মার্কস-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন। এর ফলে ভাববাদেরও নবরূপায়ণ ঘটে। উপযোগিতাবাদের সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয় ঘটে ইংলণ্ডে। আমেরিকাতেও বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ তথা প্রকৃতিবাদের সঙ্গে ভাববাদের এক ভিন্ন ধরনের সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয়ই আমেরিকার প্র্যাগমাটিক দর্শন। জন ডিউইও Pragmatic মতবাদ গ্রহণ করেন। সুতরাং ডিউইর তত্ত্ব বুঝবার জন্য Pragmatic দর্শনের প্রকৃতি আলোচনার প্রয়োজন।

প্র্যাগমাটিক দর্শন:—অন্যতম আধুনিক চেতনা—প্র্যাগমাটিজম-এর পুরোধা Charles Peirce'এর মতবাদকে পরিবর্ধিত ও সুগঠিত করেন William James। তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মচেতনার সমন্বয় করতে চেয়েছেন। মনের কর্মদক্ষতা এবং জ্ঞানের কার্যকারিতাই তাঁর মূল প্রতিপাদ্য। মনের কাজ হলো বহুতর পথের মধ্যে বাছাই করে নেওয়া; কেবল ফলাফলই এই নির্বাচনের ভালমন্দের বিচারক। সুতরাং কর্মসাধনাই বড় কথা। বাস্তববাদী মানুষের মন তাঁর কাজের সহায়ক। অর্থাৎ জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্পর্কটি কাজের ভিত্তিতে নিবিড়।

বস্তুতঃ বিমূর্ত ভাববাদ এবং প্রকৃতিবাদের মিলন প্রচেষ্টাতেই প্র্যাগমাটিক তত্ত্বের জন্ম। একদিকে প্রকৃতিবাদী তত্ত্বে অস্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এ এক

প্রতিবাদ। প্র্যাগমাটিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ ও চেতনাকে আবার স্থান করে দেওয়া। কিন্তু সেই সাথে এই দর্শন শূন্যগর্ভ ভাববাদী বাক্যসর্বস্বতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ তুলেছে। চিরন্তন সত্য ও মূল্য বলে কিছু নেই। জীবনের অভিজ্ঞতাই মূল্য বোধ সৃষ্টি করে। চলমান জগতে জীবনটাই পরীক্ষামূলক। সুতরাং স্থায়ী নৈতিকতা কিংবা পরম সত্য কিছুই নেই; মানুষের কর্মসাধনাই সত্যাসত্য স্থির করে; এই কর্মজীবন নিয়ত প্রবহমান। সুতরাং সবকিছু পরিবর্তনীয় এবং আপেক্ষিক। এই হলো প্র্যাগমাটিজম'এর কথা।

প্র্যাগমাটিক দর্শন বলতে চেয়েছে, যা কিছু মানুষের সন্তুষ্টি আনে তাই সত্য। যা কিছু কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, তাই সত্য। (এখানেই Laboratory Method এর উৎস)। সত্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়েই সত্যতা নির্ধারিত হয়, ফলশ্রুতিই কার্যকারিতা প্রমাণ করে, বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করে। সুতরাং অনবরত আত্মপ্রয়োগ, আত্মপরিপূর্ণতা এবং আত্মবিকাশই জীবনের মৌলিক সত্য।

আমেরিকাতেই এই প্রয়োগমূলক দর্শন বিকশিত হওয়ার কারণ আছে। নূতন পৃথিবীর নূতন পরিবেশে ইউরোপের ভাববাদী দর্শন বিকশিত হতে পারেনি। অজস্র সম্পদে সম্পদশালিনী প্রকৃতির বিরুদ্ধে রূঢ় বাস্তব জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকরা হয়ে উঠেছিল বড়ই বাস্তববাদী। কাজের যোগ্যতার মানদণ্ডে ব্যক্তির যেমন মূল্য হলো, তেমনি হলো প্রতিকূল পরিবেশে গোষ্ঠীজীবনের মূল্য। সুতরাং সামাজিক পারদর্শিতার মূল্যও ছিল অবধারিত।

ইউরোপীয় প্রজ্ঞা আন্দোলন আমেরিকাতেও পৌঁছেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দ্রুত হয়েছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি আন্দোলন। সর্বজাতি ও সর্বধর্মের দেশে দেশজ কোন পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল না। নূতন পরিবেশে অনেক পুরাতন মূল্যবোধও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। এর পাশাপাশি অতি দ্রুত বড় হয়ে উঠলো যন্ত্রদানব ও অর্থদানব। প্রতিযোগিতা আর পার্থিব সাফল্যই হয়ে উঠলো জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু মানবিকতা, নৈতিকতা ও আদর্শের সংকট আবার নিয়ে এল ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত। তাই প্রকৃতিবাদের সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয় করে জীবনের নূতন ভিত্তি খোঁজা হলো। জন ডিউই এই নূতন মূল্যবোধের সার্থক উদ্গাতা। উইলিয়াম জেমস্-এর তত্ত্বকে তিনি সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য এবং গতির কথা তাঁর দার্শনিকতার এক বড় জায়গা দখল করলো।

ডিউইর শিক্ষাতত্ত্ব

ডিউইর মতে শিক্ষার ছুইটি উপাদান—শিশু এবং তার দৈহিক ও সামাজিক পরিবেশ। এ ছুটির ক্রিয়া প্রক্রিয়াই শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। এই অভিজ্ঞতা আত্মকরণের মধ্য দিয়েই শিক্ষা সম্ভব। শিশুর সঙ্গে নূতন পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত পরিচয় ঘটবে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নূতন ভাবে সে সাড়া দেবে। পরিবেশের সঙ্গে এই নিত্য নূতন সামঞ্জস্য এবং সংপরিবর্তনই শিক্ষা। ডিউইর শিক্ষা দর্শনের মূল কথাই এই যে কোন নীতি বা আদর্শকে তৈরী পোশাকের মত যত্রতত্র ব্যবহার করা চলে না। কোন চিরন্তন এবং স্থিতিশীল আদর্শকেও সর্বত্র ও সর্বকালে প্রয়োগ করা যায় না। যুগসত্য এবং যুগ প্রয়োজনকে গ্রহণ করার মত মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গি গঠন করাই মূল কথা। দর্শনের কাজ হবে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের, তত্ত্ব ও তথ্যের যোগসূত্র রচনা করা। বাস্তব জীবনবেদই দর্শন।

আলোচিত দার্শনিক তত্ত্বানুযায়ী ডিউই শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার ব্যাপকতম সাধারণ উদ্দেশ্য হলো নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি। নিজের মূল্যবোধ নিজেই স্থির করে নিতে পারে, এমন সুযোগের মধ্যে শিশুকে উপস্থিত করাই শিক্ষার কাজ। এই মূল্যবোধ যেন ব্যক্তিশিশু ও সমাজ—উভয়েরই সন্তুষ্টি আনে। সুতরাং জীবনের যৌথ কাজে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন অংশগ্রহণের সামাজিক দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। চলমান সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া ছাড়া সামাজিক সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনে সৃজনশীল অংশীদারত্বের উৎকর্ষতা সাধনই শিক্ষার কাজ। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য 'প্রস্তুতিই' শিক্ষা নয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত পরিবর্তনই শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা-ক্রমই 'জীবন'। সুতরাং শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষা। অর্থাৎ সার্থক জীবন যাপনই শিক্ষার নামান্তর।

শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতির সাথে শিক্ষার পরিবেশ বদলাতে পুরানো শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। পুরাতন শিক্ষায় শিশুর বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। কিন্তু ব্যক্তি-শিশুর স্বকীয়তা স্বীকৃত না হওয়ায়, দলবদ্ধ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থার মধ্যে বুদ্ধি ও নীতিশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। সে শিক্ষায় শিশুর সৃজনশীল ভূমিকাও অস্বীকৃত ছিল। অথচ সমাজের যৌথ জীবনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথেই মাত্র নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা সম্ভব। ডিউই বলেছেন, "In the school room, the motive and the cement of social organisation are alike wanting. Upon

the ethical side, the tragic weakness of the present school is that it endeavours to prepare the future members of the social order in a medium in which the conditions of social spirit are imminently wanting."

এই শিক্ষা কিভাবে সম্ভব? বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি কার? শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বয়স্কদের পূর্ব নির্বাচিত অভিজ্ঞতা নয়। এখানেই ডিউই-তত্ত্বে শিশুকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্য। শিশু ধাপে ধাপে বড় হয় এবং এই ক্রমবৃদ্ধির স্তরে স্তরে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার স্তরভেদ অনুসারে ডিউই শিশুর জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন—(ক) ১ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত গৃহের পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ। (খ) ৪ থেকে ৮ বছরের স্তরে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিবেশে খেলা এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। (গ) ৮ থেকে ১২ বছরের স্তরে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের মূল্যই বেশী। (ঘ) ১২ বছর বয়স থেকে শুরু হয় যুক্তিশীল অমূর্ত চিন্তার স্তর। এই স্তরভেদ অনুসারেই শিক্ষার ক্রমবিকাশ প্রয়োজন।

শৈশবের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বাস্তব। এই শিক্ষার মর্মার্থ ইন্দ্রিয় ও পেশীর সদ্ব্যবহার করে স্বকীয়তা ও উদ্যোগের সাহায্যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (learning by doing)। তাই ডিউই গঠনমূলক কাজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত খেলাচ্ছলে শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। পরবশ্যতা এবং অপরের চাপানো বোঝার কাছে আত্মসমর্পণের বদলে মুক্ত আত্মশৃঙ্খলা আসবে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আসবে নূতন মূল্যবোধ। যেহেতু মূল্যবোধ হতে হবে ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ের কাছেই সন্তোষজনক, সেহেতু স্কুল হবে শিশুর সামাজিক বিকাশের সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এর মৌলিক দায়িত্বই হবে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে, শিশুদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া। তাই জন ডিউই উন্নত ভারসাম্য সম্পন্ন, পংকিলতামুক্ত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপেই বিদ্যালয়ের নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সমাজে সহজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুরা যৌথ কাজ এবং যৌথ জীবন চালাবে। এক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা এবং জীবনকেন্দ্রিকতার কোন ব্যবধান থাকবে না, কারণ শিশুর নিজস্ব জীবনই হবে তার পরিবেশ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষাক্ষেত্র। সুতরাং স্বকীয়তা, আগ্রহ এবং কাজের সদ্ব্যবহার করে মুক্ত শৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষমতাই

স্কুলের প্রকৃত শক্তি ও গুণ। গণতান্ত্রিক জীবনের শিক্ষা হবে বিদ্যালয়ে, তৈরী হবে স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, সুদক্ষ নাগরিক, যারা নেতৃত্ব করতে শিখবে, আবার নেতৃত্ব মেনে চলতেও শিখবে। স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধায় মণ্ডিত আদর্শ গৃহের অনুকরণে গড়ে উঠবে আদর্শ স্কুল। স্কুলের কাজ সমাজের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, বরং সমাজের দৈনন্দিন বৃত্তিমূলক ও বাস্তব কর্মপ্রবাহই প্রতিফলিত হবে স্কুলের কর্মপ্রবাহে। এই নীতি অনুসারেই জন ডিউই নিজে বিশ্ববিদ্যালয় লেবরেটরী স্কুলে তিন ধরনের কাজ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন—(ক) হাতেকলমে কাঠ ও যন্ত্রপাতির কাজ, (খ) রন্ধন, (গ বয়ন শিল্প।

মানুষের মন কোন স্থিতিশীল সত্তা নয়, বরং ক্রমবিকাশমান ধারা। "জেনেটিক" মনস্তত্ত্ব এই সত্যই প্রচার করেছে যে সামাজিকতাই মনের প্রকৃতি। সমাজই মনকে গড়ে তোলে, সমাজ ও পরিবেশের ক্রমবিকাশের উপর মনোবিকাশ নির্ভরশীল। ডিউই এই সত্য গ্রহণ করেছেন—"Earlier psychology regarded mind as a purely individual affair in direct and naked contact with an external world. At present, the tendency is to conceive individual mind as the function of social life—requiring continuous stimulus from social agencies and finding its new treatment in social supplies."

শিক্ষণ পদ্ধতি :—ডিউই ছিলেন Recapitulation তত্ত্বের বিরোধী। সমস্যা সমাধানের পথে শিশুর গতিশীল সক্রিয়তার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। এটিই Laboratory Method-এর মূল কথা। এই পদ্ধতির চারটি স্তর -(১) সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, (২) সমস্যার বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পরিকল্পনা করা, (৩) সমাধান সূত্রের প্রয়োগ এবং (৪) সাফল্য-ব্যর্থতার সমালোচনা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন। (Problem—orientation—application—criticism). এই পদ্ধতিতে শিশুকে গবেষকের ভূমিকায় দাঁড় করানো হয়। সেলাই, বয়ন, রান্না কারিগরি প্রভৃতি বাস্তব কাজের মাধ্যমেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্ভব।

ডিউই তাঁর পদ্ধতিতে তত্ত্ব ও প্রয়োগ মেলাতে চেয়েছেন। কাজের মধ্য দিয়ে তত্ত্বে পৌছতে হবে। আবার শিশু কেবল কাজই করে চলবে এমন নয়। তত্ত্বজ্ঞান কাজের একঘেয়ে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। সুতরাং কোনটির প্রতি একক গুরুত্ব না দিয়ে তত্ত্ব ও কাজের ভারসাম্যের পথেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব। তবে, কাজের উদ্দেশ্য কাজেই নিহিত, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া লক্ষ্যর জন্য শিশুর কর্মসাধনা

নয়। শিশুর কাজের উপযোগিতাও থাকবে। তাই 'সমস্যা পদ্ধতিতে' বাস্তব পরিবেশ, বাস্তব সমস্যা, এবং শিশুর প্রকৃত আগ্রহ ও মনোযোগেরই মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। চলমান জীবনের আদর্শও পরিবর্তনশীল। জীবনের গতির সঙ্গে তাল রেখে বাস্তব জীবন-সমস্যার ক্ষুদ্র সংস্করণই স্কুল জীবনে উপস্থাপিত হবে। হাতে কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুর অনুসন্ধিৎসা, গঠনপ্রিয়তা এবং অন্যান্য সহজাত আচরণ সুব্যবহৃত হবে; শিশুর সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠিত হবে। সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে নূতন মূল্য ন্বেষণের গৌরব সৃষ্টি করবে। স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিটি শিশুর সর্বোত্তম সম্ভাবনার সুযোগ দেওয়াই স্কুলের কাজ।

Activity বলতে কিন্তু কষ্টসাধ্য কিছু বুঝায় না, প্রকৃত উৎপাদনী শ্রমও বুঝায় না। সমাজে প্রচলিত কাজের মতই স্কুলেও চলবে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন ছোট ছোট কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের প্রয়োগ ও বিচার। উল্লেখ্য যে হার্বার্ট পুরাতন 'জ্ঞানের' ভিত্তিতে নূতন জ্ঞান আয়ত্ত করার কথা বলেছিলেন, ডিউই নূতন 'সমস্যার' ভিত্তিতে নূতন জ্ঞানের কথা বলেছেন। তাঁর দর্শন ও লেবরেটরী পদ্ধতির বাস্তব ফলশ্রুতি ঘটেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে। ডিউইর মন্ত্রশিষ্য W. H. Kilpatrick এজন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। শিশুরা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা থাকবে না। আবার শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাতেও আত্মকেন্দ্রিকতার ভয় থাকে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে দুই নীতির সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে প্রজেক্ট বলতে বুঝায়—"Planned programme undertaken." Stevension সংজ্ঞা দিয়েছেন, "A problematic act carried to completion in its natural setting." Kilpatrick বলেছেন, "A wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment." বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা চলে। কাজটি উদ্দেশ্যমূলক, সমস্যামূলক এবং সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। শিশুরা সর্বান্তঃকরণে স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে করবে। বস্তুতঃ এই পদ্ধতি শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সমর্থন রয়েছে। সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে কাজ করার মধ্যে শিশু সৃষ্টির আনন্দ পায়। বৃহত্তর জীবন ও স্কুল জীবনের ব্যবধান ঘুচে যায়। সামাজিক পরিবেশে শিশু সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের শিক্ষা পায়। খেলাচ্ছলে এই শিক্ষা শিশুশিক্ষণ পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে চার ধরনের

ট্রেনিং সহজেই দেওয়া চলে—(১) সংগঠনগত, (২) আমোদ-প্রমোদ মূলক, (৩) সমস্যা সমাধান মূলক, (৪) দক্ষতা মূলক।

ডিউই তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :—শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডিউই তত্ত্বের তিনটি মূল ভিত্তি (ক) প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী শিক্ষা, (খ) ব্যক্তিশিশুর বুদ্ধি বিকাশ, (গ) সামাজিক মানুষ হিসেবে দক্ষতা। তিনি জীববিদ্যা. মনোবিদ্যা, শারীর বিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অকাতরে গ্রহণ করেছেন। শিশু-অভীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিবর্তনবাদী নিরবচ্ছিন্নতা তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তিনি প্র্যাগমাটিক তত্ত্ব এনেছেন এবং সমাজবাদ ও গণতন্ত্র প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে "He democratised and socialised education."

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউই তত্ত্বের মূল সূত্র ও নীতিগুলি সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা চলে। আবেগ কিম্বা কল্পনাবিলাসিতা অথবা বিমূর্ত তত্ত্বের বদলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে বাস্তবতার ভিত্তিতে। অলংকরণই উদ্দেশ্য নয়, জীবনের সমস্যা সমাধানই শিক্ষা। জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। সমস্যা সমাধান ও কাজের মাধ্যমে শিশু নূতন তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে। তার কর্মোদ্যম পরিচালিত হবে যুক্তি ও চিন্তার ভিত্তিতে। সমস্যামূলক কাজ করানোই শিক্ষার পদ্ধতি। সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিক হয়ে উঠবে এবং যৌথ জীবনে বাস্তব আচরণের মধ্য দিয়েই নীতি শিখবে। শিল্প বিপ্লবোত্তর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে স্কুল তাল রেখে চলবে এবং স্কুল হবে গৃহের পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৃহত্তর সমাজের উন্নততর ক্ষুদ্র সংস্করণও। স্কুল সমাজে শিশুরা পূর্ণ জীবন যাত্রার সুযোগ পাবে। স্কুলের কাজ হবে বৃহত্তর সামাজিক কর্ম-ধারার সঙ্গে সংযুক্ত ও সাদৃশ্যপূর্ণ। Learning by doing নীতি হবে পন্থা। সমগ্র শিক্ষা প্রয়াসই নির্ভর করবে শিশুর আগ্রহ ও প্রবণতার উপর।

বস্তুতঃ আগ্রহ ও প্রবণতায় গুরুত্ব আরোপ করার ফলে জ্ঞানকে ডিউই bye product রূপেই দেখেছেন, অবশ্য এই bye productও অত্যাবশ্যকীয়। স্কুল জীবনেই শিশু আয়ত্ত করবে জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—সত্য, ন্যায়, মুক্তি, দায়িত্ব, উদ্যোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিত্ব। যৌথ কর্মোদ্যমের দায়িত্ব ও আনন্দের মধ্যেই শিশু স্বকীয়তা আবিষ্কার করবে। বিদ্যালয় জীবন দূরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নয়, জীবনেরই এক অধ্যায়। Instruction-ই শিক্ষা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য সহজাত প্রবণতার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যমূলক কর্মপ্রবাহই শিক্ষা।

অবদানের মূল্যায়ন :—ডিউই তত্ত্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্র্যাগমাটিক দর্শনের

কিছু সমালোচনা অবধারিত। প্র্যাগমাটিক দর্শন আগে থেকে স্থির করা লক্ষ্য অনুসারে কাজ করাকে বিরোধিতা করে। কাজ করাই মূল কথা এবং ফলাফলই (যাই হোক) তার লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সমালোচকরা বলেছেন যে কাজের মূল্য আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু আদর্শ ও চেতনার মূল্যও আছে মানব সভ্যতার প্রতি গ্রন্থিতে। আদর্শগত কাজ মানুষকে মহত্ত্ব দেয়, অনেক স্থায়ী ফল দেয়। তাছাড়া এমন বহু মানসিক ক্রিয়া আছে যার কোন আশু ফলশ্রুতি নেই। শিল্পকর্ম অনুভূতির মধ্যেই রয়েছে তার মূল্য, আর কোন বাস্তব ফলশ্রুতির বিচার সেখানে নেই। বস্তুতঃ প্র্যাগমাটিক তত্ত্বে অন্তর্জাত প্রেরণার মূল্য স্বল্প স্বীকৃত। "প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী" একথা সত্য; কিন্তু এমন অনেক আবিষ্কার পৃথিবীতে হয়েছে যেখানে আশু প্রয়োজনের চেয়েও অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তঃপ্রেরণাই ছিল বেশী। তাছাড়া সৃজনশীল চিন্তা সব সময়েই Experiment-এর উপর নির্ভরশীল নয়। "কর্ম থেকে চিন্তা" যেমন সত্য, "চিন্তা থেকে কর্ম" তেমনি সত্য। মানুষের বিজ্ঞান সাধনায় এই সত্যের বহু প্রমাণ রয়েছে।

প্র্যাগমাটিক দর্শনের মতে শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। "End is merely a series of acts viewed at a remote stage"। কর্মধারার সম্মিলিত ফলাফলই লক্ষ্য (end), এবং কোন নির্দিষ্ট কর্মই "উপায়" (means)। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য কখনও কল্পনাশ্রয়ী হবে না; কখনও অপরিবর্তনীয় হবে না; কোন স্থির বিশ্বাস দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে না। কিন্তু ডিউই নিজেই "How we think" গ্রন্থে "সুপ্রতিষ্ঠিত" তথ্য এবং নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ডিউইর মতে "মূল্যবোধ" পরিবর্তনশীল এবং "প্রয়োজন" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের আনুপাতিক মূল্য নিরূপণ করা যায় না। তা সত্ত্বেও তিনি নিজেই বাছাই করেছেন, এবং "Essential"-কে প্রথম ও 'Refinement'-কে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Men's fundamental common concern centres about food, shelter, clothing, household furnishings, and the appliances connected with reproduction, exchange and consumption"। ঠিক তেমনি উল্লেখ করা চলে যে ছাত্র-স্বাধীনতার প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও "How much Freedom in the New School" রচনায় তিনি স্বাধীনতার বিপদ সম্পর্কে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ডিউইর তত্ত্বের মধ্যেও সংশয় ও স্ববিরোধিতার কথা স্বীকার করতেই হবে।

সর্বশেষে বর্তমান লেখক সংকোচের সঙ্গে একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে প্রয়াসী।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউইর তত্ত্ব বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। চিরন্তন ভাববাদ জাগতিক সাফল্য এনে দিতে পারেনি। অপরদিকে প্রকৃতিবাদের অন্তর্নিহিত যান্ত্রিকতা এবং অদৃষ্টবাদিতার প্রতি বিরাগও সহজেই অনুমেয়। তৃতীয় অবলম্বন অন্বেষণের ক্ষেত্রে মার্কসীয়তত্ত্বের বস্তুবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রামের কথা সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করতে অক্ষমতার ফলেই প্র্যাগমাটিক দর্শন সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—কারণ এই দর্শনে স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, বাস্তবমুখিনতা, আত্মপ্রত্যয়, বিদ্যালয়ের নবরূপায়ণ এবং নূতন পদ্ধতির অবতারণা হয়েছে। এ জন্যই প্র্যাগমাটিক দর্শনের অন্ধ প্রয়োগের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই দর্শনের দুটি দিক পরস্পর নির্ভরশীল। ধ্রুবসত্য ও স্থিতিশীলতার বদলে অনবরত পরিবর্তনশীলতা এবং মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা (relativity of values) এখানে স্বীকৃত। আবার ডিউই বলেছেন—"Knowledge and practice are means of making good"। সুতরাং প্রতিনিয়ত "উন্নততর মূল্যান্বেষণের" কথাও এখানে স্বীকৃত। কিন্তু 'good'-এর মানদণ্ড কি? ধ্রুবমানদণ্ডের অভাবে, কিম্বা নবমূল্যান্বেষণের অভাবে বাস্তবজীবনে এই দর্শন আনতে পারে মূল্যহীনতা। মূল্যের 'অস্থিতি'বোধ থেকে সৃষ্টি হতে পারে লক্ষ্যহীন অস্থিরতা। 'আজিকার প্রয়োজন', 'মুহূর্তের আনন্দ' কিম্বা 'লক্ষ্যহীন কর্মের' মনোভাব সমাজ-জীবনকে করতে পারে নোঙরহীন নৌকো। আমেরিকার সমাজ-জীবনে অসংখ্য দুষ্টক্ষত যে প্র্যাগ-মাটিক দর্শনের অপপ্রয়োগের ফলেই সৃষ্টি হয়নি—এ কথা কে বলতে পারে? মনে হয় আমেরিকান শিক্ষাজগতও এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বলেই General Education' আন্দোলন প্রভৃতি পন্থায় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নূতন ভারসাম্যের সন্ধান চলেছে। বস্তুতঃ প্র্যাগমাটিক দর্শনের সুস্থ প্রয়োগে যতখানি শুভ ফলশ্রুতি সম্ভব, অসুস্থ ও আংশিক প্রয়োগে তার বেশী অশুভ ফলশ্রুতিই সম্ভব।

তাই বলে দার্শনিক হিসাবে ডিউইর মূল্য আদৌ হ্রাস পায় না। Rusk এর কথায় বলা চলে, "In him were concentrated in a special degree the progressive tendencies of his age and country." তিনি শিক্ষা ও জীবনকে সমার্থক জ্ঞান করেছেন বলেই দর্শনের সংজ্ঞা দিতে পেরেছিলেন, "Theory of education in its most general phases"। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে বাস্তব জীবনদর্শন দিতে পেরেছিলেন বলেই এ যুগের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদর্শনও তিনি উপস্থিত করেছেন। Ruskই বলেছেন, "Dewey was a great educationist because he was a great philosopher"। তাঁর দর্শনের ভিত্তি ছিল ব্যবহারিক

অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্র্যাগমাটিক দর্শন এবং আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে আমরা পেতে পারি বাস্তব,কার্যকরী, মানবিক ও সামাজিক শিক্ষাদর্শন—যা শিক্ষাকে করে তোলে উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং বিদ্যালয় জীবনে শিশুদের দিতে পারে বাস্তবতাবোধ। শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগে এই অবদান নিঃসন্দেহে অমূল্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে জন ডিউইর কয়েকটি স্থায়ী অবদানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) তিনি দর্শনের নূতন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং পুরাতন সংকীর্ণতার পরিবর্তে শিক্ষারও নূতন সংজ্ঞা দিয়েছেন। (২) তাঁর তত্ত্বে গৃহ, সমাজ ও শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে; ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার সমন্বয় ঘটেছে এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটেছে। (৩) ভাববাদের শূন্যগর্ভতা থেকে তিনি শিক্ষাচেতনাকে উদ্ধার করেছেন। (৪) জটিল দৃষ্টির পরিবর্তে তিনি জীবনপ্রবাহকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

শিশুমন এবং সেই মনের চাহিদা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই শিশুর ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাচেতনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন। শিশুর সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা-মুখনতার যথোচিত মূল্য দিয়ে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পরিবেশ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। বিদ্যালয়ের নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, মুক্ত শৃঙ্খলার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক সামাজিক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে শিক্ষাকে তিনি সামাজিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক শিল্পজীবনে 'সমস্যা পদ্ধতি' এবং 'Learning by doing' তত্ত্বের সীমাহীন মূল্য রয়েছে। তাই বলা চলে যে জন ডিউই শিক্ষাকে সবল দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে New Education; Progressive Education, Integrated Education; Activity Principle; Learning by Doing, Project প্রভৃতি কথা। সব আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতেই তাঁর প্রভাব পরিস্ফুট। শিক্ষকের নূতন ভূমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা, নূতন শৃঙ্খলা ও স্কুল গভর্ণমেণ্ট, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক শিক্ষাজগৎ ডিউইর কাছে ঋণী। কিন্তু এই সাথেই বলা দরকার যে বর্তমান আমেরিকাও তাঁর তত্ত্বকে পুনর্বিবেচনা করছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শনেরই বাস্তব রূপ। ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ, হিন্দুচেতনায় ত্যাগমন্ত্র, ইসলামী ঐতিহ্যের সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ব্যবহারবাদের সার্থক সমন্বয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি যথার্থ উত্তরাধিকারী। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সুকুমার কলার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবকে তিনি ধারণ করেছেন। তার উপরে ছিল জাতীয়তার প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের জীবন, চিন্তা ও কাজে দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ—(ক) সমন্বয় প্রয়াস, (খ) বিবর্তনবাদী চেতনা। **ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মদর্শনই ছিল তাঁর দর্শন-চেতনার মূলবস্তু।** বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্র সৃষ্টি পরম ব্রহ্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র। (তিনিই সৃষ্টি করেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যতান।) সুতরাং জীবনের পরম উদ্দেশ্য হলো শাশ্বত সত্যের সাথে জড়জীবন এবং মানবজীবনের ঐক্য অনুভব করা। চিরন্তনের অনুভূতিই পরম জ্ঞান। এই অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা কর্মগ্রাহ্য নয়, হৃদয়গ্রাহ্য। সুতরাং **রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা "হৃদয়ের শিক্ষা"। প্রকৃত শিক্ষা জীবনব্যাপী সাধনার বস্তু।** আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা, তার উদ্দেশ্য হবে সত্য, শিব ও সুন্দরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। **এই মহত্তানুভূতিই রূপায়িত হবে জীবনব্যাপী মহৎ কর্মে।**

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ ছাড়া জাতির দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন। মাতৃভাষার বিসর্জন, নিরক্ষরতা এবং সরকার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতায় মর্মাহত হয়ে তিনি অনুভব করেছেন যে শিক্ষা একটি জাতীয় সমস্যা এবং জাতীয় দায়িত্ব। পুঁথিপড়া বিদ্যার বোঝায় বুদ্ধিই যাচ্ছে ভোঁতা হয়ে, নিরক্ষরতা যাচ্ছে বেড়ে। চাপিয়ে দেওয়া হৃদয়হীন যান্ত্রিক শিক্ষার না আছে সংযোগ ব্যক্তির প্রয়োজনের সাথে, না আছে সংযোগ জাতির প্রয়োজনের সাথে। **প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অন্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আত্ম-নির্ভর এবং আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা।**

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হলো তাঁর অভিজ্ঞতা-তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির তত্ত্ব। প্রকৃতির পরিবেশে নিখিলের সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধের কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। সৃজনীকর্মের মাধ্যমে শিশু সংযুক্ত হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। মাতৃভাষার মাধ্যমে আহৃত জ্ঞান তার একান্ত নিজস্ব হয়ে উঠবে। গুরু-শিষ্যের

হৃদয়ের আদান-প্রদানে সৃষ্টি হবে ব্যক্তিত্ব ও সমাজচেতনা। এই হলো তপোবন শিক্ষার মূল আবেদন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্থিতিশীলতার সমর্থক ছিলেন না। সুষ্ঠু প্রগতিকে তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনাকেও তিনি নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছিলেন। **ঐতিহ্য এবং প্রগতির সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছিল শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা।**

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় স্থান পেয়েছিল আত্মনির্ভরতা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা। **এ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এক বিশেষ জীবনবিধি। মুক্তিই** এখানে মূল সুর। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার মাধ্যমে সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। আবার আবাসিক যৌথজীবন ও স্বয়ম্ভরতার মাধ্যমে সমাজচেতনা গড়ে উঠবে। **শ্রীমণ্ডিত, রুচিসম্মত সৌন্দর্যময় এই ব্যক্তিত্বের শিক্ষা দেশ জাতির সীমানার ঊর্ধ্বে বিশ্বনাগরিকতার ভিত্তি রচনা করবে।** কিন্তু এই বিশ্বনাগরিকতার শিকড় থাকবে নিজের মাটিতে, আপন সমাজজীবনের গভীরে প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথের এই চেতনাই মূর্ত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায়, যে ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার চেতনাটি রয়েছে সার্থকরূপে বিধৃত।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিক্ষাতাত্ত্বিক না হয়ে শিক্ষাকর্মীও হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ঐতিহ্যের প্রতিই তাঁর মমতা ছিল গভীর। প্রকৃতির উন্মুক্ত বদান্যতার মাঝে, গুরু-শিষ্যের হৃদয়-সম্পর্কের ভিত্তিতে তপোবন পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিণত জীবনে শুনেছিলেন বিশ্বমানবতার ঐক্যতান। বিশ্বচেতনার ফলে শান্তিনিকেতন রূপান্তরিত হলো 'বিশ্বভারতীতে'। প্রথম জীবনে মুক্তি চেয়েছিলেন উদার প্রকৃতির কোলে। দ্বিতীয় জীবনে মুক্তি চেয়েছেন বিশ্বমানবতাব হৃদয়সমুদ্রে। হৃদয়ের এই মুক্তি কেবল মুক্তিসাধনার পথেই সম্ভব। এ শুধু যুক্তির মুক্তি নয়, অনুভূতির মুক্তি।

উপরোক্ত মৌলিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(১) দার্শনিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী। পরমপুরুষের বিচিত্র প্রকাশকেই তিনি সত্য বলে জেনেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সামগ্রিক বিধি তিনি স্বীকার করেছেন। হৃদয় দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে এই বিচিত্র ঐক্যের মধ্যে পরমের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। "ভগবানের একটি প্রকাশ জগতের মাঝে, আর একটি প্রকাশ মানব সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।" সুতরাং নৈসর্গিক জগৎ, সমাজ জীবন ও মানবাত্মার একীকতার অনুভূতিই মনুষ্যত্বের সাধনা। মানবাত্মা গতিশীল বিশ্বাত্মারই নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি

মাত্র। সুতরাং "মানুষের আত্মা স্কুলের চেয়ে দেশের চেয়ে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়। বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতই মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়। মনুষ্যত্বের সাধনাই জীবন সাধনা। বাহিরের সহিত ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়াই জীবনের লক্ষণ।" রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, সম্পূর্ণ যোগ. কেবল বুদ্ধির নয়, বোধের যোগই জীবনের পরম কাম্য।

(২) কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্ত তথা হৃদয়ের যোগের অসম্পূর্ণতা অনুভব করেই তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষার মূল থাকবে জাতির জীবনে, রস আহরণ করবে জাতির জীবন থেকেই, সেবা করবে জাতিরই। বর্তমান ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই আত্মস্থ হয়নি। তিনি বলেছেন, "ভারতের শিক্ষা স্বধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, জাতীয়তা বোধের দ্বারা আবৃত নয়, গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে আমরা নিঃস্ব"। ভারতের নিজস্ব সাংস্কৃতিক গৌরব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন—প্রধানতঃ এই চারিশাখায় প্রবাহিত। ভারত চিত্ত গঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব।" কালক্রমে এর সঙ্গে মিলেছে মুসলীম সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান। তাই তিনি বলেছেন, "জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং শিক্ষা হবে জাতীয় বিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার সম্মিলিত রূপ।" টোল ও মাদ্রাসার শিক্ষাকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যার সার্থক প্রতিনিধি বলে মনে করেননি, কারণ এ শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের রূপটি বিধৃত নয়। যুগ সাধনার সঙ্গে শিক্ষা সাধনার সঙ্গতি প্রয়োজন। বাইরের বিদ্যাকে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করা প্রয়োজন। শিক্ষার সঙ্গে দেশের জীবন যাত্রার যোগ চাই—পুনরাবৃত্তি করবার শিক্ষাই শিক্ষা নয়, কারণ সে কাজ কলের দ্বারাও চলতে পারে। লব্ধবিদ্যার চর্চার দ্বারা মৌলিক বিদ্যার উদ্ভাবন প্রয়োজন। আর এখানেই আমাদের শিক্ষার প্রধান ত্রুটি. কারণ বিদেশী শাসনের স্বার্থে প্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের অন্নচিন্তা জড়িয়ে ছিল। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরির যোগ্যতা অর্জন নয়, মনুষ্যত্ব অর্জন।

পুরাতন শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্র সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমোরের চাকা ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই ..তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি

দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।"

(৩) পুরাতন শিক্ষার ব্যর্থতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাইনি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করিনি। সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে।--আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করোনা—একে স্বীকার করে নাও।"

কবি বলেছেন, "শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা শুধু সংবাদ বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানব জীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" জীবনের লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য; সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বাইরের সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়াই জীবনের লক্ষণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগই ভারতের সাধনা। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। 'সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যে বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।'

রবীন্দ্রনাথের কথায় জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। আমাদের শাস্ত্রে বলে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। একথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানিনে, তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কবি বলেছেন, "আমাদের প্রাচীনকালে যেসব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, তাঁরা কি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না!—সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি।—তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা। তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে? তাঁরা সত্যকে সকলের বড়ো বলে জানতেন, তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর কিছুতেই ভয় করতেন না—তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্য ভালোর জন্য চিন্তা করতেন।" রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন মহামানবরা যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়েছিলেন, সেই ব্রতই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা; অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এর উপর নির্ভর করে। জনমানসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস একনায়কত্বলোভেরই নামান্তর মাত্র।

(৪) শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ এবং উচ্চতর —

মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ সহজ নয়। মনুষ্যত্ব লাভই মানব জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং 'মানুষ' করে তোলাই শিক্ষা। এজন্য প্রয়োজন শক্তির প্রয়োগ, বড়ো হবার আশা, সুশিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা হৃদয়ে সুপ্তব্রহ্মকে জাগ্রত করা। আশা ও আত্মচেষ্টার সঙ্গে জাগ্রত ইচ্ছাশক্তির সমন্বয় প্রয়োজন।

সুতরাং দক্ষতা (skill) এবং সংস্কৃতির (culture) সমন্বয়ই শিক্ষার লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন মনের দাসত্ব মোচন, আত্মোপলব্ধি, পরস্পরের উপলব্ধির মাধ্যমে সামাজিক বোধের উন্মেষ এবং সমাজের যোগ্য হয়ে ওঠা। "সে শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে।"

(৫) অনমনীয় শিক্ষাব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে মনের মুক্তি সম্ভব নয়। **বিশ্ব-প্রকৃতির বিস্তীর্ণ ক্রোড়েই প্রকৃত মুক্তি সম্ভব।** বন্ধনের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিস্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। প্রাণের স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।"..."মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোন রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি।" "বিশ্ব প্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তার ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন, কোন মাস্টার কি তা পারে?—যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

(৬) প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ থেকেই রবীন্দ্রনাথ **আশ্রমের কল্পনা** করেছিলেন। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারতের শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে যে মানব-শিশু নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুগৃহে কঠিন নিয়মে সংযত জীবন যাপনের যে পদ্ধতিতে প্রাচীনকালের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হতো, সেইভাবে সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রত, ব্রহ্মব্রত অবলম্বন করে পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি আশ্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন। উপকরণ বিরল জীবনযাত্রা আশ্রমিক শিক্ষার

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সহযোগিতার ও আত্মনির্ভরতার সভ্যনীতিতে সচেতন করে তোলাই আশ্রমিক শিক্ষার প্রাধান সুযোগ ও উদ্দেশ্য।

(৭) **শিশুর মুক্তিই** এই শিক্ষার অন্যতম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "I believe that the object of education is the freedom of mind, which can only be achieved through the path of freedom—though freedom has its risk and responsibility as life itself has. Perfect freedom lies in the perfect harmony of relationship which we realise in this world not through our response to it, not through knowing but in being." তিনি বলেছেন, "মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাস ভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমের শিক্ষায় যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি, তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।" বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু বন্ধনকে নয়। তাই তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধিবিধান দ্বারা সুসংবদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই অঙ্গ বন্ধনের প্রয়োজন আছে।…সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে, কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ **ছাত্রদের কর্তব্যও** নির্দেশ করেছেন। যে কেউ জ্ঞানের অধিকার পায় না, বিদ্যালয়ে গেলেই বিদ্যালাভ হয় না। শিক্ষাকাল ছাত্রদের পক্ষে মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সান্নিধ্যে গুরুর সহবাসে ব্রহ্মচর্য পালনের পথেই মানুষ হওয়া সম্ভব। সংযমের তপস্যায় রিপুর বাধা অতিক্রম করেই বোধশক্তির মুক্তি সম্ভব। জ্ঞানের একমাত্র পথ সৃজনশীল তপস্যা। সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রত, স্বদেশব্রত, ব্রহ্মচর্যব্রত, ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তিই এই শিক্ষা-তপস্যার বৈশিষ্ট্য। সহযোগিতার সভ্যনীতি আয়ত্ত করা, আত্মকর্তৃত্ব অর্জন করা, আলস্য, অনৈপুণ্য ও বস্তুলুব্ধতাকে পরিহার করাই ছাত্রদের দায়িত্ব।

(৮) এই প্রসঙ্গে **পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও পরিবেশের সম্পর্ক** সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং সমাজের যোগ্য হওয়াই উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের সাধনা ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নয়। দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের পথেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

এবং সমাজধর্মের সামঞ্জস্য সম্ভব। সুগঠিত পারিবারিক জীবনে এই সামঞ্জস্য সর্বাধিক সম্ভব। গৃহজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "It represents the truth of human relationship; it reveals loyalty and love for the perso nality of man," সুতরাং 'ঘর যদি তেমনি ঘর হয়, তবে বাল্যজীবনে গৃহে শিক্ষাই সর্বোত্তম। বাপ মায়ের উচিত গোড়ার শিক্ষায় শিশুকে মনুষ্যত্বে পাকা করা, কোন নির্দিষ্ট পেশার জন্যে তৈরী করা নয়"। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই তিনি স্কুলসমাজ এবং আশ্রম সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। গৃহের পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্ভব নয় বলেই স্কুলের সৃষ্টি। কিন্তু প্রচলিত স্কুলও কারখানার তুল্য—যার সঙ্গে সমাজের কোন মিল নেই, অভিজ্ঞতার মিল নেই, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে মিল নেই। এই বিদ্যালয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে সকলকে একই ছাঁচে ঢালাই করা হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ আশ্রম সমাজের কল্পনা করেছেন যেখানে সুস্থ পরিবেশে শিশুর ক্রম-উন্মেষণ সম্ভব।

(৯) পরিপূর্ণ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ **পাঠক্রমের পরিকল্পনা** করেছেন। মানবিক সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য স্বীকার করে ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুস্থ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থে তিনি পৃথকভাবে রামায়ণ মহাভারত পাঠের কথা বলেছেন। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ গণজীবনে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি পাঠক্রমে গ্রহণ করেছেন। কারু ও চারুকলা—বিশেষতঃ শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যের তিনি উচ্চমূল্য স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবল মাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীত বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।" বস্তুতঃ সৌন্দর্যসাধনা রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই সূত্রেই **ভাষাশিক্ষার প্রশ্নটি** উল্লেখযোগ্য। একথা সর্বজনবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরিকল্পনায় মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে আলো জেলে বারান্দাটিকে তিনি অন্ধকারে রাখেননি। তাই আধুনিক অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী ও উর্দুর স্থান স্বীকার করেছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে একদিকে সংস্কৃত, পালি—প্রাকৃত এবং অপরদিকে আরবি

ও ফার্সি ভাষার যথোচিত মূল্য তিনি দিয়েছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষারও স্বীকৃত মূল্য রয়েছে। সর্বোপরি ইংরেজী ভাষাকেও বর্জন করেননি। কবি বলেছেন, "আমি বাঙালী বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি! আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক, যত কবি, যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন। এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?' বস্তুত শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি এই চেতনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

(১০) এই সূত্রেই পাঠক্রমের সাথে শিশুর খাপ খাওয়ানোর সমস্যা জাগে। রবীন্দ্রনাথ শুভ্রপ্রাণ শিশুদের স্বর্গদূত রূপে আখ্যা দিয়ে একথাও স্বীকার করেছেন যে তাদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে। বিকাশই হচ্ছে বিশ্ব-জগতের গোড়ার কথা। শৈশবকাল আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিকতার সময়। ক্রমে ভালবাসার সাহায্যে আসে আত্মপ্রসারতা। ইন্দ্রিয়ানুশীলন, অনুকরণ, অনুসন্ধিৎসা ও কল্পনার সাহায্যে শিশুর আত্মপ্রসারতা ঘটে। সে কখনও ইতিবাচক কখনও বা নেতিবাচক আত্মানুভূতির দোলায় দোলে। আনন্দময় জীবনে, সুস্থ ও উপযুক্ত পরিবেশে কর্ম থেকে কর্মান্তরে ছন্দায়িত গতির ভঙ্গিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আত্মগঠন করে। স্বভাবসুন্দর কৃত্রিমতাবর্জিত শিশু বিশ্বাস করতে ভালবাসে। গতিচঞ্চল ও প্রাণচঞ্চল মুক্ত শিশু খেলার ছলে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়। সুতরাং বিশেষ চিরাচরিত সংকীর্ণ ধারায় বন্দী না করে তার মুক্তিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর চাই ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অধ্যাপকদের কাছ থেকে একটু খাঁটি স্নেহ এরা যদি পায় তবে তার কাছে হৃদয় উৎসর্গ করে দিয়ে এরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

(১১) এই সূত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতির কথা উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রনাথের মতে চিত্তের গতি থেকে শিক্ষার পথ। প্রণালীর বাঁধন তিনি সমর্থন করেননি। "শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাকে বুঝতে পারে। আমরা শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে চাই প্রণালীর দ্বারা। প্রণালীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থানই সর্বাগ্রে। সুতরাং বহুতর উৎস থেকে বহুতর পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের তুলনা করেছেন ভগীরথের সঙ্গে। গুরু-শিষ্যের আত্মীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শিক্ষাদানকে তুলনা করেছেন বড় প্রদীপ শিখার স্পর্শে ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখা প্রজ্বলনের সঙ্গে।

কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা না বললেও নিকট থেকে দূরে, প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে, মূর্ত থেকে অমূর্তে যাওয়ার কথা তিনি বলেছেন। শিক্ষা হবে জীবনযাত্রার অঙ্গ, একতালে চলবে, ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। ইন্দ্রিয়ানুশীলন, অনুভূতি, প্রকৃতিবীক্ষণ, গঠনমূলক কর্মোদ্যমও তাঁর পরিকল্পনা স্বীকৃত। পুঁথির ভারে জর্জরিত হওয়ার পরিবর্তে বস্তু সংগ্রহ, পশুপালন, বাগানের কাজ, সেবামূলক কাজ, খেলাধুলা, গল্প বলা, সঙ্গীত, নাটক, ঋতু উৎসব, হাতের কাজ পরিবেশ পরিচিতি, চড়ুইভাতি, দেওয়ালপত্র ও ম্যাগাজিন প্রভৃতি নানাবিধ স্বাধীন কর্মোদ্যমই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্গত। এ সবের বহুলাংশই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষণ পদ্ধতি, এমনকি হিউরিষ্টিক পদ্ধতির সঙ্গে তুল্য। জ্ঞান প্রয়াসের যে পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করেছেন, তারই প্রয়োগ ঘটেছে 'সহজপাঠ' গ্রন্থমালায়।

(১২) পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ শিক্ষকের হাতে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব এবং গুণাগুণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধই না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তবে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। তপোবনের কেন্দ্র স্থলে আছেন গুরু। তপস্যার গতিমান ধারায় শিশুদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাবে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান—অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল, আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান।

"... গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনাপাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাদের স্বাভাবিক।...গুরু করবেন বিদ্যাসৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ংপ্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।"

(১৩) এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "প্রাচীন কালে ছিল তপোবন, সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন ; রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্য তপোভূমি রচিত হয়েছে। আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেখানে বাঁধানিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রী বানাবার কারখানাও আছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য, কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন। তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা।"

(১৪) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনা মূর্ত রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায়। শিক্ষা চেতনার বিবর্তনেই এসেছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম চেতনা থেকে বিশ্বভারতী চেতনা। তাঁর নিজস্ব ভাষাতেই এই বিবর্তনের রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। "আমার আকাঙ্ক্ষা হল আমি ছেলেদের খুশি করব। প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে · এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ নিকেতনের নীড় তৈরী করে তুলব। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে।....তখন আর যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বান সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাস্টারের আহ্বান নয়। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্যমুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।... বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক রূপরস গন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে পরম ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুল মাস্টারের বেতের ডগায় শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়।... শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই। কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে।"

"এখানকার শিশুশিক্ষার আর একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোট ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই।...ক্রমশ আমার মনে হলো যে, মানুষে মানুষে য ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে ক্তি দিতে হবে।...এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের

তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই ভারতে ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।... সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকে আমরা বলি বিশ্বভারতী।....ধন সম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে; সত্য সম্পদই ভেদ অতিক্রম করবার শক্তি রাখে।...মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজন বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প। বিশ্বভারতীতে ভারতে নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার যে সম্পদ উপলব্ধি করুক যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।...এই জায়গা তীর্থ। দেশ-বিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে—আঃ, বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।....ভারতের বিরাট কড়া বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সে তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধন আমাদের চাইতো।...বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয়, তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হলো না। আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও ফার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চার আনুষঙ্গিকরূপে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে।...সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। সেখানে যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারত চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।"

জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর প্রশ্নে বিভ্রান্ত মানবমনের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই সাধনার বাণী আজ বিশেষ মূল্যের দাবি রাখে।

(১৫) সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ কেবল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সাধনাতেই নিজেকে সীমিত রাখেন নি, শিক্ষার সঙ্গে সেবাধর্ম, বৃত্তিমূলক কর্মোদ্যম, এবং গঠনাত্মক কর্মপ্রয়াসের সংযোগ সাধন করেছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান, লোকশিক্ষা সংসদ, বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার, দেশের সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা তারই সাক্ষ্য।

হয়তো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই তিনি বলেছেন, "আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরী হয়ে উঠছে। আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোন ব্যক্তি নিজের আদেশ নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়।"